শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ(১৯৮৩-২০০৫)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা-১০০০

Dhaka University Library
466245

466245

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

DIGITIZED

উপস্থাপনায়

মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
পি-এইচ.ডি.গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা
মে'২০১৩ খ্রি.

পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৩ খ্রি.

GIFT
Dhaka University Institutional Repository

শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ(১৯৮৩-২০০৫)

পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক , ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
মে-২০১৩ খ্রি.

466245

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপস্থাপনায়
মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
পি-এইচ.ডি.গবেষক
রেজি : নং - ২০/২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা
যোগদানের তারিখ : ২৩/১১/২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ(১৯৮৩-২০০৫)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ-এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম।

আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোনভাষাতেই এই শিরোনামে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্যে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি। এটি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্যে পরীক্ষা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

466245

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম মানবতা-নৈতিকতা ও কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। মানব জাতি পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে বিগত তিনশ বছরে চারটি প্রধান অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছে, সেগুলো হচ্ছে : পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এসব মতবাদ মৌলিকভাবে ও বৈশিষ্ট্যগত একই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয় ; বরং অর্থনৈতিক বিষয়াদি আচরণের সূত্র দ্বারাই সমাধান করা যায় এবং নৈতিক সামাজিক বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এসব মতবাদের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও তা মানব জাতির প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও দক্ষতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এ অর্থনীতি আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন ও বৈষম্যদূরীকরণে তৎপর এবং শোষণ ও দারিদ্রমুক্ত শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান কায়েম করা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে সমগ্র বিশ্বের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংকের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। ব্যাংককে কেন্দ্র করে একটি দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য আবর্তিত হয়। ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া, ব্যবসা বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অসম্ভব। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। তাই এ ব্যবস্থা ক্রমবিকাশমান এবং বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ইতোমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোকাবেলায় সুদমুক্ত এ ব্যবস্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে এবং আগামীতে এর বিকাশের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলাম হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন যেমন নিষিদ্ধ করেছে তেমনি অর্থ উপার্জনের হালাল পন্থারও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে, আল-কুরআনের যে আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সুদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন, সে আয়াতেই সুদের পরিবর্তে বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের পথও দেখিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদ বর্জন করে ক্রয়-বিক্রয় এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়ন ও বিনিয়োগের বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রধান আকর্ষণ ইসলামী শরীআহ'র নীতিমালা অনুসরণ। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল প্রাপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে শরীআহ্ পরিপালনের উপর। শরীআহ্ পরিপালনের দিক নির্দেশনা সম্বলিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার অভাব রয়েছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংকব্যবস্থা যেখানে চার শতাব্দীকাল অতিক্রম করে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়েছে, সেখানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মাত্র চার দশক অতিক্রম করেছে। তবে ইসলামী পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অনেক সুযোগ ও ক্ষেত্র রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে , ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার নিমিত্তে তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুশীলন অত্যাবশ্যক। শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মৌলতত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে এককভাবে আজ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয়নি বিধায় আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা অত্যাবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান 'শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ (১৯৮৩-২০০৫)' বিষয়টি উক্ত গবেষণারই একটি প্রয়াস মাত্র। ইসলামী অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ ইসলামী ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক কাঠামো, মূলনীতি , বৈশিষ্ট্য , লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য , শরীআহ্‌সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সঠিক তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত-উপকরণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণা-অনুসন্ধানে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সার্বিক কার্যক্রমে ইসলামী শরীআহ্‌র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ যেন যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় এবং পরিণামে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয় তা-ই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট- সারসংক্ষেপ

শিরোনাম : শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ(১৯৮৩-২০০৫)

আমার অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ (১৯৮৩-২০০৫) এর অনুসন্ধান গবেষণার সুবিধার্থে এ অভিসন্দর্ভটিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোকে আবার শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায় : ইসলামী শরীআহ : ধারণা , লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যাংক : পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা : এর মুলনীতি, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

চতুর্থ অধ্যায় : শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব , প্রয়োগ ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে এর কার্যক্রম

পঞ্চম অধ্যায় : রিবা : শ্রেণী বিন্যাস ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও শ্রেণীবিন্যাস

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য , সম্ভাবনা ও সমস্যা

প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী শরীআহ্‌র পরিচিতি, মৌল ও সম্পূরক উৎসসমূহ , প্রকৃতি -বৈশিষ্ট্য , শরীআহ'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য , ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্ পরিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাংকের ধারণা , উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সবশেষে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচিতি, মুলনীতি, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসহ প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থাসমূহের মুলনীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকের ধারণা , তাত্ত্বিক কাঠামো , ইসলামী ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রয়োগ-পদ্ধতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য , কর্মনীতি-কর্মকৌশল পদ্ধতি , আমানত গ্রহণ পদ্ধতি, ব্যাংকের তহবিল গঠন, ব্যাংক তহবিলের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমের উপর আলোচনা করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১২খ্রি. পর্যন্ত সার্বিক কার্যক্রমের উপর তথ্যভিত্তিক একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রিবার (সুদ) ধারণা, শ্রেণীবিন্যাস , রিবা সম্পর্কে ইসলামী শরীআহ'র হুকুম , রিবা নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে রিবার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি (Modes of Investment) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি প্রত্যেকটি পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে ইসলামী শরীআহ্'র ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারণা, বাণিজ্য-নীতি, নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, বিনিময় , বিনিময় হার সম্পর্কে প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে শরীআহ্সম্মত উপায়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সম্ভাবনা, সাফল্য ও অগ্রগতি এবং এ ক্ষেত্রে যে, সব চ্যালেঞ্জ , সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে এসব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমে যথাযথভাবে শরীআহ পরিপালন সম্পর্কিত কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
পি-এইচ.ডি.গবেষক
রেজি : নং - ২০/২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর শত-সহস্র দরুদ ও সালাম যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও সার্বজনীন জীবনাদর্শ ইসলাম। পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহে "শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা পর্যালোচনা: মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ।(১৯৮৩-২০০৫)" শিরোনামে আমার লেখা এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করা হলো। সর্বপ্রথমে আমার এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা আমার রচিত অভিসন্দর্ভের শিরোনাম, অধ্যায়, উপ-অধ্যায়, বিন্যাস, উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় তার সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় গবেষণা কর্মটি মান-সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর এ ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার এই গবেষণা কর্মে যে সকল প্রতিষ্ঠান- গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী , বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (BIIT) লাইব্রেরী, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিচার্স ব্যুরো(IERB), সেন্ট্রাল শরীআহ্‌ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংকস ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি(IBTRA), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী অন্যতম। গবেষণা কর্মে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত-উপকরণ সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে যে সকল বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ (১৯৮৩-২০০৫)" শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

৫।৫।১৬

(মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ)
পি-এইচ.ডি.গবেষক
রেজি : নং - ২০/২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত পরিচিতি	
(আল-কুরআন, ৪ : ২৯)	প্রথম সংখ্যা- সূরার, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের (যেমন-৪র্থ সূরা আন্ নিসার ২৯ নং আয়াত)
(সা.)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(আ.)	আলাইহিস সালাম বা আলাইহাস সালাম বা আলাইহিমুস সালাম
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বা 'আনহুম 'আনহা বা 'আনহুন্না
(বাং)	বাংলা
(ইং)	ইংরেজী
(খ্রি.)	খ্রিষ্টাব্দ
(হি.)	হিজরী
(বি.দ্র.)	বিশেষ দ্রষ্টব্য
(ড.)	ডক্টর
(লি.)	লিমিটেড
(খ.)	খন্ড
(পৃ.)	পৃষ্ঠা
(অনু./অনূ.)	অনুবাদ / অনূদিত
(সং)	সংস্করণ
(ই.ফা.বা)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
(তা. বি.)	তারিখ. বিহীন
AAOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
A.D.	After Death.
BIIT	Bangladesh Institute Of Islamic Thought
CRR	Cash Reserve Ratio
Exp Form	Export Form
HPSM	Hire Purchase under Shirkatul Meelk
IDB	Islamic Development Bank
IERB	Islamic Economic Research Bureau
IRTI	Islamic Research & Training Institute
IBTRA	Islamic Banks Training Research Academy
IAIB	International Association of Islamic Banks
IIIE	International Institute of Islamic Economics
L/C	Letter of Credit
OIC	Organization of Islamic Conference
PLS	Profit and Loss Sharing Account
LCAF	Letter of Credit Authorization Form
SLR	Statutory Liquidity Reserve

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا	অ	ز	য	ق	ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	দ	ن	ন
ح	হ	ط	ত্ব	و	ও/উ/ব
خ	খ	ظ	জ	ه	হ
د	দ	ع	‘অ	ء	য়
ذ	য	غ	গ্ব	ي	য়
ر	র	ف	ফ		

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরীআহ্ : ধারণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১-১৬)

* শরীআহ'র ধারণা ১
* শরীআহ শব্দের অর্থ ও পরিচিতি ২
* ইসলামী শরীআহ'র উৎসসমূহ ৬
* ইসলামী শরীআহ'র পরিধি ও পরিব্যাপ্তি ৮
* ইসলামী শরীআহ'র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১১
* ইসলামী শরীআহ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৩
* ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ পরিপালন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাংক : পরিচিতি, ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা (১৭-৫৮)

* বিনিময় প্রথার প্রচলন ১৭
* মুদ্রার ক্রমবিবর্তন ১৯
* কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ১৯
* মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক ২০
* ব্যাংক: অর্থ ও উৎপত্তি ২১
* ব্যাংক-এর পরিচিতি ২৩
* কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২৬
* বাণিজ্যিক ব্যাংক ২৭
* ব্যাংক : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২৯
* ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের অবদান ৩৬
* ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৯
  - ▪ ব্যাংক ব্যবস্থা : বাংলাদেশে নবযাত্রা ৪৪
  - ▪ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার দ্বিতীয় ৪৫
  - ▪ বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং কাঠামো (২০১২খ্রি. পর্যন্ত) ৪৬
  - ▪ বাংলাদেশর বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪৮
* আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে বিশ্বের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাংক ৪৯
* আধুনিক ও বিশ্বখ্যাত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ৫০
* কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৫২
* ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫৩
* বিশ্বের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫৪
* ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশ ৫৫
* বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ৫৭
* ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ধারণা ৫৭
* ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ধারণা ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থা : মূলনীতি,বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (৫৯-১৬৫)
* আধুনিক অর্থশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ৬০
* `Economics'শব্দটির অর্থ ও উৎপত্তি ৬১
* অর্থনীতির পরিচিতি, পরিধি ও বিষয়বস্তু ৬২
* ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি, প্রকৃতি ও পারস্পরিক গুরুত্ব ৬৮
* সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ৭০
* পুঁজিবাদ অর্থ ব্যবস্থা ৭১
* পুঁজিবাদের মূলনীতিসমূহ ৭২
* পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৭৭
* সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরিচিতি ৭৮
* সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ ৮০
* সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৮৬
* মিশ্র অর্থব্যবস্থা ৮৭
* মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৯
* মুক্তবাজার অর্থনীতি ৮৯
* বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ৯১
* ইসলামী অর্থব্যবস্থা ৯১
* ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি ৯৫
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ৯৭
* ইসলামী অর্থব্যবস্থায় খিলাফাতের ধারণা ১০০
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১০৫
* বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ১২৭
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ ১২৯
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য ১৪৩
* ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১৫৭
* যাকাত ও 'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক উপাদান : সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ১৬৩
* যাকাতের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক পরিচিতি ১৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

শরীআহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব প্রয়োগ ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে এর কার্যক্রম (১৬৬-২৬৫)
* ইসলামী ব্যাংকের ধারণা/সংজ্ঞা ১৬৭
* ইসলামী ব্যাংক-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৬৮
* ইসলামী ব্যাংক এর বৈশিষ্ট্য ১৭০
* ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৭২
  - এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা ১৭৬
  - ইসলামী ব্যাংকিং এর সহযোগী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৭৭
  - আন্তর্জাতিক পরিসরে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক ১৭৯
  - বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ১৮৮
  - বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রগতি ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

* ইসলামী ব্যাংক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৯১
* ইসলামী ব্যাংকিং ও ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং-এর পার্থক্য ১৯৭
* সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য ২০০
* চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী শরীআহ'র নীতিমালা ২০২
* ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ ২০৭
* ক্রয়-বিক্রয়ের খিয়ার বা অধিকার : ইসলামী শরীআহ'র নীতিমালা ২০৮
* ইকালা বা চুক্তি বাতিলের অধিকার ২১১
* ব্যাংক-এর তহবিল (Bank's Fund) ২১২
* ব্যাংক-এর আমানত (Bank's Deposit) ২১৭
* ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ ২২৪
* আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ ২২৬
* শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ ২২৭
* এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ ২২৮
* আল-ওয়াদিয়া ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব- এর মধ্যে পার্থক্য ২২৯
* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা ২৩০
    - ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২৩০
    - আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩০
    - খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৩২
    - শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৩২
    - বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৩৩
* আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৩৫
    - আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩৫
    - খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৩৭
    - শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৩৭
    - বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৩৮
* আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৪০
    - আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৪০
    - খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৪১
    - শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৪১
    - বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৪২
* সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৪৪
    - আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৪৪
    - খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৪৫
    - শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৪৫
    - বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৪৬
* এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২৪৮
    - আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৪৮
    - খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৪৯
    - শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৪৯
    - বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

* ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৫২
- আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৫২
- খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৫৩
- শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৫৩
- বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৫৪

* শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৫৬
- আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৫৬
- খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় ২৫৮
- শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগমঞ্জুরী ২৫৯
- বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান ২৫৯

* শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ : পরিচিতি ও কার্যক্রম ২৬১
* সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড-এর সদস্য ব্যাংক সমূহ ২৬২
* শরীআহ্ বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি ২৬৩
* ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ২৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

রিবা : পরিচিতি, শ্রেণীবিন্যাস ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি (২৬৬-২৮৬)

* রিবা'র আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক পরিচিতি ২৬৬
* রিবা'র (সুদ) শ্রেণীবিন্যাস ২৭০
* রিবা আন-নাসিয়াহ ২৭০
* রিবা আন-নাসিয়ার বৈশিষ্ট্য ২৭২
* রিবা আল-ফাদল ২৭২
* রিবা আল-ফাদল-এর বৈশিষ্ট্য ২৭৩
* Usury,Interest,সুদ ও কুসীদ রিবা'র-ই প্রতিশব্দ : একটি বিশ্লেষণ ২৭৪
* Interest শব্দটির ব্যাখ্যা। ২৭৫
* রিবা সম্পর্কে ইসলামী শরীআহ'র সিদ্ধান্ত বা হুকুম ২৭৭
* ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হবার কারণ ও এর অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য ২৭৯
* আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ২৮২
* পূর্ববর্তী ধর্ম ও সভ্যতায় সুদ ২৮৪
* দর্শন ও সাহিত্যে সুদ ২৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও শ্রেণী বিন্যাস (২৮৭-৩২২)

* বাই' মুরাবাহা (চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়) ২৮৮
* বাই'মুয়াজ্জাল (বাকীতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়) ২৯৫
* বাই'মুরাবাহা ও বাই'মুয়াজ্জাল-এর পার্থক্য ২৯৮
* বাই'সালাম (অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়) ২৯৯
* ইসতিস্না ৩০২
* বাই'সালাম ও বাই'ইসতিসনার পার্থক্য ৩০৪
* বাই' পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

* মুশারাকা (অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য) ৩০৫
* মুদারাবা (স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা ভাগাভাগিতে বিনিয়োগ) ৩১২
* ইজারা (Leasing, Hiring or Renting Mechanism) ৩১৮
* ইস্‌তিসনা এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য ৩২২

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় (৩২৩-৩৬৯)

* বৈদেশিক বাণিজ্য ৩২৩
* বৈদেশিক বিনিময় , বিনিময়ের উদ্দেশ্য , নীতি , কার্যাবলী এবং বিনিময় হার ৩৩২
* ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামের নীতিমালা ৩৪৩
* ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরীআহর নীতিমালা : বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৩৪৪
* ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরীআহর নীতিমালা : রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৩৪৫
* ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রের অর্থায়নে ইসলামী পদ্ধতি ৩৫৫
* ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিং এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের শরীআহ্‌ নীতিমালা ৩৫৬
* বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা এবং ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্টাক্ট ৩৫৬
* কারেন্সি (মুদ্রা) বেচা-কেনার মূলনীতি ৩৫৯
* ব্যাংক গ্যারান্টি : শরী'আহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬০
* ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরীআহর নীতিমালা: আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৩৬৩
* ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর (Remittance) ৩৬৯

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য , সম্ভাবনা ও সমস্যা (৩৭০-৩৯৭)

* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : অগ্রগতি ও সাফল্য ৩৭১
* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ৩৭২
* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ৩৮৩
* ইসলামী শরীআহ্‌র লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের করণীয় সম্পর্কে কিছু সুপারিশ ৩৯২
* ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ পরিপালন সম্পর্কে কিছু সুপারিশ ৩৯৫
* উপসংহার ৩৯৭
* গ্রন্থপঞ্জি (৩৯৮-৪১০)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরীআহ্: ধারণা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারস্পরিক লেনদেন, সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন, আত্মীয়তা, শত্রুতা, শিক্ষা-দীক্ষা, দেশ শাসন ও ব্যবস্থাপনা, আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক যুদ্ধ ও সন্ধি সবকিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা, বিধি-বিধান ও দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামী শরী'আহ্তে।

ইসলামী শরীআহ্তে আত্মশুদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে, তা মানুষের মনকে জাগ্রত ও সচেতন করে; হৃদয় ও মানসিকতাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে; সব কল্যাণকর কাজের প্রতি প্রবণতা জাগায়; কল্যাণকর ভাবধারার স্ফুরণ ঘটায়; অন্যায়ের প্রতিরোধ করে; কুস্বভাব ও অশ্লীল ভাবধারাকে দমন করে। মানব রচিত আইন-বিধানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তি ও দন্ডদানের বিভীষিকা সৃষ্টিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ইসলামী শরীআহ্ আল্লাহর নাযিল করা সর্বশেষ বিধান হিসাবে দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যাশী। একটি হল, আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন ও সে সম্পর্ককে যথার্থ ও গভীরতরকরণ এবং দ্বিতীয়টি হল, মানুষের পরস্পরের মধ্যে সঠিক ও যথোপযুক্ত সম্পর্ক নির্ধারণ, স্থাপন ও সংগঠন। এর প্রথমটি হচ্ছে দ্বিতীয়টির ভিত্তি।

শ্বাশত শরী'আহ্র মূল ভিত্তি হচ্ছে- আল-কুরআন, রাসূল (সা.)- এর সুন্নাহ্, ইজমা' ও ক্বিয়াস। এ ছাড়াও রয়েছে সম্পূরক ও সহযোগী উৎস ইস্তিহ্সান, ইসতিস্লাহ, ইসতিদ্লাল, ইজতিহাদ,'উরফ বা প্রথা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা, আমালু আহলিল মদীনা, আল-যারাঈ' ও আল-ইস্তিস্হাব।

একটি বিশ্বজনীন জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামে ইবাদাতসহ মানুষের কর্মময় জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও আদর্শিক কাঠামো রয়েছে, তা-ই হল ইসলামী শরী'আহ্। তাই সত্যিকার অর্থে কর্মময় জীবনে সঠিক ইসলাম অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্যে, ইসলামিক বিধি-বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্যে, ইসলামের দাবী অনুযায়ী মানব জীবন গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিদিন ও প্রতিমূহুর্তে একজন মুসলিমকে শরী'আহ্ সম্পর্কে সদা-সচেতন ও জাগ্রত থাকতে হয়। কারণ তার কাজটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এবং বিশ্বনবী (সা.)- এর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী হল কিনা, এ বিষয়ের নিশ্চিত মানদন্ড হল ইসলামী শরী'আহ্ । ইসলামী তরীকায় জীবন-যাপন করতে হলে শরী'আহ্র মূল বিষয়, প্রকৃতি, পরিধি-ব্যাপ্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। বস্তুত, এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

☐ শরী'আহ্ শব্দের অর্থ ও পরিচিতি

شريعة অনুরূপ شَرعة , شِرعة, مَشْرعة' আরবী ভাষায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ; ঘাট, পানি পান করার স্থান, এমন জায়গা যেখানে পানি পান করার জন্যে সহজে পৌছা যায়, নদী বা সমুদ্র তীরের এমন স্থান যেখানে জীবজন্তু পানি পান করার জন্য অবতরণ করতে পারে।[১] আরবী ভাষায় বারান্দা, চৌকাঠ, অভ্যাস বর্ণনা, প্রকাশ করা ও ব্যাখ্যা প্রদান করার অর্থেও বর্ণিত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। আল্লামা ইব্ন মানযূর বলেন,

"আরববাসী কেবল সেই পানিকেই শরী'আহ্ নামে অভিহিত করে থাকে, যে পানি নিরবচ্ছিন্ন, উন্মুক্ত ঝরনা ও প্রস্রবন আকারে প্রবাহিত এবং পানি গ্রহণের জন্য রশি বা রজ্জু এরকম কোন বাহন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না"।[২] আবার দীন, মিল্লাত, পন্থা, পথ, দৃষ্টান্ত, নমুনা, উপমা ও মাযহাবকেও شريعة বলা হয়।[৩]

প্রকাশ ও বর্ণনা অর্থে যেমন বলা হয়, شرع الله كذا - আল্লাহ এরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪]

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী বলেন, والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شرعة وشرعة وشريعة ذلك للطريقة الالهية[৫]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)- এর মতে, الشرعة ماورد به القران والمنهاج ماورد به السنة -[৬]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)- বলেন,

"শরী'আহ্ শব্দটি আভিধানিক অর্থে সেই পানিকে বোঝায়, যেখানে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং একত্রিত হয়ে তা পান করে"।[৭]

গাজী শামসুর রহমান বলেন,

"শরী'আহ্ শব্দটি একবচন এর বহুবচন হচ্ছে শারাঈ'। জনসাধারণের পথ এবং তৃষ্ণার্থ আশ্রম। আরব বাসীগণ শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করত। জলাধারমূখী পথের ক্ষেত্রে যে পথ সকলের জন্য দৃষ্টিগোচর হত এবং স্থায়ী। তিনি লিসানুল আরব অভিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শরী'আহ্ শব্দটি এভাবেই (High Way) বা চলার সরল পথ হতে উৎপন্ন হয়েছে"।[৮]

ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে শরীআহ্ বলতে বুঝায় সে সব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারী করেছে। জারী করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তার প্রতি ঈমান গ্রহনণ করে তদনুযায়ী আমল করবে এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করবে। এই আদেশ-নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে কতগুলো কাজ পর্যায়ের, হতে পারে আকীদা-বিশ্বাস পর্যায়ের এবং চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের। এ আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ সমন্বিত বিধান অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠু ভিত্তিক। হৃদয়-মন, জীবন ও বিবেক-বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এ-ই হচ্ছে একমাত্র পথ।[৯]

---

১. আল্লামা ইব্ন মানযূর, *লিসান আল-আরব* (আল-কাহেরাঃ দার আল-হাদীস, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫.পৃ.৮২

২. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৩

৩. প্রাগুক্ত

৪. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী আল-গারীব আল-কুরআন* (মিসরঃ আল-মাকতাবাতু আল-তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৬১

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরী'আতের উৎস* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৯

৮. গাজী শামসুর রহমান, *মুসলিম আইনের ভাষ্য* (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০০ খ্রি.) পৃ.১০

৯. ইমাম শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফী উসূল আশ-শরীআহ্* (কাহেরাঃ আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফিকীয়্যাহ ২০০৩ খ্রি.), খ.১, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইব্‌ন মানযূর- এর মতে,

"ইসলামী পরিভাষায় شَرِيعَة شِرعَة ,বলা হয় জীবন চলার সেই পথ ও পদ্ধতিকে (দীন), যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং অনুসরণ করে চলার নির্দেশও দিয়েছেন। যেমনঃ- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ও অপরাপর সৎ কর্মসমূহ"।[১]

জুরজানী (রহ.) বলেন,

شَرِيعَة شِرعَة , হচ্ছে, এক ঐশী বা ধর্মীয় পথ যার অনুসরণ করে বান্দা স্বীয় জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ মান্য করে"।[২]

আবদুন নবী আহম্মদ নাগরী (রহ.)- এর মতে,

"এমনিভাবে شَرِيعَة شِرعَة ' দ্বারা দীনের সে সমস্ত জিনিসকে বুঝানো হয় যা আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের জন্য প্রকাশ করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত ও সার কথা হচ্ছে شَرِيعَة شِرعَة দ্বারা সেই সুপরিচিত ও প্রচলিত পথ ও পন্থা বা জীবন-বিধান বুঝায় যা বিশ্ব নবী (সা.)- হতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে"।[৩]

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী (রহ.)- এর মতে,

شريعة شِرعَة হচ্ছে সেই পথ যার অনুসরণে পার্থিব কল্যাণও লাভ করা যেতে পারে। তখন এটা সংস্কার ও সংগঠন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ফলপ্রসু হবে। অনুরূপ ইহা দীনী ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও অনসৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইহা আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের উৎস হিসেবে কাজ করবে"।[৪]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের মতে,

" شريعة' হচ্ছে এক সুদৃঢ় পথ যা দ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হেদায়েত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে। এর দুটি জিনিসই মানুষের পিপাসা নিবৃত্ত করে বলে এদুয়ের পারস্পারিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য স্পষ্ট"।[৫]

তিনি আরো বলেন,

" ইসলামী শরীআহ্‌র উৎস বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর ইল্‌ম এবং মানবতার প্রতি তাঁর নির্বিশেষে কল্যাণ কামনা। আর মানবরচিত আইন-বিধান কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির নিজস্ব অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও চিন্তা বিবেচনাপ্রসূত। এ দুটি কখনই সমান ও অভিন্ন হতে পারে না-না মর্যাদার দিক দিয়ে, না পরিণতি ও ফলাফলের বিচারে।[৬]

---

১. আল্লামা ইব্‌ন মানযূর প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২৬১, এ বিষয়ে তিনি বলেন, الشريعة والشرعة ما سن الله من الدين وامربه كالصلاة والصوم والزكات والحج

২. আশ-শরীফ আলজুরজানী (রহ.)- *কিতাব আল-তা'রীফ* (১৯৫৮খ্রি.), পৃ.১৩২

৩. আবদুন নবী আহম্মদ নাগরী (রহ), *দাসতুরুল উলামা* (১৯ ৪৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৩২

৪. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯ তিনি বলেন الطريقة المستقيمة التي يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا

৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উসূলবিদদের পরিভাষায়,

شريعة , شرعة বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বুঝায় যা পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর সাথে সম্পৃক্ত। এ হিসেবে সরল ও নিরাপদ রাস্তাকে শরীআহ্ বা শিরআহ্ বলে। সে মর্মে শরীআহ্ এক নিরাপদ ও সরল পথ যা তার পথিককে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণময় ও পূণ্যময় গন্তব্যে পৌঁছায়"। [১]

উল্লেখ্য, অতীতকালে শরীআহ্ ও শিরআহ্ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সে সকল বিধি-বিধান বুঝাত যা মানবীয় ইচ্ছাধীন আমলসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তীতে ঐসব বিধি-বিধান যেগুলো চরিত্র ও নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত ঐগুলো পৃথক করে আদাব নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফিকাহ্সহ তাফসীর, হাদীস ও সংশ্লিষ্ট ইলমসমূহের জ্ঞানকে শরীআহ্' বা শারাঈ' বলা হয়। আহকাম-ই-শারঈয়্যার বর্ণনাকে শারীআহ্ বোঝানো হয়। এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তরীকা বা পদ্ধতি ও ঐশী বিধানসমূহ যা বিশ্ব নবী (সা.)- দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তাকেই শরীআহ্ বলে। উসূল-ই-ফিকহকে উসূলে শারআহ্ও বলা হয়।

শরীআহ্ পরিভাষাটিই মুসলিম বিশ্বে সুদীর্ঘ অতীত কাল থেকে পরিচিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। এ শব্দটি সরাসরি আল-কুরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআনের ঘোষণা:

"এর পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর ; সূতরাং তুমি এর অনুসরণ কর, অজ্ঞলোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না"। [২]

আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.)- বলেন,

"আয়াতে দীনের বিশেষ বিধান বলতে সত্য ও সরল পথ, যার উপর সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তাকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূলল্লাহ (সা.)- কে উম্মতের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যেন আপনার উম্মত তাদের অনুসরণ না করে যাদের কিতাব থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নেই। তারা দার্শনিকদের মত ডাবল মূর্খ হোক; কি কুরায়েশ নেতৃবর্গের মত একক মূর্খতার শিকার হোক। কুরায়েশ প্রধানেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে বলত, তোমার বাপদাদার ধর্মে ফিরে এসো, কারণ তারা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। [৩]

শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদাহ শরীআহ সম্পর্কে বলেন,

"শরীআহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী বিশেষ এবং প্রণেতার কুদরত, ক্ষমতা মহত্ত্ব, তাঁর পূর্ণত্ব ও মহাজ্ঞানের সাক্ষ্যবহনকারী। মহাজ্ঞানী ও মহাসাংবাদিক আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান যেরূপ প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে তদ্রূপ তাঁর রচিত শরীআহ্র আইনও বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় অবস্থাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এর ভেতর কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অবকাশ নেই"। [৪]

---

১. আহম্মদ খলীল, ফী আল-তাশরীঈ' আল-ইসলামী, (কায়রো: আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফীকিয়্যা, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪

২. আল-কুরআন, ৪৫:১৮

৩. আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)- তাফসীরে মাযহারী অনু: সম্পাদনা পরিষদ(ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.), খ.১১, পৃ. ১৯১

৪. শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদা ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন, অনু মাওলানা কারামত আলী নিযামী (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র.) বলেন,

"দীন ইসলামের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে যেমন:- তাওহীদ; আখিরাত ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক আকিদা- বিশ্বাস প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মতের জন্য এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন সম্ভব নয়। কিন্তু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের শরীআহ্তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধানকেই দীনের এক বিশেষ তারীকা-বা পদ্ধতি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে"।[১]

আল্লামা বায়যাভী (রহ.)-বলেন,

" দীন বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরীআহ্ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্ব নবী (সা.)- কে। যারা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত তাদেরকে অনুসরণ করা যাবে না। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রবৃত্তির অনুসারী হল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ"।[২]

আল্লামা যামাখশারী (রহ.)- বলেন, علي شريعة দীনের বিশেষ তারীকাহ্ বা পদ্ধতির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সূতরাং আপনি শরীআহ্কে অনুসরণ করুন যে শরীআহ الثابتة باالدلا ئل والحجة- ولا تتبع ما لا حجة عليه من اهوال الجهال ودينهم المبني علي هوي وبدعة- وهم روسا قريش حين قالوا ارجع الي دين ابا ئك-[৩]

শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদা বলেন,

" শরীআহ্র আইনই হচ্ছে সর্বপ্রথম আইন যা মানুষের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাম্য ও সাধারণ সুবিচারের ধ্যান-ধারণাটিকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং তাদের উপর সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে সহযোগী হওয়া এবং ন্যায়ের আদেশ লাভের দিক দিয়ে মানব রচিত আইন শরীআহ্ আইনের পাশেও দাঁড়াতে পারে না। মুসলমানদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, তারা যতদিন শরীআহ্র আঁচল আঁকড়িয়ে রয়েছিল ততদিন এ জগতে তারা উন্নতি ও সাফল্যের দ্বারোদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। আর যখন তারা এর আঁচল ছেড়ে দিল তখন তারা ইসলামের পূর্বকার অজ্ঞানতা ও জাহেলিয়াতের আঁধারের মধ্যে নিমজ্জিত হলো। অবমাননা ও দারিদ্র্যও তাদেরকে এসে ঘিরে ফেললো। তারা জালিমের দৌরাত্ম্যের মুকাবিলা করে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলারও যোগ্য রইল না"।[৪]

---

১. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন,* অনু: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: ইফাবা),খ. ৭, পৃ. ৭৭৫

২. আল্লামা কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী, *আনওয়ার আল-তানযীল ওয়া আসরারু আল- তাভীল,* (আল-কাহেরা; আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফীকিয়্যা তা.বি.) খ. ২ পৃ. ৪৫৯

৩. আল্লামা আবুল কাশেম জারুল্লাহ মাহমুদ ইব্ন উমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ আন হাকায়েক আল-তানযীল ওয়া উয়ূন আল-আকাবীলফী উজুহি আল-তাভীল,* (মিসর: আল মাকতাবাতুঁ মিসর, তা.বি.) খ.১ পৃ.

৪. শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদা, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

☐ ইসলামী শরীআহ্র উৎসসমূহ

ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় ইসলামী শরীআহ্র উৎসসমূহকে دلائل الشريعة বা اصول الشريعة বলা হয়। اصول শব্দটি اصل এর বহুবচন অনুরূপ دلائل শব্দটি دليل এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ হল; মূল, আসল, শিকড়, উৎস, ভিত্তি, নীতি, কারণ, জন্ম, সৃষ্টি ও বংশ। আবার কোন জিনিসের তলদেশকেও اصل বলা হয়।[১] তবে ইসলামী শরীআহ্র উৎস সমূহ বুঝাতে اصول الشريعة পরিভাষাটি সর্বাধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত।

ইসলামী বিধি-বিধান, নীতিমালা, আইন-কানূন ও রীতিনীতি আহরণ-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শরীআহ্র উৎসসমূহের অকাট্যতা, নির্ভরশীলতা, প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার মানদন্ডের ভিত্তিতে উসূলবিদগণ উৎসসমূহকে নিম্নরূপ দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন;[২]

এক. সর্বসম্মত বা সর্বজনগ্রাহ্য (متفق عليه) উৎসসমূহ এবং

দুই. মতভেদপূর্ণ (مختلف فيه) উৎসসমূহ।

এক. সর্বসম্মত বা সর্বজনগ্রাহ্য (متفق عليه) উৎসসমূহ : এমন সব উৎস এতে অর্ন্তভূক্ত; যেগুলো ইসলামী শরীআহ্র উৎস, হুজ্জাত বা দলীল হবার বিষয়ে ফকীহ্ মুজতাহিদ ও উসূলবিদদের কারো কোন দ্বিমত নেই। এরূপ উৎস হল চারটি:[৩]

ক. আল-কুরআন;

খ. সুন্নাহ (হাদীস);

গ. ইজমা' (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) এবং

ঘ. ক্বিয়াস (প্রমাণসূত্রে নযীর হতে উদ্ভাবন)।

ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় বর্ণিত উৎসগুলোকে متفق عليه বা সর্বসম্মত কিংবা সর্বজনগ্রাহ্য উৎস বলা হয়। এ গুলোকে আবার মৌলিক উৎসও বলা হয়।[৪] সমগ্র মুসলিম সমাজ এ চারটি উৎসের ভিত্তিতে শরীআহ্র বিধি-বিধান আহরণ-উদ্ভাবন ও প্রমাণীকরণে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ চারটির ক্রমধারা; প্রথমে আল-কুরআন তারপরে সুন্নাহ, ইজমা' ও ক্বিয়াস। এ বিষয়েও তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইসলামী শরীআহর আইনগত কোন সমাধান পেতে হলে প্রথমে কুরআন মজীদে তা অনুসন্ধান করতে হবে, তাতে সংশ্লিষ্ট বিধান পাওয়া গেলে তা কার্যকর হবে। আল-কুরআনে প্রত্যক্ষরূপে তার বিধান পাওয়া না গেলে সুন্নাহ্ ও হাদীস ভান্ডারে সন্ধান করতে হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিধান পাওয়া গেলে তাই কার্যকর হবে। সুন্নাহতে বিধানটি পাওয়া না গেলে অনুসন্ধান করতে হবে, সে বিষয়ের বিধানে কোন যুগের মুজতাহিদগণের ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না। যদি ইজমা' পাওয়া যায় তা কার্যকর করতে হবে। ইজমা'র ভিত্তিতে সমাধান পাওয়া না গেলে ইজমা সূত্রে বর্ণিত কিংবা আল-কুরআন ও সুন্নাহর কোন বিধানের সঙ্গে তুলনা ও কিয়াস করে বিষয়টির বিধান নির্ণয়ে শ্রম-সাধনা ব্যয় - ইজতেহাদ করতে হবে।[৫]

---

১. আল্লামা ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ.১ পৃ. ১৬৩

২. আবু ঈসহাক আশ-শাতিবী, *আল-মুয়াফাক্বাত ফী উসূল আশ-শরীআহ্* (আল-কাহেরা: আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফিকীয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.) খ.১ পৃ. ২৫

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ণিত চারটি উৎসের ভিত্তিতে প্রমাণীকরণের বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত ঘোষণায়:[১]

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعو االرسول واولي الامر منكم- فان تنا زعتم في شيء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الا خر- ذالك خير واحسن تأويلا-

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে, আল-কুরআনের বর্ণিত ঘোষণায় আল্লাহর আনুগত্য ও বিশ্বনবী (সা.)- আনুগত্যের আদেশ আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ-ই বটে। আর মুসলিমদের বিধান কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের আদেশ বিধি-বিধানের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত ইজমা'র আনুগত্যের আদেশ।[২] কারণ তাঁরাই মুসলিমদের শরীআহ্র বিধি-বিধান উৎস থেকে উদ্ভাবন-আহরণ ও ব্যাখ্যাদাতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ।[৩]

আর বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও রাসূল (সা.)- এর সমীপে প্রতিস্থাপনের আদেশ আল-কুরআন, সুন্নাহ্র ভাষ্য ও ইজমা' বিদ্যমান না থাকার ক্ষেত্রগুলোতে ক্বিয়াস অনুসরণেরই নির্দেশ। কারণ এক্ষেত্রে ক্বিয়াস অনুসরণই বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)- সমীপে ফিরিয়ে নেওয়া।[৪] এ বিষয়টি বিশ্ব নবী (সা.)- এর সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত।[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৪:৫৯
২. আল্লামা ইযযদ্দীন বালীক, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৮
৩. আল্লামা শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.
৪. প্রাগুক্ত
৫. এ বিষয়ে বিশ্ব নবী (সা.) -এর হাদীস টি নিম্নরূপ:

" মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল্লাহ্ (সা.) যখন তাঁকে ইয়্যামানের কাযী ও শিক্ষক (মুয়াল্লিম) বানিয়ে পাঠালেন তখন তাকে বললেন, তোমাকে যখন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করা হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সালা দিবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব মতে ফায়সালা করব, তিনি বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে পাওয়া না যায় তাহলে কি করবেন ? তিনি বললেন তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি সুন্নাতে রাসূলেও তা পাওয়া না যায় তাহলে কি করবে ? উত্তরে বললেন, আমি এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে কার্পণ্য করবো না। মুয়ায (সা.) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের হাত আমার বুকে রাখলেন এবং বললেন, সে আল্লাহর প্রশংসা যিনি তার রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন এমন কাজের তাওফীক দিয়েছেন"[৫]

(সুত্রঃ বাগাবী কর্তৃক শারহুস সুন্নাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত আবদুল ওহাব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূল*, পৃ. ৭২২, ড. হাসান আলী আশ শাখলী, আশ-শাখলী, *আল-মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. মতভেদপূর্ণ (مختلف فيه) উৎসসমূহ

সর্বজন স্বীকৃত বা সর্বসম্মত ও সার্বজনীন উপরোল্লখিত শরীআহ্‌র চারটি দলিল বা উৎস ব্যতীত আরো কিছু দলীল আছে যা দিয়ে বিধি-বিধান উদ্ভাবন-আহরণ ও প্রমাণীকরণে সমগ্র মুসলিম সমাজ ও তাদের ফকীহ্ মুজতাহিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেননি। তাদের কেউ কেউ এর কোনটি দিয়ে শরীআহ্‌র বিধি-বিধান নির্ণয়ে প্রমাণ গ্রহন করেছেন, অন্যরা তা দিয়ে প্রমাণীকরণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উসূলবিদদের পরিভাষায় এ সকল উৎসকে مختلف فيه বা মতভেদযুক্ত উৎস বলা হয়। এ সব উৎসকে আবার সহযোগী উৎস বা আনুষাঙ্গিক উৎসও বলা হয়।

এ ধরনের উৎস ছয়টি। তা হল: [১]

১. আল-ইস্তিহসান (الاستحسان)

২. আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة)

৩. আল-ইস্তিসহাব (الاستصحاب)

৪. আল-উরফ(العرف)

৫. মাযহাবুস-সাহাব (مذهب الصحابة)

৬. পূর্ববর্তী নবীদের শরীআহ্ (شرائع من قبلنا)

মোট কথা, ইসলামী শরীআহ্‌র উৎস বা দলিল দশটি , যার মধ্যে চারটি দলিল ও উৎস হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই এবং বিধি-বিধান প্রমাণীকরণের যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বসম্মত। বাকী ছয়টি শরীআহর উৎস হবার ব্যাপারে মতদ্বন্দ্ব রয়েছে। এসব উৎস দিয়ে বিধি-বিধান আহরণ-উদ্ভাবন ও প্রমাণীকরণের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা মতভেদপূর্ণ।[২]

☐ ইসলামী শরীআহ্‌র পরিধি ও পরিব্যাপ্তি

ইসলামী শরীআহ্‌র বিধি-বিধান অবিভাজ্য। এর কিছু অনুসরণ এবং কিছু পরিত্যাগ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে এর কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করাও নিষিদ্ধ। ইসলামী শরীআহ্ বলতে সে সকল মৌলিক দর্শন ও বিধি-মালার কথাই বোঝায়, আল-কুরআন যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্ব নবী (সা.) যা আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন। এ মৌলিক দর্শন ও নীতিমালাকেই আমরা ইসলামী শরীআহ্ নামে অভিহিত করে থাকি। এদিক দিয়ে শরীআহ্ সে সকল মৌলিক দর্শন ও নীতিমালার সংকলন বিশেষ যাকে ইসলাম তাওহীদ, ঈমান, ইবাদাত, ব্যক্তিগত অবস্থা, অপরাধ, সামাজিক আচরণ, অর্থনীতি ও রাজনীতি-এক কথায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রয়োগযোগ্য। সুতরাং ইসলামী শরীআহ্‌র পরিধি-পরিব্যাপ্তি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

১. আল্লামা শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৪৩ -২৪৫

২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র.)-এর মতে, ইসলামী শরীআহ্‌র মৌল ও প্রধান উৎস আল-কুরআনের উপস্থাপিত বিধিমালা নিম্নরূপ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহল :[১]

এক. আকীদা, মতাদর্শ ও ধর্ম-বিশ্বাসমুলক বিধি-বিধান। এতে রয়েছে ; আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব ও আখিরাত সম্পর্কিত ঈমানের অপরিহার্য বিষয়সমূহ।

দুই. চারিত্রিক-নীতিমালা ও আচার-আচরণ বিষয়ক বিধি-বিধানসমূহ।

তিন. কর্মবিষয়ক বিধি-বিধানসমূহ-কথা, কাজ, লেনদেন, চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদি সম্বন্ধীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ তৃতীয় প্রকারের বিধি-বিধান ফিক্‌হুল কুরআন অভিধায় অভিহিত।[২] আল-কুরআনে বর্ণিত কর্ম বিষয়ক বিধি-বিধান দু' ধরনের বিষয়কে অর্ন্তভূক্ত করেছে।[৩]

ক. ইবাদাত সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং খ. মু'আমালাত বা পারস্পারিক লেনদেন ও আদান -প্রদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞ ও ফিকাহ্‌বিদদের কারো মতে, শরীআহ্‌র বিধি-বিধানগুলো সাধারণত নিম্নরূপ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত:[৪]

১. ইবাদাত সংক্রান্ত ;

২. মুআমালাত-পাস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত এবং

৩. আদল-উকুবাত-বিচার ও দন্ডের বিধান সংক্রান্ত;

১. ইবাদাতঃ মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তা-ই ইবাদাত। যেমনঃ- সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ, মানত কসম প্রভৃতি ইবাদাত। উল্লেখ্য, ইসলামে ইবাদাতের ধারণাটি মানুষের কর্মময় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। এই অর্থে জীবনে খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, শোয়া-জাগা কথা-বার্তা সবকিছুই ইবাদাত যদি তা আল-কুরআনের নির্দেশনা ও বিশ্ব নবী (সা.)- এর প্রদর্শিত পদ্ধতি ও পন্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইবাদাতের উদ্দেশ্য হলঃ মহাবিশ্বের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সুষ্ঠু ও সুন্দর করা।[৫]

২. মু'আমালাতঃ মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক ও বৈষয়িক কর্মকান্ডকে ফিক্‌হের পরিভাষায় মু'আমালাত বলা হয়। এক্ষেত্রে শরীআহ্‌র লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সংশোধন ও উন্নয়ন সাধন। শরীআহ্‌র দেওয়া বিধি-বিধানগুলো অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত ও খুটিনাটিমুক্ত। অবস্থা, কাল, পরিবেশ বা ভৌগলিক অবস্থানের কারণে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ফিকাহবিদ্‌দের গবেষণার ভিত্তিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হতে পারে। আধুনিক আইন যেমন ব্যাপক, মুআমালাত সম্পর্কিত ইসলামী আইনও তেমনি সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত। মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত।[৬]

সাংবিধানিক (Constitutional) ও সাংগঠনিক (Institutional) বিষয়াদিও শরীআহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশ। পরিভাষায় একে বলা হয় শরীআহ্‌ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি (আস্-সিয়াসিয়াতুশ-শারঈয়াহ্)[৭]

---

১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮১

৪. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩. আদল-উকুবাত: অপরাধ ও দন্ড বিধিকে ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় আদল-উকূবাত বলা হয়।[১] যে কোন ব্যক্তির অন্যায়-অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি ও দন্ড এ ধরনের বিধিতে নিশ্চিত করা হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল; মানুষের জীবন, ধনসম্পদ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং অপরাধের বাদী-বিবাদী ও সমগ্র জাতির অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা।[২]

আল-কুরআনে সন্নিবেশিত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাত করলেও-ইসলামী শরীআহ্‌র পরিধি, পরিব্যাপ্তি ও এর আওতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে, আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।[৩] উলূমুল-কুরআন বিশেষজ্ঞদের মতে, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ভিত্তিক আয়াত সংখ্যা নিম্নরূপ।[৪]

জান্নাতের ওয়াদা	১০০০
জাহান্নামের ভয়	১০০০
নিষেধমূলক	১০০০
আদেশমূলক	১০০০
উদাহরণ	১০০০
কাহিনী	১০০০
হালাল	২৫০
হারাম	২৫০
আল্লাহর পবিত্রতা	১০০
বিবিধ	১০০
সর্বমোট	৬৬৬৬

ইসলামী শরীআহ্‌ বিশেষজ্ঞদের কারো কারো মতে, আল-কুরআনে নানাবিধ বিধি-বিধান সংক্রান্ত ৫০০টি আয়াত রয়েছে।[৫] উলূমুল কুরআন বিশেষজ্ঞ খাল্লাফ-এর মতে, আল-কুরআনে ইসলামী জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামী শরীআহ্‌র বিধি-বিধানের উৎস বা মূলনীতিমালা সম্পর্কিত আয়াতের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ:[৬]

---

১. প্রাগুক্ত; খ. ২, পৃ.৮০

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮১

৪. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, প্রাগুক্ত: পৃ.১০২

৫. প্রাগুক্ত

৬. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল-কুরআন,* খ.১, পৃ.৫১

Dhaka University Institutional Repository

১. আইনের উৎস	৫০টি
২. অর্থ ও এর লেনদেন সংক্রান্ত	২০টি
৩. সাংবিধানিক ধারা	১০টি
৪. আর্ন্তজাতিক আইন	২৫টি
৫. বিচার সংক্রান্ত	১৩টি
৬. দন্ডবিধি (Penal)	৩০টি
৭.দেওয়ানী আইন	৭০টি
৮. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক	৭০টি
সর্বমোট	২৮৮ টি

ইসলামী শরীআহ্‌র বিধি-বিধান (আহ্‌কাম) মানব জীবনে পরিপালন, অনুসরণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বের ক্রমানুসারে বা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমল করার প্রশ্নে এসব বিধি-বিধানকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে ;

১. ফারদ বা ওয়াজিব (কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক করণীয়) : এসব পরিপালন ও অনুসরণ মানব জীবনে বাধ্যতামূলক। এসব কাজ করলে প্রতিদান বা পুরস্কার দেয়া হবে, কিন্তু না করলে শাস্তি দেওয়া হবে।[১]

২. মানদূব (সুপারিশকৃত) : এসব কাজ করলে পুরস্কার দেয়া হবে কিন্তু না করলে শাস্তি দেয়া হবে না।[২]

৩. জায়েয বা মুবাহ (নীরব) : যেসব কাজের জন্য নীরবতার মাধ্যমে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৪. মাকরূহ (অপছন্দনীয় বা নিরুৎসাহিত): যেসব কাজ অনুমোদিত, তবে শাস্তিযোগ্য নয়।[৩]

৫. হারাম (নিষিদ্ধ) : আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য।[৪]

□ ইসলামী শরীআহ্‌র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীআহ্ হলো আল্লাহর নিকট থেকে বিশ্বমানবতার জন্যে আসা সর্বশেষ শরীআহ্ । এ শরী'আহ্ নির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোনো কাল, যুগ বা শ্রেণীর জন্য নয়। তা সর্বকালের, সর্বদেশের ও সর্ব জাতির এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। এর রচয়িতা স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, প্রকাশ্য ও গুপ্ত (Fxoteric and Esoteric) সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী; অতএব, তাঁর রচিত শরীআহ্ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর রচিত বিধান সর্বাবস্থায়ই মানুষের জন্য অনুসরণীয় এবং প্রয়োজন পুরণে সক্ষম। মাবন রচিত বিধান এরূপ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অধিকারী নয়। মানব রচিত বিধানে যেরূপ মানবীয় ঝোঁক-প্রবনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে, আল্লাহ রচিত বিধানে তেমন কিছু থাকতে পারে না।

---

১. প্রাগুক্ত

২. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞদের মতে ইসলামী শরীআহ্‌র মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ তিনটি:[১]

এক. পরিপূর্ণতা (কামিল);

দুই. স্থায়িত্ব (দাওয়াম) এবং

তিন. বিশালতা ও ব্যাপকতা (সমু'উ)।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর মতে , ইসলামী শরীআহ্‌র বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :[২]

এক. ইসলামী শরীআহ্‌ শরীআতে রাব্বানী ;

দুই. বিশ্বমানবতবাদী। এই আইনে আল্লাহ্‌ তা'আলা একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী, অধিপতি এবং সকল ক্ষমতার উৎস ;

তিন. সার্বজনীন ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন ;

চার. ব্যক্তি ও সমষ্টির সমভাবে মূল্যায়ন এবং

পাঁচ. স্থায়িত্ব, কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়।

সর্বোপরি ইসলামী শরীআহ্‌র বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় :[৩]

এক. ইসলামী শরীআহ্‌ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ;

দুই. এ আইনে আল্লাহ্‌ তা'আলা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, অধিকারী ও একচ্ছত্র অধিপতি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাই সকল ক্ষমতার উৎস;

তিন. ইসলামী আইনের ব্যাপ্তি জীবনের সবক্ষেত্রে। মানুষের ঈমান, আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পার্থিব-অপার্থিব সকল বিষয় এ আইনের আওতাভূক্ত।

চার. জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামী আইন পূর্নাঙ্গ ও পরিপূর্ণ;

পাঁচঃ ইসলামী আইন বিশ্বজনীন ;

ছয়ঃ ইসলামী আইনে ইজতিহাদের প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ;

সাত. নমনীয়তা ও অনমনীয়তা দুটোই ইসলামী আইনে রয়েছে ;

আট. ইসলামী আইনে বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক বিধান রয়েছে ;

নয়. সমঝোতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে ;

দশ. এ আইনে রয়েছে-গতিশীলতা ও সুসঙ্গতি এবং পবিত্রতার ছোঁয়া-এর সর্বত্র বিদ্যমান।[৪]

---

১. শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদা, *ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১১০ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়ন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-২৯ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

৩. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.)- প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৪-৭৮

৪. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.), প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৪-৭৮ থেকে এবং মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬ ও মুহাম্মদ তাকী-আমীনী, *ইসলামী ফিক্‌হর পটভূমি,* প্রাগুক্ত; পৃ.৬১ পৃ. থেকে সংগৃহীত এবং সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীআহ্র প্রাণসত্তা আল-কুরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান সম্পর্কিত মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায় শরীআহ্ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানবিক স্বভাব- প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতিগুলোর বিবেচনা অপরিহার্য গণ্য করেছে তা নিম্নরূপঃ [১]

এক. সংকীর্ণতা বর্জন (عدم حرج)

দুই. কষ্টের স্বল্পতা (قلت تكلف)

তিন. পর্যায়ক্রমিকতা (تدريج)

চার. নস্খ (نسخ)

পাঁচ. শানে নুযূল (شان نزول)

ছয়. হিকমাত ও ইল্লাত (حكمة وعلت)

সাত. আরবের সামাজিক অবস্থা (معا شرتي حالت)

সূতরাং বর্ণিত বিষয়গুলোও ইসলামী শরীআহ্র অনন্য বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট হিসেবে পরিলক্ষিত।

❑ ইসলামী শরীআহ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী শরীআহ্র প্রধান উদ্দেশ্য (আল-মাকাসিদ আশ্-শরীআহ্) হল- সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ করা। সংক্ষেপে বলা যায়, মানবতার কল্যাণই হচ্ছে শরীআহ্র প্রধান লক্ষ্য। [২] শরীআহ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে যা বলেন তা হলঃ [৩]

اخراج الناس من د وا عي الهواي والشهوات الي د وائر الانصاف والحق اللانصاف والحق حتي يتحقق خلافة الله في اللارض علي الوجه الصحيح

"বিশ্বমানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভূল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার কু-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্র খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ট নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে"।

ইমাম গাজালী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

"The very objective of the Shariah is to promote the welfare of the people, which lies in safeguarding their faith, their life, thier intellect, their prosperity and their wealth. Whatever ensures the safeguarding of these five serves public interest and desirable" [৪]

ইব্ন আল-কাইয়্যিম ইসলামী শরীআহ্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন,

The basis of Shariah is wisdom and welfare of the people in the world as well as hereafter. This welfare lies in complete justice, mercy, well-being and wisdom. Anything that departs from justice to oppression, from mercy to harshness, from welfare to misery and from wisdom to folly has nothing to do with Shariah" [৫]

---

১. আল্লামা মুফতী তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

২. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩. প্রাগুক্ত

৪. ইমাম আল-গাজালী, আল-মুস্তাফা (১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৯-৪০

৫. ইব্ন আল-কাইয়্যিম আল-জাওজিয়াহ *Ilm al-Muwaqqi'in* (১৯৫৫ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

উসূল বিশেষজ্ঞ ইমাম শাতিবী ইসলামী শরীআহ্‌র উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :[১]

১. জরুরিয়াত বা আবশ্যকীয় (Necessities) ;

২. হাজিয়াত বা প্রয়োজনীয় (Requirement/Comfort) এবং

৩. তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধক (Beautification).

১. জরুরিয়াত বা আবশ্যকীয় : জরুরিয়াত-এর অর্ন্তভূক্ত রয়েছে ; ঐ সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো যা মানব জীবনের কল্যাণ, সুখ-শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য একান্তই আবশ্যক ও অপরিহার্য। এসব বিষয় সুষ্টভাবে রক্ষা করা না হলে দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণ ও সাফল্য অর্জন এবং পরকালের মুক্তি ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ইমাম শাতিবী জরুরিয়াতকে পাঁচটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তা হল :[২]

১.দীনকে সংরক্ষণ করা ২. নফ্‌স- জীবন সংরক্ষণ করা ৩. নসল- বংশধারা সংরক্ষণ করা ৪. মাল- সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং ৫. আকল- বিবেকবুদ্ধি সংরক্ষণ করা

কেননা, এ পাঁচটি জিনিসের ভিত্তিতেই ব্যক্তি তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে এবং আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া জীবন ও রিযিক-এর যথার্থ কৃজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

২. হাজিয়াত বা প্রয়োজনীয় : যে সব কার্যক্রম মানুষের জীবনকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আরামদায়ক করে এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে তাই হাজিয়াত।[৩] এর অভাবে প্রথমটির (জরুরিয়াত) মতো মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়ে না ; বরং ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- মুসাফিরের জন্য সালাত-সিয়ামের শিথিলতা, হালাল উপর্জন দ্বারা ভোগ-বিলাস করা, কি্সাসের পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করা প্রভৃতি।

৩. তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যবর্ধক : যে বিষয়গুলো মানব জীবনের অতিরিক্ত চাহিদা হিসেবে জীবন-যাপনকে আরো সুন্দর, নিখুঁত ও কল্যাণময় করে এবং প্রথম দুটিকে (জরুরিয়াত ও হাজিয়াত) পরিপূর্ণতা দান করে। যেমন উত্তম মুআমিলাত, উন্নত স্বভাব-চরিত্র, চুক্তি ও শর্তাদি রক্ষা, অলংকার ও শোভাবর্ধন, বাড়ির সামনে বাগান করা ইত্যাদি :[৪]

উল্লেখ্য যে, শরীআহ্‌র আকারে বিশ্ব নবী (সা.)- এর নিকট সমস্ত বিধি-বিধান (আহ্‌কাম) বা মূলনীতি অবতীর্ণ হয়েছিল, দীনের পরিপূর্ণতার পর্যায়ে তা যতই নতুন বিধানরূপে প্রতিভাত হোক না কেন মৌলিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে এমন একটিও ছিলনা, যা তৎকালীন পৃথিবীবাসির নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীআহ্‌র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলোও পরিলক্ষিত ও প্রতিভাত হয় :[৫]

১. পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারের পর আল্লাহর হিদায়াতের যে অংশ বাকি ছিল, তা পূর্ণ করা :

২. যে অংশ বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল, তাকে সুস্পষ্ট করা;

৩. যে অংশ বিস্মৃত করা হয়েছিল, তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং

---

১. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮ ৪. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

২. প্রাগুক্ত

৩. ইমাম আল-গাজালী, আল-মুস্তাফা (১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৯-৪০

৪. ইব্‌ন আল-কাইয়্যিম আল-জাওজিয়াহ Ilm al-Muwaqqi'in (১৯৫৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪

৫. আল্লামা শাতিবী, প্রাগুক্ত; খ.২, পৃ. ২৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

৪. ভূলক্রমে মানব যেসব বাঁধনে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া। এক্ষেত্রে আল-কুরআনের নিম্নরূপ ঘোষণাটি অনুধাবনীয়। আল-কুরআন ঘোষণা করছে:

"তিনি রাসূল (সা.)- লোকদের সৎ কাজের আদের্শ দেন, অপকর্ম থেকে বিরত রাখেন। তিনি পাক-পবিত্র বস্তু গুলো তাদের জ ন্য হালাল করেদেন, অপবিত্র বস্তুগুলো তিনি তাদের জন্য হারাম করে দেন। তিনি তাদের বোঝা নামিয়ে বা লঘিষ্ট করে দেন যে সব শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল, তিনি সেগুলো সরিয়ে দেন " [১]

মোট কথা, মানুষ স্বভাবত:ই যে সামাজিক জীবন-যাপনের বাধ্য, সেই সামাজিক জীবনকে কল্যাণময় আদর্শ ও ভাবধারায় পরিসিক্ত করে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' [২] নিশ্চিত করাই ইসলামী শরীআহ্‌র চরম ও পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর তাই বলা হয়েছে ان المقصد انما هو تحصيل المصالح وحفظ النظام [৩]
সাধারণ জনকল্যাণ লাভ এবং সামাজিক জীবন সংস্থার সংরক্ষণ-ই হল শরীআহ্‌র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

☐ ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্ পরিপালন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। যদিও এর তাত্ত্বিক শিকড় প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই প্রোথিত। এ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে এবং বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ইতোমধ্যেই একটি স্থান করে নিয়েছে। এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে এবং অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, গবেষক ও চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আর্কষণে সমর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মোকাবিলায় সুদমুক্ত এ ব্যবস্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে এবং আগামীতে এর বিকাশের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ব্যবস্থার প্রধান বিশ্বেষত্ব ও আকর্ষণ ইসলামী শরীআহ্‌র নীতিমালা অনুসরণ; যা আদল (সুবিচার) ও ইহ্সান (ন্যায়সঙ্গত আচরণ) ভিত্তিক। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ভর করে সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে শরীআহ্ পরিপালন ও অনুসরণের উপর ।

আমরা মনে করি, **The origine and basis of Islamic finance and Banking is Shariah**- মন্তব্যটি যথার্থ ও তাৎপর্যময়। শরীআহ্ ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রাণ। বলা হয়, **No Shariah Compliance, No Islamic Banking. OIC** -এর মতে, ইসলামী ব্যাংক সুদ বর্জনসহ সকল কর্মকান্ডে ইসলামী শরীআহ্ পরিপালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। [8]

প্রচলিত (Conventional) ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম হতে মানুষ যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত সুবিধাও অনুরূপ। তথাপিও দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কার্যক্রমের এ পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণেই একটি ব্যাংক ইসলামী এবং অপরটি অনৈসলামিক। যে ব্যাংকের ভিত্তিই হলো সুদ-সে ব্যাংকের লেনদেনের সর্বত্রই হারাম বা অবৈধতার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত। [৫]

---

১. আল-কুরআন, ৭.১৫৭

২. হায়াতে তাইয়্যেবা আল-কুরআনের পরিভাষা। আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পবিত্র ও কল্যাণময় জীবন লাভ করা যায় তাকেই হায়াতে তাইয়্যেবা, বলা হয়।

আল-কুরআনের ঘোষণা :

"যে সকল পুরুষ ও নারী সৎকর্ম করে ও ঈমান আনয়ন করে, তাদেরকে নিশ্চয় হায়াতে তাইয়্যেবা দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের (পরকালে) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব"।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্‌র লক্ষ্য ১৯৭৮ সালে সেনেগালে অনুষ্ঠিত Organisation of Islamic Conference (OIC) প্রদত্ত ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিচিতিতে সার্থক ভাবে বিধৃত হয়েছে। পরিচিতিটি নিম্নরূপ :

" Islamic is a financial institution whose statutes, rules and regulations expressly state its commitment to the pinciples of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interests on any of its operations".

সূত্র: ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীআহ্ পরিপালন, সম্পা: মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বি.এম. হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি একটি ব্যাংক ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং শরীআহ্ বোর্ড থাকা সত্ত্বেও লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি ইসলামী পদ্ধতিসমূহের পরিপূর্ণ প্রয়োগ করা না হয় তবে সুদের অনুপ্রবেশ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফলে হালাল উপর্জনের সাথে হারাম উপার্জনও মিশ্রিত হতে পারে। আর তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক-উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে কার্মকর্তা, কর্মচারী বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ইসলামী শরীআহ্র পদ্ধতিসমূহ খুব ভালো করে বুঝা এবং তার যথাযথ অনুসরণ অত্যাবশ্যক।

ইসলামী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ। উক্ত লক্ষ্যঅর্জনে ইসলামী ব্যাংককে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। ব্যবসার ধরন ও প্রকৃত এমনভাবে স্থির করতে হয় যাতে মানব কল্যাণ এবং মুনাফা অর্জন ও মুলধন গঠন উভয়টিই অর্জিত হয়। ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তিই হল ইসলামী শরীআহ্। সুতরাং এ ব্যাংকের সকল স্তরে শরীআহ্র নীতিসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হয়। আবার এটি ব্যাংক হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনাধীন, ফলে ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরোপিত বিধি-নিষেধ পরিপালন সাপেক্ষে কার্যক্রম স্থির করতে হয়। ব্যাংকের মূল কাজ হল ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করা। বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হতে ডিপোজিট গ্রহণ, বিনিয়োগকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবসার আওতাভূক্ত বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান বা সেবার বিক্রয়। ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যাংকের মূলধনও গঠন করতে হয়। অতএব, ব্যাংককে মূলধন গঠন, জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানসহ সকল কার্যক্রম হতে হয় ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক এবং দেশে প্রচলিত রুল্স-রেগুলেশন অনুসারে। [৫]

যাহোক, ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীআহ্ পরিপালন ও অনুসরণের ক্ষেত্র ও এর লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ[১]

১. ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. আর্থিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।

৩. ব্যাংকিং কার্যক্রম জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালনা করা।

৪. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি অনুসরণের কারণে কেবল মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপন করা।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

৬. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা ।

৭. মানব-সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।[২]

৮. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৯. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

১০. অর্থের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা।

১১. মুদ্রাস্ফীতির কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত রাখা।

১২. সর্বোপরি, মাকাসিদ আশ্-শরীআহ্ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা।[৩]

---

১. ড. এম. উমর চাপরা. ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, অনুঃড. মিয়া আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ (ঢাকাঃ বি আই আই টি, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৪

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাংক : পরিচিতি, ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

মানব সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো ব্যাংক এবং ব্যাংক ব্যবস্থা। ব্যাংক নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব কিভাবে এবং কখন হয়েছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি যথেষ্ঠ নয়। কোন তাৎক্ষণিক বিপ্লব বা যুদ্ধের দ্বারা ব্যাংকের উৎপত্তি হয়নি। ইতিহাসের আদি পর্বে মানব সভ্যতার উষালগ্নে বিনিময় প্রথার উদ্ভব হয়। বিনিময় প্রথা থেকে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয়-সৃষ্টি হয় ধার কর্জের। এ সকল সঞ্চয় প্রবণতা বা ধার কর্জের মাধ্যম হিসেবে ব্যাংকের উদ্ভব হয় মানব সভ্যতার উষালগ্নেই। পরবর্তীতে হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। চলার পথে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাংক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে আমরা যে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত তা কোন একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সভ্যতা কর্তৃক সৃষ্ট নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা ও চিন্তাবিদদের হাতে এর বিবর্তন ঘটেছে। ব্যাংক ব্যবস্থা আধুনিক জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, আমদানি-রফতানি, সঞ্চয়-বিনিয়োগ, তহবিল স্থানান্তর এমনকি মূল্যবান দলিলপত্র ও অলঙ্কারাদির নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হয় জনগণ। ব্যাংক ব্যবস্থা শহর-বন্দর-নগরের সীমানা পেরিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দেশের দূর-দূরান্তের জনপদে। ঘুমন্তপল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনে সঞ্চার করছে অর্থনৈতিক গতিধারা।

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিয়ে টিকে আছে। দিন দিন এর কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর শক্তি ও সম্ভাবনার নানা দিগন্ত বিকশিত হচ্ছে। এইতো ক'দিন আগেও বেশ কিছু নতুন ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরে এক গঠনমূলক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আলোচনা ও অনুসন্ধানের সুবিধার্থে এ অধ্যায়ে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ব্যাংকের পরিচিতি,কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী আনুষাঙ্গিক বিষয় ও উপাদানসমূহের উপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হবে যাতে সার্বিকভাবে ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়ক হয়।

❑ বিনিময় প্রথার প্রচলন (Barter System into Being)

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাথে বিনিময় প্রথা ও মুদ্রার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো দূর করে যখন হতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়, তখন হতেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে থাকে। সুতরাং বিবর্তনের ধারায় বিনিময় প্রথা ও ব্যাংক-এর একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে বিধায় আমাদেরকে ব্যাংক-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হবার লক্ষ্যে ব্যাংকের অবস্থান অনুধাবন করার প্রয়োজনে বিনিময় প্রথার প্রচলন বা (Barter System into Being) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। ঘাটতি চাহিদা পূরণের জন্যই অনেক প্রাচীনকাল থেকে বিনিময় প্রথার প্রচলন হয়। দ্রব্য ও সেবার বিনিময়ে দ্রব্য ও সেবা গ্রহণ করাকেই বিনিময় প্রথা বলা হতো [১]।

---

১. M.C. Vaish, *Money Banking Trade and Public Finance* (New Delhi: New Age International (P) Ltd. Publishers, 1997 A.D);p. 4

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তনের ধারাবাহিকতা গতিশীল, পরিবর্তনশীল ও প্রাগ্রসরমান। সভ্যতার শুরুতে মুদ্রা বা অর্থের কোন অস্তিত্ব ছিল না, কারণ অর্থ ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই তখন ছিল না। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক বন্ধন ও চাহিদা সীমিত ছিল বিধায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল সীমিত। তখন মানুষ পরস্পরের মধ্যে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময় করে তাদের অভাব ও চাহিদা পূরণ করতো। একজন মানুষ তার নিকট নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য একজন মানুষের নিকট থেকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতো। তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় সমস্ত প্রকার লেনদেনের মাধ্যম ছিল দ্রব্য বিনিময়। দ্রব্য বিনিময়ের এ প্রথাকেই 'বিনিময় প্রথা' বা 'Barter System' বলা হয়। বিশেষজ্ঞগণ আরো স্পষ্টভাবে বলেন যে, "The direct exchange for goods & services without intervention of money is called the bearter system.[১]" বিষয়টিকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই প্রথায় একজন ব্যক্তি তার উদ্বৃত্ত দ্রব্য ও সেবা প্রদান করার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজবে যার প্রথম ব্যক্তির দ্রব্য ও সেবার চাহিদা রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উদ্বৃত্ত ও সেবার প্রতি প্রথম ব্যক্তির চাহিদা রয়েছে। একেই Stanley Jevons (1835-1882) 'Double Co-incidence of Wants' বলে অভিহিত করেছেন [২]। সভ্যতার আলো ক্রমান্বয়ে বিকশিত হলো। মানুষের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেল। সামাজিক বন্ধনের পরিধিও ক্রমশঃ ব্যাপকতর হতে শুরু করলো। ফলে অনুরূপ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু প্রাচীন বিনিময় প্রথার যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হতো সেগুলো হল: [৩]

ক) অভাবের সামঞ্জস্যতার অভাব; খ) দ্রব্য বিভাজনের সমস্যা; গ) ক্রয় ক্ষমতা মজুদ করা যায় না এবং ঘ) সাধারণ কোন মূল্যের একক নেই।

M.C. Vaish বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, তা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো: [৪]

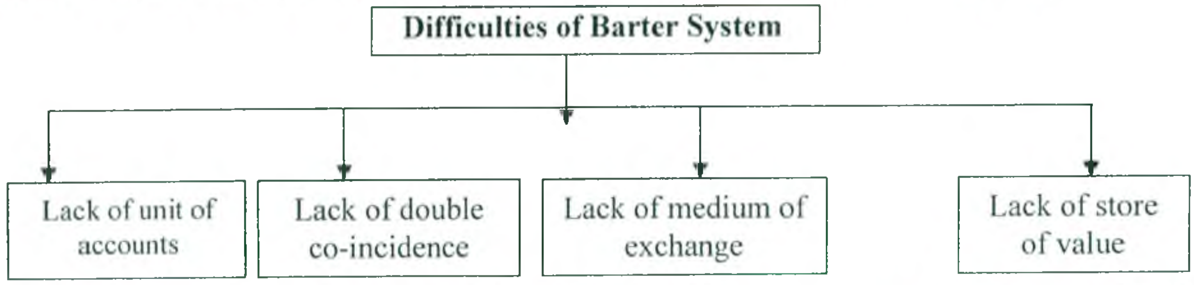

এসব অসুবিধা সামাজিক কর্মকান্ডে ও অর্থনৈতিক লেনদেনে জটিলতা সৃষ্টি করে। মূলত, এসব কারণেই এই বিনিময় প্রথা দীর্ঘদিন কার্যকর থাকেনি। পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির এক পর্যায়ে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই মুদ্রা বা অর্থের যথাযথ সংরক্ষণ, নিরাপত্তাজনিত অসুবিধা দুরীকরণ, অর্থের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন সহজীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হতেই পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রূপ লাভ করে [৫]।

---

১. ড. এ. আর. খান; *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: এস. এস পাবলিকেশন্স-১৯৯৯খ্রি:), পৃ. ০২
২. M.C. Vaish, ibid, p. 5
৩. ibid
৪. T. T. sethi. *Money Banking and International Trade* (New Delhi: S. Chand & Company Ltd: 1999 A.D), p.10
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❑ মুদ্রার ক্রমবিবর্তন (Evolution of money)

অর্থনীতি, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা অবিভাজ্য। এর বিভিন্ন শাখা পরস্পর জড়িত। অর্থনীতির আদি পর্বে রয়েছে উৎপাদন এবং অন্তিম পর্যায়ে ভোগ। উৎপাদন ও ভোগের সংযোজন ঘটে বিনিময়ে আর এই বিনিময়ের সহজতম মাধ্যম হলো মুদ্রা বা অর্থ তাই মুদ্রার প্রচলন অর্থনীতিতে যুগান্তকারী ঘটনা। এখানেই আদিম অর্থনৈতিক জীবনের শেষ এবং আধুনিক অর্থনীতির যাত্রা শুরু। বস্তুত: প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই মৌলিক আবিস্কার রয়েছে। যন্ত্রবিদ্যায় যেমন চাকা; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আগুন; রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ভোটাধিকার, অর্থনীতিতে তেমনি মুদ্রার আবিষ্কার।

সভ্যতার শুরুতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দেশীয় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের মুদ্রা হিসেবে নির্দিষ্ট আকারের কাঠের টুকরো (Spicewood), পাথর নুড়ি (Stones), কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, ঝিনুক ইত্যাদি ব্যবহার হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় [১]। কিন্তু স্থানান্তর ও স্থায়ীত্বসহ নানাবিধ জটিলতার কারণে কালক্রমে মুদ্রা হিসেবে এসব বস্তুর ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা প্রভৃতি ধাতব মুদ্রা ঐ সমস্ত কাঠ, পাথর, ঝিনুক ও নুড়ির স্থান দখল করে নেয়। যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন দেশে কড়িকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো [২]।

ধাতব মুদ্রার মূল্যমাণ নির্ধারণের জটিলতায় বিনিময় ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দেখা যায় একই মুল্যমাণ ও পরিমাণের মুদ্রা স্থানভেদে বিভিন্ন মূল্যমাণে লেনদেন হয়েছে। তদুপরি ধাতব মুদ্রার (মাণ অংকিত) আরেকটি বড় ধরনের অসুবিধা ছিল এই যে, ধাতব মুদ্রা মূলতঃ যথেষ্ট মূল্যবান এবং এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল সার্বজনীন। মানব সভ্যতার সংস্কৃতিতে ধাতব দ্রব্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। বিশেষত; অলংকার ও তৈজসপত্র বানানোর প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়েছিল। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রায় দেশেই মুদ্রা সরবরাহের সংকট প্রকট হয়ে উঠে। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান ধাতব মুদ্রা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং প্রায়শঃ এর অপ্রতুলতা দেখা দেয় [৩]। এসব নানাবিধ কারণে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতবমুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা) আর বেশি দিন চলতে পারেনি।

❑ কাগুজে মুদ্রার প্রচলন

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জন্ম দেয়। ধাতব মুদ্রার অসুবিধা ও ঝুঁকির কারণে পরবর্তী পর্যায়ে কাগুঁজে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছে। সহজ ব্যবহার যোগ্যতা, ছাপাখানা আবিস্কারের ফলে প্রস্তুতকরণে সহজ হওয়া এবং কম ঝুঁকির কারণে বহন করতে সহজ হওয়ায় এব ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যা বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে সহজলভ্য এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে স্বল্প মূল্যের কিছু ধাতব মুদ্রা কাগুজী মুদ্রার পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে[৪]।

---

১. মোঃ আব্দুল আজিজ, জি. আর. খান, *মুদ্রা তত্ত্ব ব্যাংকিং সরকারি অর্থ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি* (ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী-১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৪. O.S. Srivastava, Bank Management Including Monetory Theory and Financial Management (New Delhi: Kalyani Publishers, 2000 A.D.), p.38
মুদ্রা আবিষ্কার বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সংযোজন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "The three greatest inventions of the world are always mentioned as invention of wheel, invention of printing and invention of money"

Dhaka University Institutional Repository

তবে এগুলোর ব্যবহার ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। আজকের বিশ্বে অপরিবর্তনীয় এবং সব চেয়ে সুবিধাজনক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কাগুজী মুদ্রা সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে [১]।

মুদ্রার ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো অতি সংক্ষেপে M.C. Vaish চিত্রাংকন করেছেন। সবশেষে তাঁর চিত্রাংকনটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:[২]

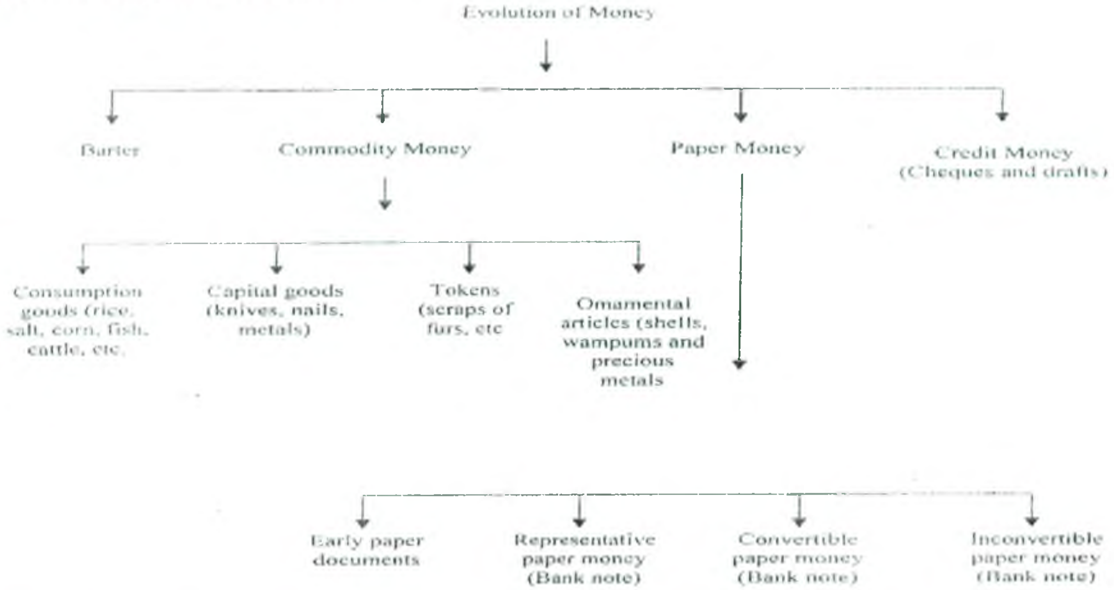

❑ মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক (Relation between Money and Bank)

মুদ্রা ও ব্যাংকের পথ চলা ঐতিহাসিক ভাবে প্রায় সমান্তরাল। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন এবং ব্যাংক ব্যবস্থার জন্ম প্রায় সমসাময়িক। মুদ্রার বহু মাত্রিক ব্যবহার ও প্রায়োগিক প্রয়োজন এবং মুদ্রার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে[৩]। সভ্যতার আলো যত দ্রুত গতিতে এগিয়েছে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিও তত দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। দেশীয় ও আন্ত দেশীয় যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক লেন-দেন, আদান-প্রদান ও বিনিময়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। আর এ বিনিময়কে অর্থবহ ও সুশৃংখল করার জন্যই সভ্যতার আদিযুগের 'Berter system' এর যুগ অতিক্রম করে এক পর্যায়ে মুদ্রার আবিষ্কার হয়েছে। আর মুদ্রা আবিস্কারের পর পরিপূরক হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। Lester V. Chandler ব্যাংকের উৎপত্তির কারণ হিসেবে ধাতব মুদ্রার চারটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল:[8]

ক. চুরি ডাকাতি হতে মুদ্রার নিরাপত্তা;

খ. দূরবর্তী স্থানে মুদ্রা পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিক পরিবহন খরচ ও ঝুঁকি;

গ. অধিক ব্যবহারের ফলে মুদ্রার ওজন কমে যাওয়া এবং

ঘ. অব্যবহৃত মুদ্রা হতে কোনো প্রকার সুদ বা মুনাফা না পাওয়া।

তাঁর মতে ধাতব মুদ্রার ঐ অসুবিধাগুলো দূর করার প্রক্রিয়া হিসেবেই ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৩. মোঃ আব্দুল আজিজ, জি.আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
8. T. T. Sethi, ibid, p. 244

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা ও ব্যাংক-এর সম্পর্কের আরেকটি বিশেষ দিক হলো, ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ বা মুদ্রা চূড়ান্ত অবস্থায় ব্যাংক ব্যবসাকেই প্রভাবিত করে থাকে। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ করা ঋণ বাজারে বিনিয়োগ সৃষ্টি করে থাকে। আবার এ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অর্থ ব্যাংকে নতুন আমানত সংগঠিত করে থাকে। এ আমানতই পুনরায় ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জনের পথ আরো প্রশস্ত করে [১]। মুদ্রার প্রচলন ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে একথা বলা যুক্তিসংগত যে, "Money is for bank and bank is also for money." মুদ্রা এবং ব্যাংক উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।

❑ ব্যাংক : অর্থ ও উৎপত্তি

'Bank' শব্দটি সমার্থক শব্দ (Synonym)। আভিধানিক অর্থে 'Bank' দ্বারা নদী, খাল, বিল বা জলাশায় প্রভৃতির তীর ভূমি বা তটরেখা, লম্বাটুল, অধিকোষ বা ধনভান্ডার (Treasury) খাজাঞ্চিখানা, কোন কিছুর স্তুপ ইত্যাদিকে বুঝায়[২]। তবে দীর্ঘ বিবর্তনের ধারাবাহিকতা অতিক্রম করে আধুনিক বিশ্বে ব্যাংক শব্দটি সার্বজনীনভাবে একটি গ্রহণযোগ্য অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর তা হলো অর্থ বিনিময় ব্যবসায়ে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই 'Bank' বলা হয়[৩]। ইংরেজী 'Bank' শব্দটি কখন কোথায় এবং কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর আগের সমস্ত তথ্যই অনুমানভিত্তিক। ফলে 'Bank' শব্দটির উৎপত্তির বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষক ও অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষজ্ঞদের কারো কারো অভিমত হল, এক সময় স্ক্যানডিনেভিয়ান ও মধ্য ইউরোপিয়ান দেশসমূহে লম্বাটুল বা বেঞ্চিকে 'Bank', 'Banke' বলা হতো। অনুরূপ ওলন্দাজ ও ফরাসি 'Banque', 'Bank'ও 'Banko' শব্দ দ্বারাও টুল বা বেঞ্চ বোঝানো হতো, এবং এ শব্দগুলো হতেই 'Bank' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে[৪]। W. Frankace বলেন,

"আরেক দল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মধ্যযুগে ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল তখন এ সমস্ত দেশের বিশেষত ভেনিস, জেনোয়া ও ইতালির বিখ্যাত Lombardy নামক স্থানে ইহুদি মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ লম্বাটুল বা বেঞ্চির উপর বসে অর্থ লেন-দেনের ব্যবসা পরিচালনা করতো, আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন দেশে এ টুল বা বেঞ্চগুলোকে 'Banco', 'Banko', 'Banca', 'Bangk', 'Bank', 'Bancus', 'Banc' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো। তাই এ মতের অনুসারীগণ বলেন যে, ইউরোপের এসব আঞ্চলিক শব্দ হতেই আজকের 'Bank' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে[৫]।"

---

১. মজিবুর রহমান সহঃ মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২. T. T. Sethi, Ibid. p. 244
৩. ibid.
৪. ibid. p. 245
৫. M.C. Vaish, ibid, p. 248

Dhaka University Institutional Repository

'ব্যাংক' শব্দের উৎপত্তির বিষয়ে বর্ণিত ধারণার বিপরীত অভিমতও পাওয়া যায় ইংরেজ লেখক Maclead-এর বর্ণনায়। তিনি বলেন, "Money Changer রা মধ্যযুগে যে স্থানে আর্থিক লেনদেন বা অর্থ কড়ি বিনিময়ের জন্যে বসতেন বা অর্থ কড়ি জমা করতেন সেটাকে কখনো 'Bancheere' বা 'Banco', 'Banque' 'Banke' বা 'Banca' বলা হতো না [১]।" তবে এটা সত্য যে, তৎকালে ইতালীতে Banco এবং জার্মানী ও অস্ট্রীয়ায় Banke শব্দ দ্বারা public debt অথবা issue of paper money কে বুঝানো হতো। তাঁর মতে, সে সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঐ শব্দগুলোকে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে ব্যবহার করা হতো। সুতরাং 'ব্যাংক' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরিউক্ত ধারণা বা অভিমতগুলো পুরোপুরি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না [২]। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্টভাবে ইতালীয় শব্দ 'Banca' ও ফরাসী শব্দ 'Banque' কে 'ব্যাংক' অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং ফ্রান্সে এখনো ব্যাংক লিখতে 'Banque' শব্দটি ব্যবহার করা হয় [৩]।

এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইতালীর প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে মারাত্নক গোলযোগ দেখা দেয় এবং ১১৫০ সালে ভেনিস শত্রু কবলিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সরকার যুদ্ধের খরচ ও আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য জনগণের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে দেয় ৫% হার সুদে এ গণ ঋণের (public debt) প্রচলন করেন। এটি স্তুপীকৃত ঋণ (Collective Credit বা Forced Subscribed Loan) নামে সুপরিচিত ছিল। এখন এ ঋণকে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে 'Banke', 'Banco', Campara, Monte ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। এদের মধ্যে ইতালীয় শব্দ Monte ও Banco সর্বাধিক পরিচিত ছিল। আবার একে জার্মান ও অস্ট্রিয়ায় 'Banke' বলা হতো। তাই অনেকে মনে করেন জার্মান শব্দ 'Banke ইতালীতে Banco এবং পরবর্তীকালে ইংরেজীতে 'Bank' শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বের ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে পরিচিতি লাভ করে[8]। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি ভেনিসের তিন ব্যাংকার–স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ীকে Monte বলে আখ্যায়িত করা হতো। তৎকালে ইতালীয় শব্দ Monte এবং জার্মান Banke শব্দ দ্বয়কে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রায় সমঅর্থে ব্যবহার করা হতো [৫]।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধুমাত্র সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবেই Bank শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য কোন ঐকমত্য আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উপরিউক্ত শব্দগুলোর সাথে Bank শব্দের উৎপত্তিগত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা বর্তমানে ব্যাংক বলতে যা বোঝায়, মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নার্থে ও কাজে 'Banco', 'Banke', 'Monte' প্রভৃতি শব্দগুলো দ্বারাও ঐ ধরনের কিছু বোঝানো হতো[৬]। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, ইতালী শব্দ 'Banco' ও র্জামান শব্দ 'Banke' হতে আধুনিক 'Bank' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং ইতালী-ই যে, 'ব্যাংক' শব্দ–ব্যাংকিং পদ্ধতির আদি উৎসস্থল এতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে এখান থেকেই অন্যান্য দেশে ও স্থানে পরিবর্তিত রূপে আধুনিক ব্যাংক (Bank) শব্দের উৎপত্তি ও প্রচলন হয় [৭]।

---

১. MaClead '*Theory of Practice of Banking*' p.36
২. Chamber's Twenteeth Century Dictionary.p
৩. AS Hornby, Ibid, P. 104
৪. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. 8
৫. প্রাগুক্ত,
৬. T. T. Sethi, ibid. p. 244
৭. M.C. Vaish, ibid, p. 250

Dhaka University Institutional Repository

❒ ব্যাংক-এর পরিচিতি

অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বা জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ সংরক্ষণ, বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরকরার উদ্দেশ্যে, নগদ লেন-দেনের ঝামেলা হ্রাস, অর্থ প্রবাহ সৃষ্টির ও লক্ষ্যে অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার জন্যই মূলত ব্যাংকের উৎপত্তি হয়। ব্যাংক বিশেজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাংককে Functional বা কার্যগত দিক থেকে আবার কেউ Structural বা কাঠামোগত দিক থেকে ব্যাংক এর পরিচিত প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত এ সব পরিচিতি এককভাবে কোনটিই ব্যাংক সম্পর্কে সার্বিক ধারণা না দিতে পারলেও ব্যাংক কি তা বুঝতে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত এবং অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল;

⇨ Dictionary of Banking and finance-এ প্রদত্ত পরিচিতিতে বলা হয়েছে,
"ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান যা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত এবং যা প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন বা পরিচালনা করেঃ

ক) চলতি আমানত গ্রহণ ও চেকের মাধ্যমে গ্রাহককে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা;

খ) মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও তার উপর সুদ প্রদান করা;

গ) নোট বাট্টাকরণ, ঋণ প্রদান এবং সরকারি ও অন্যান্য ঋণ পত্রে বিনিয়োগ করা;

ঘ) চেক, ড্রাফট ও নোট ইত্যাদি সংগ্রহ করা;

ঙ) ড্রাফট ও ক্যাশে চেক ইস্যু করা;

চ) আমানতকারীদের চেক প্রত্যয়ন করা[১];

⇨ New Encyclopedia Britanica-তে বলা হয়েছে, "ব্যাংক হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা, চেক ও বিনিময় বিলের মত বিকল্প মুদ্রা ব্যবসায়ী[২]"।

⇨ The New Caxton Encyclopedia-তে বলা হয়েছে " প্রাথমিকভাবে এটা মুদ্রা ও ঋণের হাতিয়ার এবং ব্যবসায়ের কারবার [৩]।"

⇨ ভারতীয় কোম্পনী আইন, ১৯১৩-অনুযায়ী, যে কোম্পানী তার প্রধান ব্যবসা হিসাবে চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার প্রভৃতির মাধ্যমে ওঠানোর যোগ্য টাকার আমানত চলতি হিসাবে বা অন্য কোনভাবে গ্রহণ করার কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে ব্যাংকিং কোম্পানী বলে [৪]।"

⇨ ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৯, ৫(বি)-তে বলা হয়েছে "ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ঋণদান অথবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্য জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে থাকে এবং জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র চেক, হুন্ডি অথবা যে কোন প্রকারে ফেরত দিয়ে থাকে [৫]।"

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-এ উদ্ধৃত

২. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-এ উদ্ধৃত

৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-এ উদ্ধৃত

৪. O.S Srivastava, ibid, pp.3-15- এ উদ্ধৃত

৫. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

⇨ বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানী অধ্যাদেশ ১৯৯১,৫(৩)-এর ভাষ্য অনুযায়ী "ব্যাংক ব্যবসায় অর্থ কর্জ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হতে টাকার এরূপ আমানত গ্রহণ করে যা চাহিবা মাত্র বা অন্য কোনভাবে পরিশোধযোগ্য এবং চেক ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রত্যাহার যোগ্য [১]।"

⇨ অপর দিকে বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী, "যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো চলতি বা অন্য কোন হিসেবে মাধ্যমে জনগণের নিকট হতে টাকা আমানত গ্রহণ করা এবং চেক বা আদেশ পত্রের মাধ্যমে উক্ত টাকা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করা, তাকেই ব্যাংকিং কোম্পানী আইন বলে[২]।"

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক-এর মতে,

⇨ "একটি ব্যাংক আবশ্যকীয়ভাবে বিতরণমূলক সেবাকার্য সম্পাদন এবং ঋণ গ্রহিতা ও ঋণদাতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক অর্থে ব্যাংককে একটি জটিল আর্থিক কাঠামোর প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে[৩]। সরল অর্থে বলা যেতে পারে যে, ব্যাংক মুদ্রা ব্যবসায়ে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং সে সূত্রে এটা কতিপয় সংশ্লিষ্ট আর্থিক সেবাকার্য প্রদান করে থাকে[৪]।"

⇨ এইচ এল হার্ট-এর মতে, "যে প্রতিষ্ঠান ব্যবসা-কালীন সময়ে যাদের নিকট হতে এবং যাদের জন্য চলতি হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে তাদের চেক স্বীকার করে নেয় তাকে ব্যাংক বলে[৫]।"

⇨ জন প্যাগেট ব্যাংক-এর পরিচিতিতে বলেন, "কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলা যায় না, যদি না সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানঃ

ক) আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে;

খ) চলতি হিসেবে অর্থ গ্রহণ করেঃ

গ) তার ওপর অংকিত চেক মেনে নেয় এবং

ঘ) তার গ্রাহকদের জন্য দাগকাটা বা দাগবিহীন চেক সংগ্রহ করে [৬]।"

⇨ সেয়ার্স মনে করেন, "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের পারস্পারিক ঋণ নিষ্পত্তির জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়[৭]।"

⇨ জি. এফ. ক্রাউথার ব্যাংক-এর পরিচিতিতে বলেন, "ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যা প্রকৃত ব্যাংক ব্যবসার সাথে জড়িত [৮]।"

⇨ জন হ্যারি-এর মতে, "ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ও ঋণের দলিল বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা [৯]।"

⇨ আর. পি ক্যান্ট-এর অভিমত অনুযায়ী, "ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করা এবং অপরকে তা ঋণ হিসেবে প্রদান করা [১০]।"

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-এ উদ্ধৃত
২. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-এ উদ্ধৃত
৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-এ উদ্ধৃত
৪. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-এ উদ্ধৃত
৫. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-এ উদ্ধৃত
৬. H. L. Bedi & associates, ibid, p.7- এ উদ্ধৃত
৭. ibid,
৮. ibid, p.8
৯. ibid, p. 9
১০. ibid,p. 10

Dhaka University Institutional Repository

⇨ O.S. Srivastava-এর মতে,

"Comercial banks accept primary monies as deposits and then land this money to the debt market: in the process they create secondary money or credit money. "Loan becomes children of deposits and deposit.(secondary) become the children of loans."[১]

তিনি আরও বলেন, "Banks are what banks do.[২]"

⇨ ড. এ আর খাঁন ব্যাংক-এর পরিচিতিতে বলেন , "A business Institution that receives surplus funds of individuals, trading or non-trading institution, government or private. Institution as deposit and supply money with asurance of repayment against security in excharge of profit or interest to trading or non-trading institution, government or non-government institution who has deficit fund and demand for money, and to fucilitate this process, create various credit instruments and give facility of with drawals of deposit as and when needed [৩]."

উপরোক্ত পরিচিতিগুলো পর্যালোচনা করলে ব্যাংকের পরিচিতি সম্পর্কে যা বেরিয়ে আসে তা হলোঃ

ক. ব্যাংক একটি মুদ্রা কারবারী বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান;

খ. ব্যাংক হলো আর্থিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যা জনগণের নিকট থেকে অলস পড়ে থাকা কিংবা সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে, অন্যকে সুদের বা মুনাফার বিনিময়ে ঋণ হিসেবে প্রদান করে;

গ. ঋণ আমানত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান;

ঘ. লাভজনক খাতে অনেক ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান;

ঙ. ব্যবসায়ীদের বিল বন্ড ইত্যাদি ভাঙ্গিয়ে দেয় এবং

চ. চাহিবামাত্র আমনতকারীর অর্থ ফেরত প্রদানকারী এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠান।

---

১. O.S Srivastava, ibid, pp.3-4

২. ibid

৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

❐ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক সর্বজনগ্রাহ্য সর্বকালে ও সকলদেশে প্রযোজ্য একক কোন সংজ্ঞা প্রদান একটি দূরুহ ও জটিল বিষয়। তবে অর্থনীতিবিদ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচিতিগুলো এককভাবে সার্বিক ধারণা না দিতে পারলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির ধরন ও প্রকৃতি এসব বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা পেতে সহায়তা করে। এ পর্যায়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ, ও লেখকগণ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

⇨ পি. কেন্ট-এর মতে, "যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণার্থে দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক' বলে [১]।"

⇨ পি. এইচ. কলিন-এর মতে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রধান ব্যাংক যা দেশের আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্যে দেশের প্রধান সুদের হার নির্ধারণ করে, নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে, বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে তত্ত্বাবধান করে এবং বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করে [২]।"

⇨ M.H.Dee. Kock-এর মতে, "A central bank is a bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure of its country and which performs as best as it can in the national economic interest, the following functions:

1. The regulation of currency in accordance with the requirments of business and the general public for which purpose it is granted either the sole right of note issue or at least a partial monopoly thereof;

2. The performance of general banking and agency serevices for the state;

3. The custody of the cash reserves of the commercial banks;

4. The custody and management of the nation's reserves of international currency;

5. The granting of accommodation, in the form of discounts or collateral advances, to commercial banks, bill brokers and dealers, or other financial institutions, and the general acceptance of the responsibility of lender of the last resort;

6. The settlement of clearance balances between the banks and

7. The control of credit in accordance with the needs of business and with a view to carrying out the broad monetary policy adopted by the state. [৩]"

⇨ ড. এস. এন. সেন-এর মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ব্যাংকিং সমাজের নেতা, রাজা ও সূর্য সবকিছু। নেতার মতো ব্যাংকিং রাজত্ব শাসন করে এবং সূর্যের মতো জগতে আলো দেয়, এনার্জি বা শক্তি যোগায় [৪]।"

---

১. M. C. Vaish. ibid. p. 328
২. M.H. Dekock, *Central Banking* (1956) Chapter-2, p.19
৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আলোচিত পরিচিতিগুলো বিশ্লেষণ করলে সংক্ষেপে বলা যায়;

ক. এটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতীক হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

খ. এটি ঋণ নিয়ন্ত্রক;

গ. এটি নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একচ্ছত্র অধিকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

ঘ. এটি মুদ্রামাণের স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী;

ঙ. এটি মুদ্রা বাজারের অভিভাবক;

চ. এটি সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সকল কাজ করে এবং

ছ. সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পালনে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

❐ বাণিজ্যিক ব্যাংক

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে যা বুঝায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত তাই। ব্যাংকের পরিচিতি, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও প্রসঙ্গত এখানে অর্থনীতিবিদ ও লেখকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতির উপর নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

⇨ Gilvert-এর মতে, "বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধন ও অর্থের কারবারী প্রতিষ্ঠান। মধ্যস্থকারবারী হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান এক পক্ষের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে ও অন্য পক্ষকে ঋণ দেয় এবং এই উভয় বিষয়ের পার্থক্য হলো এর মুনাফার উৎস [১]।"

⇨ R. S. Sayers বলেন, "বাণিজ্যিক ব্যাংক শুধু অর্থের কারবারী প্রতিষ্ঠানই নয় বরং অর্থের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদকও বটে [২]।"

⇨ Rozer-এর মতে, "যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থের মুল্যে নিরূপণযোগ্য পণ্য-দ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে[৩]।

⇨ Dr. H.L. Hart বলেন, "যে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে যাদের কাছ থেকে অর্থ জমা হিসাবে গ্রহণ করেছে বা চলতি হিসাবে অর্থ জমা রেখেছে তাদের ইস্যুকৃত চেকের মূল্য পরিশোধ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে [৪]।

⇨ M.C. Vaish বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচিতিতে বলেন, "Gone are the old days when commercial banks were regarded as merely purveyors of money. They are today not merely purveyors of money but are also the creator or manufacturers of money in the system. It is the banks who set the tempo of the aggregate economic activity in the system.[৫]"

---

১. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২. R.S. sayers, *Modern Banking*, Chapter-1, p. 3
৩. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৫. M. C. Vaish. ibid. p. 243

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকের সার্বিক কর্মপরিধির সীমা রেখা নির্ধারণ করা যেমন দূরূহ তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংকেরও একক সর্বজনগ্রাহ্য সকল দেশের জন্য সময় নিরপেক্ষ পরিচিতি প্রদানও জটিল বিষয়। তবে বর্ণিত পরিচিতিগুলোর আলোকে বলা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো[১]:

ক) মুনাফা অর্জনকারী একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

খ) চাহিবা মাত্র আমানতকারীদের দাবী পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠান;

গ) স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণকারী ও অধিক সুদে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;

ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থের মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং

ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থের সৃষ্টিকারী বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান[২]।

---

১. মোহাম্মদ ওসমান গণি, '*প্রায়োগিক ব্যাংকিং ও শাখা ব্যবস্থাপকের কলাকৌশল*' (ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন২০০৭ খ্রি.), পৃ.৩০

২. আর. এ হাওলাদার সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থা*, (ঢাকা: আত্মপ্রকাশন ২০০৮খ্রি.) পৃ. ২৩-২৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ ব্যাংক : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ব্যাংকের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্বন্ধে লেখক পন্ডিত ও গবেষকগণের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যাবলির ইতিহাস হতে ব্যাংকের ক্রমোন্নতির যে চিত্র ও তথ্যাবলী পাওয়া যায় সে বিষয়ে সকলে একমত। ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস মুদ্রার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। বিশেষজ্ঞ ও বোদ্ধারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম যুগ থেকেই সমান্তরাল ভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়েছে[১]। কারণ মুদ্রা প্রচলনের পর মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মূলত ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। এ জন্য যথার্থই বলা হয় যে, "অর্থ (মুদ্রা) হলো ব্যাংকের জন্মদাতা, এবং ব্যাংক হলো অর্থের সংরক্ষক।" সুতরাং ব্যাংক ও অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য[২]। Lester V. Chandler ব্যাংকের উৎপত্তির কারণ হিসেবে ধাতব মুদ্রার চারটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল:[৩]

ক. চুরি ডাকাতি হতে মুদ্রার নিরাপত্তা;

খ. দূরবর্তী স্থানে মুদ্রা পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিক পরিবহন খরচ ও ঝুঁকি;

গ. অধিক ব্যবহারের ফলে মুদ্রার ওজন কমে যাওয়া এবং

ঘ. অব্যবহৃত মুদ্রা হতে কোনো প্রকার সুদ বা মুনাফা না পাওয়া

তাঁর মতে, ধাতব মুদ্রার ঐ অসুবিধাগুলো দূর করার প্রক্রিয়া হিসেবেই ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রয়োজনে ব্যাংক ব্যবসা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে[৪]। তাই এই পর্যায়ে বহুমাত্রিকতার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাথে যে বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট তা নিম্নরূপ:

ক. মুদ্রা প্রচলনে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ;

খ. ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ;

গ. মানব সভ্যতায় ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ;

ঘ. সময় ও যুগের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ;

ঙ. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং

চ. স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের অবদানে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ।[৫]

---

১. আর, এ হাওলাদার সৈয়দ আশরাফ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৫
২. M.C. Vaish, ibid, pp. 248-249
৩. ibid,
৪. মোহাম্মদ ওসমান গণি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০
৫. T. T. Sethi, ibid. p. 244

Dhaka University Institutional Repository

ক. মুদ্রা প্রচলনে ব্যাংক

অসংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থাকে বর্তমানে আধুনিক সুসংগঠিত, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃংঙ্খল পর্যায়ে উন্নত রূপ দিতে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা[১]। ব্যাংকের উৎপত্তি এর ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় যে বিষয়টি প্রথম আসে তা হলো 'মুদ্রা'। মধ্য যুগে Baerter System বা প্রত্যক্ষ পণ্য বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূর করে, যখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয় প্রকৃতপক্ষে, তখন থেকেই ব্যাংক ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়। "মুদ্রার প্রয়োজনেই ব্যাংক এসেছে" [২]। তৎকালীন সময়ে জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ ধনবান ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট জমা রাখত এবং একই সময়ে এক সাথে অর্থ তুলে নিতে আসত না। তাই তারা এসব অর্থ মূলধন হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করত। এ ভাবেই জমা গ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে মূলত ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব ঘটে। এ জন্যেই বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য হলো; "Money is the mother of banks and banks are the reformer of money".[৩]

খ. ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংক

মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় মানুষের জাতীয়-আন্তর্জাতিক ও দেশীয়-আন্তঃদেশীয় লেনদেন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার হতে থাকে। মুদ্রা প্রচলনের পর ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সেটি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য[৪]। কারণ মুদ্রা প্রচলনের পর পরই শুরু হয় ঋণের প্রচলন। মানুষের মধ্যে অর্থ-বিত্ত ও সম্পদের মালিকানায় পার্থক্য হতে থাকে। শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থের (Surplus money) নিরাপদ সংরক্ষণ করার প্রায়োজন অনুভব করতে থাকে। আরেক শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যে অর্থের অন্বেষণে ঋণ পেতে সচেষ্ট হতে থাকে[৫]। এ ঋণের উপর কালক্রমে সুদ ধার্য করা হয়। এ ভাবেই সমাজে মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এ ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হওয়ায় মহাজনরা সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহে যথেষ্ঠ যত্নবান হতে থাকে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে আমানতকারীকে (Depositors) একটি নির্ধারিত অংশ প্রদানের রেওয়াজ গড়ে উঠে যা আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ে মুনাফা (Interest) বা লাভ হিসেবে পরিচিত[৬]।

তাই দেখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বিনিময় মাধ্যম হিসবে অর্থের বা মুদ্রার ছিল মুখ্য ভূমিকা; আর অর্থের লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতো। অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংক একে অপরের পরিপূরক। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রচলন হয় মুদ্রার, আর অর্থ বা মুদ্রার নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্ভব হয় ব্যাংকের[৭]।

---

১. O.S Srivastava, ibid, p.33
২. M.C. Vaish, ibid, pp. 248-249
৩. এ কে এম ইমদাদুল হক মজুমদার, *ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রা তত্ত্বের আধুনিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: প্রকাশক মোহাম্মদ ইব্রাহিম২০০৩ খ্রি.) পৃ. ৩
৪. মজিবুর রহমান সহঃ মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৫. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. 8
৬. M.C. Vaish, ibid, p. 25
৭. T. T. Sethi, ibid. p. 21

Dhaka University Institutional Repository

গ. মানব সভ্যতায় ব্যাংক

প্রাচীন সভ্যতায় ব্যাংক ব্যবসায়ের গোড়া পত্তনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রসার লাভ করেছিল তেমনি ব্যাংক ব্যবসায়েরও উন্নতি হয়েছিল সমান্তরালভাবে ও ব্যাপকভাবে[১]। নিম্নে যে সব সভ্যতায় ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ও এর উন্নতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলো নিম্নরূপঃ[২]

১. সিন্ধু সভ্যতা-খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল

২. বৈদিক সভ্যতা-খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল

৩. ব্যবলনীয় সভ্যতা- খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল

৪. রোমান সভ্যতা, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল-১০০০ সাল

৫. চৈনিক সভ্যতা, খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সাল

৬. গ্রীক সভ্যতা- খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সাল

৭. মিসরীয় সভ্যতা

৮. মোসোপটেমিয়ান সভ্যতা

৯. পারস্য সভ্যতা

১০. মুসলিম সভ্যতা- খ্রিষ্ট পরবর্তী

গবেষকগণ মনে করেন যে, সিন্ধু সভ্যতা থেকে খ্রিষ্ট পরবর্তী মুসলিম সভ্যতা পর্যন্ত অভ্যান্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য ও মুদ্রার প্রচলন হবার সাথে সাথেই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কারণ বাণিজ্য ও মুদ্রার সাথে ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হবার একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন যুগের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ[৩]:

- ⇨ সিন্ধু, গ্রীক, রোমান, চীন ও মিসরীয় সভ্যতায় মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং এদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বিদ্যমান ছিল;
- ⇨ ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় 'উপাসনালয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা' চালুছিল যা পুরোহিতগণ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো [৪];
- ⇨ এ সময়কালে ঋণ ও সুদের প্রথা চালু ছিল যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদও মনুতে উল্লেখ আছে;
- ⇨ প্রাচীনকালে রোমান সভ্যতায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঋণদানকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে অর্থ-উত্তোলন ও ব্যবসায়িক লেনদেন নিষ্পত্তিতে চেক, হুন্ডি ও ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহৃত হতো;
- ⇨ এ সময়ে মুদ্রার প্রচলন, আমানত সংরক্ষণ ও ঋণদানের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশ্বের সর্বপ্রথম সংগঠিত 'শান্সী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হলো[৪]।

---

১. মোঃ আবদুল আজিজ, জি আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২. M.C. Vaish, ibid, p. 23
৩. M.C. Vaish, ibid, p. 28
৪. T. T. Sethi, ibid. p. 30

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বিভিন্ন যুগে প্রেক্ষিতে ব্যাংক

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সবচেয়ে অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হবে, এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়ক হবে যদি আমরা আবহমান কালের বা যুগের বিবেচনায় এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ব্যাংক যেসব যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে অত্যাধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে তা নিম্নরূপ[১]:

- প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যাংকিং (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সাল);
- প্রাচীন যুগে ব্যাংকিং (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০- খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সাল);
- মধ্যযুগে ব্যাংকিং (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০- ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং
- আধুনিক যুগে ব্যাংকিং (১৪০০ খ্রি- বর্তমান) ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ, প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ[২]:

- অঞ্চলভিত্তিক মুদ্রার প্রচলন ছিল;
- উদ্বৃত্ত অর্থ (Surplus Money) আমানত রাখা শুরু হয় এবং
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানের প্রচলন শুরু হয়
- মধ্যযুগেই প্রথম ইহুদী ও সাধারণ মহাজনগণের উদ্যোগে ব্যাংক স্থাপিত হয় (সপ্তম শতক);
- এ সময়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে সরকার কর্তৃক সুদের বিনিময়ে বাধ্যতামূলক ঋণের প্রচলন শুরু হয়। (১১৫০ খ্রি:)
- সরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হয় (১১৫৭ খ্রি:);
- বণিকগণ কর্তৃক 'ব্যাংক অব সান জর্জিও' স্থাপিত হয় (১১৭৮ খ্রি:)
- ইতালির লোম্বর্ডি শহরে ইহুদিদের দ্বারা ব্যাংক ব্যবসায় ব্যাপকভাবে শুরু (১৩০০ খ্রি:)
- ব্যাংক ও ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য লিখিত দলিল, রশিদ, আদেশনামা ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়।

---

১. M.C. Vaish, ibid, p. 16
২. R.C Gupta, ibid, p. 58

Dhaka University Institutional Repository

❒ আধুনিক যুগে ব্যাংকিং

প্রাগৈতিহাসিক যুগ, প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ-কাল পরিক্রমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে ব্যাংক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। ব্যাংকিং কার্যাবলিতে বহুমুখীকরণের সূত্রপাত হয়েছে আধুনিক যুগে। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এ সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ও যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পর্যায়ে এসে উন্নত সাংগঠনিক রূপ লাভ করেছে। ব্যাংকের কার্যাবলিতে বিভাগীকরণ, বিশেষায়ন ও বিশেষজ্ঞতার নতুন মাত্রার সংযোজন আমরা প্রত্যক্ষ করছি[১]। মধ্যযুগে যেখানে শুধুমাত্র ইতালী ও ইংল্যান্ডে ব্যাংক ব্যবস্থার পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়, আধুনিক যুগে সেটি সারা ইউরোপসহ বিশ্বের সকল মহাদেশের প্রায় সকল দেশেই নব জাগরণের সৃষ্টি করে। যদিও মধ্য যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তবুও বিশেষ করে কর্ম পরিধির ক্ষেত্রে, কার্যাবলির ব্যাপকতায় ও প্রসারতায় আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে তার বিস্তর পার্থক্য ছিল। আধুনিক যুগ পর্যালোচনা করলে ব্যাংক ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ:[২]

- ⇨ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অত্যন্ত সুসংগঠিত ব্যাংক রূপে 'ব্যাংক অব বার্সিলোনার' প্রতিষ্ঠা লাভ (১৪০১খ্রি.);
- ⇨ 'ব্যাংক অব জেনোয়া' প্রতিষ্ঠিত (১৪০৭ খ্রি.);
- ⇨ 'ব্যাংক অব আমস্টারডাম' ও 'হামবুর্গ' গঠিত (১৬০১ এবং ১৬০৫ খ্রি.);
- ⇨ এ সময় বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ও সনদ প্রাপ্ত ব্যাংক হিসেবে 'ব্যাংক অব সুইডেন'-এর আত্মপ্রকাশ;
- ⇨ বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' স্থাপিত (১৬৯৪ খ্রি.);
- ⇨ এ সময় বিভিন্ন দেশে প্রচুর সংখ্যক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে;
- ⇨ আধুনিক যুগে ব্যাংক ব্যবস্থায় বিশেষায়ণ শুরু হয়;
- ⇨ এ সময় ব্যাংক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকতা গুরুত্ব পেতে থাকে;
- ⇨ ব্যাংক কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং
- ⇨ E. Banking' কার্যক্রম শুরু হয়[৩]।

---

১. মজিবুর রহমান সহ: মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
২. M.C. Vaish, Ibid, p. 249
৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ব্যাংক

ঐতিহাসিক বিবেচনায় বিশ্বের প্রত্ন সম্পদসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস- ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসহ যাবতীয় কার্যাবলির নিদর্শন হয়ে আছে প্রত্ন সম্পদ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় ইতিহাস ও সভ্যতার সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিস্কৃত হচ্ছে। এবং তা দ্বারা ব্যাংকের উৎপত্তি ও এর ইতিহাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও শিকড় অনুসন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনের কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থান খনন করে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুদ্রা। এসব মুদ্রা বিভিন্ন সভ্যতা ও যুগের নির্দেশক এবং এ গুলো থেকে জানা যায় কোথায় কখন কি ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। কারণ মুদ্রা ও ব্যাংক পরস্পরের পরিপূরক[১]। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকেই এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে মুদ্রার প্রচলন ছিল। মিশর, চীন, গ্রীস, রোম, পারস্য, বেবিলন, প্রভৃতি সভ্যতায় যে মুদ্রার প্রচলন ছিল তা অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়ার মাধ্যমে[২] সম্প্রতি সৌদি আরবে হাজার হাজার বৎসর পূর্বের হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ধন-সম্পদ আবিস্কৃত হয়েছে যার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রাও আছে[৩]। এসব নিদর্শন তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিশেষ করে ব্যাংক ব্যবস্থার একটি চিত্র আমাদের সামনে অতি নিখুঁতভাবে তুলে ধরছে।

চ. ধর্মীয় পবিত্রগ্রন্থে ব্যাংক

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীনকালের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির নিদর্শন-এর তথ্য বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ হতেও পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রচলনের কারণে সংগতভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, অর্থের লেন-দেন, ঋণ প্রদান, ঋণের বিপরীতে সুদ আদায় যা আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলির আওতাভূক্ত এ সব সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়[৪]। ঐসব কিছু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ব্যাংক ব্যবসায় এর অস্তিত্ব ছিল বলে অর্থনীতিবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশ্বের একমাত্র বিশ্বস্ত ও পবিত্র গ্রন্থ থেকে ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস জানা যায়। পবিত্র ও ঐশী গ্রন্থগুলো-আসমানি কিতাবসমূহে বিভিন্ন আমলের মুদ্রা ও সম্পদের উল্লেখ সুস্পষ্ট [৫]। হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমূখ ইতিহাসখ্যাত নবীগণ অপরদিকে নমরুদ, কারুন, সাদ্দাদ, ফেরাউন রাজা-বাদশাহের আমলে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল এবং ব্যাংকিং কার্যাবলিও বেশ উন্নত ছিল। ফেরাউনের আমলের ধাতব মুদ্রা ইদানিং মমির সাথে পাওয়া যাচ্ছে। ফেরাউন, নমরুদ ও সাদ্দাততো ধন-সম্পদের ঐশ্বর্যে এতটা অহংকারী হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত খোদাকেই অস্বীকার করেছিল[৬]।

---

১. মজিবুর রহমান সহ: মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২. M.C. Vaish, ibid, p. 250
৩. ড. মো: আশরাফ আলী খান, ড: মো: আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৪. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫. M.C. Vaish, Ibid, p. 251
৬. মোহাম্মদ ওসমান গণি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, কারুনের ধনসম্পদ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। সাদ্দাত তো আল্লাহ তায়ালার সাথে প্রতিযোগিতায় বেহেশত তৈরির স্পর্ধাও দেখিয়েছিল। সাদ্দাত তার বেহেশতে তৎকালের সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মণি, মুক্তা, ধন ও মুদ্রার সমাবেশ ঘটিয়েছিল। এ তথ্যগুলো হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে ব্যাংক প্রথার প্রচলন ছিল এবং এতে কোন সন্দেহ নেই[১]। হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিশরের বাদশাহ তখনও মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল। কারণ ইউসুফ (আঃ)-কে তো বণিকগণ মাত্র কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে মিশরের বাদশাহর নিকট বিক্রি করে দেয়, এমনকি তৎকালিন আন্তঃদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও পবিত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। আল-কুরআন এবং হাদীসে সুদ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তদুপরি হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ হতে ব্যাংকিং কার্যাবলির অস্তিত্বের তথ্য পাওয়া যায়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মনু ও বেদে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংকিং কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থে ব্যাংকের জামানত, বন্ধক, ঋণ এবং সুদের হার সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থে সুদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার তথ্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতে সংগঠিত ব্যাংকের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে তৎকালীন মুদ্রা, ব্যাংক, সুদ ও জামানত সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়[২]।

ছ. বিশেষ স্থানে ব্যাংক

ব্যাংকের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিশেষ কিছু স্থান প্রসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে এসব স্থানের অনন্য ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে ইতালী ও জার্মানীর নিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইতালী ও জার্মানীর বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে ব্যাংক ব্যবসায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়[৩]। মধ্যযুগের প্রারম্ভে লোম্বার্ডি শহরে একশ্রেণীর লোক বেঞ্চের উপর বসে অর্থ লেনদেনের কারবার পরিচালনা করতো এবং তারা জমার চিঠা (Deposit slip) এবং উত্তোলনের চিঠা (Withdrawal slip) ব্যবহার করতো। পরবর্তী কালে এগুলোই চেক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ কারণে অর্থনীতিবিদগণ ব্যাংক ব্যবসায়ের সুতিকাগার হিসেবে ইটালী এবং জার্মানীকেই চিহ্নিত করেছে[৪]।

জ. রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংহতিতে ব্যাংক

মানব সভ্যতায় সামাজিক কাঠামোর চূড়ান্ত পর্যায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ, বিধি-বিধান প্রণয়ন, সুশৃংঙ্খল উন্নত কাঠামোতে রূপদান এবং এর কার্যপরিধি বহুমুখিকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল[৫]। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্র তার প্রতিরক্ষা ব্যয়সহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে আয়ের উৎস হিসেবে খাজনা, কর, লেভী, শুল্ক ইত্যাদি ধার্য করে থাকে। প্রাচীনকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হলে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্র ঋণের জন্য মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর শরণাপন্ন হতো। প্রাচীনকালে যখনই কোথাও কোন রাষ্ট্র বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছে[৬]?

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৪. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে 'শানসী' ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পিছনেও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগের মাঝামাঝি ইউরোপের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল করার উদ্দেশ্যে সরকার এগিয়ে আসে। ১১৫৭ সাল থেকে ১৪০১ সালের মধ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি সনদ প্রদান শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকের ক্রমোন্নতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক সর্বদা বিরাজমান ছিল[১]।

ঝ. ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের অবদান

ব্যাংক ব্যবস্থা হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ব্যবসায়ী শ্রেণীর অবদান উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের নিকট এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মুদ্রা ব্যবস্থার আবির্ভাবের পর হতেই বিশেষ এক শ্রেণীর লোক ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে কার্যকর, ফলপ্রসু ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনায় তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা সমধিক গুরুত্ব বহন করে। এ বিশেষ শ্রেণীর লোকগুলো যুগ যুগ ধরে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কোন না, কোন ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সহায়ক হিসেবে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এর মহাজন, কাবলিওয়ালা, সাহকার, স্যাকরা, শরাফ, চেটি, ঋণকার ও ঋণের ব্যবসায়ী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসে এদেরকে আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়[২]। তাদেরকে কার্যাবলির আলোকে নিম্নরূপ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে [৩]।

১. স্বর্ণকার; ২. ব্যবসায়ী এবং ৩. মহাজন।

Crowther-এর ভাষায়, "The present day banker has three ancestory: Goldsmith, Merchants & Money lenders. A modern bank is some thing of these."[৪]

❐ **স্বর্ণকার শ্রেণী (Goldsmith):** ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তির ইতিহাসে ঋণকারদের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আদিকালে স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার, হীরক ও মনিমুক্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল বেশি। সে সময়ে মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল ছিল। তারা এ সমস্ত মূল্যবান মুদ্রা ও অলংকারাদি সংগ্রহ করে তা নিজেদের নিকট বছরের পর বছর জমা করে রাখত। তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে তারা সমাজে সৎ ও বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিল। তাদের কাছে স্বর্ণালংকার নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বিধায় জনগণ তাদের নিকট স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র জমা রাখত। তারা জমাদানকারীদেরকে আমানতকৃত সম্পদের বিপরীতে রসিদ প্রদান করতো। এ গুলো হস্তান্তর যোগ্য ছিল। গবেষকগণ বলেন এ রশিদগুলোই কালক্রমে ব্যাংকনোটে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাছাড়া আমানতকারী চাওয়া মাত্র নির্দিষ্ট অংকের অর্থ পরিশোধের জন্য একটি নির্দেশপত্র দিতেন। এ নির্দেশপত্রই পরবর্তীতে চেকরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

---

১. H. L. Bedi & associates, ibid, p.1
২. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণকাররা জনগণের জমাকৃত অর্থ হতে কিছু অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করতো এবং বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করতো। তাছাড়া ঋণপ্রদানকারীরা অর্থের নিরাপত্তা বিধানের বিপরীতে সামান্য সেবা খরচ আদায় করতো। পরবর্তীতে তারা প্রাইভেট ব্যাংক ব্যবসায়ের বীজ বপন করেন। কাজেই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসুরী হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে স্বর্ণকারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য [১]।

❒ ব্যবসায়ী (Businessman or Merchant)

ব্যাংক ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন ও এর উন্নয়নে ব্যবসায়ী শ্রেণী সভ্যতার আদিকাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এশিয়া ও ইউরোপে ব্যাংক ব্যবসায়ের পূর্ব পুরুষ হিসাবে এদের নাম ইতিহাসের পাতায় বিশেষ স্থান দখর করে আছে[২]। অর্থ হতে স্বচ্ছলতা, সামাজিক সম্মান, ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবসায়ীদেরকে খ্যাতির শিখরে পৌছানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত ও অগ্রসর থাকার কারণেও তারা ব্যবসা জগতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংক ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তারা হলো ইতালীর লোম্বার্ডি শহরের ইহুদী ব্যবসায়ীগণ। দ্বাদশ ও এয়োদশ শতাব্দীতে এ ইহুদী ব্যবসায়ীগণ লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে অর্থ লেনদেনের কারবার করতো। এ লম্বা টুল তাদের ভাষায় Banco নামে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয় যে, এ Banco শব্দ হতেই Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে[৩]। চুতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তারা এ ব্যাংক ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। বর্তমান কালের ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও এর কার্য প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে ঐ সকল ইহুদী অর্থ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সঙ্গে ব্যাপক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তাদের ব্যবহৃত ডিপোজিট শ্লীপ, উত্তোলন চিঠা ইত্যাদি; ব্যাংক ব্যবসায়েরই প্রমাণ বহন করে।

---

১. Geoffrey Crowther, An Outtine of Money, Revised Edition (1958), PP. 22-25, স্বর্ণকারগণ ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ বিষয়ে Geoffrey Crowther, বলেন, " The Goldsmith , ancestory of the modern bank is purely an English affair. Indeed, the bank as a provider of circulating money is almost entirely an English invention."

২. Geoffery Crowther, ibid, pp. 22-25
ব্যবসায়ীদের ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, "The merchant, whose high and widespread reputation or credit enables him to issue documents that will be taken all over the known world as titles to money. To this day the title of marchant banker is reserved by usage to the older cosmopolitan and more exclusive private banking firms, nearly every one of which can trace its ancestory to a trader in commodities, more tangible (Though hardly more profitable) Then money. "

৩. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

❒ মহাজন (Money lenders)

অর্থ ও ঋণ ব্যবসায়ের ইতিহাস প্রায় সমান্তরাল। সভ্যতার অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঋণ ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। এ ঋণ ব্যবসায়ের অগ্রপথিক হিসেবে মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ মহাজন শ্রেণী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ঋণ ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। ইউরোপের এ মহাজন শ্রেণীর লোকজন বেঙ্কুমি, মেডিসি, বেকুসি, পেরজ্জি, পিট্রি, আবজেন্টারী ও মিনসারী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা নামে এরা পরিচিত অর্জন করেছিল। ইউরোপের শাইলক এবং ভারতের জগৎশেঠের নাম 'মহাজন' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত[১]। আধুনিক কালের জামানতি ঋণ, বন্ধকী ঋণের (Mortgage loan) ধারণা তাদের মধ্য হতে আবিস্কৃত হয়েছে। জনগণের আমানতী অর্থের ওপর এরা আমানতকৃত অর্থে সুদ প্রদান করলেও প্রদত্ত ঋণের ওপর অত্যন্ত চড়া সুদের হারে সুদ আদায় করার মত তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ শতকে রোম সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগের গীর্জা, মন্দির এবং ১৪০০ বছর আগের ইসলাম ধর্মে সুদ গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সে সময়ে সুদের কারবার বা অর্থ ব্যবসায়ে এর মহাজনী অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে[২]।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক যুক্তি, ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সভ্যতার ঘটনাপ্রবাহ ও তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এটা প্রমাণ করে যে, আধুনিক ব্যাংক একটি সুপ্রাচীন ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সভ্যতার আলো বিকশিত হবার পাশাপাশি ব্যাংকিং ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়েছে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে ব্যাংকিং ব্যবসায়েও আধুনিকতার সংস্পর্শ ঘটছে। লোম্বার্ডি, ভেনিস কিংবা রোমের যে অর্থ-ব্যবসায়ী এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে স্বর্ণকার, সাহুকার শ্রেণী এবং তারও পরে এ ভারতীয় উপমহাদেশে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ও মহাজন শ্রেণীর অবদানের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ব্যাংকিং ব্যবস্থা সময়ের তালে তালে পা ফেলে আধুনিকায়িত হয়েছে [৩]। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

---

১. M. C. Vaish. ibid. p. 252
ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারে মহাজনদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, "Lending and borrowing are almost as old as money itself on the village money-lender is found even in quite primitive communities. He is not usually regarded as a lovely object, usurer is one of the oldest terms of abuse."

২. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ভারতীয় উপমহাদেশও পিছিয়ে নেই। উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসায়ে এখানকার পূর্ব পুরুষদের অবদান অনস্বীকার্য। হাজার বছরের ধারাবাহিকতায়, কাল পরিক্রমায় ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস প্রাচীন এবং প্রাচুর্যতায় ভরা। এ প্রসঙ্গে মদন কৃষ্ণ বল বলেন, "আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান অনেকখানি। কেননা যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে মহাজন, ব্যবসায়ী, মারওয়ারী, শেঠ, চেটী, বেনিয়া, স্বর্ণকার, সাহুকার প্রভৃতি শ্রেণী বংশ পরম্পরায় অর্থের লেনদেন, আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও আমানত সৃষ্টির মত ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পন্ন করে আসছে[১]।" প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্ন ধরনের হাতখত (Hand Notes) ও হুন্ডির মাধ্যমে অধিকাংশ লেনদেন সম্পন্ন হতো। তখনকার মুদ্রা ব্যবসায়ীগণ সমাজের সাধারণ লোক থেকে শুরু করে রাজা-বাদশা ও দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের অর্থ ঋণ দিত[২]।

উপমহাদেশে ব্যাংক-ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় প্রাচীন ও বৈদিক যুগের ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পর্কে M.C. Vaish বলেন,

"In India, the ancient Hindu scriptures refer to the money lending activities in vedic period. In India during the Ramayana and Mahabharata eras, banking had become a full-fledged business activity and during this period which followed the vedic period and Epic age the business of banking was carried on by the members of the Vaish community. Manu, The great low giver of the time, speaks of the earning of interest as the business of Vaishyas. The banker in the Smriti period performed most of those function which banks perform in modern times, such as the accepting of deposits, granting secured and unsecured loans, acting as their customers, bailee, granting loans to kings in time of grave crises, acting as the treasurer and banker to the state and issuing and managing the currency of the country.[৩]"

❒ মোঘল আমল (১১৫০ খ্রি. থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত)

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে মোঘল যুগের অবদান উল্লেখযোগ্য। মোঘলরা উপমহাদেশে সুদীর্ঘ ৬০০ বছর শাসন করেছে। প্রাচীনকাল হতে চলে আসা ব্যাংকিং ব্যবস্থা এ আমলে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ব্যক্তি ও বিশেষ পরিবারের প্রভাব পরিলক্ষিত। এ সময় খাজাঞ্চিখানা বা সরকারি কোষাগার (Treasury) প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার 'আশরাফি' নামে বিভিন্ন মূল্যমাণের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করে। ফলে দেশীয় ব্যাংকার ও মহাজনদের ব্যাংকিং ব্যবসায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। মোঘল আমলে উপমহাদেশে দেশীয় মহাজন ও ব্যাংকারগণ ব্যাপকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান করত। এ সময় ধাতব মুদ্রার প্রচলন হলে দেশীয় ব্যাংকারদের ঋণের ব্যবসা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়[৪]। মোঘল আমলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রচলন না ঘটলেও এ আমলের শেষ দিকে ঋণ ব্যবসায়ের প্রচলন ঢাকা, হুগলি ও মুর্শিদাবাদের মত বাংলাভাষী অঞ্চলেও ঋণ দানের সুবিধাসহ দেশীয় ব্যাংকিং চালু ছিল[৫]।

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২. KC Shekhar, Lekshmy Shekhar, ibid, p.2
৩. M. C. Vaish. ibid. p. 248
৪. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

❐ ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭ খ্রি.-১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত)

উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় মূলত, ব্রিটিশ আমল থেকেই। মোঘল আমলে ব্যক্তি গোত্র ও শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যাবলির দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটলেও মহাদেশব্যাপি আধুনিক ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঐ আমলে গড়ে উঠেনি[১]। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং ইংরেজ শাসন কায়েম হয়। ১৭৫৭ সাল থেকে ব্রিটিশ আমল শুরু হয়। মোঘল সুবেদার আমলে দেশীয় ব্যাংকাররা জগৎশেঠসহ অন্যান্য পরিবার, গোত্র ও শ্রেণীগুলো ব্যাংকিং কার্যাবলি এবং সরকারি মুদ্রা ও প্রশাসনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, পলাশীর যুদ্ধের পরও তারা তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষার দেওয়ানী লাভ করার পর দেশীয় ব্যাংকারদের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেকাংশে লোপ পেতে থাকে[২]। ১৮৩৫ সালে ইংরেজ বণিকগণ বা ইংরেজ শাসকগণ যখন এদেশে একটি অভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করলো, দেশীয় মহাজন ব্যাংকাররা তাদের লাভজনক মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা হারালো। পশ্চিমা ধাচের অনুসরণে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হলে তারা শুধু ব্যাংক ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে 'middle men' হিসাবে কাজ শুরু করল[৩]।

বৃটিশ আমলে উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার শুরুতে যে সব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে এর বর্ণণা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো[৪]:

- ⇨ Central Bank of India-প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৫ সালে।
- ⇨ 'Bank of Bengal-এ ব্যাংকটি ১৭৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ⇨ 'Bank of Bombay-১৮৪০ সালে এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় (H.L. Bedi-এর মতে ১৮০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- ⇨ Bank of Madras-১৮৪৩ সালে এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ তিনটি ব্যাংক কে 'Presidency Banks' বলা হত। এ তিনটি ব্যাংকের সিংহভাগ শেয়ারে মালিক ছিল ইউরোপিয়ানরা। এ গুলো সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সহ যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি সম্পন্ন করত। সীমিত আকারে মুদ্রা ইস্যুরও ক্ষমতা ছিল। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়-কেন্দ্রে ব্যাংকগুলোর শাখা ছিল[৫]।

---

১. ড. মো: আশরাফ আলী খান, ড: মো: আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২. M. Taheruddin, ibid, p.2
৩. H. L. Bedi & associates, ibid, p.2
৪. ibid, p.3
৫. ibid, p.4

Dhaka University Institutional Repository

⇨ ব্যাংক অব কলকাতা এটি ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

⇨ ১৯২০ সালে Imperial Bank of India প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে ব্যাংক অব কলকাতা, ব্যাংক অব বোম্বে, ব্যাংক অব মাদ্রাজ-এই তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংককে একত্রিত করে 'Imperial Bank of India' গঠন করা হয়। এর মধ্যদিয়ে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

⇨ ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Researve Bank of India) নামে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য যে, Researve Bank of India প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯৩৪ সালে ব্যাংকিং অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এটি ভারতবর্ষের প্রথম আইনসম্মত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে এবং এ ব্যাংকটির পৃষ্ঠপোষকতায় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। এভাবে এক পরিসংখানে দেখা যায়, ১৯০১ সাল হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত (ব্রিটিশ শাসনাধিনে) মোট ২১ টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং তৎকালিন পূববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৬৮টি শাখা ব্যাংক গড়ে উঠেছিল[১]। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের অধীন হতে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দ'ুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এ সময়ে ভারতে ১৪টি তালিকাভূক্ত ব্যাংক চালু ছিল এর পাশাপাশি বেশ কিছু অ-তালিকাভূক্ত ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়[২]।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৮৭৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামে 'ব্যাংক অব বেঙ্গল'-এর দুটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯০০ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুরে এর একটি শাখা খোলা হয়। পরবর্তীতে এ অঞ্চলে Bank of Bengal-এর অনেকগুলো শাখা খোলা হয়েছিল। আবার সময় সময় বন্ধও করে দেয়া হয়েছিল। ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে এ ব্যাংকের ৬টি শাখা কার্যরত ছিল। এ গুলো হচ্ছেঃ ঢাকা (১৮৬২), চট্টগ্রাম (১৯০৬), ময়মনসিংহ (১৯২২), রংপুর (১৯২৩) চাঁদপুর (১৯২৪) এবং নারায়নগঞ্জ (১৯২৬)[৩]। উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালের Bengal Provincial Enquiry Comittee-র রির্পোট অনুযায়ী মোট আমানতের ৫৪% এবং ঋণের ৩৭% তৎকালীন Bengal-প্রদেশেই সংগঠিত হত [১৫৯]। ব্রিটিশ শাসন আমলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল [৪]।

সন	ব্যাংকের শাখা	মোট আমানত (লক্ষ টাকায়)
১৯০১	২৫	৪৯.২
১৯১১	৪৫	১১৩.৬
১৯২১	১৪৯	২৮২.৭
১৯৩১	৩৫৯	৩০২.৬
১৯৪১	৫৬৫	৫১৪.৮
১৯৪৬	৬৬৮	১৪৪৭.০

১. মজিবুর রহমান সহঃ মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারত বিভক্তির পূর্বে বর্তমানের বাংলাদেশ অংশে ২১টি তালিভূক্ত ব্যাংক ছিল। প্রতিষ্ঠা বছরসহ এদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো: [১]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা বছর
০১	ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৮৬৪
০২	মহালক্ষী ব্যাংক	১৯১০
০৩	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯১১
০৪	কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন	১৯১৪
০৫	দিনাজপুর ব্যাংক	১৯১৪
০৬	বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক	১৯১৮
০৭	নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	১৯২০
০৮	ইমপেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯২১
০৯	কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক	১৯২২
১০	পাইওনিয়ার ব্যাংক	১৯২৩
১১	নাথ ব্যাংক	১৯২৬
১২	ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংক	১৯২৯
১৩	ব্যাংক অব কমার্স	১৯২৯
১৪	সাউদার্ন ব্যাংক লি:	১৯৩৪
১৫	কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৯৩৪
১৬	কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৩৫
১৭	ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক	১৯৪০
১৮	ভারত ব্যাংক	১৯৪২
১৯	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৯৪২
২০	হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৯৪৩
২১	হিন্দু ব্যাংক	১৯৪৩

১. H. L. Bedi & associates, ibid, p.6 এবং ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত)

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসায় এ সময়কালকে 'Years of caution and consolidation' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের অধীন হতে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। Partition-এর মতো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যেও ব্যাংক ব্যবসা দ্রুত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে [১]। দেশ বিভাগের পর কিছু দিন পর্যন্ত 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর দায়িত্ব পালন করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভক্তির ফলে উপমহাদেশের ব্যাংকগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠিত হলে উপমহাদেশের ১৪টি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ৬৩৯টি শাখা পাকিস্তানের অংশে পড়ে। পরে অবশ্য অমুসলিমরা পাকিস্তান ত্যাগ করার ফলে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৩১টিতে[২]। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানে ৩৬টি তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে শুধুমাত্র 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন' এবং 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক' লিঃ-এর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। বাকী ৩৪টি ব্যাংকের মালিকানাসহ সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) করাচীতে ছিল [৩]। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে দূর্বল ছিল এবং খুবই পিছিয়ে পড়েছিল। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পাকিস্তান আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হল:

⇨ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের সময় ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হাবিব ব্যাংক লিঃ এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি:'-এর প্রধান কার্যালয় করাচিতে স্থানান্তরিত হয়।

⇨ ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই 'State Bank of Pakistan' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে।

⇨ ১৯৪৯ সালে 'National Bank of Pakistan' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৯ সালে 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:' (বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লি:) এবং ১৯৬৫ সালে 'ইস্টার্ন ব্যাংক কর্পোরেশন লি: (বর্তমানে উত্তরা ব্যাংক লি:)-নামে দুটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে এসময় বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি বিশেষায়িত কৃষি, শিল্প, সমবায় প্রভৃতি ব্যাংকও গড়ে উঠে এবং এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত হয়। পাকিস্তান আমালে (বর্তমান বাংলাদেশ অংশে) ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গতিধারা সম্পর্কে নিম্নের তথ্য-চিত্রের সাহায্যে আরও সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা যেতে পারে:[৪]

অর্থ বর্ষ	ব্যাংক শাখার সংখ্যা	আমানত (লক্ষ টাকায়)	প্রদত্ত ঋণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৪৯-৫০	১৪৮	২২৩.০০	১৬০.০০
১৯৫৫-৫৬	১৪৫	৪৩৩.০০	২০৫.০০
১৯৫৯-৬০	১৬০	৬৬৪.০০	৪৪৭.০০
১৯৬৪-৬৫	৫৪৫	১৬৪১.৫০	১৯৫৭.০০
১৯৬৯-৭০	১০৪২	৩০৫৫.০০	৩৩৮৮.০০

১. ড. মো: আশরাফ আলী খান, ড: মো: আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২. M. Taheruddin, Ibid, p.3
৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

❐ বাংলাদেশ আমল (১৯৭১ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

প্রাচীনকালে, বৈদিকযুগে, মোঘল ও ব্রিটিশ আমলেও বর্তমান বাংলাদেশ অংশে ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন ছিল। মহাজন ও মুদ্রা ব্যবসায়ীরা সুদে অর্থ লেনদেন করত। ব্রিটিশ শাসন আমলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান বাংলাদেশ অংশে ৬৬৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা বিদ্যমান ছিল[১]। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক (বর্তমান পাকিস্তান) সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হয়। নানা রকম বৈষম্য দূর করে এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়[২]। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবসায় এক সংকটে নিপতিত হয়। সে সময় ১২টি ব্যাংকের ১০৯০টি শাখা এখানে কর্মরত ছিল। কেবলমাত্র 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ এবং 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ-এর মালিক ছিল বাঙ্গালী; আর অন্য সকল ব্যাংক-এর মালিক ছিল অবাঙ্গালী। সে কারণে মাত্র দুটি ব্যাংকের প্রধান অফিস তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) বাকী সব কয়টি ব্যাংকের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তানে) অবস্থিত ছিল [৩]।

❐ ব্যাংক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের নবযাত্রা

স্বাধীনতার পর ধ্বংস প্রায় অর্থনৈতিক সংস্কার বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতের পুনর্গঠন ও সংস্কার কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। State Bank of Pakistan-এর প্রাদেশিক শাখাকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় যা বর্তমানেও এ দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে আসছে[৪]। দেশ বিভাজনের সময় পাকিস্তান আমলে দেশীয় মালিকানাধীনে প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ ও ইস্টর্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ ও তার ১৫১টি শাখা, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধান অফিস সম্বলিত ১০টি তালিকাভূক্ত ব্যাংকের ৯৩৯টি শাখাসহ ১০৯০টি শাখা নিয়ে বাংলাদেশ তার ব্যাংকিং জগতে যাত্রা শুরু করে[৫]।

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২. ড. মো: আশরাফ আলী খান, ড: মো: আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. M. Taheruddin, ibid, p.2
৪. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৫. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের ভাগে পড়া ১২টি ব্যাংকের (দুটির প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশ ও ১০টির প্রধান কার্যালয় পাকিস্তানে) সকল শাখাকে একত্রিত করে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রুপান্তর করা হয়। ব্যাংকিং খাতের পূনর্গঠন ও সংস্কার কার্যক্রমটি নিম্নের সারণীতে দেখানো হল: [১]

পুরনো নাম (পাকিস্তানে)	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসেবে নতুন (বাংলাদেশে)
ক. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান খ. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড গ. ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর লি:	সোনালী ব্যাংক
ক. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড খ. কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	অগ্রণী ব্যাংক
ক. ইউনাইটেড ব্যাংক লি: খ. ইউনিয়ন ব্যাংক লি:	জনতা ব্যাংক
ক. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি: খ. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি: গ. অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লি:	রূপালী ব্যাংক
ক. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:	পূবালী ব্যাংক
ক. ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি:	উত্তরা ব্যাংক

❑ ব্যাকিংব্যবস্থায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয়

উপরের চার্টটি মূলত বাংলাদেশের প্রথমদিকের ব্যাংক ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে অবশ্য ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি পরিবর্তন করা হয়। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতকে উৎসাহিত করার জন্য এবং বেসরকারি খাতে ব্যাংক ব্যবসার সুযোগ করে দেয়ার জন্য উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংককে যথাক্রমে ১৯৮৩ ও ১৯৮৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। পরবতীতে অগ্রণী ব্যাংকও ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা সফলতার সাথে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছে [২]।

কিন্তু সময়ের তালে তালে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবসাও প্রভূত উন্নতি সমৃদ্ধি সাধন করেছে এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির ধারা প্রবহমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাতে ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভূক্তিকরণ হার বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রতিবেদনে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কার পর দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ক্রমোন্নতিতে বাংলাদেশ এ খাতে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সকারী দেশগুলোর তালিকায় নাম লিখিয়েছে[৩]।

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২. কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩. ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড) এপ্রিল-জুন ২০১২ খ্রি. পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অদ্যাবধি কার্যরত সমস্ত ব্যাংকগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে[১]:

১। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (Nationalised Bank);

২। ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক (Private Bank)

৩। বিদেশী ব্যাংক (Foreign Bank)

৪। বিশেষায়িত ব্যাংক (Specialised Bank)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবসায় যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং কাঠামো পর্যালোচনা করলে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সহায়ক হবে। এ পর্যায়ে নিম্নের সারণীতে এক নজরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠামোর উপর আলোকপাত করা হলো[২]:

বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং কাঠামো (২০১২ খ্রি. পর্যন্ত)

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক	ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক	বিশেষায়িত ব্যাংক	বিদেশী ব্যাংক
১. সোনালী ব্যাংক (১৯৭২)	১. উত্তরা ব্যাংক লি: (১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮৩ সালে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরিত	১. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (১৯৭২)	১. বি সি আই সি লি:
২. জনতা ব্যাংক (১৯৭২)	২. রূপালী ব্যাংক লি: (১৯৭২ প্রতিষ্ঠিত ১৯৮৬ সালে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরিত)	২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৯৭৩)	২. এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লি:
৩. অগ্রণী ব্যাংক (১৯৭২)	৩. পূবালী ব্যাংক লি: (১৯৭২)	৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (১৯৮৭)	৩. আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লি:
৪. রূপালী ব্যাংক (১৯৭২)	৪. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি: (১৯৮২)	৪. সমবায় ব্যাংক (১৯৪৮)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি
	৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: (১৯৮৩)	৫. গ্রামীন ব্যাংক ১৯৭৯	৫. হাবিব ব্যাংক
	৬. আই এফ আই সি ব্যাংক লি: (১৯৭৬)	৬. আনসার ভিডিপি ব্যাংক উন্নয়ন (১৯৯৬)	৬. ট্রেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
	৭. ন্যাশনাল ব্যাংক লি: (১৯৮৩)	৭. কর্মসংস্থান ব্যাংক (১৯৯৮)	৭. ক্রেডিট এগ্রিকুল ইন্দোসুয়েজ
	৮. আল-বারাকা ব্যাংক লি: (১৯৮৭)	৮. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৮.ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান
	৯. ইউনাটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি: (১৯৮৩)	৯. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	৯. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি:
	১০. ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স বাংলাদেশ (১৯৮৮)	১০. বেসিক ব্যাংক লি: (১৯৮৯)	১০. দি ব্যাংক অব নেভোস্কোশিয়া
	১১. দি সিটি ব্যাংক লি: (১৯৮৩)	১১. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি: (২০০৯)	১১. হ্যানভিট ব্যাংক

---

১. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ. ২৩ –২১৫ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

	১২. ইস্টার্ন ব্যাংক লি: (১৯৯২)		১২. দি হংকং এ সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি:
	১৩. ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি: (১৯৯৩)		১৩. ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন ই. সি
	১৪. প্রাইম ব্যাংক লি:(১৯৯৫)		১৪. ব্যাংক অব টোকিও
	১৫. সাউথইস্ট ব্যাংক রি: (১৯৯৫)		১৫. শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন।
	১৬. ঢাকা ব্যাংক লি: (১৯৯৫)		
	১৭. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (১৯৯৫)		
	১৮. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি: (১৯৯৫)		
	১৯. ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি: (১৯৯৬)		
	২০. মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	২১. স্টান্ডার্ড ব্যাংক রি: (১৯৯৯)		
	২২. ওয়ান ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	২৩. যমুনা ব্যাংক লি		
	২৪. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (২০০১)		
	২৫. প্রিমিয়ার ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	২৬. ট্রাস্ট ব্যাংক লি:(১৯৯৯)		
	২৭. ফাস্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	২৮. ব্রাক ব্যাংক লি: (২০০১)		
	২৯. এক্সিম ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	৩০. ব্যাংক এশিয়া লি: (১৯৯৯)		
	৩১. মিউচুয়্যাল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		
	৩২. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি: (১৯৮৭)		
	৩৩. বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি: (১৯৯৯)		

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ ৮ এপ্রিল ২০১২ দেশের বেসরকারি খাতে ছয়টি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে। ব্যাংকগুলো হলো:ইউনিয়ন ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, ফারমার্স ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক ও সাউথ বাংলা ব্যাংক। এর আগের সপ্তাহে তিনটি এনআরবি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক নামে একটি এবং এনআরবি ব্যাংক লি: নামে ২টি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হয়েছে[১]।

১. ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড) এপ্রিল-জুন ২০১২ খ্রি. পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

❑ বাংলাদেশে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ[১]

১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB)

২। বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৩। সৌদী বাংলাদেশ ইন্ডস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কো: লি: (সাবি নকো)

৪। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেপেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

৫। জিএসপি ফাইন্যান্স কো: (BD) লি:

৬। বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কো লি:

৭। বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড

৮। ইউএই বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কো: লি:

৯। ফিনিক্স লিজিং কোম্পানী লি:

১০। বে লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:

১১। প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো: লি:

১২। ডেল্টা ব্যাংক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লি:

১৩। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি:

১৪। বাহরাইন বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লি:

১৫। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ

১৬। উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:

১৭। ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানী লিমিটেড

১৮। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

১৯। চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ।

২০। ইসলামক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:

২১। হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানি লি:

২২। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লি:

২৩। প্রিমিয়ার রীজিং এন্ড ফাইনান্স লিমিটেড

২৪। ন্যাশাল ফাইন্যান্স লি:

২৫। ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

২৬। এফ এ এস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০১০-২০১১, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ. ২৪২ –৩৮৯ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাংক

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায় উন্নয়নের ধারায় যে সকল ঐতিহ্যবাহী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং পথিকৃৎ হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্যে, সে সকল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাংকের নাম, বৈশিষ্ট্য, পরিচিতি, প্রতিষ্ঠার স্থান ও সনসহ নিম্নের সারণীতে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো[১]:

আদি ও প্রাচীন ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	বাংকের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি	প্রতিষ্ঠার স্থান	প্রতিষ্ঠার সন
১. উপসনালয় ব্যাংকিং বা ব্যাংক (Temple Banking or Bank)	১. Priest বা ধর্মযাজকগণ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত; ২. Priest বা ধর্মযাজকগণ Financial Agent হিসাবে দায়িত্ব পালন করত; ৩. অর্থ ঋণ লেনদেনের কেন্দ্র ছিল এবং ৪. সুদ বিহীন ঋণ প্রদান করা হত।	গ্রীস, সিন্ধু, মিসরীয় ও রোম সভ্যতায়	খ্রি: পূর্ব ২০০০ অব্দ ২০০০ খ্রি পূর্ব or খ্রি: পূর্ব ৫০০০-৪০০ অব্দ
২. ঋণ ব্যাংক (Loan Banking or Loan Bank)	১. দরিদ্র জনগণনকে সুদ বিহীন ঋণ প্রদান করা হতো; ২. জায়গা জমি মর্টগেজ হিসেবে রেখে- এর বিপরীতে ৩/৪ বছরের জন্য ঋণ প্রদান করা হতো।	রোম	খ্রি: পূ: ২০০০ অব্দ

---

১. T.T. Sethi, ibid, p. 244, M. C. Vaish, ibid, p. 248-252, H, L, Bedi &Associates, ibid, p. 400-405, K.C Shekhar, Lekshmy Shekhar, ibid, p.1-2, M. Taheruddin, ibid, p.1-2, ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত,পৃ.৩১-৩৩, প্রমুখ লেখকগণের বই থেকে সংগৃহিত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ও বিশ্বখ্যাত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাংক [১]

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	প্রতিষ্ঠার স্থান	প্রতিষ্ঠার সন
১.	শান্সী ব্যাংক (Shansi Bank)	এটি বিশ্বের প্রথম ব্যাংক। এর মাধ্যমে ব্যাংক নামক প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়।	চীন	খ্রি: পূ: ৬০০
২.	বায়তুল মাল (Baitul Mal)	বিশ্বের প্রথম সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ্বনবী (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	সৌদী আরব, (মদীনায়)	(খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে
৩.	ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice)	১. বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক ২. অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।	ইতালি	১১৫৭ খ্রি:
৪.	ব্যাংক অব সানজর্জিও (Bank of San Georgio)	১. বণিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং ২. এটি বিশ্বের প্রথম যৌথ ব্যাংক।	জেনেভা সুইজার ল্যান্ড	১১৭৮ খ্রি:
৫.	ব্যাংক অব বার্সিলোনা (Bank of Barcelona)	১. সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত ব্যাংক এবং ২. এটি সরকারি উদ্যোগে যাবতীয় সাংগঠনিক নিয়ম কানুন পালন করে গণ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে বিশ্বের প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে গণ্য করা হয়।	ইতালি	১৪০১ খ্রি:
৬.	ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম	বিশ্বের প্রথম আমানতী ব্যাংক	আমস্টার্ডাম	১৬০৯ খ্রি:
৭.	রিক্স ব্যাংক অব সুইডেন (The Risk Bank ,The National Bank of Sweden)	১. বিশ্বের প্রথম নোট ইস্যুকারী ও সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক।	সুইডেন	১৬৫৬ খ্রি:
৮.	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (Bank of England)	১. বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ২. এটিকে Mother of all Central Bank বলা হয়	যুক্তরাজ্য	১৬৯৪ খ্রি:
৯.	ব্যাংক অব হিন্দুস্থান (Bank of Hindustan)	১. ভারত উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ২. ইউরোপীয়ান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৩. ১৮৩২ সালে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যায়	কলকাতা	১৭০০ খ্রি:
১০.	ব্যাংক অব প্রুশিয়া (Bank of Prosia)	জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক	জার্মানী	১৭৬৫ খ্রি:
১১.	বেঙ্গল ব্যাংক (Bangal Bank)	ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন ব্যাংক	ভারত	১৭৮৫ বা ১৭৮৪ খ্রি:
১২.	সেন্ট্রল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Central Bank of India)	ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	ভারত	১৭৮৫ খ্রি:

১. T.T. Sethi, ibid, p. 244, M. C. Vaish, ibid, p. 248-252, H, L, Bedi &Associates, ibid, p. 400-405, K.C Shekhar, Lekshmy Shekhar, ibid, p.1-2, M. Taheruddin, ibid, p.1-2, ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত,পৃ.৩১-৩৩, প্রমূখ লেখকগণের বই থেকে সংগৃহিত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	ব্যাংক অব ফ্রান্স (Bank of France)	ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	ফ্রান্স	১৮০০ খ্রি:
১৪.	ব্যাংক অব কলকাতা (Bank of Calcutta)	কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্সি ব্যাংক	কলকাতা	১৮০৬ খ্রি:
১৫.	ব্যাংক অব বোম্বে (Bank of Bombay)	বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ব্যাংক	বোম্বে	১৮৪০ খ্রি:
১৬.	ব্যাংক অব মাদ্রাজ (Bank of Madras)	মাদ্রাজ শহরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ব্যাংক	মাদ্রাজ	১৮৪৩ খ্রি:
১৭.	রেইখ ব্যাংক (Reichs Bank)	জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক	জার্মানী	১৮৭৫ খ্রি:
১৮.	ব্যাংক অব জাপান (Bank of Japan)	জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	জাপান	১৮৮২ খ্রি:
১৯.	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Researve System)	যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	যুক্তরাষ্ট্র	১৯১৩ খ্রি:
২০.	ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Imperial Bank of India)	ভারতের তৎকালীন বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক	ভারত	১৯২০ খ্রি:
২১.	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Researve Bank of India)	ভারতের তৎকালীন বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক	ভারত	১৯৩৫ খ্রি:
২২.	ব্যাংক অব কানাডা (Bank of Canada)	কানাডার কেন্দ্রীয় ব্যাংক	কানাডা	১৯৩৫ খ্রি:
২৩	হাবিব ব্যাংক লি: (Habib Bank Ltd.)	ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক	ভারত (বোম্বে)	১৯৪১ খ্রি:
২৪	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan)	পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	পাকিস্তান (করাচি)	১৯৪৮ খ্রি:
২৫.	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (The National Bank of Pakistan)	পাকিস্তানের প্রথম বাণিজ্যিক ও তালিকাভূক্ত ব্যাংক	পাকিস্তান	১৯৪৯ খ্রি:
২৬.	ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি: বর্তমান পূবালী ব্যাংক	প্রথম বাঙালী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক	চট্রগ্রাম	১৯৫৯ খ্রি:
২৭.	বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank)	বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	ঢাকা	১৯৭২ খ্রি:
২৮.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: (Islami Bank Bangladesh Ltd.)	বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী শরীআহ ভিত্তিক পরিচালিত সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ারও প্রথম ইসলামী ব্যাংক	ঢাকা	১৯৮৩ খ্রি:

Dhaka University Institutional Repository

❒ কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সর্বাধিক সাফল্য ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থান ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আর্থিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। W. Rogers-এর মতে, " অর্থনৈতিক বিশ্বে এ পর্যন্ত যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভাবন হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা [২৩৩]।

ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণাদি থেকে বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা, ব্যাংক ব্যবসা বা ব্যাংকিং কার্যাবলির প্রচলন থাকলেও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব ও উন্নয়নের ইতিহাস বেশিদিনের নয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুদ্রা ব্যবস্থার শৃংখলা ছিল না, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লেনদেনের একক কোন বিনিময় মাধ্যম এর জন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুদ্রা বাজার ও রাষ্ট্রের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলিতে শৃংখলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনা হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর উদ্ভাবন মুদ্রা ও ব্যাংকিং জগতের এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞ G.F. Stanlake কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারাবাহিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে বলেন,

"During the seventeenth century, people began to leave their valuables, especially their gold and silver, in the strongroom of goldsmiths for safe keeping the goldsmiths issued receipts for the prescious metal deposited with them. These receipts were paper claims to gold-they could be exchanged for gold at anytime. In time, the depositors began to use these receipts as a means of settling their depts. They would write on the receipts a note to the goldsmiths in forming him that they had transferred ownership of the gold to someone else. As this practice became more popular, the goldsmiths began to issue receipts in convenients denominations, such as $1, $2, $10, $20, and so on. They also made the recipts payable to the bearer, which meant that anyone possessing such a receipt could exchange it for gold. When these claims to gold became payable to the bearer, they became the first fully-fledged bank notes. They were acceptable as money because people know that they could convert them into gold at any time. The notes were fully backed by the gold in the goldsmith's strongrooms [১]."

---

১. G.F. Stanlake 'Starting Economics', seventh edition (London: Longman Group Ltd., 1999 AD) p. 125

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো উল্লেখ করেন, "The next stage in the development of paper money came when the goldsmith bankers began to issue bank notes in excess of the value of the gold they held. They found that they could do this because more and more people were using bank notes, and fewer were with drawing gold in order to make payments. At though in to exchange their bank notes for gold, others would be coming into deposit gold. Most of the gold was lying idle in the strongrooms. The goldsmith bankers believed that they could safely increase the issue of banknotes and still meet all likely deamands for gold from the people holding their bank notes.[১]"

সর্বশেষে তিনি আরো উল্লেখ করেন, "Upto this point, the goldsmith bankers had not been creationg money. People had simply exchanged one form of money (gold) for another form of money (Banknotes). Now, however, money was being created, because the bankers were issuing banknotes to a greater value than the gold they held. This additional money was used to make loans, on which the banks charged a rate of interest. The part of a note issue which is not backed by gold is described as a fiduciary issue. In these early days, any one can set up in business as a banker and issue banknotes. This led to many bank features because bankers tempted to over-issue bank notes and then found themselves unable to meet exceptional demands from people wishing to exchange their banknotes for gold. The government was obliged to regulate banking, and the bank of England is now the only note issuing banks in England and wales. A few bank in Scotland and Northern Ireland still retain the right to issue notes[২]".

❑ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

এ উপমহাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে ১ জুলাই 'দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে[৩]। বর্তমান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' তৎকালীন পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধান ব্যাংক হিসেবে কাজ করত। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যূদয় হলে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশ বলে উক্ত প্রাদেশিক প্রধান ব্যাংককে আর্থিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক'-এ রূপান্তর করা হয়[৪]। আজ আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন কোন বিষয় নয়। যেখানেই স্বাধীন সার্বভৌম জাতিসত্তা রয়েছে সেখানেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানব সভ্যতার ইতিহাস যতদূর অগ্রসর হবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসও ততদূর পথ অতিক্রম করবে।

---

১. G.F. Stanlake *Starting Economics,* (London: Longman Group Ltd., 1999 AD) ibid, p. 125

২. ibid, p. 126

৩. ড. এ. আর. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ বিশ্বের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশে নোট ও মুদ্রা ছাপানো এবং প্রচারের দায়িত্ব এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবেও ব্যাংকব্যবস্থার সকল কার্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ জাতীয় স্বার্থে বিশ্বের সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ১৯০০ সালে বিশ্বে যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৮টি, আজ এ সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৭২ টিতে। এ পর্যায়ে প্রাচীনতার ক্রমানুসারে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো [১]:

ক্রমিক নং	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা বছর	দেশের নাম	মহাদেশ	মালিকানার ধরন
১	বায়তুল মাল [২]	৬৩০ খ্রিঃ	সৌদি আরব (মদিনায়)	এশিয়া	সরকারি
২	দি রিকস ব্যাংক অব সুইডেন	১৬৫৩	সুইডেন	ইউরোপ	সরকারি
৩	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড	১৬৯৪	যুক্তরাজ্য	ইউরোপ	সরকারি
৪	ব্যাংক অব ফ্রান্স	১৮০০	ফ্রান্স	ইউরোপ	সরকারি
৫	ব্যাংক অব জাপান	১৯৮২	জাপান	এশিয়া	সরকারি+বেঃসঃ
৬	ব্যাংক অব ইটালী	১৮৯৩	ইটালী	ইউরোপ	বাণিজ্যিক
৭	সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক	১৯০৭	সুইজার ল্যান্ড	ইউরোপ	সরকারি+বেঃসঃ
৮	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম	১৯১৩	যুক্তরাষ্ট্র	আমেরিকা	বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্যোগে প্রতিঃ
৯	ব্যাংক অব চায়না	১৯১৮	চীন	এশিয়া	সরকারি
১০	ব্যাংক অব মেক্সিকো	১৯২৫	মেক্সিকো	আমেরিকা	সরকারি+বেঃসঃ
১১	মারকাজ ব্যাংকাসা	১৯৩১	তুরস্ক	ইউরোপ	সরকারি+বেঃসঃ
১২	ব্যাংক অব কানাডা	১৯৩৪	কানাডা	আমেরিকা	সরকারি
১৩	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৩৫	ভারত	এশিয়া	সরকারি
১৪	ব্যাংক অব ব্রাজিল	১৯৪১	ব্রাজিল	আমেরিকা	সরকারি+বেঃসঃ
১৫	স্টেস্ট ব্যাংক অব জার্মান	১৯৪৫	পূর্ব জার্মানী	ইউরোপ	সরকারি
১৬	ব্যাংক অব পর্তুগাল	১৯৪৬	পর্তুগাল	ইউরোপ	সরকারি+বেঃসঃ
১৭	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৪৮	পাকিস্তান	এশিয়া	সরকারি+বেঃসঃ
১৮	ডয়েস বুন্ডেস ব্যাংক	১৯৪৮	পশ্চিম জার্মানী	ইউরোপ	স্বায়ত্বশাসিত
১৯	ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইরাক	১৯৪৯	ইরাক	এশিয়া	সরকারি
২০	কিউবান ন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৫০	কিউবা	আমেরিকা	সরকারি
২১	রির্জার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া		সরকারি
২২	ব্যাংক অব মারকাজী	১৯৬১	ইরান	এশিয়া	সরকারি+বেঃসঃ
২৩	ব্যাংলাদেশ ব্যাংক	১৯৭২	বাংলাদেশ	এশিয়া	সরকারি

---

১. M. Taheruddin, ibid, pp.3-4, KC Shekhar, Lekshmy Shekhar, ibid, p.27, ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০, Dr. A. R. Khan, Ibid, p. 290, ১. G.E. Stanlake ibid, p. 125 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. ইরফান মাহমুদ রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানব সভ্যতা চরম অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সফলতা অর্জন করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিতেও। বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য , আমদানি-রফতানি, বৈশ্বিক ও আন্তঃদেশীয় লেনদেন, অর্থ স্থানান্তর, ফরেন এক্সচেঞ্জ, দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে, তথ্য প্রবাহে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ছোঁয়ায় সমগ্র পৃথিবী পরিণত হয়েছে গ্লোবাল ভিলেজে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় এখানেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম শুরু হয়েছে যাকে ব্যাংকিং জগতের পরিভাষায় 'Electronic Banking' বা অন্যভাষায় 'Innovative Banking' বলা হয়[১]। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আরো একধাপ এগিয়ে চালু হয়েছে 'Internet Banking' 'Cyber Banking' 'Linkage Banking'সহ 'Universal Banking' এবং Virtual ব্যাংকিং প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে[২]।

মূলত, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ও কম্পিউটারের ইতিহাস ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। কারণ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর বিশাল অংশ কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ জন্যে বলা হয় 'Innovative banking is computerisation also'[৩]। কম্পিউটার আবিষ্কার ও এর প্রচলনের ইতিহাস খুব বেশি পুরাতন নয়, তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর সংযোজনের ইতিহাসও খুব বেশি দীর্ঘ সময়ের নয়। বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গ্রাহকদের জীবন যাত্রার ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংকিং কার্যক্রমও পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় এনে নতুন গ্রাহক আকর্ষণ এবং পুরাতন গ্রাহক ধরে রাখার লক্ষ্যে সর্ব প্রথম ১৯৬১ সালে আমেরিকায় "National Bank of New York" ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন শুরু করে[৪]। তাদের প্রবর্তিত 'Electronic Fund Transfer System' (EFTS)'-এর সাহায্যে হস্তান্তর যোগ্য আমনতী সনদ চালু করে যার মাধ্যমে Bank Fund ক্রয় করাসহ তহবিল স্থানান্তরের কার্যক্রম চালানো যেতো [৫]।

পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্যের 'Barclays Bank' প্রথমে 'Cash Dispenser' (CD) স্থাপন করে। বর্তমান Cash Dispenser-এর তুলনায় এ মেশিনের কার্যক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। তখন অত্যাধুনিক চুম্বক কার্ডের পরিবর্তে কাগজের ভাউচার ব্যবহার করা হতো এবং মেশিনে ভাউচার প্রবেশ করলে ১০ পাউন্ড বের হয়ে আসতো।

---

১. O.S Srivastava, ibid, p.306
২. Dr. A. R. Khan, ibid, p. 289
৩. মজিবুর রহমান সহঃ মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪. মোহাম্মদ ওসমান গণি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫. Dr. A. R. Khan, ibid, p. 306

Dhaka University Institutional Repository

Barclays Bank কর্তৃক CD স্থাপনের বছর খানেকের মধ্যেই Sweden, Franch এবং Switzerland 'National cash dispenser network'-এর ব্যবহার চালু করে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালে জাপান ও আমেরিকা নিজেদের প্রযুক্তিতে এ পদ্ধতি তৈরি ও ব্যবহার শুরু করে। তবে এ মেশিনগুলো off line কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। Computer connection এ মেশিনগুলোতে ছিল না [১]।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তরাজ্যের 'Loyds Bank' ১৯৭২ সালে প্রথম online cash point মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং যুগের সুচনা করে। এ সকল ক্যাশ পয়েন্ট-এ সর্বদা 'Magnetic stripes যুক্ত Plastic card ব্যবহার করতে হতো। ফলে এসব কার্ড দ্বারা গ্রাহকদের পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হতো। এসব মেশিন পূর্বের মেশিনগুলোর ন্যায় Off line কার্যক্রমের সাথেই সম্পৃক্ত থাকেনি বরং On line পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং জগতে প্রযুক্তি ব্যবহারের সফলতার নতুন দিগন্তে র অভ্যুদয় ঘটে [২]।

পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তির ফলে অনুন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং জগতে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। এ ব্যবস্থা আরো উন্নত ও অগ্রগতিমূলক রূপ লাভ করে। Innovative ব্যাংকিং কার্যক্রমে সংযোজন হয়েছে Internet Banking, Cyber banking ব্যবস্থা। আধুনিককালে শুধুমাত্র গ্রাহকদের সুবিধা প্রদানের জন্যই নয় বরং একই সাথে আন্তঃব্যাংকিং ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া বর্তমানে Virtual Banking সহ Universal Banking ব্যবস্থার প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা চলছে। এ ব্যাংক ব্যবস্থায় সরাসরি কোন প্রকার মানব সম্পদ ব্যবহার না করে প্রযুক্তিভিত্তিক সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে[৩]। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশের পর্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের বিষয়টি নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো [৪]:

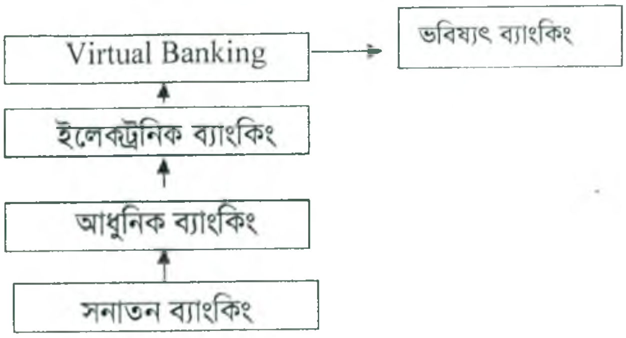

---

১. O.S Srivastava, ibid, p.307
২. Dr. A. R. Khan, ibid, p. 290
৩. মোহাম্মদ ওসমান গণি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. Dr. A. R. Khan, ibid, p. 309

Dhaka University Institutional Repository

❑ বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং

বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। রাষ্টায়ত্ব ব্যাংকগুলোসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমুহের মধ্যে জনতা ব্যাংক, রেডিক্যাশ নামে কার্ড চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রায় সকল ব্যাংকই বর্তমানে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির আওতায় চলে আসছে। এদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকগুলো অনেক পুর্বেই ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে [১]।

❐ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ধারণা

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করাকেই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে। এটি ব্যাংকিং সেবা প্রদানের একটি আধুনিক পদ্ধতি। ব্যাংকিং জগতে বিপ্লব সাধন করেছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ব্যাংকিং এর এ উন্নত তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা Online ব্যাংকিং ব্যবস্থাও বলা হয়[২]। এর মাধ্যমে দ্রুততর, নির্ভূল, সঠিক ও সহজলভ্য করে ব্যাংক তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি সম্পাদনসহ গ্রাহক সেবা প্রদান করতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটারায়িত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুততা ও নির্ভূলতার মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে[৩]।

⇨ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর পরিচিতি দিয়ে Mr. Ellen H. Lipis বলেন, "Electronic banking systems are electronic systems that transfer money and record data relation to these transfers. এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "Electronic banking services are developing tools in the overall banking services delivery system [৪]."

⇨ ড. এ আর খাঁন-এর মতে, "ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতম তড়িৎবাহী কম্পিউটারায়িত প্রক্রিয়াসমূহ যার মাধ্যমে ব্যাংক অতিদ্রুত ও নির্ভূলভাবে গ্রাহকদেরকে কাম্য সেবা প্রদানে সক্ষম হয় [৫]।"

⇨ মূলত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো;প্রযুক্তি নির্ভর একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা [৬]।

ড. এ আর খাঁন আরো উল্লেখ করেন, "Using these electronic systems of banking systems, bank usually provide the following services:

A. Self deposit and with drawal facilities;

B. Quick transfer of funds from one bank to another with the help of Electronic Fund Transfer Systems (EFTS)

C. Payment of bills, Salaries and opening of letter of credit (L/C) and other utility services while staying at home or at own chamber.

D. Conducting internal banking activities with the help of electronic system.[৭]"

---

১. মজিবুর রহমান সহঃ মোঃ আবুল হাসনাত; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
২. প্রিন্সিপাল আছাদ উল্লাহ্ ও সহযোগীবৃন্দ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩. O.S Srivastava, ibid, p.307
৪. প্রিন্সিপাল আছাদ উল্লাহ্ ও সহযোগীবৃন্দ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
৫. Dr. A. R. Khan, ibid, p. 291
৬. ibid, p. 292
৭. ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ডঃ মোঃ আলাউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে ব্যাংক ব্যবসায়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং একটি যুগান্তকারি সংযোজন। এটি গ্রাহকদের দ্রুত ও সহজে উন্নতমানের সেবা প্রদানে সক্ষম। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের The National City bank of Newyork সর্ব প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এ ব্যাংক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর দ্বারা সর্বপ্রথম Electronic Fund Transfer System (EFTS) চালু করে[১]।

❑ ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর ধারণা

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। আধুনিককালে সাধারণ জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্টারনেট ব্যাপক সেবা প্রদান করছে। এটি এমন এক ধরনের অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতি যাতে Website-এর মাধ্যমে আন্তঃযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। এ ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিকে ইন্টারনেট বলে, আর ইন্টারনেট প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করাকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং বলে[২]। এ পদ্ধতিতে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ী হয়। সঠিক, নির্ভূল, দ্রুত এবং ঘরে বা অফিসে বসেই ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করা যায় বিধায় এ পদ্ধতি ব্যাংকিং জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। O. S. Srivastava ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর যথার্থ পরিচিতি দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় তা হলো,

"Internet Facility is the Facility of contact and contract from each place of earth at any time of day or night, wherever internet computer service can be installed.[৩]"

এর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

"Internet Service allows the banks to expand their market without openning new office. Internet banking is innovative banking which provides better, quick and on going interaction with the two persons is Institutions. Purchase and payment can be made simultaneously.[৪]

ই-নেট ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির পরিভাষায় Information Bankও বলা হয়। ব্যাংকিং-এর সাধারণ লেনদেন, তহবিল স্থানান্তর, হিসাবের নিরীক্ষাকরণ, বিল প্রদান, শেয়ার ও বিনিয়োগ পরীক্ষাকরণসহ এ ধরনের ইলেকট্রনিক লেনদেনগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়,

"Internet is compu-service that can provide direct mail it is technical channel of self-service terminals and telecommunication equipment.[৫]"

---

১. O.S Srivastava, ibid, pp.306-307
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid, pp. 307-308
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থা : মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্বের রব, সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। সৃষ্টি-জগতের শুধু স্রষ্টাই নন, সব কিছুর প্রতিপালকও তিনি। প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টির প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে সুচারুরূপে সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ভিত্তিক চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতে পরিণত করেন তিনি। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ জীবিকার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল-কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী এ মহাবিশ্বের অসংখ্য ও অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠতম সত্তা বা আল্লাহর প্রতিনিধি । এবং অধিনস্থ সকল সম্পদ মানুষের দায়িত্বে রাখা হয়েছে । যেহেতু আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা (আশরাফুল-মাখলুকাত) উপাধিতে অলংকৃত করেছেন, সেহেতু মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ক্ষমতা-দূর্বলতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত। তাই মানুষের প্রয়োজন ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান দিতে তিনি সক্ষম। মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে সন্নিবেশিত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে একের পর এক ঐশী বিধান নাযিল করেছেন। তাঁর প্রেরিত বার্তা বাহকগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত নূহ্ (আ:), হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত মূসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.) সহ অসংখ্য নবী-রাসুল। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যদিও মানুষ সেই বিধি-বিধান, জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন গ্রহণ কিংবা বর্জন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন তবুও এই বিধি-বিধানকে তারা ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত প্রার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে।

মানবজাতি পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে বিগত তিনশ বছরে চারটি প্রধান অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছে, সেগুলো হল; পুঁজিবাদ , সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এসব মতবাদ মৌলিকভাবে ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে একই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হলো, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয়; বরং অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্থনৈতিক আচরণের সূত্র দ্বারাই সমাধান করা যায় এবং নৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদ তার সৌধ নির্মাণ করেছিল সীমাহীন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মুনাফার অভিপ্রায় ও বাজার ব্যবস্থার নীতির উপর। সমাজতন্ত্র মানবজাতির জন্য সুখ-সমৃদ্ধি খুঁজেছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সামাজিক-প্রণোদনা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে। এ দু'য়ের সমন্বয়ে ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক উচ্চাভিলাসের জন্ম দেয়। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ সব মতবাদের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও তা মানবজাতির প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ পতিত মতাদর্শ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এখন এটা ধারণা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে যে, সমাজতন্ত্রের পতন পুঁজিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের যথার্থতা প্রমাণ করে। একমাত্র ইসলামই পারে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository
জাতি ও পরিবেশে যে নিত্যনতুন সমস্যা ও সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়-এর সমাধান দিতে। ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত রূপে চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের দিকে এগিয়ে নিতে পারে ইসলাম। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মূল নীতিমালা রয়েছে। এসব মূলনীতি দেশ-কাল-পরিবেশ ও নির্বিশেষে সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের অর্থ হলো; ইহকাল ও পরকাল এবং বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়। ইসলাম এর কোনটাই অস্বীকার করেনি। একের সাথে অপরের সমন্বয় সাধন করেছে। আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের উগ্রতা ও চরম মাদকতাকে অস্বীকার করে ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘাতের এমন এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে যার তুলনা অন্য কোন ধর্ম, দর্শন, আদর্শ ও মতবাদে নেই।

অতীতে ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ নৈতিক উন্নয়নের জন্য তেমন গুরুত্ব প্রদান না করলেও এটা লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে তারাও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা যে, নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ন্যায়ভিত্তিক বস্তুগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ আলোচনার যৌক্তিক ভিত্তি হল, ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য সকল সম্পদের উৎপাদন, ভোগ, বন্টন, দক্ষতাও ন্যায়ের ভিত্তিতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নৈতিকতা দ্বারা ভরে দেওয়া ছাড়া দক্ষতা এবং ন্যায় পরতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং অর্জন করাও যায় না। আমাদের সময়কালের অর্থনৈতিক সংকট এখনও আগের মতোই তীব্র ও বিপন্ন রয়ে গেছে। সকল মানব গোষ্ঠির জন্য একই সঙ্গে একটি দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রচলিত অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ পর্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহের উপর সংক্ষিপ্তাকারে ধারাবাহিক আলোকপাত করা হল।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে পারে না। ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে অসীম অভাব পুরণের লক্ষ্যে সীমিত সম্পদ প্রয়োজনমত বন্টন সুনিশ্চিত বা প্রায় নিশ্চিত করণের বিষয়টি যেখানে আলোচনা করা হয় তাকে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র বলে। এই অর্থশাস্ত্র মানুষ ও মানুষের আচরণ এবং দেশ ও জাতি ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। অর্থনীতির মৌলিক বিষয় হচ্ছে, উৎপাদনের সাথে জড়িত কী উৎপাদন করা হবে, কিভাবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে [১]। আবার কাম্য উৎপাদন ও বন্টন, ভোগের দক্ষতা অর্জন ও কল্যাণ সর্ব্বোচ্চকরণ ইত্যাদি

১. Michael Parkin, *Micro economics* (New York: Pearson Internationl Edition, 2009-2010 AD), p.3

নিশ্চিত করাও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সামাজিকীকরণ যেমন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এমনি অর্থশাস্ত্রও বহুবিধ চলক ও গতিশীল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক অর্থশাস্ত্র যেমন একটি স্বতন্ত্র ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছে তা বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ, জাতি ও পরিবেশে যে সব সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, এর সমাধানের দাবি নিয়ে গড়ে উঠেছে। মানুষের সীমিত জ্ঞান-গবেষণা, বুদ্ধি-বৃত্তিক চর্চা পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণও আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। ক্রমবিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতায় এটি পরিপুর্ণতা পেয়েছে। কালপরিক্রমায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেসব সভ্যতা ও ভাবধারার সংমিশ্রণ ও স্তর বিন্যাস অতিক্রম করে অর্থশাস্ত্র আজকের পর্যায়ে এসেছে সেগুলো হলো; গ্রীক ভাবধারা, রোমান ভাবধারা, মধ্যযুগ, বাণিজ্যতন্ত্রের মতবাদ, ভূমিবাদী মতবাদ, ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা, নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা এবং আধুনিক চিন্তাধারা।

❑ 'Economics' শব্দটির অর্থ ও উৎপত্তি

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Economics' গ্রীক শব্দ 'Oikonomia' থেকে উদ্ভূত-যা Oikos ও Nomas শব্দ দু'টির সমন্বয়ে গঠিত। গ্রীক ভাষায় 'Oikos' বলতে বিধি বা ব্যবস্থাপনা বোঝায়। সুতরাং 'Oikonomia' শব্দের অর্থ হলো গৃহবিধি বা গৃহ ব্যবস্থাপনা। বস্তুত, শাস্ত্র হিসাবে অর্থশাস্ত্রের চিন্তাধারার প্রথম উন্মেষ ঘটে প্রাচীন গ্রীস দেশে। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রি:পু: ৩৮৪-৩২২) এ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং অর্থনীতিকে 'পরিবার পরিচালনার বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন [১]। ১৭৭৬ সনে এ্যাডাম স্মীথ-এর 'An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' গ্রন্থটি প্রকাশের পর প্রকৃতপক্ষে বিষয় হিসাবে সুশৃঙ্খল অর্থনীতির সূত্রপাত হয়। তখন অর্থনীতিকে 'পলিটিক্যাল ইকনোমি' বলা হতো। আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অর্থনীতির নতুন নামকরণের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এ পর্যায়ে অর্থনীতিবিদ হোয়েট্লি অর্থনীতিকে 'বিনিময়ের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। অর্থনীতিবিদ হার্ন অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইংরাম অর্থনীতিকে মুদ্রা তৈরির বিজ্ঞান বা ক্রেমাটিসটিক্স বলে অভিহিত করেন [২]। এ সব নামকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'পলিটিক্যাল ইকনোমি' নামটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তবে সেই শতাব্দির শেষভাগে পলিটিক্যাল ইকনোমির পরিবর্তে 'ইকনোমিক্স' (Economics) নামটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১. James Eagar Swain, *A History of World Civilization* (New Delhi: Eurasia Publishing House (Pvt) Ltd, 1994 A.D.), p. 464

২. Samuaelson, Nordhaus, *Economics* (New Delhi: TaTa McGraw-Hill publishing Company Ltd. 2008 A.D), p.4

Dhaka University Institutional Repository

❑ অর্থনীতির পরিচিতি, পরিধি ও বিষয়বস্তু

সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাথে সাথে অর্থনীতির পরিচিতি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে ধ্যান-ধারণার ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে। বস্তুত, বিভিন্ন সময়ে চিন্তাবিদ্গণ বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা ও তাঁদের নিজস্ব বিচার বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অর্থনীতির পরিচিতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সব আলোচনা, বক্তব্য ও অভিমত পরস্পর বিরোধী বা পরিপূরক যা-ই হোক না কেন, অর্থনীতি বিষয়ের সামগ্রিক উন্নয়নে সে সব যথেষ্ট মূল্যবান বলে বিবেচিত। অর্থনীতিবিদদের এ সব ভাবধারা ও মতবাদ কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। অর্থনীতির পরিভাষায় এগুলো নিম্নরূপ [১]:

১) ক্লাসিক্যাল ধারণা: সম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী;

২) নয়া-ক্লাসিক্যাল ধারণা: কল্যাণের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী ভাবধারা এবং

৩) আধুনিক ধারণা: সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, অভাবের নির্বাচন ও মিতব্যয়িতার উপর গুরুত্ব প্রদানকারী প্রবণতা বা ধ্যান-ধ্যরণা।

বর্ণিত ভাবধারার আলোকে এ যাবৎ অর্থনীতি সম্পর্কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য পরিচিতিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক্লাসিক্যাল ধারণায় অর্থনীতি

ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, অর্থনীতির জনক হিসেবে পরিচিত এ্যাডাম স্মীথ ক্লাসিক্যাল ধারণার প্রবর্তক[২]। তাঁর মতের অনুসারীদের মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্থনীতিবিদ হলেন, টমাস রবার্ট ম্যালথ্যাস (১৭৬৬-১৮৩৪), ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩), জে.বি. সে (১৭৬৩-১৮৩২), জন স্টুয়ার্টি মিল ওয়াকার প্রমুখ। ক্লাসিক্যাল ধারণার প্রবর্তক এ্যাডাম স্মীথ-এর মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে [৩]।

কিভাবে সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে তা ব্যবহৃত হয় তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। এ্যাডাম স্মীথই প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র ও সুবিন্যস্ত আকারে সমাজ বিজ্ঞানের রূপদান করেন। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মুক্ত অর্থব্যবস্থারও প্রবর্তক। তিনি অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' (Science of Wealth) বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, কোন দেশে শ্রম ও সম্পদের সমন্বয় ঘটলেই জাতীয় সমৃদ্ধি আসবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্মীথ তাঁর The Wealth of Nations গ্রন্থে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তা ছাড়া তিনি উদার বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মতবাদ প্রদান করেন [৪]।

---

১. প্রফেসর মনতোষ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

২. Lawrence S. Ritter, William. Silber, Gregory F. Udell, *Principles of Money, Banking, and Financial Markets* (New York: Pearson Addition Wesley, 2004, A.D.), p.3

৩. ibid, p.4

৪. "Economics is a science that enquires in to the nature and causes of the wealth of nations." (উদ্ধৃত: সুকেশ চন্দ্র জোয়ার্দার,প্রাগুক্ত, পৃ.৪)

Dhaka University Institutional Repository
স্মীথ-এর এই ধারণা তদানীন্তন শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ছিল এবং সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিশ্ব তাঁর মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে স্মীথকে বলা হয় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের দার্শনিক ও অগ্রদূত। তবে এ মতবাদ মানব কল্যাণের চেয়ে সম্পদ আহরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে[১]।

- জে.বি.সে অর্থনীতির পরিচিতিতে বলেন, " অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র সাধারণত সম্পদ নিয়ে আলোচনা করে" [২]।
- ওয়াকার-এর মতে, "অর্থনীতি একটি ধন-সম্পর্কিত শাস্ত্র।"[৩]
- জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "অর্থনীতি সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত ফলিত বিজ্ঞান।"[৪]

অর্থনীতির এই সম্পদভিত্তিক মতবাদ দীর্ঘদিন যাবৎ অনুসরণ করার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ মতবাদের ছন্দ পতন ঘটে। এ সময়ে অর্থনীতিতে আলফ্রেড মার্শাল-এর আবির্ভাবের পর তাঁর প্রদত্ত ধারণা ও অভিমত অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং ক্লাসিক্যাল মতবাদের পরিবর্তে নিউ-ক্লাসিক্যাল মতবাদের সূচনা হয় [৫]।

❑ নয়া-ক্লাসিক্যাল ধারণায় অর্থনীতি

নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার পথিকৃৎ হলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শল (Alfred Marshall, 1847-1924)[৬]। । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি অর্থনীতির নতুন সংজ্ঞায় অর্থনীতিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলির আলোচনা রূপে বর্ণনা করেন। তা ছাড়া তিনি উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপের ভিত্তিতে 'ভোক্তার চাহিদা তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। তাঁর এই সংজ্ঞায় অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্পর্কে এক নতুন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। নয়া ক্লাসিক্যাল ধারণা মতে, অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। যার মাধ্যমে মানুষের জাগতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা যায়। মার্শাল-এর এ ধারণার সহযোগী হলেন অর্থনীতিবিদ এ.সি. পিগু, ক্যানন, ডেভেনপোর্ট এবং জেভন্‌স প্রমূখ। সুতরাং নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা হলো, অর্থনীতি একটি কল্যাণমূলক বিজ্ঞান যা সম্পদের আলোচনা অপেক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির আলোচনাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। নয়া ক্লাসিক্যাল মতবাদের পুরোধা অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল তাঁর 'Principles of Economics' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে [৭]।"

---

১. Adam Smith, Who is regarded by many scholars as the founder of economics attemted to answer this questions in his book the 'Wealth of Nations', Published in 1776, Smith was pondering these questions at the height of the Industrial Revolution. During these years, new technologies were invented and applied to the manufacture of cotton, wool cloth, iron, transportation and agriculture. Smith wanted to understand the sources of economic wealth, and he brought his acute powers of observation and abstraction to bear on the question. His answer: The division of labor & Free Markets. (Michael Perkin, ibid, p.54)
২. Michael Parkin, ibid, p. 54
৩. মোঃ মাসুম আলী মোঃ নুরল আলম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪
৪. Robert E. Hall, John B. Taylor, *Macro Economies* (London: W.W. Norton & Company, 1992 A.D). p.3
৫. ibid, p.3
৬. ibid, p.3
৭. সুকেশচন্দ্র জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিবিদ পিগু-এর মতে, "সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় তার আলোচনা করাই অর্থনীতির কাজ[১]।" তাই পিগু-এর ধারণায় "অর্থনীতি হল কল্যাণের বিজ্ঞান এবং সম্পদ অপেক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির আলোচনা অর্থশাস্ত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ক্যানন-এর মতে, "অর্থনীতি হল বস্তুগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানকারী বিষয়।" তাঁর মতে সম্পদই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সৃষ্টির বস্তুগত মাধ্যম।

অর্থনীতিবিদ ফিসার-এর মতে, "অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল সম্পদের সাথে মানুষের জীবন এবং কল্যাণের সংযোগ নির্দেশ করা।"

❑ আধুনিক চিন্তাধারায় অর্থনীতি

সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, অভাবের নির্বাচন ও মিতব্যয়িতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির পরিচিতি তুলে ধরেছেন:

এল.রবিন্স (১৮৯৮-১৯৮৪ খ্রি.), লর্ড জন মেনার্ড কেইন্স (১৮৮৩-১৯৪৬খ্রি.), পল. এ.স্যামুয়েলসন (১৯১৫-১৯) প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন [২]। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'Nature and Significance of Economic Science' নামক গ্রন্থে অধ্যাপক রবিন্স বলেন "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণ আলোচনা করে [৩]। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় সম্পদের অপ্রতুলতা, সম্পদের বিকল্প ব্যবহার এবং অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর প্রাধান্য দেন। ওয়াট্সন-এর মতে, "আধুনিক অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্যতা বা স্বল্পতা (Scarcity) ও নির্বাচন (Choice) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্বল্পতা ও নির্বাচন।"[৪]

⇨ অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস অর্থনীতির পরিচিতিতে বলেন, অর্থনীতি এমন একটি সমাজ বিজ্ঞান যা কিভাবে মানুষ তাদের অভাবের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতার সমন্বয় সাধানের চেষ্টা করে এবং এই প্রচেষ্টা কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃস্টি করে, তা-ই আলোচনা করে [৫]।

---

১. মনতোষ চক্রবর্তী, 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতি', (ঢাকা:ইকনোমি পাবলিশার্স, ১৯৯৭ খ্রি:) পৃ. ২১২

২. "*Economies is a study of mankind in the ordinary business of life*"-Marshall.

৩. It examines That part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well being"-Marshall.

৪. "Economies is, on the one side, a study of wealth and on the other and more imprtant side, a part of study of man."-Marshall.

৫. "A study in to the causes of material welfare"-cannan. জহিরুলইসলাম সিকদার, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

⇨ লর্ড জে.এম.কেইনস (১৮৯৩-১৯৪৬) আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারা একজন শক্তিমান ও খ্যাতনামা চিন্তাবিদ। তাঁর মতে, "দুষ্প্রাপ্য সম্পদের প্রয়োগ এবং আয় ও নিয়োগ নির্ধারক বিষয়সমূহ আলোচনা করাই অর্থনীতির উদ্দেশ্য [১]।"

⇨ কেইনস-এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সামষ্টিক অর্থনীতি রূপে গণ্য। তাঁর General Theory of Employment, Interest and Money প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থনীতিতে আধুনিক যুগের সূচনা হয় এবং অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে যে বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন সুচিত হয় তাকে 'কেইনসীয় বিপ্লব' বলা হয়।

⇨ প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে পল.এ. স্যামুয়েলসন আধুনিক চিন্তাধারায় অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি অর্থনীতির পরিচিতিতে বলেন,

"Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society." [২]।

Michael Parkin-এর মতে, অর্থনীতির পরিধি, আওতা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলির পছন্দের উপর গুরুত্বারোপ করে অর্থনীতির পরিচিতি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে,

"Economics is the social science that studies the choices that individuals, businesses, governments, and entire societies make as they cope with scarcity and the incentives that influence and reconcile those choices. [৩]"

আধুনিক চিন্তাধারায় প্রদত্ত পরিচিতিসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। তারা অর্থনীতিকে একটি নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। অর্থনীতি কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির আলোচনায় মূখ্য ও বিবেচ্য বিষয় নয়। এল.রবিনস এবং তার অনুসারীদের মতে, অসীম অভাব, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, ও এর বিকল্প ব্যবহার এবং অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণই অর্থনীতির বিষয়বস্তু[৪]। আধুনিক চিন্তাধারায় অর্থনীতিবিদগণ এভাবে অর্থনীতির পরিধি ও আওতাকে বিস্তৃত করে একে একটি বাস্তবধর্মী এবং সার্বজনীন বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন। Michael Parkin এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে উল্লেখ করেন[৫]।

---

১. G.F. Stankle, *Starting Economics* (Singapore: Longman, 1999 A. D.), p. 49

২. "Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends ad scarce means which have alternative uses."-L. Rabbins.

৩. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

৪. G.F. Stankle, Ibid, p. 49

৫. ibid, p. 49

Dhaka University Institutional Repository

"Economics is a social science (along with political science, Psychology, and sociology). Economists try to discover how the economic world works, and in pursuit of this goal (like all scientists), they distinguish between two types of statements:

What is?

What ought to be?" [১]

❑ অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

⇨ বিশ্বায়নের সুবাদে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিকাশে মানব সভ্যতা নবতর আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে। 'Globalization' এর ফলে বিশ্বব্যাপি একটি 'Global Economy' গড়ে উঠেছে। এর ধারাবাহিকতায় অর্থনীতির পরিধি, আকৃতি ও বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতির বিষয়বস্তু নির্ধারণে ক্লাসিক্যাল, নয়া ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক চিন্তাধারার অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, যা ইতোমধ্যে আমাদের অর্থনীতির পরিচিতি বিষয়ক আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন পরিচিতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শেষে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্পর্কে Michael Parkin বলেন, "Two big questions summarize the scope of economics:

⇨ How do choices end up determining what, how and for whom goods and services get produced?

⇨ When do choices made in the pursuit of self-interest also promote the social interest? [২]

Michael Parkin অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। What, How and for Whom এবং Goods and Services-এর বিষয়ে নিজের দেশের উদাহরণ টেনে একটি সময়োপযোগী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। ব্যাখ্যাটি তার ভাষায় নিম্নরূপ: [৩]

Goods and Services-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

"Goods and services are the objects that people value and produce to satisfy human wants. Goods are physical objects such as golf balls. Services are tasks performed for people such as haircuts. By far the largest part of what the United states producces today is services such as retail and wholesale trade, health care, and education.Goods are a small part of total production.[৪]"

---

১. Economics is a social science sludying how people altempt to aceomodate scarcity to their wants and how these altempts interact through exchange-caiencross. (মাসুম আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯)

২. প্রাগুক্ত

৩. Michael Parkin, ibid, p.8

৪. ibid, p.9

'What'-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"What? What we produce changes over time seventy years ago, 25 percent of Americans worked on farms. That number has shrunk to 3 percent today. Over the same period, the number of people who produce goods-in mining, constructions, and manufacturing-has shrunk from 31 percent to 17 percent. The decrease in farming and manufacturing is reflected in an increase in services. Seventy years ago, 45 percent of the population produced services. Today, more then 80 percent of working Americans have service jobs. So 'what' determines the quantities of corn, DVDs, and haircuts and all the other millions of items that we produce[১]."

অনুরূপ How-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

"Goods and services are produced by using productive resources that economists call factors of production. Factors of production are grouped into four categories: [২]

⇨ Land :

⇨ Labor:

⇨ Capital and

⇨ Entrepreneurship

For whom-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

"Who gets the goods and services that are produced depends on the incomes that people earn. A large income enables a person to buy large quantities of goods and services. A small income leaves a person with few options and small quantities of goods and services [৩]."

তিনি আরও উল্লেখ করেন, "People earn their incomes by selling the services of the factors of production they own:

⇨ Land earns rent;

⇨ Labor earns wages;

⇨ Capital earns interest and

⇨ Entrepreneurship earns profit. [৪]

তাছাড়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কার্যাবলিও অর্থনীতির বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতির আওতা, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিধি খুবই ব্যাপক ও সম্প্রসারিত। অর্থনীতি শুধু বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না বরং ভবিষৎ প্রজন্মের কি কি সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে তা নিয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করে[৫]।

---

১. ibid
২. ibid
৩. ibid, p. 2
৪. ibid
৫. ibid

❑ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি, প্রকৃতি ও পারস্পরিক গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সীমিত সম্পদের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশ জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে সচেষ্ট। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব, জাতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বায়নের আওতায় নিয়ে আসা পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, ব্যাপক অভিবাসন সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, অবাধ বাণিজ্য, বাণিজ্যিক উদারীকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ ও উন্মুক্তকরণ এসব কারণে অর্থনীতির বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ঘটছে। অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র ও পরিসরে ব্যাপকতা আসছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে এর প্রয়োগ ও নিয়োগ বিন্যাস। তাই আধুনিককালে আলোচনার সুবিধার্থে অর্থনীতিকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics), খ. সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics)। ১৯৩৩ সালে সুইডেনের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাগনার ফ্রিস এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 'Micro' এবং 'Macro' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন [১]।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics)

'ব্যষ্টিক' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'micro' গ্রীক শব্দ mikros হতে ইংরেজী micro শব্দের উৎপত্তি [২]। আভিধানিক অর্থে ব্যষ্টিক (Micro) শব্দের অর্থ হল ক্ষুদ্র। অর্থনীতির যে বিষয়গত অংশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশের (এককের বা গ্রুপের) অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, পরিভাষায় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics) বলা হয় [৩]।

'Microeconomics'-এর পরিচতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সময় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়োছন। তাদের প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য পরিচিতিগুলো নিম্নরূপ:

- ⇨ Handerson এবং Quandt-এর মতে, "ব্যষ্টিক অর্থনীতি হল ব্যক্তির এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা"[৪]। একজন ভোক্তার ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষণ, একটি দ্রব্য বা একটি উপাদানের দাম নির্ধারণ, একটি ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়।
- ⇨ মরিসভর-এর মতে, অর্থনীতির আণুবীক্ষণিক অবলোকন ও বিশ্লেষণকেই বলে ব্যষ্টিক অর্থনীতি [৫]।"
- ⇨ Michael Parkin-এর মতে, "Microeconomics is the study of the choices that individuals and businesses make the way, these choices interact in an qkets, and the influence of governments [৬]."

---

১. সুকেশচন্দ্র জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২. AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English* (New York: 2010 A.D), p. 967
৩. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. মনতোষ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১
৫. Robert E. Hall, John B. Taylor, '*Macro Economics*', ibid, p.6
৬. Michael Parkin, ibid, P. 2

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত অভিমতসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির এমন অংশ যেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষ ফার্ম, একক পরিবার, একটি দ্রব্য, একক উৎপাদন প্রভৃতির আচরণ এবং চাহিদা ও যোগান মূল্যের বিশ্লেষণ রয়েছে। ব্যষ্টিক অর্থনীতি কিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক কাঠামোটি নিচের ছকে দেখানো হলা [১]ঃ

ব্যষ্টিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো

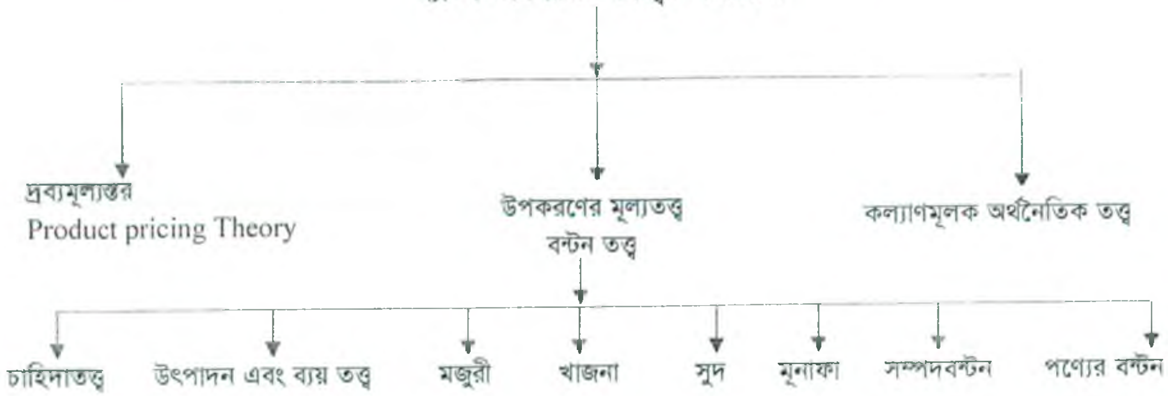

উপরিউক্ত কাঠামো থেকে বলা যায়, ব্যষ্টিক অর্থনীতি মূলত, নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেঃ-

⇨ সম্পদ কিভাবে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে বন্টিত হয়;

⇨ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কিভাবে ভোক্তাদের মধ্যে বন্টন হয় এবং

⇨ দ্রব্য, সেবা এবং সম্পদ কতটুকু কাম্যভাবে বন্টন হয়।

খ.সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics)

'সামষ্টিক-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'macro'। গ্রীক শব্দ 'makros' হতে ইংরেজী 'macro' শব্দের উৎপত্তি[২]। আভিধানিক অর্থে 'macro' শব্দের অর্থ হল বৃহৎ (large)। অর্থনৈতিক কোন বিষয়কে যখন সামগ্রিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাকে সামষ্টিক অর্থনীতির 'Macro Economics' বলে[৩]। এক্ষেত্রে অর্থনীতির যে কোন বিষয়ের সব এককের আচরণ বা কার্যাবলি একত্রে বা সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করা হয়। 'Macro Economics'-সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য পরিচিতিগুলো নিম্নরূপঃ

⇨ এ্যাকল-এর মতে, "সামষ্টিক অর্থনীতি বৃহদায়তনিক পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে[৪]।"

⇨ বোল্ডিং সামষ্টিক অর্থনীতির পরিচিতিতে বলেন, "সামষ্টিক অর্থনীতি কোন ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা দ্রব্য মূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর এবং দ্রব্যের ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন আলোচনা করে[৫]।"

---

১. মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
২. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, ibid, p.16
৩. ibid
৪. ibid
৫. ibid

⇨ লিভাকিক-এর মতে, "সমগ্র অর্থনীতির পর্যালোচনাই সামষ্টিক অর্থনীতি।[১]"

Dhaka University Institutional Repository

⇨ Michael Parkin-এর মতে, "macroceonomics is the study of the performance of the national economy and the global economy [২]."

⇨ নাসিরুদ্দিন 'Macro Economics' এর পরিচিতিতে বলেন, "Macro economics is the study of economics in terms of whole systems with reference to general levels of output and income and to the interpretations among sectors of the economy [৩].

বর্ণিত পরিচিতিগুলো বিশ্লেষণ করলে সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে যে ধারণা স্পষ্ট হয় তা হলো মোট জাতীয় আয়, মোট লোক সংখ্যা, জাতীয় বেকারত্বের কারণ ও ফলাফল, কোন দ্রব্যের মোট চাহিদা ও যোগান, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সাধারণ মূল্যস্তর ও মোট আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি বিষয় সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং অর্থনীতির যে শাখায় একটি অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে [৪]।

❑ সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা (Social Production and the system of Distribution)

উৎপাদন ও বন্টন-এ দু'টি সমস্যাসহ মানুষের সকল অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ও ধরন সব সমাজে এক ও অভিন্ন। মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার সুষ্ঠু ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু সমস্যা এক হলেও সমাজ ব্যবস্থাভেদে মানুষ তার সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এ কারণে সামাজিক উৎপাদন এবং বন্টনের প্রক্রিয়া দেশে বিদ্যামান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মানুষ যে প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয়ে অর্থনীতিবিদ জি. গ্রোসম্যান বলেন, মানুষ যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে তার দ্বারাই মানুষের সকল অর্থনৈতিক তথা উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ প্রভৃতির প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়[৫]।

---

১. Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Edition (New York: Cambridge University Press, The Edinburg Building, Cambridge CB, 28 Rull UK, P.860

২. সুকেশচন্দ্র জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৩. "Macro Economics deals not with individual quntities as such but with aggregatcs of these quntities; not with individual income but with national income; not with individual price but with the price level; not with individual output but with natioanl output"- Boulding.

৪. Michael Parkin, ibid, p. 2

৫. Nasiruddin Ahmed FIBA (USA), ibid. p.164

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে Paul a. Samuelson, W.D. Nordhaus বলেন, "Different societies are organized through alternative economic systems, and economics outsides the various mechanisms that a society can use to allocate its searce resources. [১]"

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষ যে সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তাকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ প্রচলিত রয়েছে তাকে প্রধানত নিম্নরূপ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় [২]:

- ❑ পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা;
- ❑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা;
- ❑ মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং
- ❑ ইসলামি অর্থব্যবস্থা

পর্যায়ক্রমে বর্ণিত অর্থব্যবস্থাসমুহের ওপর আলোকপাত করা হল:

❑ পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র-এর ইংরেজী প্রতি শব্দ হল 'Capitalism'। 'Capitalism' -এর পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয় 'An economic system in which a country's businesses and industries are controlled and run for profit by private owners rather than by the government [৩]".

Capitalistic-এর অর্থ হল "An economic system based on the principles of capitalism."

Capitalist-এর অর্থ হল:

১. A person who supports capitalism

২. A person who owns or controls a lot of wealth and uses it to produce more wealth.[৪]

পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপাদান ও উপকরণসমূহের (means of production) উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা সংঘঠিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না, বরং একটি স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থায় কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না বিধায় একে 'স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি হিসেবেও অভিহিত করা [৫]।

---

১. Robert E. Hall, John B. Taylor, Macro Economics ibid, p.6
২. সুকেশচন্দ্র জোয়ারদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-এ উদ্ধৃত
৩. Paul. A. Samuelson, W.D. Nrdhause, idid, p. 8
৪. ibid
৫. A.S Hornby, ibid, p.216

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদ হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Laissez-fair) প্রতিফলন। অর্থনীতিবিদ Paul A. Sameselson & W.D. Nordhause বলেন, The extreme case of a market economy, in which the government keeps its hands off economic decisions, is called a laissez-fair economy [১]." সুতরাং পুঁজিবাদ হল এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব বা ভোক্তার সার্বভৌমত্ব, স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সরকারি হস্তক্ষেপ অগ্রাহ্য প্রভৃতি বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ অর্জন ও তা বৃদ্ধি করাই সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রধান লক্ষ্য এবং জাগতিক বা বস্তুগত বিষয়ের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য [২]।

H.G. Wells-এর মতে, "যদিও আমরা কেউ পুঁজিবাদের সঠিক পরিচয় জানি না, তবুও পুঁজিবাদ বলতে আমরা সাধারণ ও কিছু কঠিন ঐতিহাসিক শব্দ, অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে হলেও বিকৃত সুযোগ সন্ধানকেই বুঝে থাকি [৩]। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে একটা বিশ্বজনীন ধারণা বা জীবন দর্শন (World view) জড়িত। সুতরাং পুঁজিবাদও নিছক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয় বরং একটি জীবন দর্শন [৪] আর তা হল জড়বাদী বা বস্তুবাদী দর্শন। তাই আমাদের মতে, (গবেষক) ব্যক্তি ও সম্পদের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যার স্থলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'যুক্তি ও বিজ্ঞান'-যে জীবন দর্শনের উদ্ভব হয়, তার উপর ভিত্তি করে বস্তুবাদী চেতনায় আয় ও সম্পদের উপর নিরংকুশ ব্যক্তিমালিকানা এবং ব্যক্তিস্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার ব্যবস্থা এবং সুদভিত্তিক পুঁজির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাকেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে।

❑ পুঁজিবাদের মূলনীতিসমূহ

বিগত দু'শত বছর যাবত ভোগবাদী জীবন ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে, অবাধ ও নিরংকুশ ব্যক্তিমালিকানা এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপি পুঁজিবাদের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করলে এর ধারণা, স্বরূপ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। এ পর্যায়ে তাই এর মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হল। পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ যে সকল মূলনীতি রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ [৫]:

---

১. Lawrence S. Ritter, William. Silber, Gregory F. Udell, ibid, p.234
২. Paul A. Samuelson, W.D. Nordhaus, ibid, p.8
৩. ibid, p,8
৪. শেখ মাহমুদ আহমদ *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনুঃ গুলমান মুহাম্মদ আবদুলহাই, (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮০ খ্রি.) পৃ. ১০
৫. P.N.Kitin, *Fundamental of Polircal Economy* (Moscow: Progress publisher 1966.) p.25

Dhaka University Institutional Repository

- ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার;
- উপার্জন-অধিকারের স্বাধীনতা;
- অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা;
- ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্মপ্রেরণার উৎস;
- মালিক ও মজুরের অধিকারের পার্থক্য;
- ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কার্যকরণের উপর নির্ভরশীলতা;
- অর্থ-সম্পদ উপার্জনে নৈতিক মূল্যবোধ বিবেচ্য নয় এবং
- সরকারের নিষ্ক্রিয়তা।

ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার

পুঁজিবাদ অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি বা মূলনীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন অধিকার। এই অর্থব্যবস্থা কেবল প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রীর উপর স্বত্ত্বাধিকারের সুযোগই নয় বরং সকল প্রকার উৎপাদন ও উপায়-উপকরণের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করা যায়। অর্থ উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলোকে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পন্থায় ও পদ্ধতিতে ব্যবহার ও প্রয়োগের অধিকারও এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত[১]। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদি ও পণ্য-সামগ্রীর ব্যক্তিগত মালিকানাকে প্রায় সব ক'টি অর্থব্যবস্থাই স্বীকৃতি প্রদান করেছে, কিন্তু উৎপাদন উপায়-উপকরণগুলোর ব্যক্তি মালিকানায় হতে পারবে কিনা বা হওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার মধ্যে বিরাট মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে [২]। অবশ্য পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থায় এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছে। বরং এটিই হচ্ছে এ ব্যবস্থার মুল ভিত্তি ও বুনিয়াদ যার উপর পুঁজিবাদের প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভূমি ও পুজির উপর নিরংকুশ মালিকানার নির্যাস হলো খাজনা ও সুদের মাধ্যমে অন্যকে শোষণ করার সুযোগ প্রদান করা [৩]।

উপার্জন-অধিকারের স্বাধীনতা

পুঁজিবাদী সমাজের অধিবাসীগণ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে দলগতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের পুঁজি ও উপায়- উপকরণকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। লাভ-লোকসানের অংশীদার তারা নিজেরাই হয়ে থাকে। লোকসানের ঝুঁকি যেমন বহন করতে হয়, তেমনি মুনাফার পাহাড় গড়তেও তাদের কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রয়োজনে হ্রাস করবার অধিকার ও ভোগ করে থাকে [৪]।

---

১. Capitalism, according to Lalin, is the name given to that social under which land, instrument etc belongs to a small number of landlords and capitalists while the masses of the people posses no property or very little property and compelled to live itself out as workers (P.Nikitin, ibid)

২. ড: এম.এ.মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব প্রয়োগ*, (ঢাকা: ইইরিব্যুরো, ১৯৯৩ খ্রি:) পৃ. ২৯.

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭।

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ করবার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ ধরনের সংগঠনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান রচনা করার বিষয়ে পুঁজিবাদী সমাজ স্বাধীন ও সার্বভৌম। মূলত ক্রেতা-বিক্রেতা,মজুর-মালিক,মনিব-চাকরের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয় পরিচালনায়, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের জন্মগত ইচ্ছা বা প্রবণতা রয়েছে। এর দাবী পূরণার্থে এবং এর বাস্তব রূপায়নের জন্য ব্যক্তিকে উপার্জন করার এবং ব্যক্তির ইচ্ছানুয়ায়ী ফল লাভের সুযোগ করে দেয়া পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি [১]।

❑ অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা[২]। এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল ব্যক্তিদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় বা ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। কেননা উন্মুক্ত বাজারে একই পণ্যের বহু সংখ্যক উৎপাদক, বহু ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-বিক্রেতা হলে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে দ্রব্যমূল্যের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে[৩]। অনুরূপভাবে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মজুরীর পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার হার নির্ধারণ করে নিতে পারে। মূলত, এই মূলনীতিটি 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' (Struggle for existence)এবং 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকা'র অধিকার (Survival for fittest) নামক সামাজিক ডারউইনবাদের দর্শন হতে উদ্ভূত[৪]। পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার প্রবক্তাদের মতে, প্রতিযোগিতার অবাধ প্রবাহে অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে না, বরং প্রচুর উৎপাদন ও তড়িৎ উৎপাদনের এটাই একমাত্র নিয়ামক। এ চেতনাই মানুষকে বিশ্ব রহস্য উদঘাটন করে অভিনব আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং অনুপ্রেরণা যোগায় [৫]।

❑ ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্মপ্রেরণার উৎস

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করে অর্থ-সম্পদ উপার্জন এবং ভোগই এ ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য। পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিতে এতদপেক্ষা উত্তম বরং এ ছাড়া অন্যকোন জিনিসই মানুষের মধ্যে এত কার্যকর, ফলপ্রসূ প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না [৬]। মূনাফার পরিমাণ কম নির্ধারণ করলে মানুষের কর্মপ্রেরণা, উপার্জন স্পৃহা, শ্রম ও চেষ্টা সাধনার মাত্রা হ্রাস পাবে। অপরদিকে মুনাফার পথ ও পদ্ধতি যদি অবাধ ও উন্মুক্ত থাকে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি নিজ শ্রম ও যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যাশিত পরিমাণ উপার্জন করবার পুর্ণ সুযোগ পায়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বোচ্চ পরিমাণ ও উৎকৃষ্টমাণের কাজ করতে চেষ্টা করবে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্য সামগ্রীর গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার আকর্ষণে সকল প্রকার উৎপাদন-উপকরণ সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহৃত হবে, প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। এভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রত্যাশা উৎপাদনের সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূলে এমন এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করবে যা অন্য কোন উপায়ে সৃষ্টি হবার কোন সম্ভাবনা নেই [৭]।

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, অনুঃ মহাম্মদ আবদুর রহিম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ২০০৩ খ্রি.) পৃ. ২৬
২. প্রাগুক্ত
৩. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪. প্রাগুক্ত
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮.
৬. ড. এম. উমর চাপরা অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯.

Dhaka University Institutional Repository

❑ মালিক-শ্রমিকের অধিকারে পার্থক্য

যে কোন শিল্প , কল-কারখানা ও উৎপাদনমূখী প্রতিষ্ঠানে দুটি পক্ষ থাকে। একটি মালিক পক্ষ অপরটি হল শ্রমিক কর্মচারী পক্ষ। মালিক পুঁজি/মূলধন যোগান দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা মালিক-পরিচালকগণের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে। অপরদিকে শ্রমিক কর্মচারীগণ তাদের শ্রম ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন ভাতাদির বিনিময়ে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে। মূল প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই [১]। পুঁজিবাদী সমর্থকগণ মনে করে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন যোগানের দায়িত্ব যেহেতু মালিক পক্ষ বহন করে, লোকসান বা দেউলিয়া হলেও এর ঝুঁকি মালিক পক্ষকেই বহন করতে হয়, সেহেতু ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে শ্রমিক কর্মচারী পক্ষ মুনাফার অংশ দাবী করতে পারে না। ন্যায়সংগত লভ্যাংশের অংশীদার হতেও পারে না। শ্রমিক-কর্মচারীগণ তাদের যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত বাজারের হার অনুযায়ী মজুরী পাবার অধিকারী মাত্র [২]।

❑ ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কার্যকরণের উপর নির্ভরশীলতা

'কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন' এ তত্ত্বে যখন মুনাফা অর্জন সর্বোচ্চকরণ সম্ভব হয়, তখন পুঁজিপতিদেরকে তাদের স্বার্থেই সম্ভাব্য পরিমাণে বৈজ্ঞানিক পন্থা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে মেশিন ও যন্ত্রপাতিগুলোকে উত্তম অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল কম মূল্যে সংগ্রহ করতে ও তাদের ব্যবসায়ের যাবতীয় উপায়, পন্থা, সাংগঠনিক-প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর উন্নত ও সুসংহত করতে সচেষ্ট থাকতে হয়। পুঁজিবাদের এ অবাধ ও নিরংকুশ অর্থব্যবস্থায় এ ধরনের কার্যক্রম কোন প্রকার বহি:প্রভাব ও কৃত্তিম ব্যবস্থাপনা ব্যতীত অভ্যন্তরীণ সংস্থা ও সংগঠনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয় [৩]। বিপুল সংখ্যক বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ও দলের ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার দ্বারা প্রাকৃতিক আইন, সমাজ সমষ্টির উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের এমন সব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, যা কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার সাহায্যেও এতো সুসংহত ও সুসংবদ্ধভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। পুঁজিবাদের প্রবক্তরা মনে করেন, বস্তুত এটা প্রকৃতিরই পরিকল্পনা বিশেষ, যা স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে [৪]।

❑ অর্থ-সম্পদ উপার্জনে নৈতিক মূল্যবোধ বিবেচ্য নয়

অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করাই এ অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের ধ্যান-ধারণা এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। সুদ, জুয়া,মাদকদ্রব্য উৎপাদন বিপণন এ সব কিছু এ অর্থব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত [৫]।

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* অনু: ড. মাহমুদ আহমদ, সম্পদনা এম.জহুরুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিউট অব ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থাট, ২০০০ খ্রি.) পৃ. ৩০

২. ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড, *অর্থনীতিবিদদের যুগ*, অনু: ড. আবদুল্লাহ্ ফারুক (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ.২৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য দেখা যায়, পুঁজিবাদী বিশ্বে পতিতাবৃত্তি ও মদ-জুয়ার লাইসেন্স প্রদান করে এ ব্যবসার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। তামাক, গাঁজা ও আফিম এ জাতীয় মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ও বিপণনে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বিনা সুদে কাউকে ঋণ প্রদান করা হয় না বরং বিনাসুদে ঋণ প্রদান পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। ঋণ প্রদানের বিনিময়ে পূর্বে নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করতে হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক, অভাব-অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হোক কিংবা অর্থোপার্জনের উপায়-স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্য হোক, কোন অবস্থাতে লেনদেন বিনাসুদে সম্পন্ন করা পুঁজিবাদী সমাজে সম্পূর্ণ অসম্ভব [১]।

❑ রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ মুক্ত

এ অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি হলো ব্যক্তি বা উদ্যোক্তাগণ কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি, প্রতিরোধ-প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত পূর্ণ স্বাধীনতাসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ-সুবিধা পেলেই উপরোল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অগ্রগতি, কল্যাণ ও সুখ-শান্তি অর্জনে সফলতা লাভ করতে পারবে [২]। যোগ্যতা, মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী জনগণ একই সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে থাকলে পরিণামে সকলেরই কল্যাণ সাধিত হবে, যদিও বাস্তবে তারা সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে কাজ করার জন্য নিয়োজিত থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমর্থকগণ মনে করেন, ব্যক্তি বা উদ্যোক্তাগণ যখন নিজস্ব চেষ্টা সাধনার প্রতিফল হিসাবে অপরিসীম মুনাফা অর্জন করতে পারবে, তখন তারা শ্রম, মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিপুল ও অত্যাধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে [৩]। এর ফলে অনিবার্যভাবে সকলের জন্যই অধিক ও উৎকৃষ্ট পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকবে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কাঁচামাল সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রকাশ্যে ও উন্মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে দ্রব্য মূল্যে স্বাভাবিক, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের গুণগতমান উন্নত হবে। কোন কোন পণ্য দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন প্রয়োজন তাও নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে [৪]।

সুতরাং পুঁজিবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন, উৎপাদনের স্বাভাবিক কর্মধারায়, রাষ্ট্র বা সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং ব্যক্তিগত কর্মস্বাধীনতা সংরক্ষণের সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, সারা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, বহি:আক্রমণ, বিরুদ্ধতা এবং সকল বিপদ হতে দেশ ও দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ রক্ষা করা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুবিচারক, সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রণকারী হবার দায়িত্ব পালন হচ্ছে রাষ্ট্র সরকারের কর্তব্য। উহার নিজেরই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ভূস্বামী হয়ে বসা কিংবা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও জমিদারের কাজ ব্যাহত করা কখনও সংগত ও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না [৫]।

---

১. ড.মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা (ঢাকা: ইফাবা, গবেষণা বিভাগ, ২০১০ খ্রি:) পৃ. ৮৮
২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. এম. উমর চাপরা প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

❑ পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক আলোচনা ও এর মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থা অতি প্রাচীন এবং প্রচলিত। যদিও এ্যাডাম স্মী-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Laissez-fair) ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সেই পুঁজিবাদ আজ আর বিশ্বের কোথাও প্রচলিত নেই। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপী একটি 'Global economy' গড়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাণিজ্যিক উদারীকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ ও উন্মুক্তকরণ। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অর্থব্যস্থাতেও অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটেছে। সংশোধনী ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার এবং যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে। এতদসত্ত্বেও যে, বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো পুঁজিবাদকে অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে পৃথক করেছে, সে সব প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:[১]

১. সম্পদের উপর নিরংকুশ মালিকানা;
২.উদ্যোগের স্বাধীনতা;
৩. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব;
৪. অবাধ প্রতিযোগিতা;
৫.কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতি;
৬. সমাজের শ্রেণী বিভক্তি;
৭. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
৮. দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা;
৯. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা;
১০. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা;
১১. মুক্তবাজার ব্যবস্থা;
১২. আয়ের অসম বন্টন এবং
১৩. শ্রেণী শোষণের পথ উন্মুক্ত হওয়া।

ড. এম. উমর চাপরা-এর মতে পুঁজিবাদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হলো:[২]

ক) পুঁজিবাদ ব্যক্তি মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে সম্পদ বৃদ্ধি ও পণ্য উৎপাদন এবং চাহিদা পূরণকে মানব কল্যাণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে;

খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তি-মালিকানা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে অবারিত স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদ অপরিহার্য মনে করে;

গ) পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সম্পদ বন্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অত্যাবশ্যক মনে করে;

ঘ) উৎপাদন দক্ষতা বা ন্যায়সঙ্গত বন্টনসহ কোনো ক্ষেত্রেই সরকারের বৃহৎ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে পুঁজিবাদ মনে করেনা এবং

ঙ) পুঁজিবাদ দাবি করে, মানুষের ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থও পূরণ হবে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বৈশিষ্ট্যগুলো হল:[৩]

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০
২. প্রাগুক্ত পৃ.৩১
৩. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: গ্রন্থমেলা, ২০০৩খ্রি:) পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি;

২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্টদর্শন;

৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা

৪. উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি;

৫. ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা;

৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা;

৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন এবং

৮. পুরোপরি সাম্রাজ্যবাদী।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায়, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে না। উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ প্রভৃতি পর্যায়গুলো স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়[১]।

❑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

সমাজতন্ত্রের বহুবিধ প্রকরণের মধ্যে এখানে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়টি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ধারণাসমূহ মার্কসবাদী মূলধারার পূর্বসূরি এবং যেহেতু অন্যান্য মতবাদসমূহ রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি তাই তাদের আলোচনা দ্বারা সমাজতন্ত্রের মূল বিষয়বস্তু অনুধাবনের কোন সুযোগের অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিচিতিসমূহ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

Michael Parkin-এর মতে,

"A command system (Socialism) is a method of organizing production that uses a managerial hierarchy. Commands pass downward through the hierarchy, and information passes upward. Managers spend most of their time collection and processing information about the performance of the people under their control and making decisions about what commands to issue and how best to get those commands implemented [২]."

Paul A Samuelson, W.D. Nordhaus-এর ভাষ্য থেকে সমাজতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায়। তারা বলেন,

"A command economy is one in which the government makes all important decisions about production and distriubution." In a command economy such as the one which operated in the Soviet Union during most of the twentieth century, the government owns most of the means of the production (land and capital) [৩]."

১. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: গ্রন্থমেলা, ২০০৩খ্রি:) পৃ. ১৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস-এর মতে, "সমাজ বিবর্তনের ধারায় পুঁজিবাদের শোষণে গড়ে উঠা শ্রেণী দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি হল সমাজতন্ত্র [১]।"

শেখমাহমুদ আহমদ-এর মতে,

"পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মেহনতী, সর্বহারা ও শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ বিশেষত ভূমি, পুঁজি ও মূলধনে ব্যক্তি মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা পূর্বক শ্রেণীহীন সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয় সেটা-ই সমজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা [২]।"

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর মতে, "পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র [৩]।"

অর্থনীতিবিদ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন,

"সমাজের সাধারণ লোকের স্বার্থে উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এর উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় সেটা-ই হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি[৪]।"

সমাজতন্ত্রের আদর্শিক এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড.এম.উমর চাপরা। তাঁর বিশ্লেষণে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন, "মার্কসবাদ (সমাজতন্ত্র) হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মধ্যভাগে উদ্ভূত বিভিন্ন আদর্শগত সংশ্লেষণ। এ আদর্শিক চিন্তা ধারাগুলো হচ্ছে তৎকালীন সেক্যুলার মুক্তিচিন্তা, হেগেল-এর দ্বান্দ্বিক মতবাদ, ফুয়েবাক-এর বস্তুবাদ, মিচেল-এর শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব, রিকার্ডো ও স্মীথ-এর অর্থনৈতিক দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের জঙ্গি আহ্বান[৫]।"

সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করে তিনি উল্লেখ করেন "মার্কস-এর বিশ্লেষণের প্রধান তাত্ত্বিক ধারণা হচ্ছে 'এলিনেশন' (alienation) বা সম্পদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া। বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে শোষণের ফলে পুঁজিবাদী সমাজে-এর উদ্ভব ঘটে। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হচ্ছে শিল্প-শ্রমিক, বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন-উপকরণের মালিক বিধায় তারা তাদের শ্রম বিক্রয় করে মজুরি-দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। সর্বনিম্ন মজুরি যা তাদের কোন রকমে বেঁচে থাকার ও নতুন শ্রমদাস প্রজননের চক্রে বেঁধে রাখে [৬]।"

---

১০৮. Michael Parkin, ibid, p. 203
১০৯. Paul. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, ibid, p. 8
১১০. ড.মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১১১. শেখ মাহামুদ আহমদ, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুঃ গুলশান মোঃ আঃ হাই (ঢাকাঃ ইফাবা, তা বি), পৃ.৪৪।
১১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩০
১১৩. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে,

"অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীর মধ্যে কার্ল মার্কসও সমাজ ব্যবস্থার রোগ নির্ণয় এবং এর প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রেণী বিচ্যুতি, শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী-সংগ্রাম, মজুরি-দাসত্ব ও অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ নামক কতিপয় ধারণার প্রবর্তন করেন [১]।

Joseph Schumpeter-এর মতে,

"সমাজতন্ত্র এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, যেখানে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত [২]।" Oscar lange সমাজতন্ত্রের ধারণা দিয়ে বলেন, "সমাজতন্ত্র হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অর্থব্যবস্থা এবং যেখানে উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত[৩]।"

উপরে উল্লিখিত অর্থনীতিবিদগণ কর্তৃক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ঐ সব ধারণার সাথে যে সকল অনুমান, আদর্শিক চিন্তাধারা ও তাত্ত্বিক আলোচনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সম্পৃক্ত, সেগুলোর সংশ্লেষণ করা হলে আমাদের (গবেষকের) মতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার যে রূপরেখা দাঁড়ায় তা হল; তাওহীদ, খিলাফত ও ন্যায় বিচারের (আদল) মানদন্ডে মানবজাতি ও সম্পদের বিশ্বজনীন ধারণার পরিবর্তে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শুধু মানব জাতির নিজস্ব প্রকৃতির সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত জীবন-জগৎ-দর্শনের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ব্যক্তি মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সমতার ভিত্তিতে বন্টনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল, সেটা-ই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নামে পরিচিত।

❑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শসমূহ বিশ্বে এমন একটি ভবিষ্যতের ধারণা পোষণ করে যে, যখন জনগণ গণতান্ত্রিকভাবে বা বলপূর্বক পুঁজিবাদীদের কবল হতে সরকারের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহন করবে এবং উৎপাদন উপকরণের জাতীয়করণ, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী-সংঘাতমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক ও সুষম সমাজব্যবস্থার উন্মেষ ঘটাবে। যা হোক, সমাজতন্ত্র যে নীতিমালা, আদর্শ, দর্শন ও ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সব মূলনীতি নিয়ে এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা করা হল[৫]:

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. Joseph Sehumpeter, Capitalism, Socialism & Development (1950) P. 167.

৫. Oscar Lange, 'Political Economy', (1963), Vol.1 (General Problems), P. 81.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ

- ❑ চরম নাস্তিক্যবাদ (Milttant Atheism);
- ❑ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism);
- ❑ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলুপ্তি;
- ❑ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান;
- ❑ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতি (Centrally planned Economy) এবং
- ❑ সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

❑ চরম নাস্তিক্যবাদ (Militant Atheism)

সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি প্রস্তর (Corner stone) হল চরম বা জঙ্গি নাস্তিক্যবাদ। ইংরেজী এর প্রতি শব্দ হল Athiesm [১]। এ দর্শনের জনক কার্ল মার্কস একটি ইহুদী পরিবারে ১৮১৮ খ্রি.জার্মানীতে জন্ম গ্রহণ করেন [২]। তিনি ধর্মনিরেপক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। যুবক বয়স হতে মার্কস গোঁড়া নাস্তিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যার দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনাই সকল সমালোচনা শাস্ত্রের মূল ভিত্তি [৩]। সমাজতান্ত্রিক দর্শনের স্থপতি এবং এর রূপকার এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মই সব অনিষ্ট ও অনর্থের মূল [৪]। ধর্মের কারণেই সমাজে শোষণ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাই এর মূলোৎপাটন ও উচ্ছেদ অপরিহার্য। মার্কস-এর বিশ্বাস এক অর্থে অংশত সঠিক ছিল। কারণ তিনি যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন তখন বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই রাজতন্ত্রের অধীন ছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ও যোগসাজসে সৃষ্ট সমাজে চার্চের শোষণ-নির্যাতন ও নিপীড়ন। সমগ্র ইউরোপে তো বটেই আফ্রিকাতেও চার্চের ও গীর্জার অত্যাচার ছিল নির্মম। সেই সাথে রাজক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী সর্বব্যাপী ও সমাজের গভীরে প্রোথিত [৫]। উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মের নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার ও উচ্চ বর্ণের লোকদের অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বিলাসী জীবনের পরিপূর্ণ কাহিনীও ইউরোপে অজানা ছিলনা[৬]। মার্কস-এঙ্গেলস ইসলামের সাম্য মৈত্রী বা আর্দশের সাথে পরিচিত ছিলেন কিনা বা ইসলামী সমাজদর্শেনের সংষ্পর্শে এসেছিলেন কিনা তা ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় না। ধর্ম বলতে তারা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল ধর্মকে মুল্যেৎপাটন, উচ্ছেদের কর্মসূচী ও নাস্তিক্যবাদের কর্মশালা। এ মতবাদে ধর্মকে বিবেচনা করা হয় শোষণ ও যুলুমের হাতিয়ার হিসাবে। ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করা হয়[৭]।

---

১. ড. এম. উমর চাপরা অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯.
২. 'Atheism' the belief that God does not exist, (সূত্র: AS Hornby, ibid, p.)
৩. কামাল উদ্দীন হোসেন, *বিশ্ব সভ্যতা পরিক্রমা ও বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৪. Neil Mclness, 'Karl Marx, *The Encyclopaedia of Philosophy* (1967), Vol.5, p.172
৫. কার্ল মার্ক্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

তারা মনে করে, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় ক্রিয়া-বিশ্বাস ভিত্তিক কোন চিন্তাধারা বিবেচ্য বিষয় নয় বরং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা-ই ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি [১]। বুর্জোয়া সমাজে অর্থ-বিত্তের মালিক দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে শ্রেণী সংঘাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ সর্বহারা, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে শোষণের জন্য ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কেই বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করে। মানব সমাজের একাংশের ক্রমাগত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হওয়ার প্রক্রিয়ায় উভয় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[২]। এ মূলনীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এ আদর্শের অনুসারী ও বিশ্বাসীরা মনে করে, ধর্মের মূলোৎপাটন ব্যতীত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, কালমার্কস-এর বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদটি প্রভাবিত ও উৎসারিত হয়েছিল ডারউইন-এর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'On the Origine of the Species' নামক গ্রন্থের জীব বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ বা 'The Theory of Evolution' নামক তত্ত্ব থেকে[৩]। উল্লেখ্য যে, ডারউইন-এর এই বিবর্তনবাদ ও প্রকৃতির নির্বাচন তত্ত্বটি তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য ও যুক্তির দ্বারা তত্ত্বটি সমর্থন পায়নি। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, তেলাপোকা লক্ষ বছর ধরে টিকে রয়েছে, কিন্তু শক্তি ধর অতিকায় সব প্রাণী পৃথিবীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। এর পিছনে যত না তাদের অযোগ্যতা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী মানুষের অবিবেচনা ও অর্থলিপ্সা। অনুরূপভাবে কবে কখন ও কি কি প্রক্রিয়ায় বানর মানুষে রূপান্তরিত হয় তার কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। কেনই বা আজও জীবিত লক্ষ লক্ষ বানর ও গরিলা মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে না তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে, প্রাণী বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ , অনুজীব বিজ্ঞানী, এমনকি গণিতবিদরা পর্যন্ত বিবর্তনবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং এর অসারতা ও শক্তিহীনতাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন[৪]।

❑ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা 'Dialectical Materialism'। জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর বিরোধমূলক বিকাশের ধারণা দ্বারা মার্কস বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল থিসিস্ এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস[৫]। থিসিসের বিরুদ্ধে তৈরি হয় এন্টিথিসিস। দু'য়ের সংঘর্ষে উদ্ভব হয় সিন্থিসিসের। এই সিন্থিসিই পরবর্তীতে থিসিস হয়ে দাঁড়ায়। হেগেল-এর এই দ্বান্দ্বিক বিকাশের ধারণাকে কার্ল মার্কস তার সমাজবিকাশের ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মার্কস ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তার তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন[৬]।

---

১. ভি. আই. লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২. ড. এম. উমর চাপরা অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৬ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সেই প্রয়াসে তিনি বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ শ্রেণী সংগ্রাম বা Class Strruggle কে। তাঁর মতে পৃথিবীর বিকাশ হয়েছে বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। চার্লস ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of Fittest) মার্কসকে তাঁর মতবাদে আস্থাশীল হতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে তিনি ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য হল পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমানরাই শুধু টিকে থাকবে, অন্যেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হয়েছে। মানব ইতিহাসের গতি পথের ক্রমবিবর্তনের এই শ্রেণী সংগ্রামই মূল নিয়ন্তাশক্তি। ব্যক্তি মানুষ কোন স্বাধীন সত্ত্বা নয়, বরং ইতিহাসের দাবার ছকের অসহায় গুটিমাত্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থের অনিবার্য সংঘাতই নিয়ন্ত্রণ করে মানব ভাগ্য (অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ বা (Economic Determinism) । মার্কস-এর মতে, "মানুষের আচরণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিক্রিয়ার প্রতিফলন[১]।" এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার আওতাধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি শোষণের হাতিয়ার হয়ে থাকে তবে দ্বান্দিক বস্তুবাদী দর্শনে যা সমাজের একশ্রেণী কর্তৃক অন্য একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ নির্মূলের প্রবক্তা সে ব্যবস্থাপনা উৎপাদন-উপকরণের রাষ্ট্রীয়করণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যখন বিজয়ী শ্রেণীকে লাগামহীন ক্ষমতা প্রদান করা হবে, তখন জনগণের দুঃখ-দুর্দশা যে আরো বৃদ্ধি পাবে না তা আশংকা না করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। দ্বান্দিক দর্শন শ্রেণী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে এক শ্রেণীর মানুষকে নির্বিচার হত্যাকান্ড ও বলপূর্বক সম্পদ দখলে বিশ্বাসী মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি সমাজে আর যাই হোক মানুষের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানব হিতৈষী ভ্রাতৃত্ববোধের দর্শন দাবি করে সমাজের বিত্তশালী অংশ কর্তৃক সমাজের দরিদ্রতর ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অংশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও শর্তহীন সেবা প্রদান। অপরদিকে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মতবাদ ডারউইন-এর শক্তিমানের বেঁচে থাকার অধিকার ভিত্তিক চিন্তাদর্শনে এ রকম ভ্রাতৃত্ববোধের আশা করাই অপ্রত্যাশিত [২]।

---

১. চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'On the Origin of Species' গ্রন্থে জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যদিও তাঁর স্কুলের বিদ্যা ছিলনা, তবুও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন কেন এত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও জন্তু আছে, কিভাবে তারা পৃথক হয়েছে এবং কেন তারা এক প্রকার নয়। তিনি 'ডিসেন্টস অব ম্যান নামক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর তত্ত্ব হচ্ছে প্রাণী প্রথমে জলজ পদার্থ বা জেলী ফিস থেকে উৎপত্তি হয়ে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জীব-জন্তু ও শেষে মানবে বিবর্তিত হয়েছে। যদিও তিনি সঠিক প্রমাণ দিতে পারেননি। তাঁর মতে বানর হচ্ছে মানবের সর্বনিকট প্রজাতি। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন', 'যোগ্যতমের টিকে থাকা', 'বাঁচার জন্যে সংগ্রাম' সূত্রের দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চান যে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের সামগ্রিক কার্যকারিতায় কোন প্রাণী বা প্রজাতি কেবল বেচে থাকেনা, তাদের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়। তাঁর এই জীববিদ্যার সূত্র সমাজ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে সেকালের পুঁজিপতিরা শ্রমিক শোষণের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেন। তারা বলেন, দরাদরি করে শ্রমিক তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেছে এবং শিল্পপতিরা যোগ্যতম বলে উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী। শীঘ্রই 'সোস্যাল ডারউইনিজম' বলে সমাজতান্ত্রিকরা এর কঠোর সমালোচনা করেন। গরীব শ্রমিকদের অর্থ নিরাপত্তার অভাবে দরদস্তুর করার সমতার অভাব ও ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রধান ভূমিকা প্রচার করে পুঁজিবাদের মতাদর্শ তারা খন্ডন করতে চেষ্টা করেন। (সূত্রঃ কামালউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩)

২. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রাগুক্ত পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

❑ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলুপ্তি

সমাজতন্ত্রের আর একটি মূলনীতি হল ব্যক্তিস্বাধীনতার অবসান ও বিলুপ্তি। মার্কস-এর মতানুসারে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক' মানব প্রকৃতি বলে কিছু নেই। ব্যক্তি মানুষ কোন স্বাধীন সত্তা নয়, বরং ইতিহাসের দাবার ছকের অসহায় গুটি মাত্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থসামাজিক ও বৈষয়িক স্বার্থের অনিবার্য সংঘাতই নিয়ন্ত্রণ করে মানব ভাগ্য[১]। এ মতবাদ মূলত অপরিবর্তনীয় ও স্থির এক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যহীন সাধারণ মানব চরিত্রের নির্দেশ করে[২]।যেহেতু ব্যক্তি মানুষের কোন মৌলিক প্রকৃতি নেই, তাই মানুষের চেতনা রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তন তার জীবনের বৈষয়িক অবস্থা তথা যে উৎপাদন-পদ্ধতির সমাজে তার অবস্থান তা দ্বারা নির্ণীত হয়[৩]। যদিও অর্থনীতিবিদ দার্শনিক নরম্যান গ্যারাস মানব চরিত্র সম্পর্কে মার্কস-এর উপস্থাপিত ও বহুল প্রচারিত ধারণার বিরোধিতা করেন[৪]। যা হোক, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিকে কথা বলার যন্ত্রের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় না। তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে; পরিবার, সমাজ কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক কর্মকান্ড সবই রাষ্ট্র-পার্টি নিয়ন্ত্রিত। যতটুকু স্বাধীনতা পার্টি অনুমোদন করবে তার বেশি চাওয়ার অধিকারও তার নেই। পার্টিই ঠিক করবে তার প্রতিটি আচরণ, তার কর্মক্ষেত্র, তার বিশ্বাস, এমনকি তার পরিবারও। এর ব্যাতায় ঘটলো কি না তার তদারকী ও খোজ খবর নেয়ার জন্য রয়েছে গোয়েন্দা বাহিনী[৫]। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনযন্ত্র উৎপাদন-উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। গণচাহিদা সেখানে মূল্য পেলেও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা থেকে যায়। এই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দ ও নির্বাচন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পঙ্গু করে দেয়। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ Oscar Lange বলেন,

"The real danger of socialism is that of a bureaucratization of economic life and not the impossibility of coping with the problem of allocation of resources."[৬]

❑ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান

মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক ধারণা হচ্ছে সম্পদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া বা alienation process[৭]। বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে শোষণের ফলে সমাজে এর উদ্ভব ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন-উপকরণের মালিক বিধায় প্রলেতারিয়েত (শিল্পশ্রমিক) শ্রেণী তাদের শ্রম বিক্রয় করে মজুরী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়[৮]।

---

১. ইসলামী দর্শন , ইফাবা গবেষণবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২. প্রাগুক্ত
৩. ড. এম. উমর চাপরা অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩
৫. ড. এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১
৬. Leslie Stevenson, *Seven Theories of Human Nature* (1974), p. 54
৭. Karl Marx, *Selected writings in S ocialogy and Social Philosophy*, অনু: T.B.Bottomore সম্পাদনা: T.B.Bottomore & M. Rubel (1963), p.67
৮. Norman Geras, *Marx and Human Nature: Refutation of Legend* (1983),p.112

Dhaka University Institutional Repository

তারা সকল উদ্বৃত্ত মূল্যে (Surplus Value) মুখ্য ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও তাদেরকে দেয়া হয় সর্বনিম্ন মজুরি যা তাদের কোন রকম বেঁচে থাকার ও নতুন শ্রমদাস প্রজননের চক্রে বেঁধে রাখে। তাই এ মতাদর্শের অন্যতম মূলনীতি বা ভিত্তি হল, এলিনেশন বা সম্পদ হস্তান্তর প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অবসানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, এর উৎস সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্য এবং তাদের রাজনৈতিক ও শোষণ-নিপীড়নমূলক ক্ষমতার বিলোপ ঘটবে। মার্কস মনে করেন, এই লক্ষ্যে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হচ্ছে প্রলেতারীয় শ্রেণী কর্তৃক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং উৎপাদন-উপায়-উপকরণ হতে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন। এ মতাদর্শ অনুযায়ী, প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুয়ায়ী প্রাপ্ত হবে-এই মৌলিক প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তিশীল নিখাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

❑ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি চরম নাস্তিক্যাবাদী ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি[১]। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ব্যতীত এর লক্ষ্য অর্জনের রণকৌশল হিসেবে যে পদ্ধতিগুলো স্থির করা হয়, তা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, উৎপাদন-উপকরণ সমূহের রাষ্ট্রীয়করণ, [২] ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান সহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন[৩]। ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত,তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদ (War communism), নতুন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা,[৪](New Economic policy) ইত্যাদি পরীক্ষামূলক স্তর অতিক্রম করার পর ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে (সাবেক) সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়[৬]।

এই পরিকল্পনার দার্শনিক উৎস মার্কসীয় ভাবধারায় বিদ্যমান যাতে বলা হয়েছে, মূলধন পুঞ্জিভূত হওয়ার এমন এক চূড়ান্ত পর্যায় আসবে যখন উৎপাদনশীল সংস্থাগুলো আকারে ক্রমেই বাড়তে থাকবে, এবং সংঘাতময় পরিণাম হবে একটি বিশাল দৈত্য-সারা অর্থনীতিটাই যখন একটি সংস্থায় রূপ নেবে। তখন তাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। এ অর্থব্যবস্থায় সমগ্র সমাজের জন্য কি পণ্য ও সেবা, কি পরিমাণ এবং কাদের জন্য উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শাসিত সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। উল্লেখ্য যে, এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ভাল ফলাফল বয়ে আনেনি[৭]।

---

১. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২. G.F. Stanlake, ibid, p.19
৩. প্রফেসর মনতোষ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬.
৪. ড. এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
৫. Karl Marx and Friedrich Engels, *Basic Writtings on Politics and Philosphy* সম্পাদনা: Lewis Feuer (1959), *The Communist Manifesto*,p.9
৬. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২
৭. G.F. Stanlake, ibid, p.19

Dhaka University Institutional Repository

❑ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা (Dictatorship of Proletariat)

শাসন-শোষণের নীড় ও শৃঙ্খল অভিধায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে মূল্যোৎপাটন করে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হল একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বে গড়ে উঠে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের (Dictatorship of Proletariat) অভ্যুদয় ঘটে। মার্কসীয় মতাদর্শে ক্ষমতার উৎস ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বিলোপের পর উৎপাদন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল ক্ষমতা পলিটব্যুরোর সদস্যদের হাতে ন্যস্ত হয়, যারা চাকরি প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদের আয়-বন্টন, পুরস্কার বা শাস্তি প্রদানসহ শ্রম শিবিরে প্রেরণের মতো সকল ক্ষমতার অধিকারী[১]। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে সেখানে চালু হয় একনায়কতন্ত্র। দেখা যায়, প্রকৃত গণতন্ত্র যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত করে, মানবাধিকার নিশ্চিত করে তা হয়ে পড়ে সুদূর পরাহত। সমাজতন্ত্রের প্রবর্তকরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়ে; 'জালিমশাহী নিপাত যাক' শ্লোগান দিয়ে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' আওয়াজ তুলে রক্তপাত, শঠতা ও ধূর্ততার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়[২]। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাদের নামে দখল করা ক্ষমতায় আর কেউ যেন অংশীদার হতে না পারে সেজন্য একদিকে যেমন চালু হয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্র তেমনি অন্যদিকে বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য চালানো হয় সাঁড়াশী অভিযান। পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্ট দেশে এর কোন ব্যতায় ঘটেনি[৩]। গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয় বরং গৃহযুদ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব-ই নয়। বলশেভিক বিপ্লবের নায়ক ভ.ই. লেনিনের উক্তি হল, "যদি বৈদেশিক যুদ্ধ নাও থাকে তাহলেও বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ -গৃহযুদ্ধ ছাড়া অচিন্ত্যনীয়"। তিনি আরও বলেন, "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কোনভাবেই এক ব্যক্তির একনায়কত্ব ও শাসনের সাথে অসামঞ্জস্য পূর্ণ নয়"। [৪]

❑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এসব মূলনীতির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ অর্থব্যবস্থার কতগুলো বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে পৃথক করে তাকে স্বতন্ত্র রূপরেখা প্রদান করেছে। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:[৫]

- ⇨ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা;
- ⇨ ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি;
- ⇨ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা;
- ⇨ ভোক্তার চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ;
- ⇨ শোষণহীন সমাজ গঠনের প্রত্যয়;

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
২. আনু মাহমুদ, '*বাজেট: পরিকল্পনা দারিদ্র বিমোচন*,' (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮ খ্রিঃ), পৃ.৯৫
৩. আনু মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৪. Jan Winiecki, *The Distorted World of Soviet-Type Economics,* (1988) Why Planned Economies Fail? The Economist, 25 June, 1988, P.69.
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

⇨ জাতীয় আয়ের সুষম বন্টনের প্রত্যয়;

⇨ মুনাফার অনুপস্থিতি;

⇨ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর এবং

⇨ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা;

ড. এম উমর চাপরার মতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ: [১]

⇨ জঙ্গি নাস্তিক্যবাদ;

⇨ অর্থনৈতিক নির্ণয়বাদ (Economic Determinism)

⇨ শ্রেণী সংগ্রামই মূলশক্তি;

⇨ এলিনেশন বা সম্পদের হস্তান্তর প্রক্রিয়াই বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরিতে সহায়তা করে বিধায় এর মূলোৎপাটন;

⇨ সমবায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তন;

⇨ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব;

⇨ আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি;

⇨ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ;

⇨ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতি;

⇨ দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সংযোগহীনতা;

⇨ মজুরীদাসত্বের অবসান;

⇨ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শ্রেণীহীন সমাজ;

⇨ মানুষের চরিত্র ও স্বভাবের গুরুত্বের অনুপস্থিতি;

❑ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা (Command Economy) এবং সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Laissez-Fair Economy) বর্তমানে বিশ্বের কোন দেশেই চালু নেই[২]। কমবেশি বিশ্বের সবদেশেই মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যেমন পরিকল্পিত অর্থনীতি বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি হবার অবকাশ রয়েছে। অনুরূপভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন (সাবেক) বা গণচীনের অর্থনীতিতেও অবাধ বাজার ব্যবস্থার ভূমিকা রয়েছে। মূলত: মিশ্র অর্থনীতি একটি আপেক্ষিক ধারণা বা প্রত্যয়। মিশ্র অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত[৩]।

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২
২. Marshal L.Goldman, USSR in crisis: *The Failure of an Economcs system* (1983), p. 2
৩. Mikhail Gorbachev, New Thinking for our country and the world. (1987)

Dhaka University Institutional Repository

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ এবং বেসরকারি উদ্যোগ পাশা পাশি বিরাজমান, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

আভিধানিক অর্থে মিশ্র অর্থনীতি হল," An economic system in a country in which some companies are owned by the state and some are private." [১]

আবার বলা হয়, "An economic system in which some industries are controlled privately and some by the Government".[২]

পল.এ. স্যামুয়েলসন মিশ্র অর্থনৈতির পরিচিতিতে বলেন, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে উৎপাদন ও ভোগ কর্ম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে থাকে [৩]।"

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন (সাবেক) এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বিদ্যমান নেই এবং অবাধ অর্থনীতিও প্রকৃত অর্থে পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিদ্যমান নেই। বরং বর্তমান বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে অর্থনীতিবিদ G.F.stanlake বলেন, "In the real world, there are no completely planned economics. In centrally planned economics such as those of USSR and the countries of Eastern Europe, we find some features of market economy, and some use is made of the price mechanism [৪]

তিনি আরও উল্লেখ করেন, "Similarly, there is no example of a completely free market economy. In all of the so called market economics in the real world, we find a great deal of state control of economic activity." [৫]

এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করে আরো উল্লেখ করেন, "It would be true to say, therefore, that to some extent, most real world economics are mixed economics. They have both a public and a private sector; some enterprises are owned by the state, while some are privately owned, but there are very important differences [৬]."

---

১. George Arbatov *Soviet Economic Reform: Challenge by the Radicals financil Times*, 2 May, 1990, p.17
২. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৪. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মিশ্র অর্থনীতির যে স্বরূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় তা হল, মিশ্র অর্থনীতি বলতে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়, যেখানে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটে। এই অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন সংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয়। অপর কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ ও বন্টন সরকারি নির্দেশমত পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ কার্যক্রমও বিরাজমান। এ অর্থব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রবণতা পরিলক্ষিত। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যবলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ মৌলিক শিল্প কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারি খাতে পরিচালনা করা হয়, যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ[১]।

❑ মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

⇨ সরকারি ও বেসরকারিখাতের সহঅবস্থান;

⇨ সরকারি নিয়ন্ত্রণ;

⇨ সরকারি বিনিয়োগ;

⇨ বেসরকারি বিনিয়োগ;

⇨ দাম নির্ধারণে বাজার-ব্যবস্থার প্রভাব;

⇨ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি খাত;

⇨ সম্পদের মালিকানা এবং

⇨ মুনাফার উপস্থিতি[২]।

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতি

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও অবাধ বিনিময় সম্পর্কের উপর যে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত তা হল বাজার অর্থনীতি। দাম ব্যবস্থার দ্বারা বিনিময় সম্পর্ক প্রভাবিত হয়। অবাধ বিনিময় সম্পর্ক বলতে কোনরূপ বিধি-নিষেধ ব্যতিরেকে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান বুঝায়। কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এসব মূল্য বা দাম ব্যবস্থা বাজার অর্থনীতির ভিত্তি। কাজেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে দাম ব্যবস্থার অধীনে অবাধ বিনিময় সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন, ভোগ, সম্পদ বন্টনসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ পরিচালিত হলে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাজার অর্থনীতি বলা হয় [৩]।

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২. *Lenin, Seleeted Works, Russian Edition, Vol.2, p.278*

৩. *Lenin, Collected Works, Vol. xvii, 1923 edition, p. 89.*

Dhaka University Institutional Repository

মূলত বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Laissez-Faire) ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বলা হয়, ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজ কর্মে সরকার কোন রকম হস্তক্ষেপ করে না, সেখানে অবাধ বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোগ ও উৎপাদন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ঘটে। বাজার অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যবহার ও বন্টন প্রক্রিয়া (Resource allocation) অবাধে পরিচালিত হয়[১]। বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য হাত (Invisible hand in market economy) সমগ্র সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং এভাবে ব্যক্তি ও সমাজে স্বার্থের মাঝে সমন্বয় সাধিত হবে[২]। মূল কথা হল, বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হবে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কোনরূপ সরকারি হস্তক্ষেপবিহীন। G.F.Stanlake বাজার এবং বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বলেন,

"Any arrangement which enables buyers to do business with sellers is described as a market. A market economy is one in which there is considerable freedom for people to buy what they want and sell what they produce[৩]."

বাজার অর্থনীতির দাম নির্ধারণ পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে তিনি আরও উল্লেখ করেন, "Prices are determined by the strength of peoples demand for goods and services. and the quantities which suppliers are prepared to offer for sale, that is, by the market forces of demand and supply [৪]."

বাজার অর্থনীতি কথাটির সাথে 'অদৃশ্য হাত' এবং 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামান। এ ব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। তাই এখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে দ্রব্যের চাহিদা প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া বাজার অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই উৎপাদনকারীগণ স্বাধীনভাবে মুনাফার উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাজার অর্থনীতির সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারীকরণ ধারণাটি জড়িত। বাজার অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য কি পরিমাণে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে এ সকল অর্থনৈতিক সমস্যা দাম বা মূল্য ব্যবস্থার অদৃশ্য হাতের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং বাজার অর্থনীতি হল সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ ছাড়া এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়[৫]।

---

১. *G. F. Stanlake, ibid, p.31*
২. *ড. এম. উমর চাপরা অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এবং সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯-৯৯*
৩. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৪. আনু মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

⇨ বাজার অর্থনীতি, অবাধ অর্থনীতি কিংবা মুক্তবাজার অর্থনীতি যা-ই বলা হোক না কেন, তা বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক দেশে প্রচলিত একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সকল অর্থব্যবস্থা থেকে পৃথক করেছে।

G.F.stanlake-এর মতে বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ:[১]

⇨ Private Property;

⇨ Freedom of choices;

⇨ Self interest;

⇨ The price mechanism (competition) and

⇨ A very limited role for government.

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় একজন মুসলিমের সমগ্র জীবন। অর্থনীতি যেহেতু সে জীবন ও কর্মকান্ডের অবিচ্ছেদ্য বৃহৎ অংশ, সেহেতু এ ক্ষেত্রেও তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস ও তার দাবী সমভাবে প্রযোজ্য। এ দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয় ইসলামী ব্যবস্থায় সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। গড়ে উঠে সমৃদ্ধ ও গতিশীল অর্থনীতি। তাই দেখা যায় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিন্তা-চেতনায় ও অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগে নীতি-নৈতিকতা ও শরী'আহ্র বিধি-বিধান অনুসরণের শর্তারোপ করে। বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অর্থব্যবস্থাগুলো ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর (Secularism and materialism world view) দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দু'য়ের বিপরীতে ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে মানব জীবনের পার্থিব (Materialistic) এবং আধ্যাত্মিক (Spiritual) উভয় প্রয়োজন পূরণের সুষম সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে সেটা-ই হল ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার সাথে সর্বোতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক। এ অর্থনীতি চিরন্তন মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি যা সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সমর্থ। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা আল্লাহ্ প্রদত্ত, রাসূল (সা:) প্রদর্শিত, আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত। সুতরাং বলা যেতে ইসলামী শরী'আহর নির্দেশনার আলোকে প্রাকৃতিক ও ভৌত সম্পদ মানবজাতিসহ সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে পরিপূর্ণ ব্যবহার ও বন্টনের বিধি-বিধানগুলো যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তা-ই ইসলামী অর্থনীতি।

---

১. G. F. Stanlake, ibid, p. 110

Dhaka University Institutional Repository

এই দার্শনিক ভিত্তি ভূমিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ের কয়েকজন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির সুসংবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য পরিচিতি প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে সহায়ক, এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

⇨ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান তুসী (১২০১-১২৭৪ খ্রি.) ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি দিয়ে বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও জনকল্যাণের বিজ্ঞান[১]।"

⇨ ইব্ন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি হল সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন ও সুষ্ঠুতম বন্টন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা[২]।"

⇨ আধুনিক বিশ্বে সমাজ বিজ্ঞানের জনক হিসেবে স্বীকৃত তিউনিসিয়ার বিশ্ববিখ্যাত আরব মনীষী ইবন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬খ্রি.) তাঁর অমরকীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমায়' ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতিতে বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান[৩]।"

⇨ অর্থনীতিবিদ আউসফ আহমদ (১৯৮৮ খ্রি.)-এর মতে, "ইসলামী অর্থনীতি বলতে আমরা ঐ অর্থনীতির তাত্ত্বিক গঠনকে বুঝে থাকি যা ইসলামী শরী'আহ্‌র আইন মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে এবং যেখানে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যক্তির কার্যপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও আচরণ নির্দেশিত হয়ে থাকে কুর'আন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক[৪]।"

⇨ মুহাম্মদ প্রিন্স আল-ফয়সাল আল সউদ-এর মতে, "ইসলামী অর্থনীতি হল এমন এক বিজ্ঞান যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নীতিমালার আওতায় মানুষ তার পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর জন্য সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণ এমনভাবে ব্যবহার করে থাকে যাতে সর্বাধিক সমতা আনয়ন করে[৫]।"

⇨ আবদুল্লাহ্ মুহসিন আত্তারিকী-এর মতে,
"যে বিদ্যা অর্জন করলে সম্পদ উপার্জন ও তা ব্যয় এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে শরী'আহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে[৬]।"

⇨ ড. মন্‌যের কাফ-এর মতে, "ইসলামী আইন, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান, ভূখন্ডের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সে সমাজে ইসলামী জীবনধারা ও ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও অর্থনীতি প্রয়োগের প্রক্রিয়া ও পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নামই ইসলামী অর্থনীতি[৭]।"

---

১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান তুসী, আখলাকে নাসিরী, পৃ. ৭, (উদ্ধৃত: এস এ মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ইসলামী ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রি.)
২. প্রাগুক্ত
৪. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৫. Ibn Khaldun, ibid, p. 23
৬. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭. প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সাল আল-সউদ, *ইসলামী ব্যাংকিং: এক সাফল্যতম অগ্রযাত্রা শীর্ষক প্রবন্ধ*, ইসলামীক ফিউচার, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ. ৮

⇨ ড. এম. এ. মান্নান-এর মতে,

"Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam [১]."

⇨ ড. এম. উমর চাপরা ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন,

"Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human welbeing through an allocation and distribution of scarce resources that is inconformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomics and ecological imbalances [২]."

⇨ ড. এম নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী-এর মতে,

"Islamic economics is the muslim thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the sunnah as well as by reason and experience [৩]."

466245

⇨ ড. এস.এম. হাসান উজ্জামান-এর মতে,

"Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the sharia'h that prevent justice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society [৪]."

⇨ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি প্রদান করে বলেন, "Islamic economics represents a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from a lslamic perspective [৫]."

⇨ মুহাম্মদ আবদুল হামিদ-এর মতে ইসলামী অর্থনীতি হল,

" ইসলামী বিদ্যার সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবা-সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে[৬]।

⇨ ড. সাবাহ জাইম-এর মতে,

"সমাজ বিজ্ঞানের যে গুরুত্বপূর্ণ শাখায় সুসংবদ্ধভাবে মানুষের চাহিদা পূরণে অর্থনৈতিক সমস্যার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণ করে। অপর কথায় শরী'আহ্ভিত্তিক সুষম উৎপাদন, বন্টন, ভোগ ও ব্যয় ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করে এবং বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা ও অর্থনৈতিক অবদান রাখে, তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে [৭]।"

---

১. আবুল কাতাহ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ*, (ঢাকা: কাওমী পাবলিকেশণ ২০০৩ খ্রিঃ) পৃ. ১-এ উদ্ধৃত

২. আবুর কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪. Mahammad Abdul Mannan, *Islamic Economics*: *Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy. 1986 A.D), p.18.

৫. M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*? (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank 1996 A.D), p.33

৬. M. Nejatullah Siddiqui, ibid, p. 69

৭. S. M. Hasanuzzaman, *Definition of Islamic Economics* (Jeddah: Journal of Research in Islamic Economics, Winter. 1984 A.D), p. 52

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

⇨ এম আকরাম খান-এর মতে,

"পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শরী'আহ ভিত্তিক সামষ্টিক ও জাতীয় সম্পদকে সৃষ্টি ও মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান-ই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি [১]।"

⇨ এ.জেড.এম শামসুল আলম-এর মতে,

"সৃষ্ট জীবের কল্যাণে সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু ও সুবিচারভিত্তিক বন্টন, ন্যায়সংগত ভোগ-বিলাস সম্পর্কীয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কীয় শাস্ত্র ও সমাজ-বিজ্ঞান-ই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি বিজ্ঞান [২]।"

⇨ এস,এম আবুল কালাম ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বলেন,

"মুসলিম উম্মাহ সামষ্টিক ও দৈনন্দিন জীবনাচার, আয়-ব্যয়, উৎপাদন, বন্টন-পদ্ধতি ও ভোগ সম্পর্কীয় সমাজ বিজ্ঞানের সে শাখা-ই ইসলামী অর্থনীতি যা ইসলামী শরী'আহর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কান্ডকে পর্যালোচনা করে [৩]।"

⇨ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান-এর মতে,

"ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বুঝায় যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল ইসলামী আক্বীদাহ্ মুতাবিক-ই নির্ধারিত হয় [৪]।"

⇨ হিফজুর রহমান ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি ও উৎসের উপর আলোকপাত করে এর স্বরূপ তুলে ধরেন। তাঁর মতে, "ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। তাতে অর্থনীতি বিদ্যার প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্মীয় ও যৌক্তিক সকল কল্যাণকর বিষয় নিহিত রয়েছে। এমনকি এই ব্যবস্থা তার চাইতেও অনেক বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী এবং অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি থেকে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। বলা চলে, এটা সে সব ব্যবস্থার বিষাক্ত প্রভাবের নজিরবিহীন প্রতিষেধক। সকল সৌন্দর্য ও গুণাবলী ছাড়াও এই ব্যবস্থার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মানুষের মস্তিষ্কের গড়া নয়। আর মানুষের গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশোধ কিংবা শ্রেণীগত বিদ্বেষের মত অপরিপক্ক বিষয়। বস্তুত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার গড়া ব্যবস্থা [৫]।

---

১. Khurshid Ahmed, *Nature and Significance of Islamic Economics in Ausaf Ahmed & K. R. Awan lectures on Islamic Economics;* Jeddah, IRTI, 1992 A.D), p.19

২. এস. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ* অনু: শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ১৯।

৩. আবুর কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪. হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোতে ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ ও প্রকৃতিকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যক্ত করেছেন। বর্ণিত পরিচিতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইব্‌নে খালদুন, মুহাম্মদ ইবন হাসান তুসী, ইব্‌ন তাইমিয়া তাঁদের প্রদত্ত পরিচিতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও জনকল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মানব আচরণ কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত হবে তার কোন দিক নির্দেশনার প্রতি আলোকপাত করা হয়নি। প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফয়সাল, আউসফ আহম্মদ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে শরীআহ মোতাবেক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন যাতে করে উৎপাদন বন্টন বিনিময় ও মানুষের পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর বিষয়ে সর্বাধিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। অপরদিকে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী, ড.এম.এ. মান্নান, ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. আবদুল্লাহ্ মুহসিন আত্ তারিকী, এস.এম, আবুল কালাম, ড. এম.ওমর চাপরা প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত পরিচিতিতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে তা হল; সমগ্র সম্পদ-সম্পত্তি, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ, সমুদয় বিনিয়োগসহ সকল কিছু শরী'আহভিত্তিক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। যাতে করে সর্বোচ্চ ন্যায়-নীতিভিত্তিক সুবিচারপূর্ণ পন্থায় কল্যাণ অর্জন করা যায়।

সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির একটি পূর্ণ পরিচিতি প্রদান করে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র সম্পদ-সম্পত্তিকে মানব ও সৃষ্টির কল্যাণে সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বন্টন, ব্যক্তি ও সমষ্টির অভাব ও চাহিদা পূরণ, যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ, অর্থ-সম্পদের উৎপাদন, বন্টন, আদান-প্রদান, বিনিময়, সমুদয় বিনিয়োগ, আমদানি-রফতানিসহ সকল কিছুর ইনসাফপূর্ণ ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালনার সামষ্টিক প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞান-ই 'ইসলামী অর্থনীতি'। ইসলামী অর্থনীতি-ই হচ্ছে বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য একমাত্র সুবিচারপূর্ণ, ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি। সমগ্র বিশ্ববাসীর পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালের মুক্তি একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি

এ পর্যন্ত আলোচিত ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি থেকে এর প্রকৃতি, ধরন, বিষয়বস্তু, পরিধি ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অর্থনীতির পরিধি বা বিষয় বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে। ইসলামী অর্থনীতি অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের মতই মানব জীবনের আচরণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও কার্যাবলি যতটা সম্প্রসারিত হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু ও পরিধি ততটা বিস্তৃতি ও পরিব্যপ্ততা লাভ করছে। বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সদৃঢ় হচ্ছে, পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী একটি 'Global Economy গড়ে উঠছে। এ পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু, পরিধি ও আলোচ্য বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ [১]

---

১. এ জেড এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৯৫
শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-৩৭
ড. এম. উমর চাপরা, অনু ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬-২৫৮
মাওলানা মুহাম্মদ আবুদর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-৩০০
বর্ণিত গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির আলোচনা;

⇨ নৈতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিশ্লেষণ;

⇨ উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক দিক নির্দেশনা প্রদান;

⇨ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধন;

⇨ প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা নিরপেক্ষ বিজ্ঞান নয়।

⇨ সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন;

⇨ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিধি ও বিষয়বস্তু হল:

ক. অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

খ. জনস্বার্থে সরকারি আয়-ব্যয় পর্যালোচনা;

গ. মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবারের মূলোৎপাটন এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সংগত হস্তক্ষেপ;

ঘ. বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনসহ সেবার ও দ্রব্য-সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ;

ঙ. ন্যায্য শ্রমনীতি ও শ্রম আইনের বাস্তবায়ন;

চ. সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ ও সবার জন্য ন্যায়সংগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন;

জ. রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ;

ঝ. পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

ঞ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;

ট. বৈদেশিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং

ঠ. মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে তোলা।

এছাড়াও ইসলামী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা নিম্নরূপ:-[১]

⇨ নৈতিক স্বচ্ছলতার প্রচলন;

⇨ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান;

⇨ ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামোর মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনপূরণকে উদারীকরণ ;

⇨ সরকারী অর্থায়নে সংস্কার সাধন;

⇨ সরকারি ব্যয়ের নীতিমালার অনুসরণ পূর্বক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান;

---

১. এ জেড এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৯৫
শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-৩৭
ড. এম. উমর চাপরা, অনু ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬-২৫৮
মাওলানা মুহাম্মদ আবুদর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-৩০০
বর্ণিত গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ দূর্নীতি, অদক্ষতা এবং অপচয়রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

⇨ সরকারি খাতের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

⇨ প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়ে প্রয়োজনবোধে অগ্রাধিকার প্রদান;

⇨ কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধন;

⇨ বাজেট ঘাটতি মোকাবেলাকরণ;

⇨ পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;

⇨ রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

⇨ মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রা অবমূল্যায়ন যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা;

⇨ ট্যারিফসহ আমদানি-রফতানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ;

⇨ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন;

⇨ বৈদেশিক পুঁজির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ;

⇨ বেকার সমস্যা দুরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

⇨ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন;

⇨ কৌশলগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রযোজ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

⇨ মুসলিম উম্মাহ্‌র অর্থনৈতিক সংহতি অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিষয়াবলীও ইসলামী অর্থব্যবস্থার আওতাভূক্ত এবং আলোচনার বিষয়বস্তু [১]।

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি

ইসলাম একটি সাধারণ সহজবোধ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য সার্বজনীন বিশ্বাসের নাম। ইসলামের বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল শরী'আহ উদ্দেশ্য এর সাথে সংগতিপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হল:[২] ক. তাওহীদ (একত্ববাদ), খ.খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব) এবং গ. আদল (ন্যায়বিচার)

---

১. এ জেড এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৯৫
শাহ্‌ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-৩৭
ড. এম. উমর চাপরা, অনু ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬-২৫৮
মাওলানা মুহাম্মদ আবুদর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-৩০০
বর্ণিত গ্রন্থসমূহ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. ইবন আল-কাইয়্যেম আল-জাওজিয়াহ, I'lm al-Muwaqqi'in (1955), খ.৩, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ক. তাওহীদ

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব ও একতা) আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর এ ধারণার উপরই গড়ে উঠেছে সামগ্রিক বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল [১]। ইসলামের অন্য সবকিছু এর থেকে উৎসারিত [২]। এর অর্থ হচ্ছে, একটি সর্বশক্তিমান সত্তা যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এ মহাবিশ্বকে সচেতনভাবে পরিকল্পনাভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন এবং হঠাৎ করে বা দূর্ঘটনা বশতঃ সৃষ্টি হয়নি[৩]। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যই এ বিশ্বের অস্তিত্বের অর্থও গুরুত্ব বহন করে [৪]। মানুষ তারই একটি অংশ তবে মানুষ আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, একক মালিক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক আল্লাহ্ তা'আলা অবসর গ্রহণ করেননি। বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ও খোঁজ রাখেন [৫]।

'তাওহীদ'-এর মর্ম হল 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য' এর অর্থ এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কেউ 'ইবাদাতের বা আনুগত্যের যোগ্য মা'বুদ নেই। কালিমা তাইয়্যেবা বা কালিমা তাওহীদ লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর অর্থও তাই। আল্লাহ্র কোন শরীক নেই। অস্তিত্বের দিক দিয়ে অন্য কেও আল্লাহ্র অংশীদার নেই, আর উপাসনার দিক দিয়েও কেও তার ইবাদতে শরীক নেই [৬]।

খ. খিলাফাত

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হবার কারণেই মানুষের মর্যাদা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই তার অধীন এবং তার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ও তার সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহর নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় তা থেকে সে সেবা লাভ করার ও উপকার ভোগ করার অধিকারী। এ বিষয়টি আল-কুরআনের একাধিক ঘোষণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সাব্যস্ত [৭]। আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'খলীফা' পরিভাষাটির ধারণা অনুসারে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বাসের এক নির্ভরযোগ্য আমানতদার। প্রতিনিধি মনোনীত করে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়েছে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে কার্যকরভাবে পালন করতে পারে, সে জন্য তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। বস্তুগত সম্পদে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের মূল্যায়নে সে উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করবে এবং তার পরকালের অনন্তজীবনের ভাগ্যও নির্ধারণ করা হবে [৮]।

---

১. ড. উমর চাপরা, অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
২. রাগিব আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৩. প্রাগুক্ত
৪. আল-কুরআন, ২:৩০, ৬:১১৫, ১০:১৪, ২৪:৫৫, ৩৫:৩৯, ৩৮:২৬, এবং ৫৭:৭
৫. আল-কুরআন ২:৩৯
৬. Muhammad Abu Zahra, *Al-Mujtama al-Insani fi Zill al-Islam,* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.) p.p. 167-170
৭. আল-কুরআন ১৫:২৯, ৩০:৩০ এবং ৯৫:৪
৮. ড. উমর চাপরা, অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে খলীফা পোপের (সৃষ্টের প্রতিভূ) মত নন। তিনি শরী'আহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর ঘোষণা শরী'আহ বিধৃত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। প্রজা সাধারণের মধ্যে নিজ ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা খলিফার নেই[১]। 'খলিফা' বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা করলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করে সঠিক বা ভুল এবং ন্যায় বা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা মানুষের জীবনের সার্বিক অবস্থা, তার সমাজ বা ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে সে ভালো এবং মহৎ[২]। মানুষ যদি যথার্থ শিক্ষা, অনুকূল পরিবেশ ও সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হয় এবং যথার্থ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে নিজের গুণাবলী ও মহত্ব বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সক্ষম হবে[৩]।

'খিলাফাত' (প্রতিনিধিত্ব) সম্পর্কিত আলোচনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। তা হলোঃ

এক. মানুষের মর্যাদা হচ্ছে 'খিলাফাতের' বা প্রতিনিধিত্বের; সার্বভৌমত্বের নয়। কোনো রাষ্ট্র যদি স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমই চূড়ান্ত ও অকাট্য বিধান, তাহলে শাসন বিভাগ এর পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবে না। আইন পরিষদ এর পরিপন্থী কোনো বিধান রচনা করতে পারবে না এবং তার বিচার বিভাগও এর পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারবে না, তা হলেই এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে আল্লাহর বিপরীতে সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব থেকে বিরত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় মূলত আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধির মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে[৪]।

দুই. খিলাফাতের (প্রতিনিধিত্বের) বাহক কোনো ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা শ্রেণী হবে না, বরং সকল ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি [৫]। কিন্তু যেহেতু সাধারণ মানুষ সকলেই একত্রে ও একই সাথে খিলাফাতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পরিচালনার যোগ্য হয় না এবং পৃথকভাবে ও প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কার্য সমাধা করতে পারে না। সে জন্য খিলাফাত পরিচালনার দায়িত্ব সবার পক্ষ থেকে নির্বাচিত খলিফাদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়। খিলাফাতে-ইলাহিয়্যাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা ইসলমী রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন একজন নির্বাচিত আমীর। তিনি জনগণের পক্ষে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক হবেন। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করবেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন [৬]।

---

১. আল-কুরআন, ১১:৬
২. আল-কুরআন ১৭:৭০
৩. আল-কুরআন, ৩:১৯০, ১৯১ এবং ১৯২
৪. আল-কুরআন, ৫১:৫৬
৫. M. Fazlur Rahman Ansari, '*The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society* (1932) Vol.2 p. 25
৬. আল-কুরআন, ৪:৫৫, ৪:১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় খিলাফাতের ধারণা

আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বকে অফুরন্ত ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ রয়েছে। মানুষ সহ এ পৃথিবীর সকল সৃষ্ট প্রাণীকুলের জীবিকার ব্যবস্থা তিনি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন[১]। পৃথিবীর এ ধন-সম্পদ দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবহার করলে সকল মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ঠ। এ সব সম্পদ কি ভাবে ব্যবহৃত হবে একজন মানুষ তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারতো। তবে যেহেতু এ পৃথিবীতে সেই একমাত্র খলীফা নয় বরং কোটি কোটি মানব সন্তান যারা তারই মতো খলীফা এবং তার ভাই-ও তার সমান, সেহেতু তার সত্যিকারের পরীক্ষা সকল মানুষের কল্যাণে (ফালাহ) আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের সুষম, দক্ষ, সমতাভিত্তিক ও ন্যায়ানুগ ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত। এটা করা তখনই সম্ভব হয়, যখন তা করা হয় খিলাফাতের দায়িত্ববোধের চেতনায় ও মাকাসিদ আল-শরী'আহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞার আলোকে।

খিলাফাতের (প্রতিনিধিত্বের) ধারণা বিশ্বে মানব সত্তাকে একটি সম্মনজনক ও মহিমান্বিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে [২] এবং মানব-মানবীর জীবনকে একটি অর্থ ও লক্ষ্য প্রদান করেছে। এ অর্থ একটি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কে বৃথা নয় বরং একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে [৩]। মানব জীবনের ব্রত হচ্ছে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ঐশী পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামী মতে 'ইবাদাত উপাসনা বলতে এটি-ই বুঝানো হয়েছে [৪]। যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব পালন (হাক্কুল ইবাদ), একে অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করা, শরী'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপদান করা। উল্লেখ্য যে, ইসলাম অধিকারের চেয়ে দায়িত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে [৫]। এর মৌলিক যুক্তি হলো, যদি প্রত্যেকে দায়িত্ব পালন করে, তবে প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অর্জিত হবে এবং সকলের অধিকার নি:সন্দেহে সুরক্ষিত থাকবে।

খিলাফাতের যে ধারণা বর্ণিত হয়েছে তার বেশকিছু সংশ্লেষ ও অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে সেগুলো হল: ক. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব; খ. সম্পদ একটি আমানত; গ. সাদাসিদে জীবন পদ্ধতি এবং ঘ. মানবস্বাধীনতা। বর্ণিত অনুসিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে খিলাফাত-এর দায়িত্ব পালন অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে[৬]।

---

১. আল-কুরআন, ৩৮:২৪
২. আল-কুরআন, ৫৭:২৫
৩. আল-কুরআন, ২:২৪
৪. আবদুল মতিন রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❑ আদল/আদালাহ্ (ন্যায়বিচার)

'আদল'বা 'আদালাহ্' অর্থ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফপূর্ণ সমাধান। এটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিশেষত ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি। ইসলাম সমাজের ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক পর্যায়ের পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুমিন-মুসলিমদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপোষহীন হতে বলা হয়েছে। যদি তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও হয়[১]। বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা ধর্মপরায়ণতার পরেই ন্যায়পরায়ণতার স্থান[২]। নবী রাসূলগণ আগমন করেছেন যাতে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারে[৩]। সত্য ও আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় এবং তাঁর নির্দেশিত পথে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) নির্দেশিত হয়েছিলেন [৪]। অধিকাংশ তাফছীরকার 'সত্য' ও 'আল্লাহর পথ' দু'টি শব্দ দ্বারা 'ন্যায় পরায়ণতা' ও 'সুবিচার' বুঝিয়েছেন [৫]।

ব্যক্তিমানুষ কর্তৃক সৎ কাজের দায়িত্ব পালন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ; বিদ্রোহ, অবিচার, লজ্জাকর ও গর্হিত কাজ পরিহার, অসৎ ইচ্ছা বা বিদ্বেষের বলে অন্যের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়ে আল-কুরআন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। শুধুমাত্র দূর্বল ও নিপীড়িতদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশই দেয়নি বরং সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআন ব্যক্তি মানুষের মাঝে এমন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ দাবী করে যে, সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একটি ন্যায়পরায়ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো; এমন সব ন্যায়বান ও দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়, যারা ন্যায়পরতা ও দক্ষতার সাথে রাজনীতি পরিচালনাসহ সকল সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ন্যায় পরায়ণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে বন্টন ও বিন্যস্ত করবে ।

মূলত, তাওহীদ ও খিলাফাতের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভ্রাতৃত্বের (মুয়াখাত) সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার না থাকলে তা একটি অন্তঃসার শূন্য ধারণায় পর্যবসিত হবে[৬]। ন্যায়বিচারকে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ মাকসিদ আল-শরী'আহ্‌র প্রশ্নাতীতভাবে অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তারা এতোই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ন্যায়বিচারহীন কোনো সমাজকে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ হিসেবে কল্পনা করা-ই অসম্ভব। মানব সমাজ থেকে সকল প্রকার জুলম নির্মূল করার জন্য ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় জুলুমকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর সাহায্যেই একজন ব্যক্তি অন্য সকলকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অথবা তাদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে [৭]।

---

১. Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam* (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah 1964 A.D), pp.128-155
২. Dr. M. Umar Chapra, *Towards Just a Monetary System* (1985), PP 27-8
৩. Majid Khadduri, *The Islamic Conception of justice* (1985), p. 10
৪. Imam Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (1967), p. 94, *Sahih al-Muslim* (1955), Vol. 4, P. 1996:56
৫. ibid
৬. আল-কুরআন, ১৬:১৭
৭. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল সহীহ্ আল-বুখারী, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, *আল-আদাব আল-মুফরাদ* (১৩৭৯ হিঃ), পৃ. ৫২:১১২

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে কম হলেও প্রায় শতাধিক স্থানে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও প্রত্যক্ষভাবে 'আদল', ক্বিশ্‌ত, ও মীজান-এর মতো শব্দ দ্বারা অথবা বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ বর্ণনা ভঙ্গির সাহায্যে। এছাড়া, 'জুল্‌ম', ইছ্‌ম, 'দালাল' বা অন্যান্য শব্দের মতো শব্দসমষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আল-কুরআনে দুই শতাধিক স্থানে তিরস্কার করা হয়েছে [১]। বিশ্বনবী (সা) ন্যায় বিচারের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "অবিচার থেকে সতর্ক হও, কারণ শেষ বিচারের দিনে তা গহীন অন্ধকারে নিয়ে যাবে" [২]। ইব্‌ন তাইমিয়া এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে,

"অবিশ্বাসী হলেও আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন এবং বিশ্বাসী হলেও অন্যায় আচরণকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন না এবং বিশ্ব অবিশ্বাস ও ন্যায় বিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম অবিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে না [৩]"। ইসলাম ও অবিচার পরস্পর বিরোধী এবং যে কোনো একটির দূর্বল বা নির্মূল হওয়া ছাড়া একসঙ্গে চলতে পারে না। ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের দৃঢ় অঙ্গীকারের দাবি হচ্ছে, মানবতার নিকট গচ্ছিত আল্লাহর পবিত্র আমানত সকল সম্পদকে মাকসিদ আল-শরী'আহ্‌র লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে। 'তাওহীদ', 'খিলাফত' ও 'আদল' সম্পর্কিত আলোচনার কাঠামোর মধ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থার চারটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছেঃ ক. চাহিদা; খ. আয়ের সম্মানজনক উৎস; গ. সম্পদ ও আয়ের ন্যায়ভিত্তিক বন্টন এবং ঘ. প্রবৃদ্ধি ও স্থিতি।

ক. চাহিদা পূরণ

ভ্রাতৃত্বের মৌলিক সংশ্লেষ বা অনুসিদ্ধান্ত এবং সম্পদের 'আমানত' প্রকৃতির বিষয়টি হচ্ছে, সম্পদ প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং প্রত্যেককে সম্মানজনক ও মানবিক মানের জীবন ধারণের নিশ্চয়তা দিতে হবে, আর তা হতে হবে স্রষ্টার খলিফা হওয়ার কারণে মানুষের সহজাত মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ [৪]। মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বিশ্বনবী (সা) বলেছেন, 'সে লোক ঈমানদার নয়, যে পেট ভরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী অভূক্ত থাকে [৫]।" যেহেতু সম্পদ তুলনামূলক ভাবে সীমিত তাই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতা ও সাধারণ কল্যাণের সীমানার মধ্যে সম্পদের উপর দাবি করা না হয় [৬]।

চাহিদা পূরণ অবশ্যই এমনভাবে হতে হবে, যাতে জীবন ধারণ খুব সাদাসিদে প্রকৃতির হয় এবং আরাম আয়েশ থাকলে তা যেন অপচয় ও দাম্ভিকতার পর্যায়ে যেতে না পারে। ইসলামে এ ধরনের অপচয় নিষিদ্ধ। ইসলামে চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে, ফিকাহ ও ইসলামী সাহিত্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফকীহ্‌বৃন্দ সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, গরীবদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ মুসলিম সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব (ফারদ কিফায়া) [৭]।

---

১. Joseph Schumpeter, quoted by W. Brus, *Journal of Comperative Economics*. (1980) Vol. 4. P. 53
২. Abu Muhammad Ali Ibn Hazm, *Al-Muhalla* Vol, 6 p. 156:725
৩. Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-shariah* vol. 2. 177
৪. M.N. Siddiqui, *Guarantee of a Minimum level of living in and Islamic State* (1988) pp.251-303
৫. আল-কুরআন, ১৬:৯০
৬. আল-কুরআন, ৩১:২০
৭. আল্লামা ইয়যুদ্দীন বালীক (রহ), অনুঃ হাফিস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

খ. সম্মানজনক উপার্জনের উৎস

ইসলাম জনকল্যাণের জন্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, সুষম বন্টন ও অর্থনীতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় [১]। বিশ্বজগতে বিদ্যমান সম্পদ ভান্ডার ও তার উৎসসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা এবং তা উত্তোলনে শক্তি নিয়োগ করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই বিশ্বের সবকিছু মানুষের বশীভূত ও সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে যাতে মানুষ তা দিয়ে কল্যাণ ও উপকার লাভ করতে পারে [২]। আল্লাহর খলীফা ও নবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী প্রতিটি সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীতে এমন অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যাতে পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদকে উপভোগ করতে পারে। খলীফার পদবীর সঙ্গে যে মর্যাদা ও সম্মান যুক্ত করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, চাহিদা অবশ্যই প্রত্যেকের নিজের চেষ্টায় হতে হবে। ব্যক্তি যেই হোক না কেন এবং যে কোন স্তরের নাগরিক হোক না কেন উৎপাদন ও উপার্জনে তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সে ক্ষেত্রে ইসলাম তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, তার জীবন ধারণ ও আরাম-বিনোদনের নিরাপত্তা প্রদান করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে [৩]।

গ. আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টন

চাহিদা পূরণ সত্বেও আয় ও সম্পদের চরম বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। একটি মুসলিম সমাজে তখন বৈষম্য মেনে নেয়া যায়, যখন তা প্রথমত কম বেশি দক্ষতা, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও ঝুঁকির অনুপাতে হয়ে থাকে। যে খানে ইসলামী শিক্ষাসমূহ আন্তরিকভাবে অনুসৃত হয়, সেই সমাজে এগুলো সাধারণভাবে বন্টিত হতে বাধ্য। চরম বা খুব বড় ধরনের বৈষম্য ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ইসলামী শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হয় যে, সম্পদ কেবল সমগ্র মানব সত্তার জন্য আল্লাহর দানই নয়[৪], তা একটি আমানতও বটে [৫]। সুতরাং গুটি কতক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকার কোন কারণ ও সুযোগ নেই। বৈষম্য দুরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর কর্মসূচী না থাকলে ইসলামের কাঙ্খিত ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি তরান্বিত করার পরিবর্তে ধ্বংসই এনে দেবে। অতএব, ইসলাম মূলত সম্মানজনক উপার্জনের উৎসের মধ্যে প্রত্যেকের চাহিদা-ই পূরণ করতে চায়না, বরং উপার্জন ও সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বন্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। আল-কুরআনের ঘোষণা, "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়[৬]"। ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ বিষয়টিকে ইসলামে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, মুসলিম সমাজে সম্পদের সমতা অপরিহার্য [৭]।

১. আল-কুরআন, ২:১৯
২. আল-কুরআন, ৫৭:৭
৩. আল-কুরআন ৫৯:৭
৪. আল-কুরআন, ৪:৫৫, ৪:১৩৫
৫. মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
৬. প্রাগুক্ত
৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. প্রবৃদ্ধি ও স্থিতি

মুসলিম উম্মাহর পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে লভ্য সম্পদ ব্যবহার না করে চাহিদা পূরণ ও উচ্চ আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুক্তিসংগত উচ্চহার অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি সম্পদ ও উপার্জনের ন্যায়ভিত্তিক বন্টনের লক্ষ্য বিত্তবান লোকদের পক্ষে আরো দ্রুত ও কম মূল্যে অর্জন করা সম্ভব, যদি উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং গরীব লোকেরা আনুপাতিক হারে সেই প্রবৃদ্ধির বৃহদাংশের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়[১]। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য, মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্য ও বিনিময় হারের অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশা ও বৈষম্য হ্রাস করে। অতএব একটি মুসলিম সমাজ যা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্যারেটো অপটিমালিটির ধারণার উপর নির্ভরশীল নয় এবং শুধু নিজের প্রয়োজনেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয় না, সেখানে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সর্বনিম্নে রাখার জন্য 'খিলাফাত' ও 'আদাল'-এর দাবি পূরণ করা প্রয়োজন[২]।

---

১. Dr. M. Umar Chapra, *Towards Just a Monetary System* (1985), pp 27-8
২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে মানবরচিত অর্থনৈতিক মতাদর্শ ও মতবাদসমূহ প্রচলিত রয়েছে। এসব মতবাদে বিশ্বাসী লেখক গবেষক ও অর্থনীতিবিদদের চিন্তার ফসল হিসাবে আধুনিক অর্থনীতির সুসংহত চিন্তাধারা, সুবিন্যস্ত কর্মপদ্ধতি ও বিশেষ বিশেষ শিরোনামে অর্থনীতির বিষয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থা রচিত হয়েছে। এতে করে আধুনিক অর্থনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের মত ইসলামী অর্থনীতির পৃথক কোন স্বতন্ত্র ও সুবিন্যস্ত রূপ নেই[১]। আধুনিক অর্থনীতির মত ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অনুরূপ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দৃষ্টিগোচর না হবার কারণ হল, বর্তমান যুগে প্রথমেই 'অর্থনীতি' নাম দিয়ে একটি শিরোনামের অধীন এক বা একাধিক বিশেষ চিন্তাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অত:পর বিভিন্ন অধ্যায়ে উক্ত চিন্তাধারার দার্শনিক ও ব্যবহারিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে একেকটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে যত প্রকারের অর্থনৈতিক মতবাদ ও মতাদর্শ রয়েছে, সবই মানুষের আবিস্কৃত বা গড়া এ সবের ভিত্তি এমন একটি দর্শন যাতে ধর্মীয় চেতনা, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা করা হয়েছে কিংবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর বিরোধিতা করা হয়েছে এবং এই বিরোধিতাকে দার্শনিক ভিত্তি দেয়ারও প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে [২]।

পক্ষান্তরে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক ও চিরন্তন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সে দর্শনের নাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। ইসলাম একটি সার্বজনীন বিপ্লবের আহ্বায়ক। যা মানবজাতির শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিরই দাবী করে না, বরং ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক তথা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার কল্যাণ ও সঠিক পথ প্রদর্শনের পতাকাবাহী, ধ্রুবতারা বা আলোকবর্তিকা। ইসলাম একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তাই সবকিছুর জন্য সমষ্টিগতভাবে এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে চিরন্তন ও শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা ইসলামী শরীআহ্-তে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। শরী'আহর মূল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে এসব কিছু সন্নিবেশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর মতে, "কুরআন সুন্নাহ্র এই সামষ্টিকতা ও সামগ্রিকতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কুরআন সুন্নাহ্ পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য বিধান উপস্থাপিত করেছে মানুষের জন্য। মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ইউনিট। মানুষের দেহ যেমন অবিচ্ছিন্ন। তার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে এক একটি অঙ্গকে আলাদা-আলাদা করে যেমন তার প্রতিটি অঙ্গকে মানুষ বলা যায় না, তেমনি ইসলামেও এক অবিভাজ্য সামগ্রিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে। তার এক একটি দিককে অন্য দিকগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, প্রত্যেকটিকে আলাদা-আলাদাভাবে ইসলাম বলা হলে তা থেকে নির্ভুল ও সম্যক পরিচিতি লাভ সম্ভব হবে না [৩]।"

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও উল্লেখ করেন,

"এ কারণে সেকালে আধুনিক কালের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান,মনোবিজ্ঞান সমাজকল্যাণ প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সুবন্যস্ত আকারে গ্রন্থাবদ্ধ হিসাবে রচনা করার কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি এবং স্বতন্দ্রভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের কোন প্রবণতাও দেখা যায়নি"[১]।

মানুষের অর্থনীতি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আচরণ ও অর্থনৈতিক কর্ম সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কিত কোন সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থাবদ্ধ না হওয়ার এটাই ছিল একমাত্র কারণ।

এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে Prof. A.H.M. Sadeq বলেন,

"Islamic economic thinking is as old as Islam itself, reflected as Islamic economic norms and values, rather than a separate discipline of knowledge. As a complete code of life, Islam provides guidance in all spheres of human activities, including economics. Economics has been an integral part of its social scheme unsegregated from its other dimensions. This nature of Islamic economics is evident from its presentation in the basic Islamic sources. The Quran does not provide a chapter on economic matters. Divine guidance in economic matters was revealed as and when circumstances demanded it and hence the Quranic verses related to economics are scattered all over in the Quran, instead of being in one or more exclusive chapter [২]."

অনুরূপ চিত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসেও পরিলক্ষিত। একই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশাল হাদীস ভান্ডারেও অর্থনীতি বিষয়ক বিধি-বিধান ও নীতিসমূহ অধ্যায়ভিত্তিক বিভাজিত ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি আরো উল্লেখ করেন,

"The Sunnah, in its origin, did not come out of the prophetic lectures on economics, but rather it originated as responses to economics, circumstances at different occasions, although the compilers of the sunnah have sometimes put the traditions releted to economics and business under the title 'mu'amelat [৩]."

যদিও পরবর্তীকালে মুহাদ্দীসগণ অত্যন্ত আন্তরিকতা নিষ্ঠা, সততা ও সতর্কতার সাথে বিষয়ভিত্তিক এবং মু'আমিলাত শিরোনামে অর্থনীতি সম্পর্কিত হাদিছসমূহ একত্রিত করে সুবিন্যস্ত আকারে সুসংবদ্ধ করেছেন। শিরোনাম দিয়ে হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন।

---

১. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

২. *Reading in Islamic Economic Thought,* Edited by Dr. Abul Hasan M. Sadeq Aidit Ghazali, (Dhaka: IFABA, 2006)p. 9

৩. ibid, p. 9
They said, "Islam Shaped and Coordinated every aspect of his life priveate and public, material and spiritual, political, economic and cultural. The ideal Islamic life fused each aspect of life with another in an inseparable whole."

Dhaka University Institutional Repository

❑ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফয়ে রাশেদার আমলে অর্থব্যবস্থা

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা করেছেন। এই মহান দায়িত্ব (খিলাফাত) পালনের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে এক অজেয় শক্তি-'জ্ঞান'(হিকমাত) প্রদান করেছেন। এই 'জ্ঞান'-শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জীব এবং আল্লাহর ফিরিশতা থেকেও মানুষকে বড় ও মহৎ করেছে। ইসলামী সমাজের এই জ্ঞান চর্চার তৎপরতা বিশ্ব নবী রাসূলল্লাহ (সা)-কে কেন্দ্র করেই সূচিত হয়েছিল। এ পৃথিবীতে তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশের আশ্রয় ও মাধ্যম[১]। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতেন তারা নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে আল-কুরআন লিপিবদ্ধ ও মুখস্ত রাখতেন। তারা ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাদের মধ্যে যারা লিখতে পারতেন না তারাও আল-কুরআন ও রাসূল-এর বাণীসমূহ মুখস্ত করে রাখতেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, অন্ধকার যুগেও আরবে যে সব কবিতার আসর বসত, সেখানে হাজার হাজার কবিতার শ্লোক মুখস্থ পাঠ করে প্রতিযোগিতার আসর কাঁপিয়ে তুলা হতো [৩]।

সুতরাং যারা লেখনী প্রয়োগ করেননি, তারা তাদের তীক্ষ্ণ স্বরন শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন পুর্ণমাত্রায়। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম সামগ্রিক জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে সংরক্ষণ করেন। এই উভয় পদ্ধতিতে ও উপায়ে সংরক্ষিত আল-কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নিজেই সম্পন্ন করতেন কিংবা সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামের (রা) সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন [৪]।

রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রীয়, পররাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে অতি সহজেই তাঁরা আল-কুরআন থেকে এবং প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ্ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। নতুন-নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের মূলনীতি অনুযায়ী সাহাবাগণের পরামর্শের ভিত্তিতে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যা প্রত্যক্ষভাবে আল-কুরআন কিংবা হাদীস থেকে গৃহীত কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্ত আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তৎলব্ধ জ্ঞানের অনুকূলে ছিল [৫]। সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পর্যায়ে জীবন-সমস্যা সমাধানের এই পদ্ধতি, পন্থা ও প্রক্রিয়ায় সাহাবায়ে কেরামের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান–ধারণা, হিকমাত ও জ্ঞানের বুদ্ধি-বৃত্তিক মিথস্ক্রিয়া ও পরামর্শের ভিত্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৫
২. Farhad Nomani Ali Rahnema, *Islamic Economic System* (Kualalumpur: Business Information press, 1995 AD), p. 31.
৩. ibid
৪. Edited by Dr. Abul Hasan M. Sadeq, Aidit Ghazali, Ibid, p. 9-10
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ

হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুফাসসীর গণের প্রচেষ্টায় তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং উৎকর্ষত লাভ করে। মুহাদ্দীসগণের প্রচেষ্টায় হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত হয়। চারজন প্রধান ও প্রখ্যাত ফিকাহবিদের অনুসরণে চারটি মাজহাব (School of Thought) গড়ে উঠে এ সময়েই। এ যুগে ইসলামী আর্দশভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্ত াধারায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে মুসলিম গবেষকগণ সততা ও নিষ্ঠাসহ তাদের আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী শরী'আহ্র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি মুকাবিলায় উদ্ভুত নতুন নতুন অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান করেন। এ পর্যায়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করে Dr. A.H.M. Sadequ বলেন,

"It is the task of the scholars to refer to the Islamic sources to obtain Islamic norms on economic issues and to findout solutions consistent with these norms. This has happened throughout Islamic history according to the need of the time and space and has produced a rich heritage of Islamic literature covering all aspects of human life including economic issues and other matters having implications for economic behaviour[১]."

উল্লেখ্য যে, উমাইয়া বংশের খলিফা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নির্দেশে সর্বপ্রথম হাদীছ সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়। এ অভিযান দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলে কিন্তু ঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ তখনও শুরু হয়নি। আব্বাসীয় খিলাফাতের দ্বিতীয় খালিফা আল-মানসূর-এর খিলাফত আমলে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। মক্কায় ইব্ন জুরাইজ, মদীনায় ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা), সিরিয়ায় ইমাম আওযায়ী বসরায়, ইবন আবু আরুবা ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা, ইয়েমেনে মাস'আব এবং কুফায় সুফিয়ান সাওরী হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। ইব্ন ঈসহাক যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারাদির ইতিহাস ও ইমাম আবু হানীফা ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়ন শুরু করেন। খলিফা আল-মাহ্দীর উজীর মু'আবিয়া ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়ামার আল-আশহারী (১৭০ হি.) 'কিতাবুল খারাজ' নামে একখানি স্বতন্ত্র ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইসলামী অর্থনীতি পর্যায়ে এ গ্রন্থ-ই সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ [২]।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর বিশ্লেষণ বহুমাত্রিকতার রূপ নেয়। মুফাসসীর, মুহাদ্দিস, মূসলিম দার্শনিক ও ফকীহ্গণ স্থান-কাল-পাত্র বিশেষ, যুগজিজ্ঞাসার নিরিখে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে, নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির বিষয়াবলীর বিশ্লেষণ করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়-এর খাতসমূহ, অর্থনৈতিক উৎসসমূহ, বন্টন-পদ্ধতি, ভোগ ও বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

---

১. Edited by Dr. Abul Hasan M. Sadeq, Aidit Ghazali, Ibid, p. 9-10
২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে Dr. A.H.M. Sadeq বলেন,

" Economic issues have been addressed from different perspectives by various authors in the context of different disciplines and in response to the needs of respective times in the Islamic history.[১]"

এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর বিশ্লেষণের ধরন আকৃতি ও প্রকৃতিতে পাঁচটি চিন্তাধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়[২]।

প্রথমত, এ পর্যায়ে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিষয়ক তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। আল-কুরআনে অর্থনীতি সম্পর্কিত অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে অর্থনীতির বিধি-বিধান সম্বলিত মূলনীতি ও নির্দেশনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্সীরগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন অর্থসম্পদ উপার্জনে অনুপ্রেরণা প্রদান সম্পর্কিত আয়াত; সূরা জুমু'আ ১০, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত ৪:১১, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সুদ নিষিদ্ধকরণের আয়াত ২:২৭৫, পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত ২:২৮২। এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে 'আলকুরআনে অর্থনীতি নামক ইফাবা প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থে ১১৪টি সূরার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংপৃক্ত টি আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে[৩]। সে সব আয়াতে অর্থনীতি সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসেও অর্থনীতির বহু মৌলিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে বহুবিবরণ আল্লাহর রাসূলের বাণীতে বিধৃত হয়েছে। মুফাস্সীর ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের অসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তিক মেধা দিয়ে এসব আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত মূলনীতি ও নির্দেশনাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন [৪]।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী শরী'আহ্র মুল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় প্রকারের আইনগত বিশ্লেষণের চিন্তাধারায় ফকীহ্গণ অসামান্য অবদান রাখেন। ফকীহ্গণ ইসলামী শরী'আহ্র অন্যান্য বিষয়াবলির মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ফিক্হ শাস্ত্রের বিশাল বিশাল গ্রন্থে বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন [৫]। কিতাব আল-বু'য়ূ, কিতাব আল-মুদারিবাহ, বাব আল-মুশারিকাহ, কিতাব আল-শুফ'আ, কিতাব আল-মুযারি'আহ,কিতাব আল-যাকাত, কিতাব আল-সাদাত, বাব আল-ফিতর প্রভৃতি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিভঙ্গী ও এসব বিষয়াবলির আইনগত ভিত্তি প্রদান করেন। এ সব ফিক্হ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত অধ্যায়গুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও মূল্য, বিনিয়োগ-নীতিমালা, ক্রয়-বিক্রয়, পদ্ধতি, দাম ব্যবস্থা, বাজার প্রক্রিয়া, মুদ্রা ব্যবস্থা, ভুমি ব্যবস্থা ও সরকারি আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় [৬]।

---

১. ibid
২. ibid
৩. এম. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনু: শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৮
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. ibid, p. 9-10

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, এ পর্বে মুসলিম দার্শনিকগণ নীতি নৈতিকতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ফকীহ্গণ উপস্থাপিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত। ফকীহগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শরী'আহ্র আইনগত বৈধ-অবৈধতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। অপরদিকে মুসলিম দার্শনিক ও সুফী উলামাগণ অর্থনৈতিক আচরণের উপর কৃচ্ছতা সাধন, মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন, অল্পে তুষ্টি ও ভোগবিলাসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে ইসলামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে Dr. A.H.M. Sadequ বলেন,

"This analysis is different from the juristic analysis of economic matters in that the latter presents the legal status and leastwhile the former emphasizes the real spirit of Islam over and above legal limits, guiding man towards the most desirable economic behaviour of human beings. The works of Ulama, Sufis, Islamic philosophers and Islamic reformers (mujaddideen) come under this category [১]."

চতুর্থত, এ ধারার বিশ্লেষণে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর গুরুত্বারোপ করে বেশকিছু ফিক্হ গ্রন্থ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়। Dr. A.H.M. Sadequ-এ প্রসঙ্গে বলেন,

"The works in this category fall mainly under public finance, in particulary, public revenues including land tax, public expenditure, and so on [২]." এ বিশ্লেষণে মূলত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামো, রাষ্ট্রের আয়ের উৎস, ব্যয়ের খাতসমূহ, ভূমিকর, যাকাত ব্যবস্থা, উশর, খারাজ, জিযিয়া, জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ পর্বের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণটি 'Macroeconomics' পর্যায়ের বিশ্লেষণ-এর অন্তর্ভূক্ত [৩]।

পঞ্চমত, এ পর্বের বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতা আরও সম্প্রসারিত, সমৃদ্ধ আরও সুসংবদ্ধ। মুসলিম গবেষক, অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকগণ অর্থনৈতিক সমস্যাবলির Objective analyses এর সূত্রপাত করেন[৪]। ইব্ন খালদুন, ও বিশ্ব বিখ্যাত ফকীহ্ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইব্ন তাইমিয়াহ দাম ব্যবস্থার উপর চাহিদা ও যোগান (Demand supply) তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন[৫]। অর্থনীতিবিদদের আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'Microeconomics' বলা হয়-এর সূত্রপাত করেন। এ পর্বের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে Dr. A.H.M. Sadequ বলেন,

"These analyses of economic issues fall under three broad categories:

1. Ideal economic norms and values;
2. legal status and limits in economic issues and
3. Historical application and analysis.[৬]

---

১. ibid
২. ibid
৩. ibid
৪. Farhad Nomani and Ali Rahnema, ibid, p. 83
৫. ibid, p. 84
৬. ibid, p. 9-10

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা মনে করি চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশের সূচনালগ্নে এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উপর যে বহুমাত্রিকতার ভাবধারা নিহিত রয়েছে, তা বর্তমানে বিশ্বের আধুনিক অর্থনীতির গবেষকের জন্য অনুসন্ধানের বিষয়। পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাসহ মিশ্রঅর্থনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি বা উদার অর্থনীতি কিংবা উন্নয়ন অর্থনীতির সে সব কল্যাণকর দিক রয়েছে এখনো সে সব ধ্যাণ-ধারনার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তা প্রমাণের জন্য এ পর্যন্ত এ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এ পর্যায়ে যে সব মুসলিম পন্ডিত, অর্থনীতিবীদ ও গবেষকের লেখনীতে ও গবেষণায় ইসলামের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ হয়েছে, চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তাদের কালপরিক্রমাকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নরূপ চারটি পর্বে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে:[১]

- ❑ প্রাথমিক পর্যায় বা ভিত্তি পর্ব (৪৫০ হি./ ১০৫৮ খ্রি. পর্যন্ত);
- ❑ দ্বিতীয় পর্যায় (৪৫০-৮৫০হি./ ১০৫০-১৪৪৬ খ্রি. পর্যন্ত);
- ❑ তৃতীয় পর্যায় (৮৫০-১৩৫০ হি:/১৪৪৬-১৯৩২ খ্রি. পর্যন্ত) এবং
- ❑ চতুর্থ পর্যায় (১৩৫০ হি.-বর্তমান/১৯৩২-বর্তমান পর্যন্ত)।

❑ প্রাথমিক পর্যায়, ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি পর্ব (৪৫০হি./১০৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত

এ পর্বটি ৪৫০ খ্রি. থেকে ১০৫৮ খ্রি. পর্যন্ত। বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা খোলাফায়ে রাশিদার আমলে-এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এর পর উমাইয়া শাসন আমল থেকে আব্বাসীয় শাসন আমল পর্যন্ত তদানিন্তন পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে আসে[২]। হিজরী ৪৫০ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য মুসলিম গবেষক, পন্ডিত, সুতীক্ষ্ণ মেধা ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় তাদের অবদান আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে[৩]। ৪৫০হি/১০৫৮ খ্রি. পর্যন্ত যারা ইসলামী শরী'আহ্‌ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনকল্যাণমূখী ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:[৪]

১. যায়েদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইমাম হাসান (রা) (১০-৮০হি:/৬৯৯-৭৮৩ খ্রি.); ২.আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খি.); ৩. আল আওযা'য়ী (৮৮-১৫৭ হি:/৭০৭-৭৭৪ খ্রি.); ৪. ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (৯৩-১৭৯হি./৭১৭-৭৯৬ খ্রি.); ৫.আবূ ইউসুফ (১১৩-১৮২হি:/৭৩১-৭৯৮ খ্রি.); ৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান (১৩২-১৮৯ হি./৭১৭-৭৯৬ খ্রি.); ৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদম আলকারাশী (১৩৪-২০২হি./৭৫২-৮১৮ খ্রি.); ৮. আবূ উবায়দ (১৫৪-২২৪ হি./৭৬৬-৮৩৮ খ্রি.); ৯.হারিস ইব্‌ন আসাদ আল-মুহাসিবী (১৬৫-২৪৩হি./৭৮১-৮৫৭খ্রি.); ১০. জুনাইদ বাগদাদী (মৃত ২৯৭ হি./৯১০ খ্রি.) এবং ১১. আল-মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি:/৯৭৪-১০৫৮খ্রি:) প্রমুখ মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ।

---

১. ibid
২. *ইসলামী অর্থনীতি*, গবেষনা বিভাগ (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৯৭
৩. এম আকবর আলী *বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান* (ঢাকা: দি মালিক লাইব্রেরী, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৭
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এ সময়ে অসংখ্য ফকীহ্, সুফী ও দার্শনিক এর সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় অবদান রেখেছেন। গবেষণা-অনুসন্ধান সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে এখানে মাত্র কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ফকীহ্দের মধ্যে আবূ ইউসুফ (১৮২ হি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[১]। তাঁর কিতাব-আল-খারাজ[২] ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর পরে অন্যান্য ফকীহ্রাও লিখেছেন। আবূ ইউসুফ যেসব বিষয়ে তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার মধ্যে রয়েছে জনগণের প্রয়োজন পূরণের উপর তাগিদ, এবং করের ক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার ও সমতা রক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান। তিনি কৃষি ভূমির উপর কর আরোপের সুপারিশ রাখেন। তাঁর মতে, শুধু ন্যায়-বিচার-ই প্রতিষ্ঠা করে না, সরকারের আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক। এ ছাড়া সেতু, বাঁধ ও সেচ ব্যয়সহ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যয় কিভাবে মেটানো যায় সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। যদিও তাঁর মৌলিক অবদান সরকারী অর্থায়নে, আবূ ইউসুফ দাম নিয়ন্ত্রণের উপরও অবদান রাখেন। দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, বিভিন্ন রকম কর দামের উপর কিরূপ প্রভাব রাখে, তাও আলোচনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন-আল-হাসান ‘পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনের জন্য উপার্জনের এর উপর পুস্তক রচনা করেন [৩]। এই পুস্তকে কিভাবে সৎপথে আয়-উপার্জন করা যায়, সে সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। সৎ উপার্জনের জন্যে তিনি যেসব পদ্ধতির সুপারিশ রাখেন তার মধ্যে ‘ইজারাহ্’ (ভাড়া), ‘তিজারাহ’ (ব্যবসা), ‘জিরা’আহ’ (কৃষি) এবং ‘সিনা’আহ’ (শিল্প) উল্লেখযোগ্য। তাঁর গ্রন্থে এসব বিষয়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর কিতাব-আল-আসল এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে বিভিন্ন লেনদেন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপকরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘সালাম’ (অগ্রীম ক্রয়), ‘শিরকাত’ ও (অংশীদারিত্ব), ‘মুদারাবাহ’ (মুনাফা-ভাগ) ইত্যাদি।

আবু উবায়েদ-এর কিতাব ‘আল-আমওয়াল’ ইসলামে সরকারি অর্থব্যবস্থার একটি ব্যাপক দলিল। এ দলিলে প্রজাদের উপর শাসকদের অধিকার এবং শাসকদের উপর প্রজাদের অধিকার ছাড়াও ‘যাকাত’ (‘উশরসহ), ‘খুমস’ এবং ‘ফাই’ (খারাজ ও যিজিয়াসহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে [৪]। ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস বিষয় হিসেবেও বইটির বহুল পরিচিতি রয়েছে। সুফীদের মধ্যে জুনাইদ বাগদাদীর নামে সর্বাগ্রে আসে [৫]।

---

১. Masudul Alam Chowdhury and Uzir Abdul Malik, *The Foundations of Islamic Political Economy* (London: Macmillan Press, 1992 A. D), P. 25-26
২. ibid
৩. ibid
৪. Monzer Kahf, *The Islamic Economy* (Plainfield Indiana: The Muslim Students Association of the United States and Canada, 1978), p. 43
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, তিনি সুফী হওয়া সত্ত্বেও বিত্তশালী ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করতেন। তিনি তাঁর গরীব বন্ধু-বান্ধবদের জন্য প্রচুর খরচ করতেন। যে কাজগুলো করতে তিনি পছন্দ করতেন তার মধ্যে রয়েছে স্বার্থপর উদ্দেশ্য বর্জন, আধ্যাত্মিক স্বভাবের চর্চা, সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকা, সমাজের সার্বিক মঙ্গল কামনা করা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা এবং শরী'আহ্র বিষয়াদিতে রাসূল (সা:) কে অনুসরণ করা। মাওয়ার্দীর 'আল-আহকাম-আল-সুলতানিয়া' সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কিত একটি গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ[১]। এতে একজন শাসকের কর্তব্য, সরকারী আয় ও ব্যয়, সরকারি ও খাস জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। একজন আদর্শ শাসক বাজার তদারকী করবে, সঠিক ওজন ও মাপ নিশ্চিত করবে, প্রতারণা রোধ করবে এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা যাতে তাদের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্র নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে সে দিকে নজর দেবে। দার্শনিক হিসাবে ইব্ন মিসকায়ালী'র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এরিষ্টটল-এর মত দার্শনিকদের চিন্তাধারা ইসলামী শিক্ষার সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। বিনিময়, ন্যায়-বিচার ও মুদ্রার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মানুষ সামাজিক জীব। তারা একে অপরকে সহায়তা করে এবং যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে। একজন মুচি একজন সুতারের সেবা গ্রহণ করে, আবার সুতারও মুচির সেবা নেয়। ন্যায় বিচারের দাবিতে তাদের সেবার মূল্য সমান সমান হবার কথা। তবে বাস্তবে তা হয় না। এখানেই আসে মুদ্রার ভূমিকা। তিনি আরও বলেন, মাপকাঠি হিসাবে মুদ্রা নিখুঁত নয়। এ কারণে তিনি শাসকদের দুজন অংশীদারের লেনদেন যাতে ন্যায় বিচারপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেন[২]।

❑ দ্বিতীয় পর্ব (৪৫০-৮৫০হি./১০৫৮-১৪৪৬ খ্রি. পর্যন্ত)

এ পর্বে ইসলামী সাম্রাজ্যের আরও সম্প্রসারণ ঘটে। ইসলাম মরক্কো থেকে পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৪০০ বছরে (হিজরী) অসংখ্য ফকীহ, সূফী ও দার্শনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী নিবেদিত প্রাণ মুসলিম মনীষীদের গবেষণার দ্বারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। বিশেষভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে তাদের চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে নিম্ন বর্ণিত বিশ্ববিখ্যাত পাঁচ জন মনীষীর অর্থনৈতিক জগতে তাদের চিন্তাধারা ও অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো:[৩]

❑ ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালী (৪৫১-৫০৫হি./১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

❑ তাকীউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮খ্রি.)

❑ আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ-বকর ইব্ন আল-কাইয়েম (৬৯১-৭৫১হি./১২৯২-১৩৫০ খ্রি.)

❑ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খি.)

❑ ইব্ন খালদূন (৭৩২-৮০৮ হি/ ১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)

---

১. Khurshid Ahmed, (ed) *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981 A. D) p.33
২. Satoshi Iwai, *A New Approach to Human Economics: A case Study of an Islamic Economy* (Tokyo: International University of Japan, 1985), P. 75
৩. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❑ আল-গাজ্জালী (৪৫১-৫০৫হি./১০৫৫-১১১১খ্রি.)

মানুষ যে সময় জাগতিক সুবিধাদির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সে সময়েই গাজ্জালীর আবির্ভাব[১]। তিনি 'ইহ্ইয়া 'উলুম'-আল-'দীন'-এর (ধর্মীয় বিজ্ঞানের উত্থান) মতো গ্রন্থ ছাড়াও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন[২]।

তাঁর লেখাতে সুফী মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি সৎ নিয়্যাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যজনিত কাজকর্মের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, একজন ব্যবসায়ী এমনভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে যাতে তার সামাজিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যও (ফরজ-ই-কিফায়া [৩]) পালিত হয়। একজন ব্যক্তি (সাধারণভাবে) তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার তার বেশী বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিবাহ ও সন্তানাদি পালন এবং কিছু সম্পত্তি। তিনি কখনও খুব উচুঁ মানের জীবন যাপনের পক্ষে ছিলেন না।

রাসূল (সা:) ও তাঁর সাহাবীরা যেরূপ জীবন যাপন করতেন, তিনি সেটিই পছন্দ করতেন। বেশী বেশী দান খয়রাতের জন্যে বেশী বেশী আয় করার প্রবণতাকে তিনি সমর্থন করেননি। যারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে এবং তা মজুত করে রাখে, এবং তার গরীব ভাইদের সহায়তা করে না, তাদেরকে তিনি অত্যাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেন [৪]। প্রজাদের সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর দেয়া, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং শরী'আহ্ বিরোধী আইন-কানুন আরোপ না করার জন্যে তৎকালীন শাসকদের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। জনগণ যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয়, তাদের সে সময় খাদ্য, বস্ত্র ছাড়াও সরকারি কোষাগার হতে আর্থিক সাহায্য দেবারও পরামর্শ দেন [৫]। শ্রম বিভাগ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশের উপরও গাজ্জালীর অবদান রয়েছে [৬]। 'রিবা-আল-ফদল' নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি বলেন, "এটা মুদ্রার প্রকৃতি ও কার্যাদিকে লঙ্ঘন করে"। মুদ্রা গচ্ছিত করা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখান যে, মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে কাজ করার জন্য, কিন্তু গচ্ছিত মুদ্রা সেই প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে [৭]।

❑ তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)

ইব্‌ন তাইমিয়া একটি পান্ডিত্যপূর্ণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক পরিবেশও তাঁর সৃজনশীল মেধাবিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাঁর মৌলিক অবদান ফিক্‌হশাস্ত্র। সমাজকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার লেখনী ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক, যৌক্তিক ও দলীলভিত্তিক[৮]।

---

১. *Readings in Islamic Economic Thought*, ibid, p.37
২. ibid, p. 37-38
৩. Dr. Sabahauddin, ibid, p.50
He said, "Al-Ghazali considers productive works as part of worship. He is of the opinion theat pursuit of economic activities is a part of the shariah mandated obligatory duties because if they are not ful filled, worldy life would collaps, and humanity would perish."
৪. Al-Ghazali *Ihya'Ulum al-Din* (Egypt: Mustafa Babi al-Halabi, 1939AD), Vol.2, p.85
৫. ibid
৬. Al-Ghazali *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (Egypt: Maktaba al-Jundi, 1967 A.D.), p.105
৭. এ সম্পর্কে মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী বলেন,
"Ghazalis analytical insights have also enriched Islamic Economic evolution of money, and shown how the evil society was organized out of necessity. Highly reminiscent of the contributions of the philosophers down to Ibn Miskawaih, Ghazali, offers some additional insights. He tries to explain the prohibition of riba al-fadl by arguing that it violates the nature and functions of money and condemns hoarding of money on the grounds that money is designed to facilitate exchange, whereas hoarding obstructs this process." (সূত্র: Readings in Islamic Economic Thought, ibid, p.39)
৮. Readings in Islamic Economic Thought, ibid, p.39

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ও মুজাদ্দিদ হিসেবে বিশ্বব্যাপী তার সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। সমাজই ছিল তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী গ্রন্থ হল 'আল-হিসবাহ ফী আল-ইসলাম'[১]। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল সামাজিক বিষয়াদি, চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন, দাম কোন কোন অবস্থায় তা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন হিসাবে গণ্য করা যায়, বাজার তদারকীতে 'মুহতাসিব'-এর দায়িত্ব, সরকারি অর্থব্যবস্থা ও জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি [২]।

ইব্ন তাইমিয়া-ই প্রথম ইসলামী অর্থনীতিবিদ যিনি অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বপ্রথম ন্যায্য দামের উপর বিস্তারিত অবদান রাখেন[৩]। ইসলামী অর্থনীতির ইতিহাসে তাঁর আরও একটি অবদান হলো বিভিন্ন ধরনের অংশিদারিত্বমূলক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা। তিনি মনে করেন, নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদারভিত্তিক চুক্তি ভাড়ায় চুক্তির চেয়ে শ্রেয়। তিনি ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনা, ওজন ও মাপ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও দাম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত রেখেছেন[৪]। ইব্ন তাইমিয়া অর্থনীতির যে সব বিষয় আলোচনা করেছেন এবং সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন সে সবের মধ্যে রয়েছে:[৫]

১. নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
২. রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ও তার সীমারেখা;
৩. বাজার তদারকী, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য মুনাফা;
৪. সম্পদের মালিকানার ধরন এবং
৫. প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আল-হিসবাহ্'-এর প্রতিষ্ঠা।

'আল-হিসবাহ'-এর আওতায় মুহতাসিবের দায়িত্ব কি কি সে সম্বন্ধে ইব্ন তাইমিয়া বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মুহতাসিবের কাজের মূলনীতি হবে 'সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ'-এর যথাযথ প্রয়োগ। তার কার্যক্রমে যে বিষয়গুলো থাকবে তা নিম্নরূপ: [৬]

১. দ্বীনি আহ্কাম বা শরী'আহ্র বাস্তবায়ন;
২. জুয়া, মাদক দ্রব্য ও সুদের ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্ছেদ;
৩. দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ;
৪. মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
৫. ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণ;
৬. সম্পদের মালিকানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;
৭. জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার;
৮. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান;
৯. পৌর সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান এবং
১০. 'আদল' ও 'ইহ্সান'-এর প্রতিষ্ঠা।

---

১. ibid
২. Ahmad Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Egypt: Matba'ah al-Moiyid, 1218 AH.)pp. 14-30
৩. ibid, p. 40
৪. নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০
৫. প্রাগুক্ত
৬. Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Shariah, (*Cairo: Dar al-Shab, 1971 A. D), p.184.

Dhaka University Institutional Repository

আজ বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। এ বাজার সম্বন্ধে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে ইব্ন তাইমিয়ার আলোচনা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি বাজার অর্থনীতিতে সরকারের ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক হস্তক্ষেপের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। যা বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের নিকট সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। তাঁর মতে, যে সব ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ জনকল্যাণের স্বার্থে ন্যায়সংগত ও যৌক্তিক সেগুলো নিম্নরূপ:[১]

১. ইসলামী শরী'আহ্তে যা সুস্পষ্টভাবে হারাম তেমন কোন কিছুর উৎপাদন বিপণন, ভোগ ও বন্টনের জন্যে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সহায়-সম্পদ কোন ক্রমেই যেন ব্যবহৃত হতে না পারে তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা;

২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

৩. সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হবে প্রকাশ্যে। কারণ গোপন লেনদেন শুধু সরবরাহের পরিমাণ ও সময়ই বিঘ্নিত করে না, সামাজিক মূল্যস্তর প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়;

৪. ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে যেন সিন্ডিকেট করে দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস না করতে পারে;

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা;

৬. মধ্যস্বত্ব ভোগী, দালাল, বেপারী ও ফড়িয়া শ্রেণীর উৎখাত করা;

৭. বাজার দখল বা প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যবসায়ীকে ঘায়েলের উদ্দেশ্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ডামপিং প্রতিহত করা

৮. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের পণ্য সামগ্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খুঁত প্রকাশে বাধ্য করা। ক্রেতাদের সামনে যেন মিথ্যা শপথ করে প্রতারণা না করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা;

৯. পল্লী অঞ্চলের সরবরাহকারীদের বাজারের সন্নিকটেই পণ্য-সামগ্রী মজুত, বিশ্রাম ও অবস্থানের সুযোগ করে দেয়া যেন তারা নিজেরাই বাজারের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে এবং সুবিধামত সময়ে ও মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং

১০. শহুরে ব্যবসায়ীরা পথিমধ্যেই পল্লীর সরবরাহকারীর সাথে যেন মিলিত হতে না পারে, কারণ-এর ফলে তারা ঐ সব সরবরাহকারীকে শহুরে বিদ্যমান মূল্যস্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে নেয় এবং শহরবাসীর কাছে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করে অতিরিক্ত অনৈতিক মূনাফা অর্জনের সুযোগ পায় [২]।

---

১. N. Ziadeh, *Al-Hisbah wal Muhtasib fi al-Islam* (Beirut:Catholic press, 1963), p.34

২. Abdul Azim Islahi *Economic Views of Ibn Taimiyyah,* (Aligarh: Aligarh Muslim University, Ph. D. Thesis, 1980), p. 279, (Unpublished)

Dhaka University Institutional Repository

❑ শাম্‌স আল-দ্বীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুবকর ইব্‌ন কাইয়্যেম (৬৯১-৭৫১হি./ ১২৯২-১৩৫০ খ্রি.)

এই পর্বের একজন বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ্‌, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ হলেন ইব্‌ন কাইয়্যেম। তাঁর বিখ্যাত রচনা হল 'আত-তুরুক্ব আল হুকমিয়্যাহ'। তাঁর মতে, ব্যক্তি যদি তার সম্পদ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তাহলে রাষ্ট্র অবশ্যই তাতে হস্তক্ষেপ করবে। তিনি ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরী এবং সঙ্গত মুনাফার পক্ষপাতি ছিলেন। একচেটিয়া কারবার অথবা বাজারে অপূর্ণতা থাকলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বিস্তারিত নীতিমালা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন[২]। বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে কারিগরদের মজুরী নির্ধারণের উপর তাগিদ দিয়েছেন। উপরন্তু নাগরিকদের প্রয়োজনে পণ্য আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারেরও পরামর্শ দিয়েছেন[৩]। ইব্‌ন তাইমিয়ার মতো তিনিও প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আল-হিসবাহ্‌'র কার্যক্রমের সমর্থক ছিলেন[৪]।

তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান লক্ষ্য ছিলো সুবিচার (আদল) প্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ সংরক্ষণ (আল-মাস্‌লাহাহ্‌ আল-'আম্মাহ) এবং সে সব কাজের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, (সাদ আল-ঝারি'আহ) যেগুলো জনস্বার্থ ও সুবিচারের মূল লক্ষ্যকেই নসাৎ করতে পারে, সেগুলোকে শরী'আহ্‌র 'সাদ আল-ঝারি'আহ' নীতির আলোকে কঠোর হস্তে দমন করা। আবদুল আজীম ইসলাহী ইব্‌ন কাইয়্যেম-এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও বিষয়গুলোকে চারটি শ্রেণীতে সুবিন্যস্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় সেগুলো নিম্নরূপ:[৫]

1. His views on the economic philosophy of Islam.;
2. Comparison and contrast between riches and poverty.;
3. Economic significance of Zakah.;
4. Interest, 'riba al-fadl' and 'riba al-nasiah ' and
5. Market Mechanism and price regulation.

❑ আবূ-ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মুসা আল-লাখমী আল-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি./১৩৮৮ খি.)

আল-শাতিবী এই পর্বের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উসূলবিদ, ফকীহ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদ। তিনি ইমাম হিসেবেও বহুল পরিচিত। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'আল-মুয়াফিক্বাত ফী উসূল আল-শরী'আহ্‌'[৬]। যে শরী'আহ্‌র দ্বারা মানব জীবনের সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত সেই শরী'আহ্‌র প্রকৃত উদ্দেশ্য (মাক্বাসিদ আল-শরীআহ্‌) অর্জন, কলা-কৌশল ও উপায়-পন্থা-পদ্ধতি তার আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তার মতে, রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো হলো:[৭]

---

১. Ibn al-Qayyim, *Igathah al-lahfan* (Egypt: Matba'ah al-Maimaniyah 1320AH.) p. 190
২. শাহ্‌ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১
৩. প্রাগুক্ত
৪. ibid, p.238
৫. M. Nejatullah Siddiqi *Muslim Economic Thinking* (Leicester:The Islamic Foundation 1981 A.D), p.130
৬. Abdul Azim Islahi, ibid, p.255
৭. M. Fahim khan, Noor Muhammad Ghifari, *Shatibi's Objective of Shariah and some implications for Consumer Theory,* Edited by Dr. AHM Sadeq, ibid, p. 77

Dhaka University Institutional Repository

১. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন;

২. জীবনের মৌলিক পাঁচটি চাহিদা পূরণ;

৩. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয়রোধ ও অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তির গ্রাস থেকে বিরত রাখা এবং

৪. যাবতীয় নেশার সামগ্রী যা বিচার শক্তিকে কলুষিত করে এমন সব দ্রব্যের উৎপাদন বিপণন, বন্টন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ।

মানবজীবনের প্রয়োজনকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:[১]

১. অপরিহার্য (জরুরীয়াহ);

২. প্রয়োজনীয় (হাজিয়াহ) এবং

৩. সৌন্দর্যবর্ধক বা উৎকর্ষমূলক (তাহ্সিনীয়াহ)।

'জরূরীয়াহ'র মধ্যে রয়েছে পাঁচটি মৌলিক বিষয়। সেগুলোর অবশ্যই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। কারণ এর মধ্যে পার্থিব ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই পাঁচটি মৌলিক বিষয় হলো:[২] (১) আক্বীদা বিশ্বাস (আল-দ্বীন), (২) জীবন (আল-নফস), (৩) বংশধর(আল-নসল), (৪) সম্পত্তি (আল-মাল) এবং (৫) বুদ্ধিমত্তা (আল-'আকল)।

❑ ওয়ালী আল-দীন আবদ আল-রহমান আল-হাসান ইবন খালদূন (৭৩২-৮০৮হি./১৩৩২-১৪০৬খ্রি.)

ইবন খালদুনের জন্ম তিউনিসে, মৃত্যু কায়রোতে। একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী হলেও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কেও তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। অর্থনীতির জগতে তাঁর যে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে আজ থেকে নয়শত বছর পূর্বে, সে প্রেক্ষিতে তাঁকে শুধু ইসলামী অর্থনীতি নয় বরং আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসেবে আ্যাখ্যায়িত করলেও অতিশয়োক্তি হবে না বলে আমরা মনে করি। 'কিতাব-আল-ইবার' বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও এই বইয়ের 'আল-মুকাদ্দিমাহ' বিশ্বব্যাপী বহুল পরিচিত ও প্রশংসিত[৩]। এ বইয়ে তিনি অর্থনীতির যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সে সবের মধ্যে রয়েছে:[৪]

১. শ্রম বিভাজন; ২. মূল্য পদ্ধতি; ৩. উৎপাদন ও বন্টন; ৪.মূলধন সংগঠন; ৫. চাহিদা ও যোগান; ৬. মুদ্রা ব্যবস্থা; ৭. জনসংখ্যা সমস্যা; ৮. বাণিজ্য চক্র; ৯.সরকারি অর্থব্যবস্থা এবং ১০. উন্নয়নের স্তর।

---

১. 'Allama Shatibi, *Al-Muwafaqat fi al-Usul al-Shariah* (Cairo: al-Tijareyya, al-kubra, 1395 AH), Vol.2, pp. 8-25

২. ibid

৩. M. Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), p. 294

৪. Edited by Dr. H.M. Sadeq, ibid, *Islamic Economic Thought foundations Evolution and Needed direction*: নামক প্রবন্ধে মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী ইবন খালদুনের তীক্ষণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং 'আল-মুকাদ্দিমাহর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন, "He was gifted with analytical powers unprecedented in Islamic scholarship. His Muqaddimah may rightly be regarded as the greatest work in social, Political and economic analysis in the Islamic tradition, offering insighte into such subjects as division of labour, money and prices, production and distribution, international, Trade, capital formation growth, trade cycles, poverty and prosperity, population, agriculture, industry, trade and the macroeconomics of taxation, and public expenditure."

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সময়কালে যে সব বিষয় তাঁকে নাড়া দেয় তা হলো রাজবংশের উত্থান-পতন এবং দারিদ্র ও প্রাচুর্য। তার লেখনীতে তিনি এগুলো সম্পর্কে বেশ কিছু প্যাটার্ন চিহ্নিত করেন। এ্যাডাম স্মীথ-এরও চারশত বছর পূর্বে 'আল-মুকাদ্দিমাহ্'তে তিনি শ্রম বিভাজন এবং এর ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন [১]। একদল মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে যা উৎপন্ন করে তা এককভাবে একজনের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী। ফলে প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বিক্রি করা সম্ভব। তিনি মনে করেন, শ্রম বিভাজনের ফলেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়। শ্রমের বিশেষীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। তার মতে, একমাত্র বিশেষীকরণের ফলেই উচুঁ হারে উৎপাদন সম্ভব যা পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের জন্যে অপরিহার্য [২]।

ইব্ন খালদুন উৎপাদনে সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মানবীয় শ্রমের সবিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নানা ধরনের পেশা ও সে সবের সামাজিক উপযোগিতার কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। দারিদ্রের ভিত্তি এবং তার কারণ সম্বন্ধে তার আলোচনার জন্য ইব্ন আল-সাবিল তাঁকে প্রুঁদো, মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করেন। তাছাড়া তিনি দেখিয়েছেন ইব্ন খালদূনের মডেলে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত [৩]।

ইব্ন খালদুন বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম হন, যে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সে সব দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় ধনী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জনসংখা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশী হলে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয় এবং এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এরূপ উন্নয়নে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা-সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্পে বৈচিত্র আনয়ন করে [৪]। তিনি ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বিচারে পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ঘন জনবসতির কারণের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেন, চরম উষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি কম। এ সকল অঞ্চলে জীবন-যাত্রা কঠোর । পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা হয় সংযমী, মিতাচারী ও সংযমী। এ সকল এলাকার লোকেরা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও পোশাক পরিচ্ছেদে স্বাভাবিক ভাবেই উন্নত হয় [৫]। তাঁর রচনায় শ্রমের মূল্যতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মুদ্রার মূল্য তত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধেও ইব্ন খালদূনের আলোচনা ছিল খুবই সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী। কর ও সরকারি ব্যয় সম্পর্কে তিনি বিস্ত ারিতভাবে আলোচনা করেন [৬]।

---

১. Dr. Sabahuddin, ibid, p. 139
২. ibid
৩. ibid, p. 140
৪. Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Baghdad: Maktaba al-Muthanna, n,d), p.286
৫. ibid
৬. ibid p. 281

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল রাখার স্বার্থে সরকারি ব্যয় অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন[১]। এ ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পরে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা জে.এম.কেইনস-এর প্রদত্ত তত্ত্বের সাথে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্যে যেমন সরকারি ব্যয় অপরিহার্য গণ্য করেছেন তেমনি সরকারি ব্যয়ের ফলে বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা অব্যাহত থাকে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সরকার, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীসহ যথোপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে না তুললে জনগণের প্রয়োজন পুরণ যেমন সম্ভব নয় তেমনি তারা নিরাপত্তা হীনতায়ও ভোগে। শহরগুলোতে সমৃদ্ধির কারণই হলো সরকারি ব্যয়। তাঁর মতে শাসক এবং অমাত্যবর্গ ব্যয় বন্ধ করলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মুখ থুবড়ে পড়ে, মুনাফা হ্রাস পায় এবং মূলধনেরও স্বল্পতা দেখা দেয়। তাই সরকার যতই ব্যয় করবে ততই কল্যাণ বেশী হবে [২]।

অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যুমপিটার-ই প্রথম ইব্ন খালদুনের কথা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক কালে ব্যারিগর্ডন তাঁর 'Economic Analysis before Adam Smith-Hesiod to lessius' নামক গ্রন্থে ইব্ন খালদুনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার জন্যে ডে. স্পেনসার, ফ্রাঞ্জ বোজেনথাল, টি.বি. আরভিং, জে.ডি. বৌলাকিয়া প্রমূখ ইউরোপীয় গবেষকরা তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসাবে বিবেচনা করেন। জে.ডি. বৌলাকিয়া বলেন,

"Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official birth. He discovered the virtue and necessity of a division of labour before Adam Smith and the principle of labour value before David Ricardo. He elaborated a theory of population before 'Malthus' insisted on the role of the state in the economy before Keynes. But much more than that, Ibn Khaldun issued these concepts to build a coherent dynamic system in which the economic mechanism mexorably lead economic activity to long term fluctuation. Without tools, without pre-exsisting concepts he elaborated a genial economic explanation of the world ...... His name should figure among the fathers of economic science." [৩]

এ পর্বে আরও যে সব ফকীহ্ অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতিতে সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তারা হলেন: [৪]

---

১. Khurshid Ahmad, *Towards the Monetary and fiscal system of Islam* (Islamabad: Institute of policy studies, 1991) pp. 30-31
২. Mohammad Arif, *Monetory and fiscal Economies of Islam* (Jeddah: International Centre for research in Islamic Economics, 1982), pp. 412.
৩. Zohreh Ahghari, *The Bigining and Evolution of Islamic Economic Thought* (Florida: Florida State University, 1991), pp. 240-241
৪. J.A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (London: George Allen & Unwin Ltd. 1961), p.73

Dhaka University Institutional Repository

১.আল-কাসানী (মৃত্যু ৫৭৮ হি./ ১১৮২ খ্রি.) ২. আল-সালজারী (মৃত্যু ৫৮৯ হি./ ১১৯৩ খ্রি.) ৩.ফখরুদ্দীন আল-রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হি./ ১২১০ খ্রি.) ৪.নিযামুদ্দীন আল-রাজী, (মৃত্যু ৬৫৪ হি./১২৫৬ খ্রি.) ৫. নাসির উদ্দীন তুসী (৫৯৭-৬৭২ হি./ ১২০১-১২৭৪ খি.) ৬. ইব্‌ন আল-উখুভাই(মৃত্যু ৭২৯হি./ ১৩২৯ খ্রি.) ৭. আল-মাকরিযী (৭৬৬-৮৪৫ হি./ ১৩৬৪-১৪৪১খ্রি.)

❑ তৃতীয় পর্ব (৮৫০-১৩৫০হি./১৪৪৬-১৯২৩ খ্রি. পর্যন্ত)

এ পর্বে ইসলামী অর্থনীতির চিন্তাধারায় স্থবিরতা দেখা দেয়। মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর মতে,

"ইসলামী অর্থনীতির চিন্তাধারায় (৮৫০হিঃ/১৪৪৬খ্রিঃ পর্যন্ত) যে চরম উৎকর্ষ লাভ করে ও সাফল্য অর্জিত হয় তা এখানেই এসে থেমে যায়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর পর প্রায় ৫-৭শ বছর পর্যন্ত এ পর্যায়ে নতুন চিন্তা গবেষণা হয়েছে বলে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি[১]"। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

"ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং মুসলিম মনীষীর অবক্ষয় এ ইতিহাসকে অত:পর অগ্রসর হতে দেয়নি। এ ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাত জড়বাদী সভ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তার ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদী, পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রে সমাজবাদী চিন্তাধারার নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে"[২]।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় মুসলিম সভ্যতার পতনের কারণ অনুসন্ধান নয় তবুও এটি নি:সন্দেহে বলা যায় ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে আসাসহ নানা অভ্যন্তরীণ কারণে মুসলিম সভ্যতার পতন ঘটে। মুসলিম বিদ্বেষীদের কারণে নয়। এর দু'টো বাস্তব উদাহরণ হলো; ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিসর অবরোধ করলে মিসর অধিপতি মুরাদ শত্রুর মোকাবিলা না করে সারাদেশে বোখারী শরীফ খতমের আদেশ জারি করেন। খতম শরীফ শেষ হওয়ার আগেই নেপোলিয়ন মিসর দখল করেন[৩]। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাশিয়ার সৈন্যরা বুখারা আক্রমন করলে বুখারার অধিপতি খতমে খাজেগান পাঠ করার জন্য সব মসজিদ ও ধর্মীয় স্থানে ফরমান জারী করেন। ফলাফল মিসরের মতোই, মুসলমানদের আত্নসমর্থন [৪]। ন্যায়ের ও সত্যের পথে নৈতিক দৃঢ়তায় ও ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রযোজ্য ও যৌক্তিক পন্থায় ও পদ্ধতিতে সব বাস্তবতাকে মোকাবিলা ও জয় করার শিক্ষাই ইসলামের মূল শিক্ষা। ক্রমাগত পদস্খলনের কারণে মেরুদন্ডহীন হয়ে তিলাওয়াত ও মোনাজাতের মধ্যে সমাধান খুঁজতে গেলে এ রকম হওটাই স্বাভাবিক। অন্ধকার যুগ পেরিয়ে পাশ্চাত্য যখন রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের দেদীপ্যমান আলোকশিখা হয়ে মাথা উঁচু করে ওঠা শুরু করে, বিলাসী মুসলিম সভ্যতা তখন নতজানু হয়ে প্রিয়ার কপোলের কালো তিলের জন্য বোখারা ও সমরকন্দ লিখে দিতে প্রস্তুত হয়[৫]।

---

১. J.A. Schumpeter, ibid, p.73
২. Jean David Boulakia, *Ibn Khaldun: A fourteenth century Economist; Journal of Political Economy*. Vol.79, No.5, September-October 1971, pp. 105-111
৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী অর্থনীতির চিন্তার ইতিহাস*, (ঢাকাঃ গবেষনা বিভাগ, ইফাবা, ২০০৪ খি.), পৃ. ১০৭
৪. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১২, নজর-ই জ্বিলানী, *মুসলিম সভ্যতার অধ:পতন শুরু হয় কিভাবে?* প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যা হোক, এ পর্বের মুসলিম ফকীহ্গণের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে থাকে। ফকীহ্গণ প্রাথমিক নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ফতোয়া দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন[১]। তবে এ পর্বের শেষদিকে কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে অর্থনীতিতে আবার সংস্কার আনয়নে সচেষ্ট হন। এদের মধ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মুহাদ্দিস-ই-দেহলবী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব, মুহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য[২]। অনুসন্ধান-আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে এখানে শুধুমাত্র শাহ ওয়ালী উল্লাহ্র অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অবদান নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো:

❑ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০২-১৭৬৩ খ্রি.)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও অসাধারণ পন্ডিত্যের অধিকারী। 'হুজ্জাতুল্লা আল-বালেগাহ্' ও 'আল-মুসাওয়া মারদুল মূয়াত্তা' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক [৩]"। তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহ্ আল-বালিগা গ্রন্থে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি বিষয়ে শরী'আহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন [৪]। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সেহেতু তাদের সার্বিক কল্যাণ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে নিহিত। যে সব কাজ সহযোগিতার মূলনীতি ধ্বংস করে সেগুলি প্রকৃত পক্ষেই শরী'আহ্ বিরোধী। তিনি উদাহরণ স্বরূপ যুদ্ধ ও জুয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জুয়া থেকে আয় আসলে জনগণের প্রজ্ঞা লোপ পায় এবং এর সাথে সহযোগিতা বা সভ্যতার কোন সংস্পর্শ নেই। সুদ নিষিদ্ধ হবার বিষয়ে তিনি একই রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেন [৫]। তাঁর মতে, সহযোগিতার কাঠামোতে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে জমি সমভাবে ভাগ করা উচিত। মসজিদের মত সমস্ত জমিও ভ্রমণকারীদের আশ্রয় স্থল। 'আগে আসলে আগে পাবে' নীতির ভিত্তিতে সবাইকে এসব সম্পদ শেয়ার করতে হবে[৬]। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তার অভিমত হলো, মালিকানার অর্থ হলো সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া। তিনি কতিপয় প্রাকৃতিক সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও কালোবাজারীর তিনি কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন[৭]।

---

১. প্রাগুক্ত
২. Dr. H.M. Sadeq, ibid, p.43
এ বিষয়ে মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী বলেন, "The jurist in this period were generally speakin content with writing foot notes to the works of their eminent predecessors and issuing fatawa in the light of the standard rules of their respective schools. This period also witnessed the works of some eminent sufis.'
৩. এম. হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪. J.M.S. Baljon, *Social and Economic Ideas of Shah wali Allah* A.H.M. Sedeq (edi.), ibid. p.23
তিনি বলেন, "According to Sha Wali Allah, the principle of mutual aid is fundamental to a proper social order. it can be applied in various ways, in trade, crafts and farming. Thus, there are the instifutions of mudarabah, mufawadah, Inan, sharikah, Sharikah al-Wujuh, musaqat, and mukhabarah etc."
তিনি আরও বলেন, "The requirement of mutual aid is, in the opinion of Sha Wali Allah, the main ground for the prohibition of mysir (gambling) and riba (interest)"
৫. J.M.S. Baljon, ibid, p. 357
৬. ibid, p. 357
৭. ibid, p. 358

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা ছিল, প্রতিটি সভ্য সমাজের জন্যে একটি সরকার থাকবে, দেশ রক্ষা, আইন-শৃংখলা, ন্যায়বিচার ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে এবং জনগণের স্বার্থে দালান-কোঠা (বিশ্রামাগার), রাস্তাঘাট ও ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ করবে। এ ধরনের কাজ করার জন্যে সরকারকে অবশ্যই কর আরোপ করতে হবে। তবে তাঁর মতে, " আরোপের ক্ষেত্রে যাদের সামর্থ্য আছে কেবল তাদের উপরই কর আরোপ করতে হবে, এই নীতি অনুসৃত হবে"[১]।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী মনে করেন, বিলাসবহুল জীবন-যাপনে নিমগ্ন হলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। অন্যান্য ফকীহ্দের মত তিনিও প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ করেন। প্রয়োজন, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল [২]। তৎকালীন বৃটিশ শাসনের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের সামগ্রী যোগান দেবার জন্যে সীমিত সম্পদ বিলাসজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এতে সাধারণ জনগণের চাহিদা উপেক্ষিত হয়। তাঁর নিজ দেশ ভারতবর্ষের অধঃপতনের জন্যে তিনি দু'টো বিষয়কে দায়ী করেন[৩]। প্রথমত, কবি ও সাধু ধরনের লোকদের কার্য সম্পাদনের জন্যে অনুৎপাদনশীল কাজে অর্থ ব্যয় এবং দ্বিতীয়ত, চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরের উপর এত উঁচু হারে কর আরোপ করা হয় যে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে তার বিশ্লেষণের সাথে শত বছর পরের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের উদ্ভাবক কার্ল মার্কস-এর বিশ্লেষণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত[৪]।

❑ চতুর্থ পর্ব: আধুনিক কাল (১৩৫০হি./১৯৩২খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

ইসলামী অর্থনীতি আলোচনায় এর পর দীর্ঘদিনের স্থবিরতা দেখা দেয়। মুসলিম মিল্লাত জড়বাদী সভ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তার ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদী চিন্তাধারার নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। ইসলামকে নতুনভাবে জানা এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে শুরু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। সেই আন্দোলনে নতুন নতুন কর্মসূচী ও ইজতিহাদের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যার ইসলামী সমাধান নিয়ে এগিযে এসেছেন অনেক ফকীহ্, গবেষক, অধ্যাপক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও যুক্তিপূর্ণ রচনা বিশাল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে।

এই পর্বে সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী-এর নাম উল্লেখ্য [৫]। অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' এবং 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি হলো সুদ। এ সুদের ভয়ংকর সব ক্ষতিকর দিক তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুদবিহীন ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক মডেল প্রদান করেছেন। নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী তাঁর বইয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক মডেলের রূপরেখা তুলে ধরেছেন [৬]।

---

১. ibid, p. 364
২. G.N. Jalbani, *The Socioeconomic Thought of Sha Wali Allah,* Dr. A. H. M. Sadeq (edi.), ibid, p. 379.
৩. G.N. Jalbani, ibid, p. 379.
৪. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৫. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৬. ড. নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী, *সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা*, অনু: মাওলানা কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: আঞ্জুমানে মুছান্নিফীন, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ১১-২০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একটি গ্রহণযোগ্য মুদ্রা-নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. এম উমর চাপরা আলোচনা করেছেন তাঁর 'Towards a just Monetary System' গ্রন্থে। তাঁর 'Islam and the Economic Challenge' গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা, সমাজতন্ত্রের পশ্চাদাপসারণ, কল্যাণ রাষ্ট্রের সংকট, উন্নয়ন অর্থনীতির অসঙ্গতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করেছেন[১]। উপরন্তু ইসলামী বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল, অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং মানবসম্পদ উজ্জীবন ও উন্নয়ন সম্বন্ধেও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সকল আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান ইসলামে-ই নিহিত রয়েছে।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর 'ফিক্হ আল-যাকাহ' গ্রন্থ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কিভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা উচিত তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন[৩]। যাকাত বিষয়ে তিনি যেমন কতিপয় পুরাতন প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেছেন তেমনি নতুন কিছু প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেছেন।

বাক্বীর আল-সদর তাঁর 'ইকতিসাদুনা' বইয়ে যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর পর্যপ্ত পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ বিলাস-সামগ্রী উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহার না করার উপর জোর দিয়েছেন। এ জন্যে রাষ্ট্রকেই ভূমিকা রাখতে হবে[৪]। উপরন্তু প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি জীবন-যাপনের মানেরও ভারসাম্য বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তারও গ্যারান্টি দেবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপরও তাঁর আলোচনা রয়েছে।

সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মুহম্মদ হিফযুর রহমান তাঁর 'ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম' গ্রন্থে। খারাজ নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিতর্ক রয়েছে ফকীহ্দের মধ্যে। পাক–ভারত উপমহাদেশেও এ বিতর্ক ছিল। এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করেছেন মুফতী মুহাম্মদ শফী' তাঁর 'ইসলাম কা নিযাম-ই আরদ' গ্রন্থে। ইসলামী কাঠামোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে সংঘটিত হবে, কেমন হবে তার গতি-প্রকৃতি ইত্যাকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন খুরশীদ আহমদ তাঁর বই 'Islamic Approach to Development: Some policy Implications'-এ। ড. এম উমর চাপরা তাঁর 'Islam and Economic Development'-এ এবং আবুল হাসান এম. সাদেক তাঁর 'Economic Development in Islam' গ্রন্থে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন[৫]।

---

১. M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (Leicester: The Islamice Foundation 1992 A.D) p.86
২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনু: মাওলানা মহাম্মদ আবদুর রহীম (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.) ১ম ও ২য় খন্ড, পৃ.১৬
৩. ইফাবা গবেষণা বিভাগ সম্পাদিত, *ইসলামী অর্থনীতি*, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ খ্রি:) প্রবন্ধ: মুহাম্মদ আবদুর রহীম থেকে (সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত, পৃ. ৯৫-১০৮ থেকে সংগৃহীত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনামূলক লেখার সংখ্যা বর্তমান সময়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য সকলেই যে নতুন চিন্তা বা বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট এমন নয় তবু এসব লেখার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা হচ্ছে। ফলে ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটছে যার বাস্তবায়ন হলে পৃথিবী একটি শোষণ ও দারিদ্রমুক্ত সমাজব্যবস্থা উপহার পেতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি এবং এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্যে অনেকেই এখন বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং পড়াশুনার জন্যে বই-পত্রের খোঁজ-খবর করছেন। অনেকে গবেষণার জন্যে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবন-নির্দেশিকা আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদী বিষয়ের। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বেশ কিছু কালজয়ী দিক-নির্দেশনা রয়েছে হাদীস শরীফে। সে সবের উপর ভিত্তি করে আলোচনা ও বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামের সোনালী যুগে। সে আলোচনার ভাষা ছিল আরবী। সাম্প্রতিককালে ফার্সী, তুর্কী, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আধুনিককালে অর্থনীতির আলোচনা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং ক্রমাগত গাণিতিক, ইকোনমেট্রিক ও পরিসংখ্যাননির্ভর জটিল রূপ পরিগ্রহ করছে। সেই আলোকে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও চিন্তার জন্যে প্রয়োজন দস্তুরমতো ভাল বই, পত্র-পত্রিকা ও গবেষণামূলক জার্নাল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী তাঁর যুক্তিপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগাতে ও বিপুল আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তিনি প্রধানতঃ উর্দূতে লিখেছেন। সাম্প্রতিককালে যাঁরা আরবীতে এ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ ও বই রচনা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আনাস জারকা, ইউসুফ আল-কারযাভী, সুলতান আবু আলী, মুস্তাফা আল-জারকা, মুহাম্মদ আহমদ সাকর, আহমদ আল-নাজ্জার, রফিক ইউনুস আল-মিসরী, আবদুর রহমান ইউসুরী, বাকীর আল-সদর, আবু সউদ, কাউসার আবদুল ফাতাহ আল-আবজী, মাবিদ আল-জারহী এবং ইউসুফ কামালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য [১]।

ইসলামী অর্থনীতি বিশেষ করে এর ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি, মুদ্রা-বাজার, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা, ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, কর কাঠামো, সুদের বিলোপ ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, পুঁজি বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন, যাকাতের ভূমিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রতিপাদ্য ও বিতর্কের অবতারণা হয়েছে ও হচ্ছে ইংরেজী ভাষাতেও। ইংরেজীতে এখন প্রচুর বই, পুস্তিকা ও গবেষণা জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে উৎসাহ নিয়ে লিখে চলেছেন মুসলিম অধ্যাপক ও গবেষকগণ। সেই সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন বেশ কিছু আগ্রহী অমুসলিম অর্থনীতিবিদও[২]।

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিগত তিন দশক ধরে ইংরেজী ভাষায় যেসব খ্যাতনামা মুসলিম গবেষক ও অধ্যাপক বই ও প্রবন্ধ লিখছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. এম. উমর চাপরা, মনযের কা'ফ, সাবাহউদ্দীন যাইম, সাইয়েদ নওয়াব হায়দার নকভী, মুহাম্মদ আরিফ, এম. আবদুল মান্নান, ফাহীম খান, মুনাওয়ার ইকবাল, মাসুদুল আলম চৌধুরী, আব্বাস মিরাখর, মোহসীন এস.খান, জিয়াউদ্দিন আহমদ, আউসাফ আহমদ, আকরাম খান, ড. আবুল হাসান এম সাদেক, যুবায়ের ইকবাল, সাইয়েদ তাহির, বু'আলীম বিন জিলালী, আবদুল আযিম ইসলাহী, তরিকুল্লাহ খান প্রমুখ[১]। এদের মধ্যে কেউ কেউ উর্দূতেও লিখে থাকেন [২]। অমুসলিমদের মধ্যে যাঁরা গবেষণা করছেন[৩] এবং লেখালেখি করছেন তাঁদের মধ্যে ভোলকার নিয়েনহাইস (বখুম বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী), জন আর. প্রেসলি (লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য), ফ্রাংক ই. ভোগেল (হার্ভার্ড ল স্কুল, যুক্তরাষ্ট্র), রডনি উইলসন (ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য) বাদল মুখার্জী (দিল্লী স্কুল অব ইকোনমিকস, ভারত) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য[৪]।

ইংরেজী ভাষায় রচিত এসব বই-পুস্তিকা ও গবেষণা জার্নাল প্রকাশ এবং ইসলামী অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী চর্চা ও গবেষণায় আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে এখানে সেগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদের মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট[৫]। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, সংকলন, গবেষণাপত্র ও অনুবাদ মিলিয়ে শতাধিক বই প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরবী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও প্রায় সমসংখ্যক। এরপরেই যে প্রতিষ্ঠানটির অবদান উল্লেখযোগ্য সেটি হলো জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আযীয ইউনিভারসিটির 'সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স'[৬]। ইসলামী অর্থনীতির নানা শাখায় গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা গবেষক-পন্ডিতদের সমাবেশ ও সম্মিলন ঘটানোর অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত এই সেন্টারটি এযাবৎ চল্লিশটির বেশী গবেষণা প্রবন্ধ, বই ও সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের সম্পাদিত সংকলন প্রকাশ করেছে[৭]।

এর পরেই যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থান। দাওয়াধর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী অর্থনীতির উপর ইতোমধ্যে বিশটির বেশী মূল্যবান বই প্রকাশ করেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউট অব পলিসি ষ্টাডিজ (ইসলামাবাদ),ইন্টরন্যাশনার ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ইন্টরন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া (কুয়ালালামপুর), শেখ মুহম্মদ আশরাফ পাবলিকেশন্‌স (লাহোর), পেলানদুক পাবলিকেশন্স (কুয়ালালামপুর), লংম্যান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি[৮]।

---

১. প্রাগুক্ত
২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৫৪ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. এম এ হামিদ ' ইসলামী অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৭. প্রাগুক্ত
৮. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, অনুঃ আবুসালেহ মহাম্মদ তোহা (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩, খ্রিঃ) পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে বিদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীও প্রদান করা হচ্ছে। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে ইতোমধ্যে এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ডক্টরেট ডিগ্রীর সংখ্যা তিন শতাধিক[১]। এশিয়াতে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ছাড়া সউদী আরব, ইরান, জার্মান ও ভারতের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতির উপর নিয়মিত গবেষণা চলছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের লাফবরো ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর উপর প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাজুয়েশন ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহী প্রধান ও কর্মকর্তাদের জন্যে 'Intensive training course' চালু করেছে। ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি পাঁচটি কোর্স সম্পন্ন করেছে। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Harvard University Forum on Islamic finance[২]।

❑ বাংলাদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতির চর্চা, এবং এ বিষয়ে বইপত্র লেখার কাজ শুরু হয় ১৯৫০ এর দশকে মূলতঃ অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে[৩]। এদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বিশ্ববরেণ্য পন্ডিত ও গবেষক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর উর্দূ বইয়ের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা–ভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি নিজেও 'ইসলামের অর্থনীতি' নামে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ও আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষা ও বিশ্লেষণের নিরিখে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখেন। বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপর ধীরে ধীরে মওদুদীর আরও কিছু বই অনুবাদের পাশাপাশি তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন[৪]।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বই রচনার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের অনুবর্তী ছিলেন হাসান জামান, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, শাহ আবুদল হান্নান, রায়হান শরীফ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ। ১৯৭০-এর দশকের শেষে বেশ কিছু অধ্যাপক-গবেষক একযোগে লিখতে শুরু করেন পত্র-পত্রিকায়। তাদের বইও প্রকাশিত হতে শুরু করে [৫]। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল হাসান এম. সাদেক, আলী আহমদ রুশদী, আতাউল হক প্রামাণিক, এম.এ.হামিদ, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, জহুরুল ইসলাম, কাজী মর্তুজা আলী। তরুণদের মধ্যে যারা এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন তারা[৬] হলেন এম. কবির হাসান, মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, এস.এম. আলী আক্কাস, আবদুল আউয়াল সরকার, মাহমুদ আহমদ, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত
৩. এজেডএম শামসুল আলম প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৪. প্রাগুক্ত
৫. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪৫ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ এদেশে এই বিষয়ের চর্চাকে এগিয়ে নিয়েছে। যারা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল মান্নান তালিব, ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, শাহ্ আবদুল হান্নান, মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ। উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বাংলায় সবচেয়ে বেশী অনুদিত হয়েছে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, ড. এম উমর চাপরা, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইউসুফ আল-কারযাভী ও মুফতী মুহাম্মদ শফীর গ্রন্থ। এতো কিছুর পরেও বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান শ্রেণী পর্যায়ে মানসম্মত টেক্সট বইয়ের অভাব ছিল প্রকট। গত শতাব্দীর একেবারে শেষে এসে এই অভাব অনেকখানি পূরণ হয় প্রথমে আবদুল মান্নান চৌধুরী ও পরে এম. এ. হামিদের প্রচেষ্টায়। শেষোক্ত জনের বইটি ইংরেজীতে রচিত। বাংলায় এটির অনুবাদ-সম্পাদনা করেছেন শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বিপুল চাহিদার কারণে ইতোমধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়েছে[১]।

ইসলামী অর্থনীতির চর্চা এদেশে বেগবান হয় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় 'ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠার পর হতে। আধুনিক অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষিত ও একই সঙ্গে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী বেশ কিছু তরুনের নিরলস প্রচেষ্টার সফল ফসল এই ব্যুরো। ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ছাড়াও বই ও জার্নাল প্রকাশের ব্যাপারে ব্যুরো শুরু হতেই বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেয়। প্রায় সমসাময়িক সময়ে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও। প্রতিষ্ঠানটি বিগত তিন দশকে বিশটির মত বই প্রকাশ করেছে ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ে। এসব বইয়ের মধ্যে যেমন রয়েছে মৌলিক রচনা তেমনি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী ও উর্দূ বইয়ের অনুবাদ[২]।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২. ড. এম উমর চাপরা, অনুঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগী বৃন্দ পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ

প্রচলিত অর্থব্যস্থার কতগুলো মূলনীতি রয়েছে। এ সব মূলনীতি ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতেই অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতাকে (Laissez-faire)[১] পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। সামাজিক মালিকানাকে[২] সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়েছে। ইসলাম উপস্থাপিত অর্থব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত। অনেক বেশি অর্থনৈতিক মূলনীতি ও নিয়মাবলী রয়েছে। তবে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো প্রধানত: আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস এবং শরী'আহর অন্যান্য উৎস হতে উৎসারিত। শরী'আহভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান মূলনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দূর্নীতির প্রতিরোধ, সুদ নিষিদ্ধকরণ, সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, দু:স্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা (যাকাত), ব্যবসা ও জীবিকা অনুন্ধানের অধিকার, অর্থ ও সম্পদের জমাকরণের (Concentration) বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব এবং ইসলামের মীরাসী ব্যবস্থা বা উত্তরাধিকার ব্যবস্থা।

এ মূলনীতিগুলোর আলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সকল ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি এবং কর্মোদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ [৩] :

- ❑ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দূর্নীতির উচ্ছেদ;
- ❑ সকল কর্মকান্ডে শরী'আহর বিধি-বিধান অনুসরণ;
- ❑ 'আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহ্সান (কল্যাণ)-এর প্রয়োগ;
- ❑ ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- ❑ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রয়াস;
- ❑ মৌলিক মানবিক প্রয়োজনপূরণ নিশ্চিতকরণ;
- ❑ সুদ নিষিদ্ধকরণ;
- ❑ অর্থ-সম্পদ জমাকরণের বিরুদ্ধে নিরুৎসাহিতকরণ;
- ❑ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি;
- ❑ যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- ❑ উত্তরাধিকার ব্যবস্থার (মীরাসী ব্যবস্থার) প্রবর্তন এবং
- ❑ যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন।

---

১. প্রাগুক্ত
২. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

❑ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দূর্নীতির মূলোৎপাটন

সংকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান মূলনীতি। সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত। এ সম্পর্কে আল-কুরআন ঘোষণা করছেঃ

"আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে[১]"। আল-কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য আয়াতে সৎকর্মের জন্য 'আল-মা'রূফ' এবং অসৎকর্মের জন্য 'আল-মুনকার' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম যে সব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো 'আল-মা'রূফ'-এর অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে চিহ্নিত, তা সবই 'আল-মুনকার'-এর অন্তর্ভূক্ত [২]।

আল-কুরআন আরো ঘোষণা করছে,

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে, এরাই সফলকাম[৩]।" আল-কুরআন ঘোষণা করছে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর, অসৎকর্মে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর[৪]।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয় [৫]।"

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার গুরুত্ব সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শাফী' বলেন, "আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দূর হয়ে যাবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং আল্লাহর আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের সাফল্যের চাবিকাঠি-এর মধ্যে-ই নিহিত ছিল [৬]।"

---

১. আল-কুরআন, ২২:৪১
২. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪
৩. আল-কুরআন, ৩:১০৪
৪. আল-কুরআন, ৩:১১০
৫. আল-কুরআন, ১০৩:১-৩
৬. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, পাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা মুফতী শাফী' (রহ) আরো বলেন, "মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, খোদাভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়ত, প্রচার বা তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন [১]।"

মুফাসসীরদের মতে, আল-কুরআনের বর্ণিত আয়াতগুলোর নির্যাস হলোঃ

⇨ সালাত কায়েম করা। ব্যাপকভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে গোটা সমাজকে সর্বকল্যাণের আধার মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া;

⇨ যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এরই ভিত্তিতে সমাজ সমষ্টির জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনপূরণ ও সুসংবদ্ধকরণের কাজ তরান্বিতকরণ;

⇨ কল্যাণময় কার্যাবলির প্রকাশ, প্রচার ও সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা এবং

⇨ সকল প্রকারের অকল্যাণকর, ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী, বিপর্যয় ও বিকৃতি উদ্ভাবক কার্যাবলি নিষিদ্ধকরণ, জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ ও মিথ্যার অপনোদন করা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর অন্ত র্ভূক্ত।

যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় যুগপৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্য বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেই, সে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় ও মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নেহী 'আনিল মুনকারের' বিধান নেই বলেই পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, সেই অর্থনীতি সচল রাখার উদ্দেশ্যে কৌশল বদলানো হচ্ছে। কখনও মার্কেন্টাইলিজম কে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব, কখনও বা অদৃশ্য হস্তকে (Invisible hand), কখনও পেয়েছে কল্যাণ অর্থনীতির (Welfare Economics) ধারণা, আবার কখনও বা প্রাধান্য পেয়েছে উন্নয়ন অর্থনীতি।

মানব জীবনের পরম প্রত্যাশা হচ্ছে শান্তি ও সমৃদ্ধি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অব্যাহত রয়েছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা। আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রায়শঃ অবক্ষয়িষ্ণু, অস্থিতিশীল, জটিল ও মন্দাকবলিত বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, কাম্য লক্ষ্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো নৈতিকতা বিবর্জিত ও ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। এরই প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্যে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মানুষের মধ্যে, সমাজের সকল স্তরে সত্য ও মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তারই প্রতিবিধানের জন্য সুনীতির সপক্ষে ও দূর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিতে ইসলাম নিদের্শ দিয়েছে। মানুষের চুড়ান্ত কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণে ইসলামের এই নির্দেশ অমোঘ ও কালজয়ী[২]।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী'(রহ) তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, অনুঃ ও সম্পাঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ কথা অধিক প্রযোজ্য। এ নীতি প্রয়োগের মৌল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সকল অপরাধমূলক, নাশকতামূলক, হিংসাত্মক ও চরিত্র বিধ্বংসী কাজসহ খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত থাকা যেন মানুষ মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে 'উসওয়াতুন হাসানা' ও 'ইনসানে কামিলের' প্রতিবিম্ব হতে পারে। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে এ অর্থব্যবস্থার মুলনীতিসমূহের মধ্যে এটি সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে [১]।

❑ সকল কর্মকান্ডে শরী'আহ্‌র অনুসরণ

ইসলাম-এর অনুসারীদেরকে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের জন্য অবাধ ও অবারিত সুযোগ বা স্বাধীনতা প্রদান করেনি। বরং আয়-উপার্জনের উপায় ও পন্থার মধ্যে জাতীয় ও সামগ্রিক স্বার্থের প্রেক্ষিতে জায়েয-নাজায়েয-বৈধ-অবৈধের পার্থক্য সূচিত করেছে। এ পার্থক্যের একটি বিশেষ মূলনীতি রয়েছে তা হলো অর্থ উপার্জনের পন্থা ও উপায়ে এক ব্যক্তির লাভ অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষতি হয় তা শরী'আতে অনুমোদিত নয়। অপর দিকে যে ক্ষেত্রে মুনাফা ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়সংগতভাবে বন্টন হয়, তা সবই ইসলামে বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। আল-কুরআন এ মূলনীতিটি ঘোষণা করছেঃ

"হে ঈমানদারগণ ! পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করিওনা। সব রকমের লেনদেন হইতে হইবে পারস্পরিক সন্তোষ ও সম্মতির ভিত্তিতে এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। যে কেহ স্বীয় কার্য সীমা লংঘন করিয়া যুলুম সহকারে এইরূপ কাজ করিবে, তাহাকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব[২]।"

সুতরাং আল-কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত নীতিমালার আলোকে বলা যায়, জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কাউকে অবারিত স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে জীবিকার অন্বেষণকালে সব সময় দু'টি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, উপার্জিত জীবিকা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো 'তাইয়্যেব' বা সৎ পথে উপার্জন করতে হবে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে একাধিক নির্দেশনা রয়েছে। আল-কুরআনের নির্দেশনায় জীবিকার ব্যাপারে 'হালাল'ও 'তাইয়্যেব' এ দু'টি নীতিই উল্লেখ করা হয়েছে[৩]। এর অর্থ হলো, খাওয়া-পরা, পোশাক-আশাক এবং বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার এমনকি; সকল প্রকার উপার্জন-উপকরণের ব্যাপারে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সার কথা হচ্ছে, মানুষের শারীরিক ব্যাধির উৎস কিংবা তাকে ধ্বংসকারী পদার্থ দ্বারা তৈরী সকল বস্তু অথবা যে সব বস্তু মানুষের মধ্যে পশু শক্তির উত্তেজক এবং তার সংযত স্বভাব বিনষ্ট করে আত্মিক ও নৈতিক ব্যধির কারণ হয়ে থাকে এ ধরনের সকল বস্তুর আহার, ভোগ, উৎপাদন ও বিপণন শরী'আহ অনুমোদিত নয়-ই শুধু বরং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩০
২. আল-কুরআন, ৪:২৯-৩০
৩. আল-কুরআন, ২:১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে 'হালাল' ও 'তাইয়্যেব'-এর বিপরীতে হারাম ও খবীস (অপবিত্র)-এর কিছু কিছু শ্রেণী বিভাগও উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু কিছু শুধু নীতিগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে[১]। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পুরুষদের রেশমী পোশাক, ফুল কাটা জরীদার রেশমী বস্ত্র, মোটা রেশমের পোশাক পরা, রেশমের তৈরি গদীতে বসা এবং রক্তিম রঙ্গের পোশাক পরা নিষিদ্ধ করেছেন[২]। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকারের পোশাক পরেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান ও লাঞ্চনার পোশাক পরাবেন[৩]।" রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, "তোমরা মুসলমান (পুরুষ ও মহিলা) সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার করোনা[৪]।" হযরত হুযাইফা (রা) বলেন, সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা, রেশমী বস্ত্র ও ফুলকাটা জরীদার রেশমী পোশাক পরিধান করা এবং রেশমী কাপড়ের বিছানায় বসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তির শরীরের মাংস ও চামড়া জুলুম ও সুদ দ্বারা তৈরী হয়েছে তার জন্য নরকের আগুনই শ্রেয় [৫]।"

বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কিছু কিছু পেশা, খাদ্য ও পানীয় এবং কর্মকান্ডকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ সব কর্মকান্ড, খাদ্য ও পানীয়ের ভোগ-উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল কিছুই হারাম বা নিষিদ্ধ। অনুরূপ শরী'আহর সীমার মধ্যে বেশ কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ বলেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন অর্থনীতিতেই এ ধরনের বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের বিধান নেই। বরং পুজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সরকার বা আইন পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদে কোন কাজকে বৈধ আবার কোন কাজকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে থাকে। মানুষের মনগড়া মতবাদেই কেবল এ সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একই ধরনের কাজ একবার আইনত নিষিদ্ধ আবার অন্য সময়ে আইনত বৈধ হয়। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ পান ও মদ তৈরী নিষিদ্ধকরণ ও পরবর্তীকালে পুনরায় অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইসলামে এই ধরনের কোন সুযোগ নেই। যা বৈধ-চিরকালের জন্য ও সকলের জন্য বৈধ এবং যা নিষিদ্ধ বা অবৈধ তা চিরকালের জন্যে ও সকলের জন্যেই অবৈধ। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অনুমতি থাকলে বা আইনের বিধান করে নিয়ে যে কোন সমাজবিধ্বংসী ও মানবতার জন্যে অবমাননাকর কাজও বৈধতার রূপ পেয়ে যায়। জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি সমাজ বিধ্বংসী ও মানবতার জন্য অবমাননাকর। কিন্তু যথোপযুক্ত ফী দিয়ে লাইসেন্স করে নিলে কি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই এ দুটি কাজ শুধু বৈধ নয়, সমাজেরও অনুমোদন পেয়ে যায়। বিপরীতক্রমে যা হালাল বা বৈধ তা প্রাপ্তির বা অর্জনের চেষ্টা করা এবং যা হারাম বা অবৈধ তা পরিত্যাগ বা বর্জনের চেষ্টা করা ইসলামী জীবন-বিধান ও ইসলামী অর্থনীতির অপরিহার্য দাবী।

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, অনু: আবদুল মতিন জালালাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩
২. মাওলানা হিফজুল রহমান, অনু: মাওলান আবদুল আওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❑ 'আদল ও ইহসান-এর প্রয়োগ

সুবিচার বা ন্যায়বিচারক শব্দটির আরবী প্রতি শব্দ 'আদল'। 'আদল'-এর অভিধানিক অর্থ হল যথাস্থানে রাখা, যথাযথ করা, সঠিক করা, বাস্তবসম্মত করা, সমান সমান করা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, সমতা নিরূপণ করা, ন্যায়বিচার করা, কমবেশি না করা, কোন কিছুকে দাবিদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া ও যে যেখানে যতটুকু পাবে তাকে সেখানে ততটুকু দেয়া ইত্যাদি [১]। এ অর্থেই বিচারালয়কে আরবীতে 'আদালত' বলা হয়[২]।

ইমাম রাগিব ইসফাহানী-এর মতে, 'আদল' অর্থ বিচারের ক্ষেত্রে কোন রূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমান সমান করা [৩]। আল-কুরআনে সুবিচারের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো 'আদল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে [৪]। ন্যায়ানুগ ও সুবিচারের অতিরিক্ত প্রদানকে 'ইহসান' বলা হয় [৫]। 'আদল' শব্দের বিপরীত শব্দ 'যুল্‌ম'-এর অর্থ কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে না রাখা, সুবিচার না করা, অবিচার করা, যার যা প্রাপ্য যথাযথভাবে তাকে তা প্রদান না করা। 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্যকোন অর্থনৈতিক মতবাদ বা মতাদর্শে সুবিচারের এই প্রসংগটি একেবারেই উপেক্ষিত।

ঐ সব অর্থব্যবস্থায় দুর্বল, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের এবং সমাজের হতভাগা লোকদের জন্যে স্বীকৃত কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাজ্যের মহামন্দা এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর চাপের মুখে পরবর্তীকালে কিছু কিছু কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে । প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহে 'আদল' ও 'ইহসান' এর মত নীতির অনুপস্থিতির ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। ধন-সম্পদে বৈষম্য আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি-এর আলোচনায় এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়টি মুসলিম জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার অবিচার নির্মূল করাকে আল-কুরআনে আল্লাহর রাসূলগণের প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ এ বিষয়ে আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনাগুলো পর্যালোচনা করে বলেন, কম করে হলেও আল-কুরআনে প্রায় শতাধিক স্থানে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করা হয়েছে, কোথাও প্রত্যক্ষ বর্ণনা বা বর্ণনাভঙ্গির সাহায্যে। এ ছাড়া, 'জুল্‌ম', 'ইছম', দালাল বা অন্যান্য শব্দের মতো শব্দসমষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে অবিচারের বিরুদ্ধে আল-কুরআনে দুই শতাধিক স্থানে তিরস্কার করা হয়েছে।

---

১. আল্লামা ইব্‌ন মানযূর, "*লিসান আল-'আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৬ পৃ.১২৩
২. প্রাগুক্ত. খ. ৬ পৃ. ১২৪
৩. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
৪. আল-কুরআন, ১৬:৯০, ৫৭:২৫, ৭:২৯, ৪:৪৮, ৪৯:৯ এবং ৬০:৮
৫. আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

মূলত, ইসলামী বিশ্বাসের গুরুত্ব অনুসারে আল-কুরআনে ন্যায়বিচারকে আল্লাহ ভীতির পরেই স্থান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ভীতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর কারণে মানুষ ন্যায়বিচারসহ সকল ভালো কাজে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ন্যায়বিচারের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতিকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "অবিচার থেকে সতর্ক হও, কারণ শেষ বিচারের দিনে তা গহীন অন্ধকারে নিয়ে যাবে[১]।" বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ্ ইব্নে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮খ্রি.) ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এক্ষেত্রে তা পুণঃপ্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "অবিশ্বাসী হলেও আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন এবং বিশ্বাসী হলেও অন্যায় আচরণকারী রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন না এবং বিশ্ব অবিশ্বাস ও ন্যায়বিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম অবিচার নিয়ে টিকে থাকতে পারে না [২]।"

ইসলাম ও অবিচার পরষ্পর বিরোধী এবং যে কোন একটির দুর্বল বা নির্মূল হওয়া ছাড়া একসাথে চলতে পারে না। একই সঙ্গে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটিও ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় যতটুকু গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে অন্য কোনও অর্থব্যবস্থায় তা অনুপস্থিত। আল্লাহ্ পাক কেবল সুবিচারের কথাই বলেননি 'ইহসান' বা সু-আচরণের কথাও বলেছেন। সুবিচার পাওয়াতো প্রত্যেকের অধিকার। তবে সুবিচারের অতিরিক্ত জনগণকে দিতে হবে এবং সেটাই হচেছ 'ইহসান'। দূর্বল ও বঞ্চিতদের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকে কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। মূলতঃ এ কারণেই যাকাতের মতো একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উশর, সাদাকাতুল ফিতর ও কারদ হাসান। সমাজে যারা মন্দভাগ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দূর্বল তাদের সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হয় যদি যথোচিতভাবে যাকাত এবং উশর আদায় ও বন্টন করা হয়, ফিতরা প্রদান করা হয় এবং 'কারদ হাসান'-এর দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়। দূর্বল, অসচ্ছল, বঞ্চিত, ইয়াতীম, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, পীড়িত ও আর্তজনেরা অর্থনৈতিক এ কল্যাণ ইসলামী সমাজে পায় তাদের অধিকার হিসাবেই, দয়ার দান হিসেবে নয়। পরিশেষে বলা যায়, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের দৃঢ় অঙ্গীকারের দাবি হচ্ছে, মানুষের নিকট গচ্ছিত আল্লাহর পবিত্র আমানত সকল সম্পদকে মাকাসিদ আশ-শরীআহ্র লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা।

---

১. ইমাম মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬:৫৬

২. Ibn Taymiyyah, Ibid, p. 94

Dhaka University Institutional Repository

❑ ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সাধারণত দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তাই ইসলাম অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এ জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়া আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীসহ অন্যান্যদের অধিকার রয়েছে।

সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীদের কেউ নূন্যতম প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীকে সহায়তা করা তার সামাজিক দায়িত্ব। এভাবে ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় ও পদ্ধতিতে কোন জাতির বা দেশের এক-একটি পরিবার যদি স্ব স্ব আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেশ হতে দারিদ্র যেমন দূর হবে তেমনি পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। ইসলাম প্রয়োজনে অন্যদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাসহ যাবতীয় বিষয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়া বা এগিয়ে আসাকে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। তাক্বওয়ার গুণাবলীতে অন্তর্ভূক্ত করেছে । ইসলাম শুধু দান-খয়রাত করাকে উৎসাহিত করেনি বরং এক্ষেত্রে নিজের প্রিয়বস্তুকে আল্লাহ্‌র পথে দান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ।

ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আর্থ-সমাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক দায় দায়িত্বের চেতনা জাগ্রত করা। ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন এবং যে কোন স্তরের নাগরিক হোক না কেন, ততক্ষণ সে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে, যতক্ষণ তার সাধ্য বহির্ভূত, কিংবা তাকে পরাভূতকারী কোন অনিবার্য কারণে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, তার জীবন ধারণ ও আরাম-বিনোদনের নিরাপত্তা প্রদান করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য যে সব বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নির্দেশনা দিয়েছে তা পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যকোন অর্থব্যবস্থায় রয়েছে মর্মে আমাদের জানা নেই। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নির্বিশেষে সকলের জন্য যে ইনসাফ ও ন্যায়পরতার অনুপম আর্দশ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজীর বিহীন। এক্ষেত্রে খলীফা উমর (রা)-এর উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য। একবার খলীফা উমর (রা) এক ইয়াহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তার ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। ইয়াহুদীর অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি নিজেকেই তিরস্কার করতে লাগলেন এবং তাকে বললেন, ওহে! আমরাই তোমার প্রতি ইনসাফ করিনি, তুমি যখন সামর্থ্যবান ছিলে, তখন তোমার নিকট থেকে আমরা জিযিয়া উসূল করেছি। আর এখন তোমার সামর্থ্যহীন অবস্থায় তোমার খোজ-খবর নেইনি। এ অবস্থায় খলীফা ওমর (রা) তার জন্য বায়তুলমাল হতে তার প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দেন [১]।"

---

১. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ.) , অনু. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.১৪১

Dhaka University Institutional Repository

❑ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি

ইসলাম একদিকে ধন সম্পদকে জাতির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আবর্তিত করবার ও ধনাঢ্য-সম্পদশালীদের অর্থ-সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গরীব নিস্বঃদের অংশীদার বানাবার ব্যবস্থা করেছে। অপরদিকে ইসলাম সবকিছুতেই 'মধ্যম পন্থা সর্বোত্তম পন্থা' নীতির আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয়সহ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমনীতি ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিতব্যয়িতা ও অর্থব্যয়ের মধ্যম নীতি অবলম্বন করলে এবং ভারসাম্যপূর্ণ সাদাসিদে জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করলে ব্যক্তিগণ তাদের আর্থিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করবার ব্যাপারে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ি, কৃপণতা বা অপচয় করে অর্থ সম্পদ বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট করবে না। ইসলামী জীবন দর্শন বৈরাগ্যবাদ কিংবা অতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগবাদের মধ্যে সমন্বয় করেছে। বৈরাগ্যবাদী সংসারত্যাগী পার্থিব কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ না করার ফলে মানুষের কল্যাণ সাধন করা তার সাধ্য বা ক্ষমতা বহির্ভূত।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের তাৎপর্য ও মূল বক্তব্যই হলো নিজে সৎ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা, অন্যকে সেভাবে জীবন-যাপন করতে সহযোগিতা করা। প্রকৃত মুসলিম আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের জন্যে, না নিজের সব মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনাকে বিসর্জন দেবে, না অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে নেবে। বরং কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে তার যাত্রার সহযোগী করে নেবে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকদের। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ লিপ্সা মানুষকে অন্যায়ের পথে প্ররোচিত করে। পরিণামে সমাজে অশুভ পরিণতি ডেকে আনে। অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে নিজের অর্থ-সম্পদ জাহির করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এ সব অর্থ-সম্পদের লোভ-লিপ্সা লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এ সবই ইসলামে নিন্দিত ও ঘৃণিত। আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে " সেই সব লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে যা তাদের দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে[১]"। আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বলেন, "তোমরা কখনো অযথা ব্যয় করোনা। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই[২]।"

বরং ইসলাম ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল-কুরআনের ঘোষণা:

" তারাই আল্লাহর নেক বান্দাহ যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এই উভয়ের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে[৩]।

আল-কুরআন আরো ঘোষণা করছে: "পানাহার করো, অপব্যয় করো না [৪]।"

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে: "নিজের হাত নিজের ঘাড়ের সাথে বেঁধে ফেলো না (কৃপণতা করোনা) আবার একেবারে খুলেও দিওনা (অপব্যয় করো না)[৫]।"

---

১. আল-কুরআন, ৪:৩৭
২. আল-কুরআন, ১৭:২৭
৩. আল-কুরআন, ২৫:২৬
৪. আল-কুরআন, ৭:৩১
৫. আল-কুরআন, ১৭:২৯

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ ইবন কাসীর ইমাদুদ্দীন তাঁর তাফসীরে লিখেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা 'ইনফাক' বা খরচ করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে 'ইসরাফ' বা অপব্যয় না করার কথাও বলে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন[১]। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, ন্যায়ের পরিপন্থী সকল প্রকার ব্যয়কে 'তাবযীর' বলা হয়। 'ইসরাফ' বা অপব্যয় এবং 'তাক্তীর' বা কৃপণতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাফসীর বিশারদগণ একাধিক অভিমত উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠতর ও যুক্তিগ্রাহ্য অভিমতটি হলো, আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণ বর্ণনা করেছেন যে, জীবিকা ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তারা অযথা সীমালংঘন বা অপব্যয় করেনা এবং অযথা কৃপণতা করে না[২]।

❑ মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিতকরণ

ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা ভাইসজারেন্ট (Vicegerent)- এখানে বলা হয়নি যে কেবল মুসলমানরাই আল্লাহর খলীফা, বরং বলা হয়েছে মানুষ আল্লাহর খলীফা। এখানে আদম (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত প্রত্যেক নর-নারীদের বুঝানো হয়েছে। ধনী-গরীব, শ্রমিক-মালিক, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম, অঞ্চল ও নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহর খলীফার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। একই খিলাফতের দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর অর্পিত। এ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সকলের মর্যাদা ও অধিকার সমান ও সকলের দায়িত্ব একই। বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্ব নবী (সা) বলেছেন, "সকল মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরী [৩]" মানুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত এবং সকলের সৃষ্টির উপাদানও এক ও অভিন্ন। সুতরাং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। দুনিয়ার সকল মানুষকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করার এর চেয়ে বড় কথা, এর চেয়ে অধিক সত্য আর কি হতে পারে। ইসলামের ঘোষণা হল, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একই উপাদানে তৈরী, একই উৎস থেকে উৎসারিত একই লক্ষ্য পানে পরিচালিত, এক মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং একই দায়িত্বশীলতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য যা মানব রচিত মতবাদ, মতাদর্শ কিংবা রাষ্ট্রীয়নীতি, পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা দুরীভূত করণের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের উন্নত জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করা ইসলামের লক্ষ্য। জীবন-যাপন পদ্ধতিতে যোগ্যতার মানদন্ডে মর্যাদাগত নূন্যতম পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু চরম বৈষম্য কিংবা মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পুরণের প্রশ্নে বৈষম্য থাকা ইসলামে স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়। এ পৃথিবীতে মানুষ অনাহারে থাকবে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অভাবে দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়ে জীবন-যাপন করবে, তা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বের (খিলাফতের) মর্যাদারও পরিপন্থী [৪]।

---

১. মাওলানা হিফজুর রহমান, অনু. মাওলানা আবদুল আওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২. Kitab al-Kasb of al-Shybani in al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut, Vol.30,pp-266-267
৩. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৪৬২
৪. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন হাযম (৩৮৪-৪৫৬হি./৯৯৪-১০৬খ্রি.) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুহাল্লা'তে মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরণ সম্পর্কে বলেন, "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকার বসবাসরত অসহায় দরিদ্র ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে দু:স্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন [১]।" সমাজে সামগ্রিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য যদি কখনও সরকারের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের হত দরিদ্র শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য যাকাতের সংগৃহীত সম্পদ যথেষ্ট নয়, তখন এ অসহায় শ্রেণীগুলোর প্রয়োজন মেটানো ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত করার জন্য ধনীদের সম্পদ হতে চাঁদা আদায় করার অধিকার সরকারের রয়েছে [২]।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার নিকট প্রয়োজনের বেশি শক্তি-সামর্থের উপকরণ রয়েছে, সেটা দূর্বলকে দিয়ে দেয়া উচিত। যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার উপকরণ রয়েছে, সেটা যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে দেয়া উচিত। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, নবী করীম (সা) এমনি করে বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম উল্লেখ করছিলেন। তাতে আমরা বুঝতে পারলাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখার আমাদের কোন অধিকার নেই [৩]। হযরত ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, "আজ যে কথা আমি অনুধাবন করলাম, যদি প্রথম থেকে তা বুঝতে পারতাম তাহলে এতটুকু বিলম্ব করতাম না নির্দ্বিধায় বিত্তবানদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে গরীব মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম [৪]।" হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর উদ্বৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইব্‌ন হাযম (রাহ) বলেন, "এ ব্যাপারে সকল মাযহাব ঐকমত্য ঘোষণা করেন যে, যদি কোন লোক ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র থাকে কিংবা প্রয়োজনীয় বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হয় তবে বিত্তবানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা তার ব্যবস্থা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য [৫]।"

ইমাম শাতিবী[৬] ও ইমাম গাজালী মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:[৭]

এক. জরুরীয়াত (Basic Needs)-অত্যাবশ্যকীয় যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য। তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি। সেগুলো নিম্নরূপ:

ক) দ্বীন বা আকীদা সংরক্ষণ (Protection of faith, Deen, Ideology) ঈমান, দ্বীন, আদর্শ।

খ) নফস সংরক্ষণ (Protection of life) : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবহন, পরিবেশ, বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধপানীয়, যোগ্যতানুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি যা সব মানুষের জীবন ধারনের সাথে সম্পৃক্ত।

---

১. ইব্‌ন হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৬, পৃ. ১৫৬-১৫৯
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত,
৪. ইরফান মাহমুদ রানা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬
৫. প্রাগুক্ত
৬. ইমাম শাতিবী, খ.২, পৃ.১৭৭
৭. ইমাম আল-গাজালী, আল-মুস্তাফা, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

গ) নস্‌ল সংরক্ষণ (Protection of posterity): পরিবার গঠনের অধিকার, বংশধারা সংরক্ষণ করা।

ঘ) 'আকল সংরক্ষণ (Intelect বা Reason): শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা।

ঙ) মাল সংরক্ষণ (Property, wealth): ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।

চ) হুররিয়াত সংরক্ষণ (freedom): স্বাধীনতা।

দুই: হাজিয়াত (Requirements বা comforts); প্রয়োজনীয় যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

তিন: তাহ্‌সিনিয়াত (Beautification):সৌন্দর্য বর্ধণ যা মানব জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে। যে কোন সমাজে আপামর জনসাধারণের 'জরুরীয়াত' মৌলিক নুন্যতম মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। এ কারণেই বর্তমানে অবক্ষয়িষ্ণু, অস্থিতিশীল, জটিল ও মন্দাকবলিত বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবনে আশঙ্কার ছায়া নেমে এসেছে। ক্ষুধা-দারিদ্র ও সহিংসতার আবর্তে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। কাম্য লক্ষ্য শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো বিগত ২৩ জুন ২০১২খ্রি. পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের ৫৭টি দেশের মানুষ বিক্ষোভ করেছে [১]। এ সব পরিস্থিতি হতে পবিত্রাণ পেতে হলে চাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যথার্থ ব্যবস্থা। ইসলাম তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এই প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির সম্পদে সমাজের 'Have-nots' দের অধিকারের স্বীকৃতি, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ একযোগে এই নিশ্চয়তা-ই প্রদান করে।

❑ যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মুলোৎপাটন

ইসলামের অর্থব্যবস্থায় 'যাকাত' এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, একে ইসলামের একটি রুকন-স্তম্ভরূপে গণ্য করা হয়েছে। সালাতের পরপরই আল-কুরআনে এর উল্লেখ করেছে এবং সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে যাকাত আর্থিক লোভ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দারিদ্রতা ও অসমতা দূরীকরণার্থে অনন্য ভূমিকা পালন করে। যাকাত হচ্ছে বিত্তবানদের ধন-সম্পদে আল্লাহ নির্ধারিত সেই অপরিহার্য অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহর আদেশে শরী'আহ্‌ নির্ধারিত খাতে ব্যয়-বন্টন করার জন্য দেয়া হয়। আল-কুরআনে যাকাতকে 'সাদাকাহ' বলা হয়েছে। যাকাত প্রদানকারীকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুসাদ্দিক' বলা হয়েছে। 'সাদাকাহ' শব্দের মূল 'সিদ্‌ক'-এর অর্থ হচ্ছে সত্যতা। 'সাদাকাহ্‌' হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ। যাকাত দাতা যাকাত দানের মাধ্যমে ঈমানের এ সত্যতার প্রমাণ দেয়। মাওয়ার্দী বলেছেন, 'সাদাকাহ' 'যাকাত', 'যাকাত' 'সাদাকাহ'। নাম পার্থক্যপূর্ণ হলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে তা এক ও অভিন্ন [২]।

---

১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৩ জুন, ২০১২ খ্রি. সংখ্যা
২. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত আদায় ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। এ বিষয়টি দাতার ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে অভাবী জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, সে জন্য ইসলাম শুরু থেকেই উৎসাহিত করেছে। জনগণের মনমানসিকতাকে সে লক্ষ্যেই গড়ে তুলেছে। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় স্থায়ী আইন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে যাকাত প্রদানকে বাধ্যতামূলক করে অভাবীদের অধিকার সংরক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছে।

❑ মিরাসী আইন বা উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানের উৎকর্ষতায়, বিকাশ ও প্রচারে ইসলাম অসামান্য অবদান রেখেছে। মানব সমাজের এমন কোন দিক নেই যেখানে মানসিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক চরম উৎকর্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও আর্থ-সামাজিক নিরপেক্ষতা বিধানে ইসলাম অবদান রাখেনি। ইসলাম উপস্থাপিত অর্থব্যবস্থায় মিরাসী আইন বা উত্তরাধিকার আইন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কালজয়ী ও অনন্য সংযোজন। নিজের প্রয়োজন পূরণ, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে ধন-সম্পদ কোন স্থানে পুঞ্জিভূত হবে, তাকে বিক্ষিপ্ত ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছে। সেই বিশেষ পন্থাটি হচ্ছে 'মিরাসী আইন' বা উত্তরাধিকার আইন[১]। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে পরিত্যক্ত সম্পত্তি-তার পরিমাণ কম বেশী যাই হোক না কেন, তা ওয়ারিশ বা উত্তরাধীকারির মধ্যে শরী'আহ নির্দেশিত নীতি-মালা অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ ভাগ-ভাটোয়ারা করে দেয়া। কারো কোন উত্তরাধিকারী না থাকলেও বা কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া না গেলেও তাকে পালকপুত্র বা কন্যা রেখে সম্পত্তিকে এক কেন্দ্রিক করে রাখার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়। এরূপ অবস্থায় তার সম্পত্তিকে বায়তুল মালে জমা করা হবে যেন এর দ্বারা সমগ্র জাতির লোক উপকৃত হতে পারে। 'মীরাস' বন্টনের এ আইন ইসলামে যেরূপ রয়েছে, তেমন আর বিশ্বের প্রচলিত কোন অর্থব্যবস্থায় বর্তমান নেই। বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদ এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকুক। কিন্তু ধন-সম্পদকে এককেন্দ্রিক ও পুঞ্জিভূত করে রাখা ইসলামের প্রত্যাশিত নয় বরং একে বিক্ষিপ্ত করা, বহু মানুষের মধ্যে একে ছড়িয়ে দেয়া এবং ধন-সম্পদের আবর্তন সহজতর করাই এর লক্ষ্য[২]।

❑ গবেষণা ও উন্নয়ন

'ইজতিহাদ' শরী'আতের গুরুত্বপুর্ণ উৎস। এ উৎসই ইসলামী শরী'আহ্কে যুগোপযোগী করেছে। গতিশীলতা ও গতিময়তা দান করেছে। ইসলামী শরী'আহ্র আইন প্রণয়নের ইতিহাসে ইজতিহাদ একটা অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য কার্যকরণ। কেননা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন এমন বহু বিষয় ও ব্যাপারই রয়েছে যে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে শরী'আতদাতা এমন বহু নিদর্শন ও নীতিমালা দাঁড় করে দিয়েছেন ও এমন কিছু নিয়মপন্থা বলে দিয়েছেন, যা এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে[৩]।

---

১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, অনূ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৫১

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বে ইজতিহাদের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। বরং এটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতির বিধি-বিধান রচনা ও ব্যবহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল-কুরআন ঘোষণা করছে:
"এবং আয়ত্বধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে এবং যা আছে ভূমন্ডলে তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে[১]।"
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বলেন, আল্লাহ তার অসীম অনুগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে পদানত করার এবং যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে রহস্য উম্মেষনের ক্ষমতা দিয়েছেন। এ অনুগ্রহই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের গবেষণা ও উন্নযন কর্মসূচী গ্রহণের জোর তাগিদ দেয়। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে যদি যথাযথ দক্ষ ও যোগ্য লোকের ঘাটতি দেখা দেয়, তা হলে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এ জন্যে নিন্দনীয় হবে, বিশেষ করে এই দায়ভার আরো বেশী তাদের যারা সমাজের নেতৃত্বে আসীন রয়েছে[২]। ইমাম গাজালী বলেন, "এই দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের যে সব ক্ষেত্রের জ্ঞান অপরিহার্য তাকে 'ফরয কিফায়া' গণ্য করতে হবে, যেমন, চিকিৎসা বিদ্যা, ঔষধ, গণিত, কৃষি, টেক্সটাইল, রাজনীতি এবং এমনকি রক্তমোক্ষণ ও টেইলারিং এর কাজ[৩]।"

❑ যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব কল্যাণ। শরী'আহ্‌র সকল প্রকার আইন-কানূন ও বিধি-নিষেধের লক্ষ্যই হলো মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। মানব জীবনের দু'টি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়টি হল দুনিয়ার জীবন যা ক্ষণস্থায়ী, আর দ্বিতীয় পর্যায়টি হল আখিরাতের জীবন, যা চিরস্থায়ী। এ পর্যায়দ্বয়ের কোনটাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার মানুষের সার্বিক কল্যাণের চিন্তা করা যায় না। আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অন্বেষণ করা মানবশুলভ বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী। আবার দুনিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু আখিরাতের মঙ্গল কামনা করাও যুক্তিসংগত নয়। সুতরাং ইসলাম উভয় প্রকার চরম পন্থার বিরোধী। এ সার্বজনীন জীবন-ব্যবস্থায় বৈরাগ্যের স্থান নেই। অন্য দিকে আখিরাতকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া তলব করাও চরম নিন্দনীয়। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন তা জীবনের উভয় স্তর দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে বিস্তৃত হয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করেই ইসলামী অর্থব্যবস্থার গোটা প্রাসাদ নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের উভয় স্তরের সফলতা, সুখ, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

---

১. আল-কুরআন, ৪৫:১৩
২. ড. এম উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের ঘোষণা:

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার হাসানা দাও এবং আখিরাতের হাসানা দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও [১]।" এখানে দুনিয়া ও আখিরাতের হাসানার কথা বলা হয়েছে। যা মানুষের জন্য ভাল ও কল্যাণকর, তাই হাসানা। এ হাসানা জীবনের উভয় স্তরের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং দুনিয়ার কল্যাণও শরীআতের লক্ষ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার জীবনের বিশেষ একটি দিকের প্রতি দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে সার্বিক কল্যাণ লাভ করা যায় না। সমকালীন দর্শনের কোনটি অর্থব্যবস্থা হয় ভোগকেন্দ্রিক কিংবা কোনটি রাজনীতিসর্বস্ব আবার কোনটি বৈরাগ্যভিত্তিক। ইসলাম এরূপ একদেশদর্শী মতবাদে বিশ্বাসী নয়। কারণ, তা সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না। একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে তাই ইসলাম অর্থনীতিসহ জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ দিকদর্শন প্রদান করে। দুনিয়ার কল্যাণের জন্য যেমন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন, তেমনি আখিরাতের জীবনের মুক্তি, চিরস্থায়ী কল্যাণ ও শান্তির বিষয়টি বরং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূল (সা)-এর অনুসরণের পাশাপাশি সম্পদ অর্জনের প্রতি ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। সালাত শেষ হলে সম্পদ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। ধন-সম্পদ অর্জন করে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইসলামী আদর্শের অন্যতম কাম্য বিষয়। সুতরাং 'যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন'-এর বিষয়টি ইসলামী অর্থব্যবস্থার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মুলনীতি হিসেবে স্বীকৃত।

❑ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন দর্শনেরই অংশ বিশেষ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান ও আত্মসমর্পণ, তার সৃষ্টি সমগ্র মানবজাতিকে সমগোষ্ঠীভুক্ত মনে করা এবং তাঁর তৈরি সম্পদে সকলের সমঅধিকার রয়েছে, এই দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যাবৎ ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচিতি, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এবং এর মূলনীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী ও রূপরেখা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ও মানব রচিত অর্থব্যবস্থা থেকে একে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে স্বতন্ত্র পরিচিতিতে স্বকীয়তা প্রদান করেছে। কোন অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হতে হলে সেই অর্থব্যবস্থা এ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা অপরিহার্য। বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টিই হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা।

---

১. আল-কুরআন, ২:২০১
২. আল-কুরআন,৬২:১০

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ❑ সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর;
- ❑ ভারসাম্যপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা;
- ❑ জীবিকা অর্জন ও উৎপাদানে প্রতিযোগিতার অধিকার;
- ❑ হালাল ও হারামের নিয়ন্ত্রণ;
- ❑ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন;
- ❑ সুদ ও শোষনমুক্ত অর্থব্যবস্থা;
- ❑ কৃপণতা ও অপব্যয়মুক্ত অর্থব্যবস্থা;
- ❑ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মানসিকতামুক্ত অর্থব্যবস্থা;
- ❑ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান;
- ❑ দারিদ্র বিমোচন ও ভিক্ষাবৃত্তির বিলুপ্তি সাধন;
- ❑ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ;
- ❑ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা;
- ❑ আয়-উপার্জনের বৈধ অধিকার;
- ❑ নারীর উপার্জন ও অর্থনৈতিক অধিকার;
- ❑ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ;
- ❑ ইসলামী ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন;
- ❑ ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ;
- ❑ ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- ❑ পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং
- ❑ ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।

❑ সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর

আল্লাহ্ তা'আলার নিরংকুশ মালিকানার ধারণা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির অবাধ ও নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত নয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান ধন-ঐশ্বর্য ও ভোগ্য পণ্য; আকাশে বিদ্যমান গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-চন্দ্র-সূর্য-এর সবগুলোতে ইসলাম সর্বাগ্রে এক আল্লাহর মালিকানা সাব্যস্ত করে। সে মালিকানায় তার বিপক্ষে অংশীদারিত্বের সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার মত দ্বিতীয় আর কোন সত্তা নেই। এ বিষয়টি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আল-কুরআনের বহু আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে [১]।

---

১. আল-কুরআন, ২:৮৪,৬:৫৭,১৮:২৬,৪২:৪৯,২:১০৭,১৬:০৫,৩২:০৯,২:২৯,১৪:৩২-৩৩,২২:৬৫,৩১:২০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ব্যক্তিকে ধন-সম্পদের মালিকানায় যতটুকু ইখতিয়ার দিয়েছে, তাকে বড়জোর নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা বা সীমিত ব্যক্তি-মালিকানা হিসাবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের কর্তৃত্বকে বৈধ ও সংগতভাবে আল্লাহর নিয়ামত ও সম্পদের ভোগ-দখলের অধিকার বলা যেতে পারে। তাই পুঁজিবাদের ন্যায় অবাধ ব্যক্তি-মালিকানাও নয়, আবার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ন্যায় সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রীয়করণও নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ মালিকানার দৃঢ়বিশ্বাস কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি-ই ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তির সীমাহীন মালিকানা ও অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক যুলম-নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার পথকে প্রশস্ত করেছে। অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমস্ত অন্যায়, যুলুম ও অনিষ্টের মূল কারণ বলে ব্যক্তি-মালিকানার উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অবাস্তব ও মানবতা বিধ্বংসী সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে হরণ করে রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। ইসলাম সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ ও অবাধ ব্যক্তি-মালিকানাকে নিষিদ্ধ করে নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করে ভারসাম্যমূলক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

❑ ভারসাম্যপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা

ইসলাম ধনীদের জন্য অনুৎপাদনশীল সঞ্চয়, গুদামজাতকরণ, মজুদদারী ও বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণের উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে। দরিদ্রদের জীবনমান উন্নীতকরণে উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধনাঢ্য-বিত্তশালীদের সম্পদে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সে উদ্দেশ্যে কার্যকর বিধি-বিধান প্রয়োগের ব্যবস্থা করে সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারসাম্যমূলক, সুবিচারপূর্ণ ও সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অবাধ বুর্জোয়া পদ্ধতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও স্তূপীকরণের কোন অবকাশ নেই। অপর দিকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) হতে বঞ্চিত রাখার মতো সমাজ কাঠামোকে ইসলাম অনুমোদন করে না। সুষম ন্যায়সংগত ইনসাফপূর্ণ সম্পদ বন্টন ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অবকাঠামো ও রূপরেখা। আল-কুরআনের ঘোষণা: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুবিচার ও মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয় [১]।" আল-কুরআন আরো ঘোষণা করছে: "লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে[২]।" ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অবিচার, নির্যাতন এবং অন্যায়ের উচ্ছেদের জন্য আল-কুরআনের প্রায় দু'শতাধিক আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে [৩]।

---

১. আল-কুরআন, ১৬:৯০
২. আল-কুরআন, ৪:১৮
৩. ড. এম উমর চাপরা, অনু. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

❑ জীবিকা অর্জন ও উৎপাদনে ও প্রতিযোগিতার অধিকার

মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে প্রতিযোগিতার বিষয়টি শরী'আহ্তে শুধু অনুমোদিতই নয় বরং ইসলাম এ বিষয়টিকে সীমারেখার মধ্যে উৎসাহিত করেছে। ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ও উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ-প্রতিযোগিতার অনুমোদন দিয়েছে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ প্রতিযোগিতা যেন প্রতিহিংসা ও ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম না দেয় এবং পারস্পরিক ক্ষতির কারণ না হয়। গঠনমূলক প্রতিযোগিতার অধিকার দিয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা থেকে মুক্ত হয়ে মানসিক ও কায়িক শ্রমের প্রতিযোগিতায় সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রত্যাশা হলো সমাজের অর্থ-সম্পদ যেন কোন বিশেষ গোষ্ঠি বা মহলের হাতে কুক্ষিগত না হয় এবং তা যেন প্রতিনিয়ত সমাজের প্রত্যেক মানুষের হাতে আবর্তিত হতে থাকে। আল-কুরআন সদাচরণ ও আল্লাহ ভীতিতে একে অপরকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাহ প্রদান করেছে।

❑ হালাল ও হারামের নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অপবিত্র ও অবৈধ উপার্জনের সব উৎস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম পবিত্র ও বৈধ সম্পদের প্রশংসা করেছে। বৈধ ও হালাল সম্পদের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণকে এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধিকে অপরিহার্য করেছে। মানবকল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সম্পদ বিনিয়োগকারীর সমুন্নত মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক চেতনায় অর্থ-সম্পদের উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের শর্ত আরোপ করে অসৎ উপার্জন ও অবৈধ পথে ব্যয় নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এক সুষম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অবৈধ ভোগ বিলাসে অর্থ ব্যয়, জুয়া, ঘুষ, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি এবং এজাতিয় অন্যান্য কার্যাবলি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মাপে কম-বেশি প্রদানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। পবিত্রতা, কলুষতামুক্ত, নৈতিক অপরাধ ও অবক্ষয়মুক্ত মার্জিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হালাল পন্থায় উপার্জন, উৎপাদন ও হারাম পদ্ধতিকে বর্জনের উপর ইসলামী অর্থব্যবস্থা সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এমনিভাবে হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতিকে সুষমামন্ডিত করে এক অনুপম দৃষ্টান্ত ও স্থাপন করেছে। হালাল ও হারামের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী অর্থনীতির এক দৃষ্টান্তহীন বিরল বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য একটি শান্তিপূর্ণ, যুলুম ও নিষ্ঠুরতামুক্ত সমাজ গঠন ও মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। আল-কুরআনের ঘোষণা: "হে মানব সকল! তোমরা পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করো, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা [১]।" আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ প্রদত্ত হালাল ও পবিত্র রিযক ভক্ষণ করো, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করো, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করো [২]।"

---

১. আল-কুরআন, ২:১৬৮
২. আল-কুরআন, ১৬:১৭

Dhaka University Institutional Repository

❑ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন

'যাকাত' ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন। 'যাকাত' ফরয হওয়ার বিষয়টি আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা স্বপ্রমাণিত। বিশ্ব নবী (সা)-এর মুতাওয়াতির সুন্নাত দ্বারা তা প্রমাণিত। পূর্বের ও পরের গোটা উম্মতের লোকদের সামষ্টিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা স্বীকৃত। যুগের পর যুগে ও বংশের পর বংশে তা প্রচলিত ও প্রতিপালিত। ইসলামী শরী'আতে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ফকীহ্গণ বলেছেন, যে লোক তা অস্বীকার করবে, তার ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, সে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে এবং ধনুক থেকে তীর যেমন করে বের হয়ে যায়, সেও ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে [১]। আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ)-এর মতে আল-কুরআনে প্রায় ত্রিশ স্থানে সালাতের আদেশের সাথে সাথে যাকাতের আদেশকে সংযুক্ত করা হয়েছে[২]।

'যাকাত', 'উশর' 'গণীমত', 'ফায়' খুমুস সাদাকাতুল ফিতর ও উত্তরাধিকার আইন ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির শুধু অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য-ই নয় বরং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রাণ। যাকাত ব্যবস্থা বস্তুত, বিত্তহীনদের সঞ্চয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত, 'উশর' ফায়, ও খুমুস ধনী বিত্তশালীদের নিকট হতে আদায় করে ফকীর, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, পঙ্গু, বেকার, বন্দী, দাসমুক্তি, সংকটাপন্ন পর্যটক ও নব দীক্ষিত মুসলিমদের পুনর্বাসনের খাতে ব্যয় করবে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কোন অনুকম্পা বা অনুদান নয়, বরং সম্পদশালীদের উপর দরিদ্রদের অধিকার। আল-কুরআনের ঘোষণায় তাই বলা হয়েছে "ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে [৩]।" রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি, তাঁকে সম্বোধন করে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "ধনীদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে মার্জিত, পরিশোধিত ও পবিত্র করো [৪]।" রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, "ধনীর কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করে অভাব গ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য তা ব্যয় কর [৫]।" যাকাত ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করে সমাজে সমতা আনয়ন করে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসনের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। যাকাত সম্পদের সুষম বন্টনকে সুনিশ্চিত করে।

❑ সুদ ও শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা

শোষণের অন্যতম হাতিয়ার সুদের অভিশাপমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিই হচ্ছে 'সুদ'। সমাজবাদী-অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত ও অর্থ-সম্পদে রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠা করে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সুদের উচ্ছেদ ও মুলোৎপাটন করা। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করেছে। ক্রয়-বিক্রয় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্যকে বৈধ ও হালাল করেছে। সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম সুদকে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য পাপ বলে অভিহিত করেছে।

---

১. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, অনু: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১১০-এ উদ্ধৃত
২. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ), অনু: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪-এ উদ্ধৃত
৩. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৪. আল-কুরআন, ৯:১০৩
৫. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, অনু: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছে সুদ দাতা, গ্রহীতা, সাক্ষ্যদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যাপারে মর্মন্তুদ পীড়াদায়ক, ভীষণ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। আল-কুরআনে সুদদাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী রূপে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতে, সুদ নিষিদ্ধকরণ ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যে ভাষায় আল-কুরআনে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, তা অন্যকোন অপরাধ বা পাপ সম্পর্কে করা হয়নি। সুদ মানব প্রকৃতির মধ্যে নিষ্ঠুরতা, অর্থ-লিপ্সা, বুর্জোয়া মানসিকতা, নীতি-নৈতিকতা বর্জিত স্বভাব ও উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করে। সুদ মানুষকে প্রেম, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দয়া-দানশীলতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী হতে বঞ্চিত করে হিংস্রতা ও নিষ্ঠুর মানসিকতা বৃদ্ধি করে। ইসলামী অর্থনীতি তাই সুদ ভিত্তিক সকল কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

❑ কৃপণতা ও অপব্যয়মুক্ত অর্থব্যবস্থা

বিশ্ববাসীর জন্যে ইসলাম যে অর্থব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করেছে তা সবদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, কৃপণতা ও অপব্যয়মুক্ত। ইসলাম কৃপণ ব্যক্তিকে আল্লাহর শত্রু অ্যাখ্যা দিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করেছে এবং দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহর বন্ধুর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কৃপণ মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরত্বে অবস্থানকারী ও দানশীলকে আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী এবং মানুষের নিকটতম সংবেদনশীল বন্ধু বলে ঘোষণা করেছে। অপরদিকে অপব্যয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব কল্যাণে এমনকি স্বীয় পরিবার পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্ন-বস্ত্রের জন্য সম্পদ ব্যয়কে ইবাদত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপব্যয়কারীকে আল-কুরআনে 'শয়তানের ভাই' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনভাবে কৃপণতা, অপব্যয়, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও নির্দয়তার ঘৃণ্য স্বভাব বর্জন করে পাশাপাশি মানব কল্যাণে দানশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতার মত মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এক সুখী, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবনদর্শন ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

❑ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মানসিকতামুক্ত অর্থব্যবস্থা

অধিক পাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত ও বুর্জোয়া মানসিকতামুক্ত স্বল্পে তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ ইসলামী অর্থনীতির আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ অর্জনের লোভ-লিপ্সাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে: "আর অধিক পাওয়ার আগ্রহ, আকাঙ্খা ও লোভ তোমাদের সমাধিস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে ধাবিত করবে[১]।" ইসলাম আরও ঘোষণা করছে যে, "তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত যারা শুধু সম্পদের স্তুপ বৃদ্ধি করে আর শুধু হিসাব কষতে থাকে আরও কি পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়[২]।" অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "যারা শুধু স্বর্ণ-রৌপ্য, সম্পদের স্তুপ পুঞ্জীভূত করে আর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না। হে রাসূল (সা)! আপনি তাদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দিন যেদিন তাদের স্তুপীকৃত সম্পদকে অগ্নিগোলকে পরিণত করে তাদের মুখমন্ডলে, পৃষ্ঠদেশে ও পাঁজরে দাগ লাগানো হবে[৩]।"

---

১. আল-কুরআন, ১০২:১-২
২. আল-কুরআন, ১০৪:১-২
৩. আল-কুরআন, ৯:৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অনিয়ন্ত্রিত, সীমাহীন ও অবৈধ সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যাকাত, 'উশর' ফিতরা, সাদকা দান, জনকল্যাণ, মানব সেবা ও সৃষ্টির সেবায় অর্থ ব্যয়ের মহান গুণাবলীর ভিত্তিতে সাম্য, মৈত্রী,ভ্রাতৃত্ববোধ, পরোপকারের বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বল্পে তুষ্টির চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করতে চায় ইসলামী অর্থনীতি।

❑ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম আর্দশ ও বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যাদের কোন অভিভাবক নেই, (রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে) আমি তাদের অভিভাবক" [১]। বিশ্বনবী রাসুল (সা) আরো বলেন, "অমুসলিম নাগরিকের (যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয়, রাষ্ট্রীয় আইনের আনুগত্য করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে) জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা মুসলিম নাগরিকের সমতুল্য[২]।" হযরত উমর (রা)-এর উক্তিটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমার রাজ্যে সুদূর তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে একটি ছাগলছানা (কিংবা কুকুরছানাও) যদি না খেয়ে মরে, তবে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে আল্লাহর আদালতে অবশ্যই আমাকে জবাবদিহি করতে হবে [৩]।" যে সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে না, সে সমাজ ইসলামী সমাজ ও সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র তথা কল্যাণ রাষ্ট্র নামে অভিহিত হবার কোন অধিকারই রাখে না। তাই সন্দেহাতীতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ (Fullfilment of Basic Needs) ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি আল-কুরআনের একাধিক ঘোষণা বিশ্ব নবী (সা)-এর সুন্নাহ দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে স্বপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

❑ দারিদ্র বিমোচন ও ভিক্ষাবৃত্তির বিলুপত্তি সাধন

সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র, পঙ্গু, অসহায় জনগণের বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তির বিলুপ্তি সাধন ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম দাবি। সমাজ থেকে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার অসংখ্য আইনগত বিধি-বিধান রয়েছে। সুস্থ দেহের অধিকারীর জন্য ইসলাম ভিক্ষা-বৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সমাজের বিত্তহীন, বেকার দরিদ্র, পঙ্গু, অসহায়দের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ফরয করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা। ভিক্ষাবৃত্তি আল্লাহর খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদারও পরিপন্থী [৪]।

---

১. আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (রহ), অনূ: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ.৭২
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. এম উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

❑ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ

কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ ইসলামী সমাজ দর্শন ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ, কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। ঘুষ, দুর্নীতি, মাপে কম-বেশ করা, বিক্রিত দ্রব্যের ত্রুটি গোপন, চোরাচালান, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, প্রতারণা, জুয়া, লটারী, যাদুবিদ্যা, ভবিষদ্বক্তা, পৌওলিক শিল্প, হারাম দ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, ও ব্যবসা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নগ্নতা, বেহায়পনা, অশ্লীলতা দেহ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। প্রচলিত বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত চড়া দামে ক্রয়-বিক্রয়ের মতো যুলুম ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামে দাওয়াত-তাবলীগ, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসবে প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরের মানবসেবা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন, সকল সৃষ্টির সেবা ও সমগ্র বিশ্ববাসীকে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শনের পথে অর্থ ব্যয়কে ইসলাম ইবাদত রূপে ঘোষণা দিয়েছে। কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ এবং হালাল রিয্ক অর্জন ও উৎপাদনে অর্থ ব্যয়কে ইসলাম ফরয 'ইবাদত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

❑ 'বায়তুল-মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা

'বায়তুল-মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামী রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অর্থ ভান্ডার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত অর্থ-সম্পদই বায়তুল-মাল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় অর্থ ভান্ডার কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ও সম্পদ নয়। বায়তুল মাল জনগণের সম্পদ ও জনকল্যাণের জন্য তা নিবেদিত। ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত, খুমুস,'উশর, সাদাকাত, গনীমত, জিযিয়া, আয়কর, খারাজসহ সবধরনের আয় করই বায়তুল মালে সঞ্চিত হয় এবং তা শরী'আহ্ভিত্তিক দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান কতৃক নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় হয়। জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, প্রশাসন, নিরাপত্তা, শান্তি-শৃংখলা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সংরক্ষণ, সামরিক, আধাসামরিক, সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত, সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কর্মকান্ড ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পেনশন-গ্রাচুইটি, বোনাস, আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে চিকিৎসা ও অসহায় পরিবারের ব্যয়ভার ও পুনর্বাসনের ব্যয় বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বন্টন করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে বায়তুল মালের সূচনা বিশ্বনবী (সা) এর ধারণা থেকে উদ্ভূত। বায়তুল মালের ধারণাটি বিশ্বনবী (সা) এর কাছ থেকেই এসেছিল। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশিদার বিশেষ করে হযরত উমর (রা)-ই বায়তুল মালকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

❑ আয়-উপার্জনের বৈধ অধিকার

ইসলাম প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ আয়-উপার্জনের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করেছে। কায়িক ও মানসিকশ্রম, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, কৃষি, বনজ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বৃত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পেশাজীবির হালাল উপার্জন ও উৎপাদনের অধিকার প্রদান ইসলামী অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রমজীবি ও পেশাজীবিদের নিরাপত্তা বিধান, তাদের জৈবিক, নৈতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক কৃষ্টি সভ্যতা, বিশ্বাস প্রত্যয় ও জীবন-যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। শালীন ও বৈধ চিত্ত বিনোদনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরণসহ সাপ্তাহিক ও প্রাত্যহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, অসুস্থতা ও নৈমিত্তিক প্রয়োজনে দৃষ্টি প্রদান ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃত ও অনুমোদিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হালাল রিযিক অন্বেষণ করা আল্লাহ তা'আলার ফরয ইবাদতের পর (সবচেয়ে বড়) ফরয [১]। রাসুলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, "ফরয সালাত আদায়ের পর তোমরা জীবিকার জন্য পরিশ্রম করা ছাড়া ঘুমের (বা বিশ্রামের) নামও নিও না [২]।"

ইসলাম এসেছে মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। একজন পেশাগতভাবে যত নীচু মানের হোক, সে নিজের প্রতিভা ও কর্মের মাধ্যমে সমাজে স্বীয় মেধা প্রতিষ্ঠা করার নিশ্চয়তা লাভ করবে। সকল মিথ্যা আভিজাত্যের ওপর কুঠারাঘাত হেনে নবী করীম (সা) ঘোষণা করেছেন: ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি মানবতার উর্ধ্বে নয়। মহান আল্লাহর নিকট মনিব চাকর, উঁচু-নীচু এবং গরীব-আমীর সকলেই সমান, কারো মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে পার্থক্য হবে একমাত্র পরহেজগারী ও সৎকর্মের। এই যখন তোমাদের প্রকৃত অবস্থা তখন কেন তোমার অধীন লোকদের হীন মনে কর [৩]।"

❑ নারীর উপার্জন ও অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামী সমাজ দর্শনে ইসলামী শরী'আহ্‌র আওতাধীন, শরী'আহর সীমালঙ্ঘন না করে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, উৎপাদন-উপার্জনে নিয়োজিতকরণ, প্রযোজ্য আয়-রোজগারের জন্য যে কোন পেশা গ্রহণের অধিকার ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শুধু স্বীকৃত ও অনুমোদিতই নয় বরং উৎসাহিত। ইসলাম নারীদের উপার্জনের অধিকার কেড়ে নেয়নি, বরং নারীদেরকেও উপার্জনের অধিকার দান করেছে। নারীরা যা উপার্জন করবে, তারাই তার মালিক হবে। তাদের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোন পুরুষের নেই।

---

১. মাওলানা হিফযুর রহমান, অনূ. মাওলানা আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-এ উদ্বৃত
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর দেনমোহর আদায়, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ স্বাস্থের প্রয়োজনীয়তা পূরণ ইসলাম স্বামীর উপর ফরয হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বৈধ পথে অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বলে পাওয়া ধন-সম্পদ নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখা ও ভোগ-দখল করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইসলাম দান করেছে। বায়তুলমাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কারদ হাসান প্রদান করা হতো। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না।

❑ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

ইসলাম অর্থ-বিত্ত, সম্পত্তি-সম্পদকে ব্যক্তি,পরিবার, মুষ্টিমেয় বিশেষ মহল, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রের হাতে কুক্ষিগত ও পুঞ্জিভূত না করে এর আবর্তন ও বিকেন্দ্রীকরণের নির্দেশ দিয়েছে। উত্তরাধিকারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাকাত-উশর দান-সাদকা এমনকি হজ্জের মতো মৌলিক ইবাদতের মাধ্যমে অর্থ সম্পদের আবর্তন , এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়া ও সমাজের ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ ও সম্পত্তির বন্টনের মাধ্যমে এক উত্তম বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পদের সুষম বন্টন পদ্ধতি ইসলামী অর্থনীতির এক উত্তম বৈশিষ্ট্য।

❑ ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালূ রয়েছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষি বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তখন বড় বড় শিল্পপতিরা হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভুস্বামী হয়ে বসে। নব্য জমিদাররা বহু ক্ষেত্রেই শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। কৃষি কাজে জমির পূর্ণ ব্যবহারে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে বহু দেশেই। একই সঙ্গে মানসবদার, জমিদার, জায়গীরদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভুস্বামীদের শোষণ-নিপীড়ন ও অত্যাচার-অবিচার বাড়তে থাকে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, ব্যক্তিকে জমি থেকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা হয়। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় নেয়া হয়। মালিকানা বঞ্চিত কৃষকদের রাষ্ট্রীয় খেত-খামারে জবরদস্তি করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বিনিময়ে তাদের ভরণ-পোষণের ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি । এই উভয় প্রকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক, মানব-স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্ট না হয় সে জন্যে ইসলাম তার অনন্য বিশ্বজনীন ভূমি ব্যবস্থা বা ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনের ঘোষণা: "জমি আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাহ্দের মধ্য থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারিত্ব দান করে থাকেন [১] ।"

---

১. আল-কুরআন, ৭:১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র এক প্রকার ভুমিস্বত্বই স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি ভূমি-মালিকের সম্পর্ক। কোন প্রকার মধ্যস্বত্বের অবকাশ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সে কারণে শোষণেরও সুযোগ নেই। জমি পতিত রাখাকেও ইসলাম সমর্থন করেনি। সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পংগু, অসুস্থ ও শিশু বা স্ত্রী লোক হয় অথবা নিজে চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয়, তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, "যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাঁকে চাষ করতে দেবে[১]।" রাসুল (সা.) আরো বলেন, "যে লোক পোড়া ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে[২]।" জমি অনাবাদী ও পতিত না রাখতে ইসলামে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদি জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুণরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূল্য শর্ত হিসাবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ইসলাম।

❑ ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ

ইসলামে শ্রমনীতি নতুনভাবে প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শ্রমনীতির রচয়িতা এবং বিশ্বনবী (সা) এ নীতির প্রবর্তক। কুরআন ও হাদীসে ইসলামের শ্রমনীতির মৌলিক বিষয়গুলো সুষ্ঠু ভাবে বর্ণিত রয়েছে, সে সব নীতি আজকের আধুনিক বিশ্বের মেহনতি মানুষের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম। শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই ভাই। এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্য। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও"-শ্লোগান সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এখানে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি জমির মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত ইসলামী শ্রমনীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ: [৩]

- ⇨ উদ্যোক্তা বা শিল্পমালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে;
- ⇨ মৌলিক মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে;
- ⇨ কাজে নিযুক্তির পূর্বে শ্রমিকের সাথে যথারীতি চুক্তি সম্পন্ন হবে এবং তা যথাসময়ে পালিত হবে;
- ⇨ শ্রমিকের অসাধ্য কাজ তার উপর চাপানো যাবে না;
- ⇨ শ্রমিকের স্বাস্থ্য,শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নীচে মজুরী নির্ধারিত হবেনা;
- ⇨ উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ শ্রমিকদের দিতে হবে;

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-এ উদ্ধৃত
২. ইরফান মাহমুদ রানা, অনু: জয়নুল আবেদিন মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

- ⇨ পেশা বা কাজ নির্বাচন ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কে দর দস্তুর করার পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রমিকের থাকবে;
- ⇨ অনির্বায কারণ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনার প্রেক্ষিতে কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে শ্রমিকের উপর নির্যাতনমুলক আচরণ করা চলবেনা;
- ⇨ মালিক পক্ষ দূর্ঘটনা ও ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে;
- ⇨ দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে;
- ⇨ অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে;
- ⇨ পেশা পরিবর্তনের অধিকার শ্রমিকের থাকবে;
- ⇨ পরিবার গঠনেরও অধিকার তার থাকবে;
- ⇨ স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের অধিকার থাকবে;
- ⇨ শ্রমিকের স্থানান্তর ও গমনের অধিকার থাকবে এবং
- ⇨ শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এ নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক-মালিকের মধ্যে যে সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকেনা। দু'য়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্ত রিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য কোন অর্থনীতিতে এ ধরনের নীতিমালা অনুসরণ তো দূরের কথা, এ জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বা গ্রহণের প্রশ্ন-ই উঠে না। ইসলামী অর্থনীতির সাথে এখানেই অন্যান্য অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত।

❑ ইসলামিক পদ্ধতিতে অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কারদ হাসান ও মুদারিবাত-এর প্রবর্তন অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে বর্তমান প্রচলিত অর্থব্যবস্থার বিপরীতে এক যুগান্তকারী ও যুগোপযোগি পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নীকারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই কারদ হাসান ও মুদারিবাতের প্রর্বতন ইসলামী অর্থনীতির বৈপ্লবিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরের বেশী এ দু'টি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির সীমানায় ঘেঁষতে পারেনি।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক, বিনিয়োগ ও কৃষিকাজের জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে কারদ হাসান প্রথার চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। এ ছাড়া বায়তুল মাল হতেও কারদ হাসান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। কারদ হাসান বিষয়ে আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারিবাত বা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য, উৎপাদন-উপার্জন, আয়-রোজগার, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য অবদান। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা গড়ে উঠলে মুলধনের সংকট হ্রাস পায়। সুদী ব্যাংক ও পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক মুসলি দেশ এমনকি অমুসলিম দেশে পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে মূলত: এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই। তবু ইসলামী সমাজে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে সাধারণভাবে কারদ হাসান, মুদারিবাতসহ শরী'আহ্ অনুমোদিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থাকা আবশ্যক।

❑ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা

ইসলামী অর্থনীতিতে লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ হিসাবে পরিগণিত। আল-কুরআনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে একাধিক আয়াতে উল্লেখ করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল-কুরআনের এই নির্দেশসমূহের অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো, অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্যে সহযোগিতামূলক শক্তির কৌশল কাজে লাগাবার উপর জোর দেয়া। শরী'আহ্র সীমার মধ্যে সমাজের বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সামাজিক কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানই হলো সঠিক উপায়। ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত সহমর্মিতা না থাকলে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যায় না। বস্তুত, ন্যায়নীতি ও জীবনধারার ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজন পুরণের প্রশ্নে সাম্যই উক্ত ব্যবস্থার চাবিকাঠি। আর মানবজাতির জীবন ব্যবস্থায় কতগুলো নীতি রয়েছে যেগুলো কার্যকর থাকলে বা বাস্তবরূপ লাভ করলেই গোটা সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে নীতিগুলো নিম্নরূপ:[১]

- ⇨ এ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জীবনোপায় ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্মক্ষেত্রে কেউ যাতে জীবনোপায় ও প্রয়োজন ফুরণ থেকে বঞ্চিত না হয়, এই নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- ⇨ যে সব উপরকরণ অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ সৃষ্টি করে, মানব সমাজে শোষণ-নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে এবং অর্থব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো নির্মূল করতে হবে।
- ⇨ সম্পদ ও সম্পদ-উপকরণ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা দলকে অর্থব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার থেকে বিরত রাখতে হবে, তাতে করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গোটা মানব সমাজের কল্যাণসাধনের পরিবর্তে উক্ত বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত হবে না।
- ⇨ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একে অপরের সীমানায় অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে[২]।

---

১. মাওলানা হিফযুর রহমান, অনূঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

❑ ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ সাধন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে 'মা'রুফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও 'মুনকার' বা দূর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুনীতিমূলক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং একই সাথে 'আদল' ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা করা। অন্য দিকে দূর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। ইসলামী রাষ্ট্র এ উপায়েই সুদ-ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাচালানী, কালোবাজারী, পণ্য-দ্রব্য আত্নসাৎ, সব ধরনের জুয়া ও হারাম সামগ্রীর উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সকল প্রকারের অসাধুতা প্রভৃতি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল নিপীড়ন ও শোষণমুলক কাজ সমূলে উৎপাটন করতে পারে। রাষ্ট্র যাকাত ও 'উশর আদায় এবং তার উপযুক্ত বিলি-বন্টন, বায়তুলমালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির যথাযথ প্রয়োগ, কারদ হাসান ও মুদারিবাত ব্যবস্থার জন্যে আইন তৈরী এবং নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখতে পারে।

এসব কাজে রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে 'আদল ও ইহ্সান প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং সমাজে যুলুম ও বঞ্চনার সয়লাব বয়ে যাবে। এ কারণেই উপযুক্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান রয়েছে ইসলামী অর্থনীতিতে। একই সাথে বেশ কিছু সম্পদের সামাজিক মালিকানাও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে।

বর্ণিত আলোচনা থেকে ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বা ইসলামী জীবন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ইসলামী অর্থনীতি কোন সমাজে কোন দেশে কোন অবস্থাতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ জন্যে ইসলামের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, আইন-বিচার-প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ সবকিছুই যুগপৎ বাস্তবায়ন আবশ্যক। সে সাথে প্রয়োজন প্রকৃত অর্থে ঈমান-আক্বীদার অধিকারী, তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসী, ইসলামী জীবন দর্শনের অনুসারী ও তাক্ওয়া অবলম্বনকারী মুসলিম জনগোষ্ঠি। প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় পাওয়া যায়তো তারই মধ্যে যে প্রত্যয় ও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে:

"নিশ্চয় আমার সালাত, আমার সাওম, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্যে[১]।"

---

১. আল-কুরআন, ৬:১৬২

Dhaka University Institutional Repository

❑ ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মদীনায় ইসলামী অর্থনীতির যে প্রথম মডেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতে শরী'আহ্'র সীমা-রেখার মধ্যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের স্বাধীনতা ছিল। তবে এ স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতা (laissez-faire) হিসেবে গণ্য করা যাবে না, কেননা মদীনায় ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদের প্রায় বারো শত বছর পুর্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক নীতিমালা ইসলাম দিয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সুদের নিষিদ্ধতা, যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পত্তি বন্টনের উত্তরাধিকার আইন (মীরাসী আইন) এবং হালাল-হারামের বিস্তৃত সীমারেখা-এসব হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি যেগুলোর উপর ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য হলো মানবজাতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো, অভাব-অনটন দূর করা এবং তা এমনভাবে কার্যকর করা যাতে যুগপৎভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন নিশ্চিত হয়। তাহলেই শোষণমুক্ত দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত একটি সমাজ-সমষ্টি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ইসলাম অর্থনীতিকে বিত্তবানদের মধ্যে মুনাফা লুটার প্রতিযোগিতার মাঠে পরিণত করতে চায়না। সে এটাকে অভাব মোচন ও প্রয়োজন মেটানোর একটা কল্যাণকর মাধ্যমে রূপান্তরিত করে সবার জন্য অবারিত করার পক্ষপাতি। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে নিহিত। মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:[১]

- ❑ অর্থনীতিতে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা;
- ❑ নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- ❑ অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দূর্নীতির মূল্যোৎপাটন;
- ❑ জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা;
- ❑ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার;
- ❑ সম্পদের যথাযথ বন্টন এবং
- ❑ কল্যাণকর দ্রব্য পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন।

❑ অর্থনীতিতে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলামে অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে ন্যায়পরতা, ন্যায়বিচার, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সুফল হচ্ছে মানুষের মধ্যে নিহিত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশ এবং তার পূর্ণত্ব লাভ। ন্যায়পরতা ও সুবিচার সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক ন্যয়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ কারণে বিশ্বনবী (সা.)-এর সারা জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল মানবিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যয়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব নবী (সা)-এর ঘোষণা: "এবং তোমাদের মাঝে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ঠ হয়েছি[১]" মূলত; আল-কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী নবী-রাসুলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ এবং তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ন্যায় পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা[২]।

---

১. মাওলানা হিফযুর রহমান, অনূ: মাওলানা আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
২. M. Nejatullah Siddiqui, *Muslim Economics Thinking: A Survey of Contemporary Literature* Edited by Khurshid Ahmed (Uk: Islamic Foundation, N.D). p. 197

Dhaka University Institutional Repository

এ ন্যায়বিচার, ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের প্রশ্নে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অণুপরিমাণও পার্থক্য করা যাবেনা। আল্লাহ এবং রাসূল (সা) নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নি:শর্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে আইন শাস্ত্রবিদগণ প্রশ্নাতীতভাবে মাকাসিদ আল-শরী'আহ্‌র অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তারা এতই গুরুত্বারোপ করে অভিমত পোষণ করেছেন যে, ন্যায়বিচারহীন কোনো সমাজকে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ হিসেবে কল্পনা করাই অসম্ভব [১]।

মানব সমাজ থেকে জুলুমের সকল দিক নির্মূল করার বিষয়ে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামে জুলুমকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর সাহায্যেই একজন ব্যক্তি অন্য সকলকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে। সাইয়েদ কুতুবের উদ্ধৃতি দিয়ে ড. এম. ওমর চাপরা বলেন, "তাওহীদ ও খিলাফতের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ন্যায়রিচার না থাকলে তা একটি অন্ত সারশূন্য ফাপা ধারণায় পর্যবসিত হবে [২]।" সুতরাং ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার, ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে শোষণমুক্ত, অবিচারমুক্ত এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে, ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ [৩]:

⇨ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে;

⇨ অর্থনীতির সকল কার্যাবলিতে এবং

⇨ সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে।

ইসলাম পরিপূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তা নিম্নরূপ:-

⇨ সমগ্র মানুষের ঐক্য ও অভিন্নতা–মানুষ হিসেবে;

⇨ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য–মুসলিম ও ঈমানদার হিসেবে;

⇨ জাতীয়তার দিক দিয়ে পূর্ণমাত্রার অভিন্নতা, পার্থক্যহীনতা;

⇨ দ্বীন ও জীবন বিধানের ঐক্য ও অভিন্নতা;

⇨ সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও মানবিক অধিকারে অভিন্নতা;

⇨ আইনের দিক দিয়ে আইন কার্যকরকরণে পার্থক্যহীনতা এবং

⇨ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয়তার অভিন্নতা।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, অনু: আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি:) পৃ. ১১০

২. Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamaic Publications Ltd. 1974 A.D) Vol. 2, p. 124

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২-২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

❑ নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ

উল্লেখ্য যে, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের আহাজারি ও ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলাও এদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ বিষয়ে আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে: "পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ইমাম (নেতা) ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে চাই [১]।" এ হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাধারণ নীতি। উত্তরাধিকারী করার বিষয় সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাতে বঞ্চিতরা পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া অসংখ্য সম্পদরাজি প্রয়োজনের আলোকে ন্যায়সংগতভাবে উপভোগ করতে পারে [২]।

এ নীতির অর্থ হচ্ছে এমন বেতন-ভাতাদির সুবিধা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বসবাসের সুবিধা যা জনগণের জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থার এমন সব আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সাধারণ লোকদের স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষিত হয় এবং কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। এটা করতে ব্যর্থ হলে সে অর্থনীতিকে বা সরকারকে সঠিক অর্থে ইসলামী অর্থনীতি বা ইসলামী সরকার বলা যাবে না। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, অন্য সব শ্রেণীর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান হ্রাস করা হবে। অন্য সব শ্রেণীর স্বার্থ-অধিকার ও রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদের স্বার্থ ও অধিকার (তাদের দুর্বল হবার কারণেই) প্রাধান্য পাবে[৩]।

❑ সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দূর্নীতির উৎখাত করা

ইসলাম মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দূনীতির উৎখাতকে 'ফরজ' (অবশ্যকর্তব্য) সাব্যস্ত করেছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে:

"যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়া হয় তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সালাত ও যাকাতের প্রতিষ্ঠা 'মারুফ' বা সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও 'মুনকার' বা দূর্নীতি প্রতিরোধ করা [৪]।" এ ধরনের একাধিক আয়াত আল-কুরআনে রয়েছে। এ সব আয়াতে ব্যবহৃত 'মারুফ' ও 'মুনকার' দু'টি শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বলেন, 'মা'রুফ' ও 'মুন্‌কার' শব্দকে সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কেবল নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা সঠিক নয়[৫]। অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং দূর্নীতির উচ্ছেদ করতে হবে। এ সব নির্দেশনার আলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা যাতে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং দূর্নীতি দূর হয়। একইভাবে এ সব আয়াতের তাৎপর্য হবে অর্থনীতি হতে এমন সব ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রণয়নসহ শরী'আহ্ পরিপন্থী এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছু সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ, অপসারণ ও দূর করা, যার ফলে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। এসব কাজ করা ইসলামী সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব।

---

১. আল-কুরআন, ২৮:৫-৯
২. ড. ওমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৩. ড. ওমর চাপরা, প্রাগুক্ত, অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগীবৃন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৪. আল-কুরআন, ২২:৪১
৫. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এই নীতি প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তার জীবন ও সমাজকে পবিত্র করা। আল্লাহভীতি বা তাক্ওয়ার দাবীও তা-ই। কুরআন ও সুন্নাহ্র সকল বিধানের মূল লক্ষ্য হলো ইহকালীন জীবনে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালনার মাধ্যমে তাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা 'আশরাফুল মাখলুকাত'-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরকালীন স্থায়ী ও অনন্ত জীবনের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

❑ জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা

যেখানে কঠোরতা ও কষ্ট, সেখানে সহজতা অবশ্যম্ভাবী। শরী'আহ্'র এই মৌলনীতি আল-কুরআনের একাধিক ঘোষণা দ্বারা সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষের সরল ও সহজ জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে চায়। কঠোরতা, কষ্ট ও অতিরিক্ত চাপ মানুষের উপর আরোপ করতে চায় না। 'কষ্ট ও অসুবিধা বলতে ফিকাহ্বিদদের ভাষায় নিছক কষ্ট ও অসুবিধাই বুঝায় না। কেননা শরী'আতের কোন কাজই কষ্ট ছাড়া হয় না। সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে সেই অতিরিক্ত ও বাইরে থেকে চাপানো কষ্ট ও কঠোরতা যা মানুষের মনোবল সংকীর্ণ করে দেয় এবং চেষ্টা-সাধনা চালানোর পথকে অবরুদ্ধ করে দেয়।

এ কারণেই ইসলাম সেই অতিরিক্ত, বাইরে থেকে চাপানো কষ্ট ও অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করেছে এবং যাতে করে জনগণ সহজ জীবন-যাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ও বিশ্বনবী (সা) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিটি মুসলিম সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সে সব অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিস্পেষণের বিধি-বিধান, নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি হতে উদ্ধার করা যা জনগণের জীবনের উপর বোঝা হয়ে ও শিকলাবদ্ধ হয়ে আছে। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় রীতি-রেওয়াজ ও আইন-কানুন মানুষের জীবনের স্বাধীনতা ও শান্তি নষ্ট করে। কাজেই ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতিতে কোনো অপ্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের স্থান নেই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কোন্‌টি প্রয়োজনীয় আর কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয় তা ইসলামী সরকারের আইন পরিষদই সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকারী।

❑ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার

সম্পদের লক্ষ্য হলো তা কল্যাণ সাধনের উপায় হওয়া এবং সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। মানুষ তা নিজের উপকার ও কল্যাণের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে আমানতদার মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে থাকা ও দখলীভূক্ত সম্পদ-সম্পত্তি নিজের জন্য এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায় ইসলাম। এ জন্যই ইসলাম পতিত জমি ফেলে রাখা সমর্থন করেনি। যে কেউ তিন বৎসর পর্যন্ত জমি ফেলে রাখলে বিশ্ব নবী (সা) তা নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পতিত সরকারি জমি আবাদ করার জন্য হযরত ওমর ইবন আব্দুল আজিজ এক-দশমাংশ ফসল পাবার বিনিময়ে হলেও চাষীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য গভর্নরদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শরীআহ্র নির্দেশ অনুযায়ী একই নীতি অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলাম মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপসহ শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ প্রদান করাই যথেষ্ঠ মনে করেনি বরং এমন বিল্ট-ইন (Built in) ব্যবস্থা করেছে যা স্বত:ই মানুষকে উৎপাদন ও মুনাফাজনক কাজের দিকে পরিচালিত ও উৎসাহিত করে । সুদ নিষিদ্ধ করে ইসলাম অর্থ লগ্নি করে নিশ্চিত আয়মূলক ব্যবসার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। সম্পদের উপর যাকাত আরোপ করে ইসলাম এক দিকে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে সম্পদকে লাভজনক অথচ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে যেতে বাধ্য করেছে। 'মুশারাকা' (অংশীদারী ব্যবসা), 'মুদারাবা' (পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারী ব্যবসা) 'মুযারা'আ' (ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বর্গাচাষ) ' মুসাকাত' (ফল ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্গা দেয়া) ইত্যাদি ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন অনুমোদনের মাধ্যমে ইসলাম পুঁজি ও শ্রমের সম্মিলন ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থ-সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

❑ সম্পদের যথাযথ বন্টন

সম্পদ মানব জীবনে কল্যাণ সাধনকারী উপকরণসমূহের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। অর্থ-সম্পদ দিয়েই মানুষ পারস্পরিক লেনদেন, পণ্য-সামগ্রীর বিনিময় করে একে অপরের উপকার সাধন করে। সুতরাং কল্যাণের মাধ্যম বা উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হলে সম্পদ কল্যাণ-ই, অন্যথায় তা মানুষের জন্য কেবল অনিষ্টকর-ই নয় বরং সকল অনিষ্টের মূল। অর্থ-সম্পদ, ধন-দৌলত, ধন-ঐশ্বর্য, কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তখনই হবে, যখন তা হবে পরস্পর দয়া-মমতা, সহযোগিতা-সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধের উপায়, অসহায়-অক্ষম ও অভাব-অনটন গ্রস্তদের প্রয়োজন মেটাবার মাধ্যম এবং সমাজকে পারস্পারিক সহায়তা-সহমর্মিতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার হাতিয়ার। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলাম সম্পদকে 'খায়র' কল্যাণ ও ভাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে । ইসলাম অর্থ-সম্পদের যথাযথ ও ন্যায়সংগত বন্টনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নীতি নির্ধারণী ঘোষণা হচ্ছে:

"সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে [১]।"

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

"নির্বোধদের হাতে দিয়ো না তোমাদের সম্পদ যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবন ধারণের উপায় বানিয়েছেন[২]।"

এসব আয়াতের মর্মানুযায়ী ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে, বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে,সুষ্ঠ পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি কর্মনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বাধিক বিস্তার ও বন্টন নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন সম্পদের অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত হবার সুযোগ না হয়।

---

২. আল-কুরআন, ৫৯:৭
২. আল-কুরআন, ৭:১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

❑ কল্যাণকর দ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীর সর্বাধিক উৎপাদন

ইসলাম নির্দেশিত জীবন-বিধানের কার্যাবলি প্রধানত ও মূলত পরকালে আল্লাহর নিকট সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সুসম্পন্ন করা হয়। আর সে জন্য দৈহিক শক্তি ও সুস্থতা একান্তই আবশ্যক। আর দৈহিক সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলি যথাযথ পূরণ হওয়ার উপর। রাসূল (সা) প্রায় সময়ই আল্লাহর দরবারে দো'আ করতেন এই বলে: "হে আমাদের আল্লাহ, তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা সালাত-সাওম পালন করতে পারব না, আমাদের প্রতিপালক নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না[১]।" আল-কুরআন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিশেষ আহবান জানিয়েছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে বিপুল উৎপাদনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লাভ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশ্বনবী (সা)-এর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদের জন্য পবিত্র দ্রব্য হালাল করেন ও অপবিত্র দ্রব্য হারাম করেন[২]।" আল-কুরআনে বর্ণিত এ ধরনের অসংখ্য ঘোষণার আলোকে ইসলামের উৎপাদন ব্যবস্থায় অপবিত্র দ্রব্যাদি-পণ্যসামগ্রীর কোনো স্থান নেই। সেখানে কেবল স্বাস্থ্যকর, পবিত্র ও হালাল দ্রব্য-সামগ্রীই থাকবে। তাই ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য হবে জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যাদি-পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং সব অকল্যাণকর দ্রব্য ও পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন, বিপণন, আমদানি-রফতানি ও ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থে মৌলিক প্রয়োজনসমূহের উৎপাদন প্রাধান্য পাবে। পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, এটি একটি সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় অর্থনীতি বিদ্যার প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্মীয় ও যৌক্তিক সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ব্যবস্থা অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং বলা যায় এটা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার বিষাক্ত প্রভাবের অতুলনীয় ও নজিরবিহীন প্রতিষেধক। সকল বিশেষত্ব, সৌন্দর্য ও গুণাবলী ছাড়াও এ ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ ব্যবস্থা মানুষের মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত নয় আর মানুষের গড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশোধ কিংবা শ্রেণী স্বার্থ-সংরক্ষণ কিংবা শ্রেণীগত বিদ্বেষের মত অপরিপক্ক বিষয়। বস্তুত, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার গড়া ব্যবস্থা।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-এ উদ্ধৃত

২. আল-কুরআন, ৭:১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

❑ যাকাত ও 'উশর ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক উপাদান: সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি

ইসলামের অন্যতম 'রুকন' বা স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যাকাত যে ফরয, তা আল-কুরআনের বহু সংখ্যাক আয়াতের নির্দেশ ও স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা সপ্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুতাওয়াতির 'সুন্নাত' দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। পূর্বের ও পরের গোটা উম্মতের লোকদের সামষ্টিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা স্বীকৃত। যুগের পর যুগ ও বংশের পর বংশের মাধ্যমে তা প্রচলিত ও প্রতিপালিত। যাকাত ইসলামের এতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে , ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সময়ের ঘটনাটিই এর প্রমাণ। তিনি খলীফা হওয়ার পর পরই কিছু ভন্ড নবীর প্ররোচনায় আরবের কয়েকটি গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। খলীফার নিকট তারা যাকাত প্রদান হতে অব্যাহতি চাইল। হযরত আবু বকর (রা) তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাত-এর মধ্যে পার্থক্য করবে (সালাত পড়বে' কিন্তু যাকাত দিবে না), তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবো-ই। কেননা যাকাত হলো সম্পদের অধিকার। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তারা যদি যাকাতরূপে কোন মেষ শাবকও আদায় করে থাকতো, যদি তারা এখন আমাকে তা আদায় করতে বিরত থাকে, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য লড়াই করবো[১]।" মানুষের সমগ্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা ও হুকুম মেনে চলার নামই 'ইবাদাত'। এ 'ইবাদাত' প্রাথমিক ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত, দৈহিক ও আর্থিক। দৈহিক 'ইবাদাতের' মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সালাত, আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'যাকাত'। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দু'টি-ই সমান ভাবে 'ফরয' এবং সমান গুরুত্বের অধিকারী।

ইসলাম সম্পদের লাগামহীন সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক ভার-পরিণতি থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আবার হালাল-হারামের শর্ত, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দুর করে যাকাত এবং উশর ব্যবস্থার মাধ্যমে এক সুবিচার ও ভারসাম্যমূলক অর্থনীতি উপস্থাপিত করেছে ইসলাম। মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য সংরক্ষণে যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম ও এর অবদান ব্যাপক। ইসলাম অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও অধিকার সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকান্ড সম্পর্কে শেষ বিচার-দিবসে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। এ পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টি প্রশ্ন-ই অর্থনীতির উপর নির্ধারণ করা হয়েছে[২]।

ইসলামী জীবন দর্শনের বুনিয়াদী স্তম্ভ পাঁচটি হচ্ছে:

⇨ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি;

⇨ সালাত প্রতিষ্ঠা;

⇨ যাকাত ও ওশর আদায়;

⇨ সিয়াম পালন এবং

⇨ হজ্জ পালন।

---

১. ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, কিতাব আয্-যাকাত, হা.নং ১৩১২
২. মাওলানা মুনতাসির আহমদ রহমানী, যাকাত দর্শন (১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৮৬-এ উদ্ধৃত

Dhaka University Institutional Repository

❑ যাকাতের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক পরিচিতি

'যাকাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা, মার্জিত, উৎকর্ষিত ও সংস্কৃতিবান। কেননা যাকাত আদায়ে সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ হয় এবং তার মন বা অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পরিশুদ্ধ হয়। অন্যভাবে " সম্পদের আদি উৎসসমূহ যথা-চন্দ্র, সূর্য, মাটি বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি আল্লাহর দান। উৎপাদনের জন্য পুঁজি, শ্রম এবং এসব স্রষ্টা প্রদত্ত সম্পদের প্রয়োজন। কাজেই উৎপাদিত বস্তুতে প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজি ও শ্রমের যেমন অধিকার আছে তেমনি তৃতীয় উপকরণ স্রষ্টার নির্দেশিত পথে ব্যয় করার জন্য একাংশ স্থিরিকৃত থাকা উচিত; তাই হলো 'যাকাত' ও 'ওশর'। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ অংশ নির্দিষ্ট হওয়ার পর বাকী অংশ পরিশোধিত হয়, এখন তা অন্যান্য উপকরণের মধ্যে বন্টন হয়। যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদের পবিত্রতা ও বরকত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযব হতে সমাজ মুক্ত ও পবিত্র হয়। [১]

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্ নির্ধারিত খাতে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করাই হলো যাকাত। এতে ব্যক্তির কোন লোভ, সুনাম বা সুখ্যাতি প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকতে পারবে না। অন্যভাবে বলা যায়, জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর কাল সঞ্চিত থাকলে এদের শরীআত নির্ধারিত পরিমাণ অংশ , শরী'আহ্ নিধারিত খাতে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া মালিকানা হস্তান্তর করাকে যাকাত বলে [২]। আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, "শরীআতের দৃষ্টিতে যাকাত ব্যবহৃত হয় অর্থ-সম্পদের আল্লাহ্ কতৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরজকৃত অংশ বোঝানোর জন্য। যেমন পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে নির্দিষ্ট অংশের অর্থসম্পদ দেয়াকেও যাকাত বলে। তিনি আরো বলেন, "অর্থ-সম্পদ থেকে এই নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে 'যাকাত' বলা হয় এ জন্য যে, অর্থ সম্পদ থেকে যা বের করা হয়, তা দ্বারা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষেই তার মাত্রা ও পরিমাণ বেড়ে যায়। তা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায়। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া বলেন, " সাদকায় দানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরিমাণে বেশি হয়[৩]।" বস্তুত যাকাত একদিকে যাকাত প্রদানকারীর মন ও আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে তার ধন-সম্পদকেও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়, অন্যদিকে দারিদ্রের অভাব পূরণে সহায়তা করে এবং সম্পদে ক্রমবৃদ্ধি আনয়ন করে তাই আর্থ -সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে যাকাত আর্থিক লোভ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দারিদ্রতা ও অসমতা দূরীকরণার্থে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

---

১. আল্লামা ইব্‌ন মানযূর, প্রাগুক্ত,খ. ৪, পৃ. ৩৮০

২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ. ২৮৬

৩. প্রাগুক্ত,পৃ.২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের পরিভাষায় যাকাত ব্যয়-বন্টনের খাতসমূহকে 'মাসরাফ' বলা হয় [১]। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। এই ব্যাপারটি কোন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের ইখতিয়ারাধীন রাখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ধন-সম্পদের উপর কর ধার্যকরণ ও তা আদায় বা সংগ্রহকরণের ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকার মাত্রই নানা উপায় ও পন্থায় মাধ্যমে নানাবিধ কর আদায় করে থাকে। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, তা সংগ্রহ ও আদায় করার পর তা কোথায় ব্যয় করা হবে? এখানেই ন্যয়পরায়ণতা ও সুবিচারের বিষয়টি মানব প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অর্থ-সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টনটি হয় তিরোহিত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, শাসকগোষ্ঠী ও নীতিনির্ধারকদের অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে ও ব্যাক্তি স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে অর্থ-সম্পদ তারাই পেয়ে যায়, যারা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার যোগ্য বা অধিকারী নয়। বঞ্চিত হয় অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠি যারা এসব পাওয়ার যোগ্য অধিকারী ও হকদার[২]।

ইসলামপূর্ব বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা য়ায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রের নিকট থেকে ন্যায়-অন্যায়ভাবে অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করে কর আদায় করা হতো। এ সব ব্যয় করা হতো অংহকারী রাজা-বাদশাহদের খাজাঞ্চিখানায়। তারা তা নিজেদের ও তাদের আত্মীয়দের খাহেশ ও খেয়াল-খুশিমত ভোগ-বিলাসিতায় ব্যয় করা হতো। তাদের আধিপত্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব সুসংহতকরণে ব্যয় করত। অপর দিকে গরীব মিসকীন, দূর্বল-শ্রমজীবি ও চাষি-মজুররা চরম ভাবে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকতে বাধ্য হতো [৩]। কিন্তু ইসলাম এসে সর্বপ্রথম এই অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন-যাপন মান উন্নয়নে কৃপার ও অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তাদের জন্য যাকাত সম্পদে একটা পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ নির্দিষ্ট করে দিল। আর সাধারণভাবে সমগ্র জাতীয় সম্পদের আবর্তনেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। অর্থনৈতিক জগতে কর ধার্যকরণ ও সরকারী ব্যয় বন্টন ক্ষেত্রে ইসলামের এই সামষ্টিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ আজ হতে প্রায় দেড় হাজার পূর্বে সর্বাগ্রে গৃহীত বিষয় ছিল। বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল তার কল্যাণ অর্থনীতির বিষয়ে জানতে ও অবহিত হতে পেরেছে। আমরা মনে করি এখানে-ই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠত্বের ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার [৪]।

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
৪. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন সম্পাদিত *দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম* প্রাগুক্ত,পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব প্রয়োগ ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে-এর কার্যক্রম

আধুনিক অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ধারার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিনিয়োগ কার্যক্রমে অর্থায়ন পদ্ধতি এখন তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা নয় বরং বাস্তবতায় ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে তা সমুজ্জল। ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। জীবনের সকল অস্তিত্ব ও সমস্ত কর্মপরিসর ঘিরে এর আবর্তন। সমগ্র মানবতার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক নির্দেশনার জন্য ইসলাম একটি সুসমন্বিত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যশীল একক সমগ্রতা, বিশ্বজনীন নীতিমালার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাপাত ও সামঞ্জস্যশীল একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।[১] ইসলামের আগমন শুধু প্রচারের জন্য নয়, বরং অনুশীলন করে তা বাস্তবায়নের জন্য এবং সঠিকভাবে একে উপস্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অর্থনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম, রাজনীতি ও অর্থনীতি এসব মিলে হয় এক অবিভাজ্য সত্তা[২]। তাই ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি ও আদর্শের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব আজ সমগ্রবিশ্বের প্রতিভাত। আর এই অর্থনৈতিক ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে মজবুতভাবে গৃহীত ও সমাদৃত।

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যাংক ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এ থেকে তার সকল বুনিয়াদী নীতিমালা গ্রহণ করে এমন ব্যাংককেই ইসলামী ব্যাংক বলে।[৩] আর এ ধরনের বিশ্বাস-ই হলো এ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত চিন্তাদর্শনের প্রতীক। এ ব্যাংক ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে বিশ্বাসগত ও আচরণগতভাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলাই এ বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা। এ বিশ্বাসই হলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সকল নীতি-আর্দশ ও কার্যক্রমের ভিত্তি।[৪] এ বিশ্বজাহানের সার্বভৌমত্বের অধিকর্তা একমাত্র তিনি, আর মানুষ হলো তার প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্ব ও আকীদা-বিশ্বাস সকল আর্থিক লেনদেন ও পরিচালন প্রক্রিয়ার নিয়ামক হিসেবে গণ্য করতে এবং এসব মৌলিক বিধি-বিধানের লজ্ঘন থেকে বিরত থাকার আবশ্যকতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইসলামী ব্যাংক। [৫]

যাহোক, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা, ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রয়োগ-পদ্ধতি, কার্যাবলি ও কর্মনীতি, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তবায়ন ও-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হল :

---

১. মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩. ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, *ইসলামী ব্যাংকিং*, অনু.এম,এম.এ,এম.মুনাওয়ার আলী ও একে এম মফিজুল ইসলাম (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১১

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকর ধারণা

ইসলামী ব্যাংকের ইসলাম থেকে উৎসারিত একটি আদর্শিক চিন্তা-দর্শন রয়েছে এবং যেহেতু এ চিন্তা-দর্শন ইসলাম প্রদত্ত একটি অনুপম ব্যবস্থাপনার আওতায় ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রম পরিচালনার দাবী রাখে; সেহেতু ইসলামী ব্যাংককে সেই চিন্তাদর্শনের আলোকে শরীআহ্ বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা ও পরিচিতি প্রদান করেছেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

Organization of the Islamic Conference (OIC) ইসলামী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে তা হল :

"Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.[১]

ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী-এর মতে,

"যে ব্যাংক ইসলামী রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে এবং সকল কার্যক্রমে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায় একেই ইসলামী ব্যাংক বলে।"[২]

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন,

"প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে সুদভিত্তিক লেনদেনই পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। একপেশে বিশ্লেষণ ও কতিপয় স্থুল বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব নয়, বরং আকীদাগত চিন্তা-দর্শনের ফলশ্রুতিতে তার অর্থব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যেসব সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে তারই পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের স্বরূপ চিহ্নিত করা সম্ভব "।[৩]

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা International Association of Islami Bank (IAIB) ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

"Islami bank basically implements a new banking concepts, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic society, hence one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people."[৪]

মালয়েশিয়ান ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট ১৯৮৩ ইসলামী ব্যাংকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

"Islamic bank is a company which carries on Islamic banking Business...Islamic banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam."[৫]

---

১. Definition by the General Secretariat of the caccepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978, Cited in the Tex Book on Islamic Banking IERB 2004, p. 55
২. ডঃ সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. প্রাগুক্ত
৪. Board of Editors, *Tex Book on Islamic Banking* (Dhaka : IERB, 2003A.D.), p.55
৫. Islamic Banking Act' 1983 of Malaysia (Act no- 272) cited in the *Tex Book on Islamic Banking*, ibid, p.55

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ড. শাওকী ইসমাঈল শাহতা বলেন,

"It is therefore, ... imperative for an Islamic Bank to incorporate in functions and practices commercial investment and social activities, as an Institution designed to promote the civilized mission of an Islamic Economy."[১]

ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর মতে,

"Islamic banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam."[২]

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

"Islamic banking an alternative to interest based banking is not banking in the traditional sense of the word. It derives its inspirations and guidance from the religious edicts of Islam and has to conduct its operations strictly in accordance with the directive of Shariah."[৩]

বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি, যা তার লেনদেনে সুদ আদান-প্রদান করে না। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয় এবং এমন এক ব্যাংকিংধারার সৃষ্টি হয়, যার লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শরীআহ্সম্মত পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় বিনিয়োগ কার্যক্রমে অর্থায়ন করা। একটি ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শরীআহ্র উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও দায়বদ্ধ থাকে।

❒ ইসলামী ব্যাংক-এর গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শরীআহ্ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটি বিষয়ের বিবেচনা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

এক. আল কুরআনের একাধিক আয়াত, চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা' দ্বারা সুদের অবৈধতার প্রমাণিত ও সাব্যস্ত [8]। এরপর কোন মুসলিম সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতে পারে না। যে এই নীতিবিরোধী কাজ করবে অবশ্যই তা ঈমানের পরিপন্থী হবে। অতএব, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মুলোৎপাটন করা এবং হালাল উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, ভোগ, বন্টন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। আর এটা প্রশ্নাতীতভাবে ঈমানী দ্বায়িত্বেরই একটি অংশ। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ্ব আদায় করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সুদী লেনদেন বা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার যাবতীয় কার্মকান্ড বিলোপ সাধনও সমানভাবে জরুরী।[৫]

---

১. Munawar Iqbal, *Islamic Banking and finance: Current Develpment in theory and practice* (Leicester: The Islamic Foundation, 2001 A.D.), cited in p.2

২. ibid

৩. ibid

৪. আবদুর রকীব সম্পাদিত, *শরীআহ্ পরিপালন: প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক* (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ৫৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আধুনিককালে ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা ও উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচিত। একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্নত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অত্যাধুনিক শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য[২]।

তিন. বর্তমান অর্থব্যবস্থায় অমুসলিমবিশ্বতো বটেই, এমনকি মুসলিমবিশ্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধারার আদলে একটি ব্যাংক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে আর্থিক কর্মকান্ড সচল রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করার কথা ভাবতে পারে না। কারণ ব্যাংকব্যবস্থা ক্রমশ আধুনিক জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, আমদানি-রপ্তানি, সঞ্চয়-বিনিয়োগ ও তহবিল স্থানান্তর এমনকি দলিলপত্র ও অলঙ্কারাদির নিরাপদ সংরক্ষণের জন্যও জনগণ ব্যাংকের দ্বারস্থ হচ্ছে।

চার. পৃথিবীতে বর্তমানে দুই ধারার ব্যাংকিং চালু রয়েছে। একটি অতি পুরাতন যা সুদী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরটি অতিসাম্প্রতিক যা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ইসলামী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বয়স প্রায় চার যুগ অতিক্রম করতে চলেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দূর্বল ও বিরূপ অবকাঠামো এবং প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়া জুড়ে আপাতদৃষ্টিতে যে ব্যাপক সাফল্য ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে তাতেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে।[৩]

পাঁচ. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম অপরিহার্যতা এ কারণেও যে, সমাজ ও জাতিকে সুদের অর্থনৈতিক শোষণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সুদী লেনদেন, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন ও প্রবর্তন কে ইসলাম গুনাহ বা অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শরীআহ্‌বিশেষজ্ঞদের মতে, আল-কুরআন এমন কঠোর ভাষায় সুদকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সম্ভবত, অন্য কোন অপরাধ বা গুনাহ্‌র ক্ষেত্রে এতোটা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি।[৪] অনুরূপ সুন্নাহতেও সুদী লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষণ করে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে [৫]। সুদনির্ভর অর্থব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান মানুষকে শোষণ করে এবং মানুষের মধ্যে নৈতিকতা বিরোধী প্রবনতা সৃষ্টি করে। সুদী ব্যবসায়ী সাধারণত কৃপন, মুনাফাখোর ও শোষক হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়-এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বেকারত্ব সৃষ্টি হয়, পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং পরিণামে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। সুতরাং সুদের এসব দুষ্টক্ষত এবং অনৈতিক কার্যাবলি থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রচলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

---

১. M.Nejatullah siddiqi, *Banking without Interest* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983 A.D), p.56
২. Shahid Hasan Siddiqui, *Islamic Banking* (Karachi: Royal Book Co.1994 A.D.), p.19
৩. ibid
৪. ibid, p.20
৫. ibid, p.23

Dhaka University Institutional Repository

❐ ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকের আদর্শিক ভিত্তির প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আদর্শিক ও নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, নীতিমালা ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রকৃতি নিম্নরূপ : [১]

ক. আল্লাহ্ তাআলাই একমাত্র স্রষ্টা। এ বিশ্বজাহানের সার্বভৌমত্বের অধিকর্তা একমাত্র তিনিই, আর মানুষ হলো তাঁর প্রতিনিধি। এ বিশ্বাসই হলো ইসলামী ব্যাংকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সকল নীতি আদর্শ ও কার্যক্রমের ভিত্তি। সুতরাং এ ব্যাংক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করতে এবং এতে আস্থা রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

খ. এ ব্যাংক বিশ্বাস করে যে, তার কার্যক্রম একটি সার্বজনীন ইসলামী ব্যবস্থাপনার অংশ।

গ. এ ব্যাংক এটাও মনে করে যে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী নীতি আদর্শ ও তার যথাযথ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও রূপায়নে দায়বদ্ধ।

ঘ. ইসলামী জীবন চরিত্রের সার্বজনীন রূপধারনে দায়বদ্ধ।

ঙ. তার ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্য ব্যাপক প্রয়োজন পূরণে সমর্থ।

চ. ইসলামী ব্যাংক সুদ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে দায়বদ্ধ।

এছাড়াও ইতোমধ্যে আলোচিত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা থেকে এর যে বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় তা নিম্নরূপ[২]:

ক. শরীআহ্ভিত্তিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক শরীআহ্র নির্দেশাবলী মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। শরীআহ্র নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যবিধি, কর্মপরিকল্পনা, কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীআহ্র অনুসারী। সাংগঠনিক, প্রশাসনিকসহ কর্মচারী পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই শরীআহ্র বিধি-নিষেধের আলোকে সম্পাদন করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ইসলামী ব্যাংক আর্থিক লেনদেনের কার্যাবলিতে জড়িত। ব্যাংক অর্থ জমা নেয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রদান করে। এই অর্থে ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

গ. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন ব্যবসার সাথে ইসলামী ব্যাংক জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে লাভ-লোকসান এবং ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে। শুধু লাভই হিসেব করা হয়না বরং লোকসানেরও ঝুঁকি বহন করতে হয়। সুতরাং একে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

ঘ. সুদবিহীন ব্যাংক : সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকান্ডের কোন পর্যায়ে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করে না। ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রমকে সুদ থেকে মুক্ত রাখতে হয়।[৩]

---

১. ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৩

২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনু. মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ.২২-২৫

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. লাভ-লোকসানের অংশীদার : সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করলেও এর লেনদেন আয়শূন্য নয়। ইসলামী ব্যাংক আমানতদারদের লাভ-লোকসানের অংশীদার করে নেয়। উদ্যোক্তার সাথেও লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে এর সম্পদ বিনিয়োগ করে। ফলে এ ব্যাংকের ব্যবসা লাভ-লোকসান বন্টনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

চ. অর্থের ব্যবসা নয়, অর্থের মাধ্যমে ও সাহায্যে ব্যবসা : সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় অর্থ বরং নিজেই একটি ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এ অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ একটি বিনিময় মাধ্যম মাত্র। সুদী ব্যাংক যেখানে অর্থলগ্নীর ব্যবসা করে, অর্থ দিয়ে অর্থ বৃদ্ধি করে, সেখানে ইসলামী ব্যাংক অর্থের সাহায্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে এবং ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করে, যা প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থায় নেই।

ছ. কারদ হাসান : ইসলামী ব্যাংক তার অর্থ বিনিয়োগকালে সমাজের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তাই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে বিনালাভে ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাক্তিগত ও জনকল্যাণমূলক এ বিশেষ ঋণ কারদ হাসান বা কল্যাণকর ঋণ নামে পরিচিত। ইসলামী ব্যাংকিং-এ কারদ হাসান ব্যতীত অন্য কোনো ঋণের ব্যবস্থা নেই।

জ. যাকাত তহবিল : ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব যাকাত তহবিল রয়েছে। ব্যাংক তার নিজস্ব অর্থ-সম্পদ ও আয়ের ওপর যে যাকাত দেয় তা উক্ত তহবিলে জমা করে এবং এই অর্থ শরীআহ্ অনুমোদিত ও নির্ধারিত পন্থায় ব্যয় করে।

ঝ. শরীআহ্ কাউন্সিল : ইসলামী ব্যাংকিং শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকী ও সুপারভিশন করার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব শরীআহ্ কাউন্সিল বা শরীআহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড রয়েছে। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালা মোতাবেক পরিচালনায় শরীআহ্ বোর্ড দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

ঞ. বহুমূখী তৎপরতা : ইসলামী ব্যাংকের বহুমুখী তৎপরতা ও কার্যক্রম রয়েছে। এটি একাধারে বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থায়নকারী ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক এবং উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূখী ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানীর মতে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং-এর কয়েকটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হলো :[১]

প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনীতির বাস্তব খাত (Real Sector) বা বাস্তব পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করে থাকে, ফলে এ ব্যবস্থা অর্থের প্রবাহ এবং পণ্য-সামগ্রী ও সেবা সরবরাহের মধ্যে সংগতি রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অসাধারণ স্থিতিশীলতা বহাল রাখতে সক্ষম।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়* অনু. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন (ঢাকা: আইইআরবি, ২০০৮ খ্রি) পৃ.৯৯-১০০

Dhaka University Institutional Repository
দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা-এর নিজস্ব প্রবর্তিত রাষ্ট্রে লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলি পরিচালনা করে। এভাবে ইসলামী ব্যাংক সমাজকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখে। বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অর্থনীতি যদি মন্দা বা মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে নিপতিত হয় তাহলে সে অবস্থায় লাভ-লোকসানে অংশীদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির চালকদেরকে পুঞ্জিভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখে এবং ঋণখেলাপী ও দেওলিয়াত্বের সংখ্যা নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

তৃতীয়ত, ইসলামী বাংক ব্যবস্থার আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বিনিয়োগ বা অর্থায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নির্ধারিত সুদের হারের পরিবর্তে লাভ-লোকসানে অংশীদারীত্বের ওপর ভিত্তিশীল।

চতুর্থত, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে নতুন নতুন ধারণা ও নবতর উৎপাদান ক্ষমতা উদ্ভাবনের ওপর এবং নতুন ঋণ সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীলতা থাকবে না। নতুন নতুন মুনাফা এবং সঞ্চয়ের ইতিবাচক প্রবাহের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ভিত্তিশীল হবে।

পঞ্চমত, অর্থের বিশুদ্ধতা ও সততা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি পুন:প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষে মানুষে বিরোধের কমপক্ষে একটি কারণের বিলুপ্তি ঘটবে। সঞ্চয়কারী, নির্দিষ্ট আয়কারী ও দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ জনগোষ্ঠির কাছ থেকে যে অর্থ অতিসংগোপনে এবং সবার অলক্ষ্যে আত্মসাৎ করা হয় এর অবসান ঘটবে।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামের আদর্শিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানবতার মনোজাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নকে সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়[১]। বিশ্বনবী (সা.) একটি শোষনমুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম (খিলাফাত আলা মিনহাজিন-নুবূয়্যা) বর্ণিত চিন্তাদর্শনের ভিত্তিতে সূচনা করেছিলেন। বিশ্বনবী (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর তাঁর সকল কার্যক্রম দু'টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সূচনা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান দু'টি হল; একটি মসজিদ অপরটি হল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রভূমি বাজার। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনস্তাত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নধারা যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়ে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হতে পারে। কেননা মসজিদ মন ও মস্তিষ্ক বিকশিত করে, চরিত্র উন্নত করে এবং মানসিকতাকে ক্যল্যাণমূখী করে এবং এসবের সমন্বিত প্রভাবে বাজার কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা ও কর্মকান্ড পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে তোলে।[২] ইসলামী অর্থব্যবস্থার ধারণা নতুন কিছু নয়। আল-কুরআন, সুন্নাহ্ ও সমৃদ্ধ ফিকহ্শাস্ত্রের বিশাল সম্ভারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শতশত বছর পূর্বে যখন পাশ্চাত্যে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের অস্তিত্বও ছিল না। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শীর্ষক শিরোনামে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

১. Dr. Sabahuddin Azmi, *Islamic Economisc* (New Delhi: Goodword Books, 2009 A.D), p.30

২. ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
(সূত্র: *ইসলামী ব্যাংকের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা বিষয়ক বিশ্বকোষ (ছয় খন্ড)* আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত, উরুবা, কায়রো, (১৯৭৮ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও এ বিষয়টি সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা বাস্তবরূপ নেয় ষাটের দশকে এসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং ছিল কেবল দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের গবেষণা ও রচনার বিষয়। দ্বিতীয়ার্ধের ষাটের দশক ছিল বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকাল এবং সত্তরের দশক ছিল বাস্তবায়নের দশক। পরবর্তী দশকগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণমূখী ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১]

যাহোক, ইসলামী ব্যাংকিং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতাকে পর্যালোচনা-অনুসন্ধানের সুবিধার্থে কয়েকটি পর্বে বিন্যাসকরে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হলো: [২]

- ষাটের দশক : পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ বা তাত্ত্বিক অনুশীলন।
- সত্তরের দশক : ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা।
- আশির দশক : সংহত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।
- নব্বই দশক : সুদৃঢ়ভিত্তি।
- এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা।
- আন্তর্জাতিক পরিসরে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক।
- ইসলামী ব্যাংকিং-এর সহযোগী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশ।
- বাংলাদেশে নন-ব্যাংক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

❐ ষাটের দশক : পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ বা তাত্ত্বিক অনুশীলন

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিসরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' কায়েম করা হয়। ১৯৬৪ সালের ৭ মার্চ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলাম বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন।[৩] তারা সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সম্মেলনে সর্বসম্মত অভিমত ঘোষণা করা হয় যে, ভোগ বা উৎপাদন যেকোন উদ্দেশ্যে ঋণের ওপর ধার্যকৃত বাড়তি অর্থ, পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক, তা নিষিদ্ধ 'রিবা'র পর্যায়ভুক্ত। সম্মেলনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের কতিপয় ইসলামী পদ্ধতিও অনুমোদন করা হয়। অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আরো কতিপয় বিষয় গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ইসলামী বিকল্প উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণের মতামত আহবান করা হয় [৪]।

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'পিলগ্রীম্‌স সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা কায়েম করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে ডক্টর আহমদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিসরের কায়রো থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে 'মিটগামার' নামক এক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় [৫]।

১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাস করে ইসলামী শরীআহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এ উদ্যোগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য এক ধাপ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে ষাটের দশক ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক অনুশীলনের দশকরূপে চিহ্নিত হয় [৬]।

---

১. Mohsin Khan and Abbas Mirakhar (eds.), *Theoritical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: Institute for Research and Islamic Studies, 1987 A.D), p.80-83
২. Board of Editors, *Text Book on Islamice Banking*, (Dhaka: IERB, 2003 A.D), p. 47-52
৩. Yahia Abdul Rahman, *The Art of Islamice Banking and Finance* (New Jersey, Johon-Wiley & Sons Inc. 2010 A.D.), p. 191-193
৪. ibid
৫. ibid
৬. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ সত্তরের দশক : ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা

১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশগুলো শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদ স্বাক্ষর করে। এ উপলক্ষে সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এক আবেগপূর্ণ ভাষণে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আযীয মুসলমানদের অবস্থাকে মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া সেই উটের সাথে তুলনা করেন, যার পিঠে মশকভর্তি পানি থাকা সত্ত্বেও সে উট পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[১]

মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল দায়িত্ব নিয়ে ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) যাত্রা শুরু করে। আইডিবি প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সত্তর দশকের শেষ নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশটির বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার মধ্যে শেখ সাঈদ আহমদ লুতাহ-এর উদ্যোগে 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' নামে ১৯৭৭ সালে আরো দু'টি বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর কুয়েতে শেখ আহমদ রা'জি আল ইয়াসিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ'।[২]

বিভিন্ন মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে এ সময় কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সত্তর দশক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।[৩]

❒ আশির দশক : সংহত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

আশির দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। সরকারী ও বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ফোরামে এ দশকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরদার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এ ব্যবস্থার পরিচালনাগত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এ সময় নানামূখী বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের মে মাসে OIC'র সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ সম্মেলনে ইসলামী আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্‌বান জানানো হয়, যার শাখা সকল সদস্য দেশে সম্প্রসারিত হবে। বাংলাদেশ ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করে।[৪]

১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মুসলমানদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়;

"The Islamic countries should develop a separate Banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce."[৫]

---

১. Ausaf Ahmed, The Evolution of Islamic Banking : In Encyclopaedia of Islamic banking and Insurance (London : IIBI, 1995 A.D.), P.17
২. ibid
৩. ibid, p.18
৪. ibid,
৫. Text Book on Islamic Banking, ibid, p.56

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭৯ সালে ইরানে রাজতন্ত্রের উৎখাত করে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ১৯৮১ সাল থেকে সেদেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানদের খার্তুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়।

১৯৮৪ সাল থেকে ইরান তার সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে পুনর্গঠন করে।[২]

পাকিস্তানের সার্বিক ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তও এ সময়ই গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই থেকে পাকিস্তানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সুদানের ব্যাংকব্যবস্থা শরীআহ্‌র আলোকে পুনর্গঠনের জন্যে এ সময় উদ্যোগ নেয়া হয়।[৩]

আশির দশকের প্রথম সাত বছরে নতুন ৫৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আশির দশকের শেষ নাগাদ একশ'টির বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের শাখা সংখ্যা এ সময় দশ হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যায়।

❒ নব্বই দশক : সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন

নব্বই দশকে সারাবিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এ সকল ব্যাঙকের পরিচালনগত সাফল্য ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি বিশ্বের ব্যাংকার অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। ফলে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রসার বৃদ্ধি পায়। ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণসহ সারাবিশ্বে বিশ শতকের শেষ নাগাদ তিনশ'র বেশি ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস (আইআইবি)-র উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা এ সময় বৃদ্ধি পায়। নীতি ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোগ দৃঢ়তর হয়।[৪]

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপলাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতেই নয়, অনেক স্বল্পোন্নত দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিমবিশ্বের বাইরেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এযাবত তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহের যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যান্য দেশে। সুদান, মিসর,পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য এমনকি বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং মডেল সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ রয়েছে[৫]।

---

১. Jalees Ahmed Faruqi and Shahid Habibullah, *Islamisation of Banking in Pakistan* (Karachi: Research Deptt.United Bank Ltd. 1984 A.D), p.23-25
২. S.H. Amin, *Islamic Banking and Finance: The Experience of Iran* (Tehran:Vahid Publications, 1986 A.D), p.30-33
৩. Jalees Ahmed Faruqi and Shahid Habibullah,ibid, p.26
৪. ibid
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমিক গবেষণা ও অধ্যয়নের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে। এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও ডিপ্লোমা সনদ প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❒ একনজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা : [১]

- ইসলামী নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মালেয়েশিয়ার Pilgrims Saving Corporation প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মিসরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭০ সালে ওআইসি দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের স্যোসাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৩ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৪ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে International Association of Islamic Banks (IAIB) গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়[২]।
- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে তার সামগ্রিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে[৩]।
- ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়[৪]।
- ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

১. Kamel Saleh, *Development of Islamic Banking Activity: Problems and Prospects* (Jeddah: IRTI/IDB,1998 A.D), p81
২. Jalees Ahmed Faruqi and Shahid Habibullah,ibid, p.63
৩. S.H.Amin, ibid, p.49
৪. Ataul Huq (ed.) *Readings in Islamic Banking* (Dhaka: IFABA, 1987) p.28

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদানের জন্য হিসাব বিজ্ঞান মান প্রস্তুত ও এর বাস্তব প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে। ইসলামী অর্থনীতির আলোকে হিসাব বিজ্ঞান মান প্রয়োগের জন্য ইতোমধ্যেই কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বের প্রতিটি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সঠিক ও মানসম্পন্ন হিসাব পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ, মনিটরিং এ বিশ্বব্যাপী শরীআহ্ ভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :[১]

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
- Islamic financial Service Board (IFSB)
- International Islamic financial Market (IIFM)
- International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)

❒ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI):

ইসলামী অর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক হিসাববিজ্ঞান বিবরণী, ইসলামী শরীআহ্র নীতিমালা ,আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান মান, নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন এবং নীতি প্রস্তুত ও এর পরিপালন সংক্রান্ত যাবতীয় দিক নির্দেশনামূলক কাজ করে থাকে। এ পর্যন্ত বিশ্বের মোট ২৫ টি দেশ যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, সুদান, কাতার, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, বাংলাদেশ, ব্রুনাই, ক্যামো দীপপুঞ্জ, ইয়েমেন, শ্রীলংকা, তিউনিশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরাত, ফিলিস্তিন এবং পাকিস্তানের সর্বমোট ৮৭টি ব্যাংক AAOIFI এর সদস্যপদ লাভ করেছে। সবচেয়ে বেশী সদস্য হচ্ছে সুদানের মোট ১৮টি ব্যাংক। বাংলাদেশের 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর একমাত্র সদস্য।

❒ Islamic Financial Service Board (IFSB)

ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বোর্ড (আইএফএসবি) মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নভেম্বর ২০০২ সালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ও ১০ মার্চ, ২০০৩ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও ইসলামী আর্থিক বাজারে এদের অবস্থান সুসংহত করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬৪, এর মধ্যে ৪১টি পরিচালনা ও তদারকি কর্তৃপক্ষ আছে। এগুলোর মধ্যে ব্যাংক, ইসলামিক কর্পোরেশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব প্রাইভেট সেক্টর এবং ১১৭টি দেশের শীর্ষ স্থানীয় কোম্পানী। প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী সদস্য ২১টি এবং পর্যবেক্ষণ সদস্য ১২২টি। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর প্রতিষ্ঠানটি একমাত্র পর্যবেক্ষক সদস্য।

আইএফএসবি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭টি মান, নীতি এবং কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। এগুলো হচ্ছে-Risk Management, Capital Adequacy, Corporate Governance, Supervisory Review Process, Market Transparency, Market Discipline, Recognition of Rating on Shariah compliant Financial Instruments. এছাড়া সংস্থা আরো ৫টি নতুন নীতিমালার উপর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-(১) মূলধন পর্যাপ্ততার বিশেষ অবমুক্ত KEY (special Issuance of Capital Adequacy) (২) বিনিয়োগ তহবিলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা (৩) সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাকাফুল পরিচালনা (৪) শরীয়াহ পরিপালন ও (৫) বাজার পরিচালনা।

---

১. Daphen Buckmaster, *Islamic Banking : An Overview* (London : Institute of Islamic Banking and Insurance, 1996 A.D.), p.42-45

Dhaka University Institutional Repository

❒ International Islamic Financial Market (IIFM)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক অব বাহরাইন, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সুদান এবং ইসলামী উন্নয়ন বাংকের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ইসলামিক আর্থিক বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও উন্নয়ন সাধন করা। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন উপাদান (Product) উদ্ভাবন ও এর উন্নয়ন, ইসলামী মূলধন ও মুদ্রা বাজারের উপর উপদেশ, পরামর্শ প্রস্তুত, বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি, শরীয়াহ বোর্ডের মাধ্যমে আর্থিক কার্যক্রমে শরীআহ্ পরিপালনের উপর গুরুত্ব আরোপ, অভিন্ন ও গ্রহণযোগ্য দলিলপত্র ও আর্থিক উপাদান প্রস্তুতের মাধ্যমে ন্যূনতম খরচ নির্ধারণ ও আর্থিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক মতামত বিনিময়, কারিগরি উন্নয়ন, কারিগরি সহায়তা এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করার ব্যাপারে সহায়তা করে।[১]

❒ International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)

বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)। মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত INCEIF শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে[২]।

এছাড়াও রয়েছে

- International Islamic Centre for Reconciliation & Arbitration (IICRA)
- General Council for Islamic Banks & Financial Institutions (GCIBFI)

---

১. ibid

২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ এ পর্যন্ত বিশ্বের যে সব দেশে ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর একটি তালিকা দেশের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠার সালসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
ক.মুসলিম দেশসমূহ		
১. আফগানিস্তান	ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান	১৯৯৩
২. আলজিরিয়া	ব্যাংক আল-বারাকা দ্য আলজেরি	১৯৯১
৩. আলবেনিয়া	আরব ইসলামিক ব্যাংক অব আলবেনিয়া	১৯৯৪
৪. ইরাক	ইসলামিক ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১৯৯৩
৫. ইরান	ব্যাংক মিল্লি ইরান	১৯৭৯
	ব্যাংক কেশাভারজি	১৯৭৯
	ব্যাংক মাছকান ইরান	১৯৭৯
	ব্যাংক সাদারাত ইরান	১৯৭৯
	(পূর্বের ব্যাংক সাদারাত ভা মাদান)	
	ব্যাংক সিপাহ	১৯৭৯
	ব্যাংক তিজারাত, তেহরান	
৬. ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংক মুয়ামালাত ইন্দোনেশিয়া	১৯৯২
	বিপিআর আমানাহ উম্মাহ	-
	বিপিআর আমানাহ রব্বানিয়াহ	-
	বিপিআর আর্থা কারিমাহ ইরসায়াদী	-
	বিপিআর বাবুস সালাম	-
	বিপিআর বায়তু নিয়াজা ইনসানি	-
	বিপিআর বায়তুর বেরকাহ জেমাদানা	-
	বিপিআর বাইতুর রিদ্দাহ	-
	বিপিআর রেকাহ আমাল সেজাহতেরা	-
	বিপিআর বিনা আমওয়ালুল হাসানাহ	-
	বিপিআর দানা মারধাতিল্লাহ	-
	বিপিআর দানা তিজারাহ	-
	বিপিআর হারেউকাত	-
	বিপিআর হার্তা ইনসান কারিমাহ	-
	বিপিআর ইখওয়ানুল উম্মাহ	-
	বিপিআর ইনতি রাক্কাত	-
	বিপিআর মারজিরিজকি বাহাগিয়া	-
	বিপিআর কিরাদাহ	-
	বিপিআর শরীয়াহ সালেহ আর্থা	-

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	বিপিআর শরীয়াহ বানগুন দারাজাত ওয়ারাযা	-
	বিপিআর শরীয়াহ মেনতারি	-
	বিপিআর উসওয়াতুন হাসানাহ	-
৭. কাজাখস্তান	আল-বারাকা কাজাখস্তান ইন্টারন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাংক	১৯৯১
	ন্যাশন্যাল ইসলামিক ব্যাংক	
৮. কাতার	ইসলামিক এক্সচেঞ্জ এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী কাতার	১৯৮৩
	কাতার ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
	কাতার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৯০
	আল-জায়িরা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	
৯. কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ	১৯৮২
১০. কুয়েত	কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, সাফাত	১৯৭৭
	ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস	১৯৮৮
১১. গাম্বিয়া	ইসলামিক ব্যাংক অব গাম্বিয়া	১৯৮৪
১২. গিনি	ব্যাংক ইসলামিক দ্যা গিনি	১৯৮৩
	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
১৩. জর্দান	জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট	১৯৭৮
	ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান	১৯৮১
	ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৮
	জর্দান ফাইন্যান্স হাউস, আম্মান	১৯৮৮
	বাইত আল-মাল সেভিংস এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৮
১৪. জিবুতি	ব্যাংক আল-বারাকা জিবুতি	১৯৯০
১৫. তিউনিসিয়া	বাইত আত-তামওয়ীর আল্-সউদী আল্-তিউনিসি	১৯৮৩
১৬. তুরস্ক	ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন	১৯৮৫
	আল-বারাকা টার্কিস ফাইন্যান্স হাউস	১৯৮৯
	টার্কিশ-কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস	১৯৮৯
	ফয়সাল ফরেন ট্রেড এ্যান্ড মার্কেটিং কোম্পানী	-
	ফয়সাল রিয়াল এস্টেট কনস্ট্রাকশান এ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী	-
১৭. নাইজার	ব্যাংক ইসলামিক দ্য নাইজার	১৯৮৩
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
১৮. পাকিস্তান	(ক)	ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট	১৯৭৯
		ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান	১৯৭৯
		হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
		স্মল বিজনেস ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
		দি ব্যাংকার্স ইকুইটি লিমিটেড	১৯৭৯
	(খ)	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
		ইসলামিক মুদারাবা কোম্পানী	১৯৮০
		মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৮৩
		ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		এ্যালায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিমিটেড	১৯৮৩
		এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৮৩
		আশকারী কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ব্যাংক অব খাইবার	১৯৮৩
		ব্যাংক অব পাঞ্জাব	১৯৮৩
		দোহা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ফেডারেল ব্যাংক অব কোঅপারেটিভস	১৯৮৩
		এমিরেটস ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল	১৯৮৩
		হাবিব ক্রেডিট এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ইনডাজ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৮৩
		ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৯৮৩
		মাশরিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		মেহরান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন	১৯৮৩
		পাক-লিবিয়া হোল্ডিং কোম্পানী লিমিটেড	১৯৮৩
		প্রাইম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		প্রুডেন্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
		পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাংক লি:	১৯৮৩
		এ বি এন আমরো ব্যাংক	১৯৮৫
		আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক	১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	এ. এন. জেড. গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক	১৯৮৫
	ব্যাংক অব আমেরিকা	১৯৮৫
	ব্যাংক অব টোকিও	১৯৮৫
	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	১৯৮৫
	বালোন ব্যাংক	১৯৮৫
	চেজ ম্যানহাটান ব্যাংক	১৯৮৫
	সিটি ব্যাংক	১৯৮৫
	ডয়েশ ব্যাংক	১৯৮৫
	বাবিব ব্যাংক এ. জি. জুরিখ	১৯৮৫
	হংকং ক্রেডিট এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন	১৯৮৫
	রূপালী ব্যাংক	১৯৮৫
	ফাস্ট উওমেনস ব্যাংক লি:	১৯৮৫
	প্যান-আফ্রিকান ব্যাংক:	১৯৮৫
	সোসিয়েট জেনারেল দ্য ফ্রেঙ্গ এ্যান্ড	১৯৮৫
	ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৮৫
	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৯৮৫
(ঘ)	আল-তওকিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯০
	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, লাহোর	১৯৯০
	সোনেরি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯১
	ব্যাংক আল-হাবিব	১৯৯১
	ইউনিয়ন ব্যাংক,ফয়সালাবাদ	১৯৯১
	আল- ইনভেস্টমেন্ট ফয়সালাবাদ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯১
	ইয়ুথ ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড প্রমোশান সোসাইটি	১৯৯২
১৯. প্যালেস্টাইন	ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্ট ব্যাংক	১৯৯৪
	দি ইসলামিক আরব ব্যাংক, গাজা	১৯৯৫
২০. বাংলাদেশ	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
	আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (বর্তমানের দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড)	১৯৮৭
	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
	সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক	২০০১
	শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন	২০০১
	এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ	২০০৪
	প্রাইম ব্যাংক (ইসলামী শাখা)	১৯৯৫
	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লি. (ইসলামী শাখা)	২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২০০১
	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড	২০০০
	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	২০০০
	ফার ইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	২০০১
	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২০০২
	প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০১
	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০১
	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০২
২১. বাহরাইন	বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, মানামা	১৯৭৯
	ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন	১৯৮১
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৩
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন	১৯৮৩
	শিরকাত আল-তাকাফুল আল-ইসলামীয়া	১৯৮৩
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দ্য গালফ	১৯৮৪
	আল-বারাকা ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন	১৯৮৪
	ইসলামিক ট্রেডিং কোম্পানী	-
	গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৮৫
	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স এ্যান্ড রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৭
	আল-আমীন সিকিউরিটিজ কোম্পানী, মানামা	১৯৮৭
	আরব ইসলামী ব্যাংক	১৯৯০
	আল-তৌফিক কোম্পানী ফর ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	১৯৯০
	আল-গোসাইবী ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লি: মানামা	১৯৯৫
	ইসলামিক ব্যাংক বাহরাইন	১৯৯৫
	ফয়সাল সিকিউরিটিজ এ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	-
	ইসলামিক লিজিং কোম্পানী	-
২২. ব্রুনাই	পারবাদানন তাবুং আমানাহ ইসলাম ব্রুনাই	-
	ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রুনাই বেরহাদ	১৯৯৩
	তাকাফুল (টি.এ.আই.বি) সেনদিরিন বেরহাদ	-
	তাকাফুল (আই.বি.বি) সেনদিরিন বেরহাদ	-
২৩. মরক্কো	ব্যাংক আল-আক্বীদাহ	১৯৮৫
২৪. মালয়েশিয়া	লেমবাগা উরুসান দান তাবুং হাজী	১৯৬৩
	ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বেরহাদ	১৯৮৩
	শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া সেনদিরিন বেরহাদ	১৯৮৪
	দাল্লাহ আল-বারাকা মালয়েশিয়া	১৯৯১
	শিরকাত আল-ইজারা সেনদিরিয়ান বেরহাদ	১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	মালয়ান ব্যাংকিং বেরহাদ	-
	ব্যাংক কেরজাছামা রাকায়াত মালয়েশিয়া	১৯৯৪
	বি.আই.এম.বি. ইউনিট ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট বেরহাদ	-
	বি.আই.এম.বি. সিকিউরিটিজ সেনদিরিন বেরহাদ	-
২৫. মালি	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	১৯৯৪
২৬. মিশর	নাসের সোস্যাল ব্যাংক	১৯৭১
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঈজিপ্ট	১৯৭৭
	আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো	-
	ব্যাংক মিশর (ইসলামী শাখাসমূহ)	১৯৮০
	আরব ইন্সুরেন্স কোম্পানী	১৯৮০
	ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স	-
	এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, কায়রো	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং	-
	ইজিপসিয়ান সউদী ফাইন্যান্স ব্যাংক	১৯৮৩
	আল-সালাম ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৮
২৭. মৌরিতানিয়া	ব্যাংক ইসলামিক আল-বারাকা মৌরিতানিয়ান	১৯৮৫
২৮. লেবানন	আল-বারাকা ব্যাংক, বৈরুত	-
২৯. সউদী আরব	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	১৯৭৫
	ইসলামী আরব ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯
	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	১৯৮২
	আল-রাজী ব্যাংক এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন	১৯৮৪
৩০. সংযুক্ত আরব আমীরাত	দুবাই ইসলামিক ব্যাংক	১৯৭৭
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ, শারজাহ	১৯৮০
	আবুধাবী ইসলামী ব্যাংক	-
	ইসলামিক আরব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	-
৩১. সেনেগাল	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
	ব্যাংক ইসলামিক দ্য সেনেগাল	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	-
৩২. সুদান	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান	১৯৭৭
	ইসলামিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯
	এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান	-
	আল-বারাকা ব্যাংক, খার্তুম	১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	সুদানীজ ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
	আল-শামিল ইসলামী ব্যাংক	১৯৮৩
	ইসলামিক কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান	১৯৮৩
	ব্যাংক অব খার্তুম গ্রুপ	১৯৮৩
	আল-তাদামন ইসলামিক ব্যাংক	-
	আল-বারাকা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	ব্লু নাইল ব্যাংক	-
	সিটি ব্যাংক	-
	কোঅপারেটিভ ইসলামিক ব্যাংক ফর ডেভেলপমেন্ট	-
	এল-নাইল ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ফরমার্স ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	-
	হাবিব ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	-
	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	-
	তাদামন ইসলামিক কোম্পানী ফর এগ্রিকালচারাল	-
	ডেভেলপমন্ট লি:	-
	তাদামন ইসলামিক কোম্পানী ফর ট্রেড এ্যান্ড ইনবেস্টমেন্ট	-
	তাদামন এক্সচেঞ্জ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	-
	ইসলামিক ট্রেডিং সার্ভিসেস কোম্পানী	-
	ফয়সাল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	-
	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	-
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	-
	ন্যাশনাল ব্যাংক অব সুদান	-
	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ওমদুরমান ন্যাশনাল ব্যাংক	-
	আল-সাফা ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ক্রেডিট ব্যাংক	-
	সউদী সুদানীজ ব্যাংক	-
	মাশরিক ব্যাংক	-
	সুদানীজ ফ্রেঙ্গ ব্যাংক	-
	সুদানীজ এস্টেট ব্যাংক	-
	সুদান কমার্শিয়াল ব্যাংক	-
	সুদানীজ সেভিংস ব্যাংক	-
	ওয়ার্কারস ন্যাশনাল ব্যাংক	-

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
খ. অমুসলিম দেশসমূহ		
১. আর্জেন্টিনা	ইসলামিক প্যান আমেরিকান ব্যাংক	-
২. জার্মানী	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, ফ্রাংকফুর্ট	-
৩. ডেনমার্ক	ফয়সাল ইন্টারন্যাশলাল ব্যাংক ডেনমার্ক	১৯৮৩
৪. থাইল্যান্ড	এ্যারাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী	১৯৮৩
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৮
	আল-বারাকা ব্যাংক লিমিটেড, ডারবান	১৯৮৮
৬. ফিলিপাইন	আমানাহ ব্যাংক, জামবোয়াংগো	১৯৮২
৭. বাহামা	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব গালফ	১৯৭৭
	দার আল-মাল আল্-ইসলামী	১৯৮০
	আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক	-
	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেডিং লিমিটেড	-
	ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, বাহামা	১৯৮৩
	ইসলামিক তাকাফুল এ্যান্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৩
৮. ভারত	আল-আমীন ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৬
	আল-বারাকা ফাইন্যান্স হাউজ, মুম্বাই	১৯৯১
	ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ মুম্বাই	-
	ফালাহ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ মুম্বাই	-
	আমানাহ ব্যাংক, ব্যাঙ্গালোর	-
৯. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	দার আল-মাল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস	-
	আল-বারাকা ব্যাংক, টেক্সাস	১৯৮৭
	আল-বারাকা ব্যাংক, ক্যালিফোর্নিয়া	১৯৮৭
	আল-আমীন ব্যাংক, শিকাগো	১৯৮৯
১০. যুক্তরাজ্য	আল-রাজী কোম্পানী ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮২
	ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ	১৯৮২
	ফার্স্ট ইন্টারেস্ট-ফ্রি ফাইন্যান্স কনসর্টিয়াম	১৯৮২
	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	১৯৮২
	আরব ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮২
	দাল্লাহ আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৩
	আল-বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৯৮৪
	তাকাফুল. ইউ.কে. লিমিটেড	১৯৯৫
	উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউস	-

Dhaka University Institutional Repository

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
১১. লিখেনস্টাইন	আরিনকো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী আই বি এস ফাইন্যান্স	
১২. লুক্সেমবার্গ	ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং	১৯৭৮
	ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৩
	ফয়সাল গোল্ডিং, লুক্সেমবার্গ	-
১৩. শ্রীলংকা	সেরেনদীপ ব্যাংক লিমিটেড	-
১৪. সাইপ্রাস	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস	১৯৮২
	কিবরিজ ইসলামী ব্যাংক, লেফকোসা, নিকোশিয়া	-
১৫. সুইজারল্যান্ড	শরীয়াহ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	দার আল-মাল আল-ইসলামী	১৯৮৪
	ফয়সাল ফাইন্যান্স সুইজারল্যান্ড	১৯৯০
	তাকওয়া ব্যাংক	-

'-' = প্রতিষ্ঠার বছর জানা যায়নি।

---

১. M. Fahim Khan (ed.) *Islamic Financial Institutions* (Jeddah: IRTI/IDB,1995 A.D) এবং Banker' Almanac Ausaf Ahmed, *Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques* (Jeddah: IRT/IDB 1993 A.D), pp.54-60
Saleh Kamel, *Develpment of Islamic Banking Activity : Problems and prospects* (Jeddah: IRTI/IDB,1998 A.D) pp.60-65
Monwar Iqbal, *Islamic Banking and Finance : Current Development in Theory and Practice* (Leicester : The Islamic Foundation 2001 A.D) pp. 20-40
শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮৯ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি'র চার্টারে স্বাক্ষর করে এবং নিজ দেশে ইসলামী শরীআহ্ ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে[১]। ১৯৭৬ সালে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ঢাকায় 'ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে[২]।

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ঢাকারে অনুষ্ঠিত OIC'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এ সুপারিশ অনুমোদন করে।[৩]

১৯৮০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন [৪]। ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়[৫]।

১৯৮১ সালের মার্চে ওআইসি দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের সম্মেলন সুদানের খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে [৬]।

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায়ও পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে এ জন্য পৃথক লেজার রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে 'মক্কা' এবং 'তায়েফে' অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয় যে, 'মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা।[৭] এ ঘোষণা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক ও সক্রিয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন [৮]। ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় [৯]।

---

১. M. Azizul Huq (Editor), *Readings in Islamic Banking, Banglades Islamic Bankers Association* (BIBA), (1983 & 1984,A.D) Vol-1,p.25-30
২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক পটভূমি*, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. M. Umer Chapra and Tariqullah, ibid, p.36
৮. M. Azizul Haq, ibid, p.43
৯. *Islami Bank : 18 years of Progress*, public Relations Deptt. Islami Bank Bangladesh Ltd. 2001, p.9-10

Dhaka University Institutional Repository
১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আইডিবি'র অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর প্রচুর কাজ হয়েছে এবং শীঘ্রই এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে[১]।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার ব্যাপারে 'ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' (আইইআরবি) এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন' (বিবা) অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য দক্ষ ব্যাংকারের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পক্ষে জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে [২]। এক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা এবং সৌদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয় [৩]।

৩০ মার্চ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত শুধু আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে টাকা জমা নেয়া হয় [৪]। এর পর ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের উদ্বোধন করা হয়। ১২ আগষ্ট থেকে চলতি হিসাব ছাড়াও মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রফিটলস শেয়ারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বা পিএলএস সঞ্চয়ী হিসাব খোলা শুরু হয় [৫]।

❒ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে এদেশে আরও যে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিম্নরূপ [৬]:

- ১৯৮৭ সালে 'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে 'ওরিয়েন্টাল ব্যাংক' এবং বর্তমানে 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড' নামে ব্যাংকটি পরিচালিত হচ্ছে।
- ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে 'আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এবং 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক'প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এর নাম হয় 'শামিল বাংক অব বাহরেইন' (ইসলামী ব্যাংকার্স)। বর্তমানে এদেশে এই ইসলামী ব্যাংকটির কার্যক্রম নেই।
- ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'
- ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে সুদভিত্তিক 'এক্সিম ব্যাংক' তার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।
- ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পরিহার করে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নাম ধারণ করে।
- উল্লিখিত ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও ৯টি সুদভিত্তিক ব্যাংকের মোট ২০টি পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বর্তমানে কাজ করছে।

---

১. মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অর্থনীতি গবেষণা পত্রিকা, সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮, নয়াটোলা, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত, পৃ. ৫৭-৫৮
২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের শাখা সংক্রান্ত তথ্য : [১]

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৮৪	০৫	১৯৯৫
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৫০	০২	২০০৩
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫৬	০৫	২০০৩
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	৩৮	০২	২০০৩
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	৫৪	০২	২০০৩
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৯৭	০১	২০০৩
এবি ব্যাংক লিমিটেড	৭৭	০১	২০০৪
এইচএসবিসি	১০	০১	২০০৪
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক	২৭	০১	২০০৪
মোট শাখার সংখ্যা ঃ	২৫০২	২০	

২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখার পরিবর্তে কনভেনশনাল শাখার মধ্যেই 'ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো' খোলার লাইসেন্স প্রদান শুরু করে।

❒ এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের তথ্য : [২]

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৪	০৫	২৯ জুন ২০১০
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৮৬৭	০৫	২৮ফেব্রুয়ারি ২০১০
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮৬	০২	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৪১	০২	১৫ ডিসেম্বর ২০০৯
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৪১	০৪	২৪ ডিসেম্বর ২০০৮
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৪২	০৫	০২ জুলাই ২০০৮
মোট শাখার সংখ্যা ঃ	২৫০২	২০	

সফলভাবে ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করে 'সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ।[৩]

---

১. Md. Abdul Awwal Sarker, Islamie Banking in Bangladesh : Performance problems & prospective (Dhaka: Publice Relations Deplt. IBBL, 2007), p. 27
২. ibid
৩. ibid

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ গত ০৯ নভেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে শরী'আহ্ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য 'গাইডলাইন্স ফর ইসলামিক ব্যাংকিং' শীর্ষক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫/২০০৯ জারি করে।[১]

বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ হতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য প্রদত্ত এটাই প্রথম গাইডলাইন।

❒ ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সুবিচার ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ইসলাম কতিপয় মূলনীতি ও সীমা-চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দিয়েছে। সম্পদের উৎপাদন ও বিপণনের পন্থা-পদ্ধতি কিরূপ হবে, সে ব্যাপারে কোন পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সংগত কারণেই ইসলামে নেই, কারণ সময় ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সাথে সাথে এসব পন্থা ও পদ্ধতি নির্ণীত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মুহাম্মদ বাকির আস সদর উল্লেখ করেন,

"The economic doctrine of Islami is distinguised from doctrines by its general religious framework. Because Islam is the framework which comprehends all aspects, ways of life in Islam, as while dealing with every walk of life, Islam links it with religious shaping it in the framework of man's religious relationship with his creator and the world to come"[২]

ইসলাম অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে একসূত্রে গেঁথে মৌলিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

"Islam does not provide us with a theoritical framework of Islamic iqtisad, but legislation in form of a collection of laws and decisions which organise the economic life of muslim society, within a framework of general concepts and values in which Islam believe." [৩]

আইএমএফ-এর পরিচালক ড. আব্বাস কিরখি ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতির উপর আলোকপাত করে বলেন,

"At the core of the Islamic economic system lies a collection of immutable rules and institutions which affect economic behaviour and outcomes and which are bothtime and place invariant. This immutable core is definde by the Shariah." [৪]

---

১. মোহাম্মদ আবদুর মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২. Muazzam Ali(ed.), Islamic Banks and Strategies of Economce co-operation (London: New Century Books, 1982), p. 51
৩. ibid
৪. IMF Working paper on Islamic financial Institutions and products in the Global Financial System: Key Issues and Risk Management and Challenges ahead. w.w.w.inf.org.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির বিনির্মাণের নির্ধারকসমূহ সম্পর্কে শরীআহ্ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ড. এম. ওমর চাপরা বলেন,

"Islamic economics is based on a paradigm which has socio-economic justics as its primary objective".[১]

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

"Human well being requires a balanced satisfaction of both the material and the spiritual needs of the human personality. The spiritual need is not satisfied merely by offering prayers; it also requires the moulding of individual and social behaviour in accordance with the Shariah (Islamic Teachings), which is designed to ensure the realisation of the Maqasid al Shariah (the goals of the Shariah), two of the most important of which are socio-economic justice and the well-being of all God's creatures."[২]

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ। আর মানুষের কল্যাণের জন্যই ইসলাম। সুবিচারের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে একে অন্যকে সম্মান করা। ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম যে Just Society-র ধারণা দেয় তার অর্থ হচ্ছে "The Society that secures and maintains respect for persons through various social arrangements that are in common interests of all members."[৩]

ইমাম গাজালীর মতে, ইসলামী শরীআহ্'র লক্ষ্য হচ্ছে :

"To promote the welfare of the people which lies in safe guarding their faith, their life, their intellect, their posterity and their property."[৪]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অতি স্বাভাবিকভাবেই শরীআহ্'র মূলনীতি আল-কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইসলামী শরআিহ্র লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশের আলোকে পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়স-এলাকা নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, আয় ও অর্জনই হচ্ছে ইসলামী শরীআহ্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং মানব কল্যাণ (ফালাহ্) অর্জনই এর মূল লক্ষ্য।

আধুনিক বিশ্বে অর্থব্যবস্থা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রাণসত্তা হল ব্যাংকব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুঁজি সঞ্চালিত হয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এগিয়ে যায়। অতএব, ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ ইসলামী ব্যাংকিং-এর

---

১. M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, Regulations and Supervision of Islamic Banks (Jeddah: IRTI/IDB, 2004 A.D), p.78
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid

Dhaka University Institutional Repository
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে শুধু সামঞ্জস্যশীলও সংগতিপূর্ণ-ই নয় এবং একই সূত্রে গাঁথা ও একই নিগড়ে গ্রোথিত। সুতরাং ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

❒ অর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সুবিচারপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। অর্থ-সম্পদ যাতে কোনো একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পুঞ্জীভূত না হয়, বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ব্যাংকের অর্থ দ্বারা উপকৃত হতে পারে, সে ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে। আল-কুরআনে এ ব্যাপারে যে মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তা হলো,

"জনপদবাসীদের কাছ থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতিমের, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের, যাতে করে ধন-সম্পদ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না থাকে। আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বিরত থাকতে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক, আর ভয় করো আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[১]

ইসলামী ব্যাংক সম্ভাব্য সমাজের সকল মানুষের মধ্যে তার বিনিয়োগ প্রসারিত করে আল-কুরআনের এ নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে যাতে ধনীদের পাশাপাশি সম্পদহীন লোকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তা ছাড়া যাকাত ব্যবস্থা, কারদ হাসান প্রভৃতি নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সেসব নির্দেশ পরিপালন করে, যেখানে বলা হয়েছে,

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং সালাতে অবনত হও তাদের সংগে যারা অবনত হয়।"[২]

"পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"[৩]

"আল্লাহ যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। এবং তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে যেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।"[৪]

❒ আয় ও সম্পদের সুষমবন্টন

সম্পদের সমান বন্টন নয়, বরং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। বৈষম্য দূরীকরণ এবং আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা, কর আরোপ, সম্পদ হস্তান্তর এবং আবর্তনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

---

১. আল-কুরআন, সুরাহাশর :৭
২. আল-কুরআন, ২:৪৩
৩. আল-কুরআন, নমল:২-৩
৪. আল-কুরআন, কাসাস : ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

❒ অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন

আল্লাহর দেয়া সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, অপচয়রোধ এবং মানব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানব জীবনকে অর্থবহ ও কল্যাণকর করে তোলা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। এই দুনিযার যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ্ এবং এ সম্পদ তাঁরই হুকুম মতো ব্যবহার করতে হবে। আর তা হলেই কেবল মানুষের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সম্পদের ব্যাপারে ইসলামে যে ধারণা রয়েছে, ইসলামী ব্যাংক একই ধারণার ভিত্তিতে তার সম্পদকে ব্যবহার করে। সম্পদের ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্বসিষয়ে সর্ব শক্তিমান।"[১]

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। নিশ্চই আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।"[২]

আবার সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারেও কালামেপাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে,

"তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"[৩]

"হে মু'মিনগণ, যারা ঈমান এনেছে, তোমরা ব্যয় কর তা থেকে আমি তোমাদের যা দিয়েছি সেদিন আসার পূর্বে যেদিন থাকবে না ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধত্ব আর না সুপারিশ। আর কাফিররাই প্রকৃত যালিম।"[৪]

"আর ব্যয় কর আল্লাহর রাস্তায় এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকাজ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"[৫]

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর দেয়া সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সমাজের মানুষের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও রয়েছে ইসলামে। যে কোনো উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা ইসলামে কাম্য নয়। অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা, এরূপ মাত্রাতিরিক্ত ও বলগাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং সমাজে অনৈতিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। তাই মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। আর এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা।

---

১. আল-কুরআন, ২:২৮৪
২. আল-কুরআন, আ-হাজ :৬৪
৩. আল-কুরআন,আল-হাদীদ :৭
৪. আল-কুরআন, ২:২৫৪
৫. আল-কুরআন, ২:১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

❒ পুঁজি সমাবেশকরণ ও বিনিয়োগ

ইসলাম অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে যেমন অপছন্দ করেছে, তেমনি অলস সঞ্চয় একত্রিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যথার্থ বিনিয়োগেও উৎসাহিত করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার অপরিহার্য। অনেকে অর্থ সঞ্চয় করে তা দিয়ে নিজ উদ্যোগে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর পক্ষেও উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ অসম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা সঞ্চয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।[১]

❒ মুদ্রামানের স্থিতি সংরক্ষণ

অর্থের মূল্যমান স্থিতিকরণ বা মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণের স্বার্থে একটি জরুরি বিষয়। 'মুদ্রাস্ফীতি' আধুনিক অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা। এটি অর্থনৈতিক সুবিচার ও জনকল্যাণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মুদ্রাস্ফীতি আর্থিক পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করে ও ঋণদাতার ক্ষতিসাধন করে। মুদ্রাস্ফীতি ফটকা কারবারকে উৎসাহিত করে। সর্বোপরি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে। মুদ্রাস্ফীতি ফটকা কারবারকে উৎসাহিত করে। সর্বোপরি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে। মুদ্রাস্ফীতি মানেই হচ্ছে অর্থ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মূল্যমান ধরে রাখায় মুদ্রার ব্যর্থতা। ইসলামী অর্থনীতি মুদ্রার এই স্থিতিহীনতা মেনে নেয় না। এ জন্য ইসলাম এমন একটি সমন্বিত নীতি প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়, যাতে বাস্তবসম্মত ও বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়। তিনটি প্রধান কারণে সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। যথা ঃ

১. অর্থের ক্রমবৃদ্ধির সাথে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির অসামঞ্জস্যতা,
২. অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং
৩. সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি।[২]

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর নীতিমালার কারণে মুদ্রাস্ফীতি দূরীভুত হয়। সুদনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থলগ্নির ফলে বাজারে মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায় এবং সেই অর্থ উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত না হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংক অর্থলগ্নি করে না। পণ্যের বেচাকেনা ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি হওয়ায় অর্থ সরাসরি গ্রাহকের কাছে যেতে পারে না। পণ্যভিত্তিক এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। ইসলামী ব্যাংক অনুৎপাদনশীল খাতে বা কোনো অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে না। ফলে এখানেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সুযোগ থাকে না। ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা যেহেতু অপচয়রোধ করে এবং সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনকে নিশ্চিত করে, তাই অযথা ঋণের প্রবণতা কমে আসে এবং এভাবেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়।[৩]

---

১. Ausaf Ahmed, Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by the central Banks (Jeddah: IRTI/IDB, 1993), p. 61
২. Mosad Zineldin, The Economics of Money and Banking : A Theoritied and Empirieal Study of Islamic Interest Free Banking (tockhom: Almqvist and Wicksell International, 1990), p. 83-84
৩. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❐ সুদের পূর্ণ বিলোপ সাধন

সুদ নির্মূল করাই ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুদের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করে মুনাফাভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যাংকের যাবতীয় কর্মনীতি ও কর্মকৌশলে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ সুদের অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত থাকার জন্য যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক এই সুদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেনের সকল কার্যক্রমে সুদকে পরিহার করে চলে।[১]

❐ বেকারত্ব দূরীকরণ এবং অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

ইসলামী ব্যাংকের গোটা বিনিয়োগ নীতি উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত। উৎপাদনের চাকাকে গতিশীল রাখতে ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি পরিকল্পিত। ফলে ব্যাংকের কার্যক্রমের কারণে স্বাভাবিকভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংক শুধু সম্পদশালী ও বিত্তবানদের বিনিয়োগ প্রদান করে না, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদেরও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এতে অধিক কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হয় এবং সমাজ থেকে বেকারত্ব দূরীভূত হয়। [২]

❐ শরী'আহ্র নীতি অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্র পূর্ণ পরিপালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ব্যাংকের যাবতীয় কর্ম পরিকল্পনা ও নীতি শরী'আহ্ লংঘিত হয় এমন কোনো লেনদেনও করে না। তাই ইসলামী ব্যাংক অধিক মুনাফার দৃষ্টিকেও সমর্থন করে না। যে সব খাতে শরী'আহ্ বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে, ইসলামী ব্যাংক কখনও তাতে বিনিয়োগ করে না, তা যতই লাভজনক হোক না কেন। ব্যাংক তার আমানত গ্রহণ নীতি থেকে বিনিয়োগ প্রদান নীতি পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতিকে মেনে চলে। [৩]

ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদিয়াহ ও মুদারাবা নীতিতে আমানত সমাবেশ করে এবং মুদারাবা, মুশারাকা, বাই'মুরাবাহা, বাই'মুয়াজ্জাল, বাই'সালাম, ইসতিসনা ইত্যাদি নীতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরী'আহ্' মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা দেখাশোনা করার জন্য রয়েছে শক্তিশালী শরীআহ্ কাউন্সিল। ব্যাংকের লেনদেনে সুদের আবির্ভাব ঘটে কিনা, বা কোনো লেনদেনে শরী'আহ্ নীতি লংঙ্ঘিত হয়েছে কিনা তা শরীআহ্ কাউন্সিল নির্ধারণ করে এবং যদি এমন ঘটে তা হলে সংশ্লিষ্ট আয় আলাদা করে ফেলা হয়। কোনক্রমেই তা ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।[৪]

---

১. M. Nejatullah siddiqui, Riba, bank Interest and the Rationale of its prohibition (Jeddah: IRTI/IDB,2003 A.D), p.16
২. ibid
৩. Alan E.Hammad, Islamic Banking : Theory and proctica (Ohio: Zakal and Research foundation, 1989 A.D), p.10
৪. শরীআহ্ পরিপালন, প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক, আব্দুর রকীব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত,পৃ.২০

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকিং ও ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং এর পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক মূলত, একটি নতুন ব্যাংকিং ধারনাকে বাস্তবে রূপ দেয় যাতে তা ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআহ্‌র বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংক-কে একটি সমাজ নির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করতে হয় এবং সে জন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা। ধর্মীয় আদর্শিক ভিত্তি বিনিয়োগাত্মক ভিত্তি ও উন্নয়নের চিন্তাদর্শনের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ট্রাডিশনাল বা প্রচলিত ব্যাংকিং এর সাথে ইসলামী ব্যাংকিং এর পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উভয় ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর হল :

ইসলামী ব্যাংকিং ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং এর পার্থক্য :[১]

	ইসলামী ব্যাংকিং		ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং
১	ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য উপাদান ইসলামী অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং।	২	ব্যাংক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সুদ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় একটি অংশ।
২	ইসলামী শরীআহ্‌'র লক্ষ্য যথা আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট থাকে।	২	নির্লিপ্ত।
৩	ফাইন্যান্সিয়াল সম্পদের প্রবাহ (Flow of the financial resources) গরীবদের দিকে ধাবিত করে।	৩	উদাসীন।
৪	সমাজের আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসকরণের নিমিত্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।	৪	আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।
৫	বিত্তহীন, গরীব অর্থাৎ শারীরিকভাবে সক্ষম ও দক্ষ লোকদের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে।	৫	বিত্তবানদের জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
৬	উৎপাদন ও বিনিয়োগে হালাল-হারামের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হয়।	৬	এ ধরনের কোন বিধি-বিধান নেই।
৭	যাকাত লাইনের নিচের লোকদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য মুদারাবা ও মুশারাকার মাধ্যমে বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।	৭	এ ধরনের কোন কর্মসূচী নেই।
৮	আর্থিক লেনদেনের সর্বপর্যায়ে সুদ ও অতিসুদ' পরিহার করা হয়।	৮	সমস্ত আর্থিক লেনদেনের ভিত্তি সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৯,
Yahia Abdul Rahman, ibid, p.

Dhaka University Institutional Repository

৯	আমানতকারী বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে, আমানত বীমার প্রয়োজন নেই।	৯	আমানিতকারী বিনিয়োগের কোন ঝুঁকি বহন করে না বরং মূল অর্থ পূর্ব নির্ধারিত সুদসহ ফেরৎ নেয়ার অঙ্গীকার নিয়ে থাকে।
১০	আমনতকারী ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার চেতানা ও সৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে।	১০	উভয়কেই অর্থলিপ্সু করে তোলে।
১১	কেবলমাত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পসমূহ বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করে।	১২	পুঁজির বিকাশে সার্বিক সহয়তা দান করে।
১৩	ঋণগ্রহীতাকে ঋণদান করে ইসলামী ব্যাংক তার কারবারে অংশীদার হয়।	১৩	কারবারে লোকসানের অংশ বহন করে না।
১৪	যে কোন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ Shock ইসলামী ব্যাংক সহজেই আয়ত্ত করে ফেলে।	১৪	ট্রাডিশনাল ব্যাংক Ex-ante Commitment -এর কারণে Shock absorb করতে পারে না।
১৫	ইসলামী ব্যাংকিং একটি জনকল্যাণমুখী আদর্শের মূলনীতি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর।	১৫	শোষণ ও জুলুমের সৃষ্টি হয়।
১৬	আন্তঃব্যাংক লেনদেন PLS ব্যবস্থাধীনে হয়।	১৬	আন্তঃব্যাংক লেনদেন সুদভিত্তিক হয় (Exorbitant increase in the Call Money Rate).
১৭	ইসলামী ব্যাংক শরীআহ্সম্মত পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য শরীআহ্ সুপারবাইজারী বোর্ড কর্তৃক Surveillance-এর ব্যবস্থা রয়েছে।	১৭	কোন ধরনের শরীআহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড নেই।
১৮	ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ায় Moral Hazard Problem-এর মাত্রা অনেক কম।	১৮	ব্যাংকার-কাস্টমার বা ক্রেডিটর-ডেপটর সম্পর্ক (Monetary relations) এবং বিশ্বাস-হীনতা। ফলে Moral Hazard সমস্যার সৃষ্টি হয়।
১৯	Speculation related আর্থিক কর্মকান্ডকে পরিহার করা হয়।	১৯	Speculation কর্মকান্ডই মূল ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

২০	রিজার্ভ ফান্ডের উপর ২.৫ হারে যাকাত প্রদান করে এবং Client দেরকে যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করে। (Redistribution of income)	২০	যাকাতের কোন ব্যবস্থা নেই।
২১	ব্যবসায়ের নীতির ভিত্তি হচ্ছে Socio-economic upliftment of the disadvantaged groups.	২১	ব্যবসায়ের মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে মুনাফা।
২২	শরীআহ্ লক্ষ্যসমূহ ও মুনাফা অর্জন পাশাপাশি চলে।	২২	শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনই মুখ্য।
২৩	ইসলামী ব্যাংক এককালীন কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।	২৩	কমিশন হারের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে।
২৪	ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার তাৎক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় (Spot sale and purchase) করে থাকে, কোন ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (Forward booking and future contracts) করে না।	২৪	সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় Spot and forward উভয় পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে।
২৫	সাধারণত অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন করা হয় না। ফলে বাজারের আন্তঃপ্রক্রিয়ায় লাভ-লোকসান নির্ণিত হয় এবং কাঠামোগত মূলধনের সঠিক ব্যবহার ও পুনঃউৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হয়।	২৫	সুদী ব্যাংক সুদের প্রাপ্তির উপর জোর দেয়, উৎপাদন সম্ভাব্যতা ও স্তরের দিকে সৃষ্টি রাখে না।

ইসলামী ব্যাংক এবং সুদভিত্তিক ট্রাডিশনাল ব্যাংকের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের কল্যাণ অর্জনের জন্য শরী'আহ্ যে সকল মৌলিক নীতির উল্লেখ করেছে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকান্ডে। দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের মূল কাজ হচ্ছে "to create right conditions by consistent planning and engineering" [১] । ইসলামী ব্যাংকিং-এর মহানায়ক আহমদ আল-নাগগার ও বলেছেন যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফলতার জন্য প্রয়োজন Socio*cultural changes such as attitudes, motivations and aspirations. [২]

ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে Development-oriented. পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা পালন করে তার চেয়ে অনেক বেশী ভূমিকা পালন করে ইসলামী ব্যাংক। আল নাগাগার মনে করেন যে, এটি একটি Mass movement rather than as financial institutions.

---

১. M. Nejalullah Siddiqui, Banking without interest (Leicester: The Islamic foundation, 1983 A.D) p. 33

২. ibid

৩. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং উভয়ই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য করে। তবে এক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয় যে, মুনাফা অর্জনই প্রচলিত ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যাংক ও গ্রাহকের সাথে এর সম্পর্ক ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা হিসেবে। প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক নিশ্চিত মুনাফা আদান প্রদান করে থাকে। যাকে পরিভাষায় সুদ (Interest) বলা হয়। পক্ষান্তরে মুনাফা অর্জনই ইসলামী ব্যাংক এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নয়। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন সম্পাদনের মাধ্যমে পুঁজি ব্যবহারকারীর ন্যায্য স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অর্জিত মুনাফা শরীআহ্‌সম্মত পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের মাঝে বন্টিত হয়। সুদ ইসলামে চুড়ান্তভাবে হারাম, অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফা হালাল। এ বিষয়ে আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও শুধু কোনটি সুদ আর কোনটি সুদ নয় তা চিহ্নিত করতে ভুল হবার কারণে প্রায়শ ঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষবাবে সুদ বিরোধী হয়েও সুদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এ পর্যায়ে সুদ ও মুনাফার পার্থক্যের ওপর সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হল :[১]

পার্থক্যের বিষয় বা ক্ষেত্রে	সুদ	মুনাফা
১. সংজ্ঞা	অর্থ বা দ্রব্য ঋণ দানের বিপরীতে সময়ের ভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত হারে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত মূল অর্থ বা দ্রব্যের অতিরিক্ত যে অর্থ বা দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলা হয়।	উৎপাদন কিংবা ক্রয় বিক্রয়ের ফলে অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে মূলধনের অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থ বা সম্পর্কে মুনাফা বলা হয়।
২. নির্ধারক উপাদান	সুদের নির্ধারক উপাদান হলো তিনটি ঃ সময়, সুদের হার ও মূলধনের পরিমাণ। নির্দিষ্ট সুদের হারে ধার দেয়া কোন মূলধনের সুদ ঋনের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।	অপরপক্ষে মুনাফা হওয়া না হওয়া কিংবা কম-বেশী হওয়া নির্ভর করে অনুকূল ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যয় সাশ্রয় ও অনুকূল বাজার চাহিদার উপর।
৩. ভিত্তি	সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি। অন্য কথায়, সুদমুক্ত ঋণ সম্ভব কিন্তু ঋণ ব্যতিরেকে সুদের উদ্ভব সম্ভব নয়।	মুনাফার ভিত্তি হলো হয় প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদান ও বিক্রয় কিংবা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা।
৪. ঝুঁকি (তহবিল মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে)	সুদের বেলায় ক্ষতি হবার ঝুঁকি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ মালিক পুঁজি খোয়াবার ঝুঁকি বহন করে না।	মুনাফার বেলায় ক্ষতি হবার ঝুঁকি প্রযোজ্য। অন্য কথায়, মালিক সম্পূর্ণ বা আংশিক পুঁজি খোয়াবার ঝুঁকি বহন করে।

১. M.Nejatullah Siddiqi, ibid, p.3033
Nabil A.Saleh, Unlawful Gain and Legitmate Profit in islamie
Law: Riba, Gharar and islamie Banking (Cambridge:Cambridge University Press, 1986 A.D), p. 80-83 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ঝুঁকি (তহবিল ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে)	একটি ফার্মের মূলধন কাঠামোতে সুদযুক্ত ঋণের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় ফার্মটি তত বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হয়। নতুন বিনিয়োগকারীগণ ঋণ ভারাক্রান্ত ফার্মে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হয়।	লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে কোন পরিমাণ বিনিয়োগ ফার্মের আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধি করে না। ঋণমুক্ত ফার্মে অর্থ বিনিয়োগে নতুন বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহ বোধ করে।
৬. সুবিধা প্রাপক	ঋণদাতা নিজেই কেবল সুদের সুবিধা লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ সুদের সব টাকাই চলে যায় ঋণদাতার পকেটে।	অন্যদিকে ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় মুনাফা বাবদ প্রাপ্য অর্থ পুঁজির যোগানদাতা ও পুঁজি ব্যবহারকারী উদ্যোক্তার মাঝে চুক্তি অনুপাত বন্টিত হয়।
৭. নিশ্চয়তা	সুদের হার ও সময় পূর্ব নির্ধারিত বিদায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কোন উপাদান নেই। নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কত সুদ পাবেন তা আগে থেকেই জানতে পারেন।	সময় যেহেতু মুনাফা নির্ধারণের কোন নিয়ামত উপাদান নয়, মুনাফা হার যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত হয় না সেহেতু একজন বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগে আদৌ মুনাফা পাবেন কি না অথবা কি হারে বা কি পরিমাণ পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব হয় না।
৮. ফলাফলের গণসংখ্যা	একটিমাত্র ঋণচুক্তির অধীনে ঋণদাতা দীর্ঘকালব্যাপী একই পরিমাণ সুদ বারবার পেতে থাকে।	পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে অর্জিত মুনাফা একবারই পাওয়া যায় এবং বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে মুনাফা অর্জন সাপেক্ষেই পাওয়া যায় বিধায় একই ফল বারবার পাওয়ার প্রশ্ন আসে না।
৯. নির্ণয়প্রনালী	সুদ নির্ণয়ের ফর্মূলা নিম্নরূপ ঃ সুদ $= p(1+r)^t$ যেখানে, $p =$ আসল $r =$ সুদের হার $t =$ সময়	মুনাফা নির্ণয়ের ফর্মূলা নিম্নরূপ : মুনাফা = বিক্রয় (পরিবর্তনশীল ব্যয় + স্থির ব্যয়)
১০. তাম স্তরের উপর প্রভাব	সুদ একটি স্থির ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয় বলে অনিবার্যবাবে দাম স্তরে বৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে মূল্যস্ফীতির প্রসার ঘটায়।	অপরপক্ষে মুনাফা ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয় না বলে অনিবার্যভাবে দাম স্তরে বৃদ্ধি ঘটায় না, ফলে মূল্যস্ফীতির প্রসারে সরাসরি কোন প্রভাব রাখে না।
১১. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	সুদ ইসলামে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কোনভাবেই সুদ বৈধ হবার কোন সুযোগ নেই।	অন্যদিকে মুনাফা ইসলামে অনুমোদিত। ইসলাম অবশ্যই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনে উৎসাহিত করে এবং মুনাফাখোরী নিষিদ্ধ করে।
১২. মূলধন সংরক্ষণ	সুদী ব্যবস্থায় সুরক্ষিত। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ঋণদাতার মূলধনের উপর তার বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে না।	ব্যবসায় কিংবা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগের বেলায় লোকসান হলে বিনিয়োজিত মূলধন আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী শরীআহ্‌র নীতিমালা

চুক্তির প্রচলন ছিল আদিকাল থেকেই, তবে বিধি-বদ্ধ আকারে ছিল না। আদিযুগে মানুষ ছিল সহজ সরল, বর্তমান সময়ের মানুষের মত তাদের এত জটিল জীবনব্যবস্থা ছিল না। তাই সে যুগে লেনদেনও ছিল সহজ সরল। বিধি-বদ্ধ লিখিত প্রয়োগ ছিল না বটে তবে তখন আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব দেয়া হত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সে যুগে চুক্তি মৌখিক ও লিখিত দু'ভাবেই হত। চুক্তির সময়, স্থান ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ থাকত। আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গভীর রাতে চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ ছিল। পঙ্গু, দন্ডিত ব্যক্তি, অসুস্থ মহিলা এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ চুক্তি করবার অযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য হত [১]। ফিকাহ্‌বিদদের মতে, ইসলামী শরীআহ্‌তে এমনকি প্রচলিত ব্যবহারিক আইনের মধ্যে চুক্তি একটি অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আইন। চুক্তি আইন বাণিজ্যিক আইনের একটি অপরিহার্য অংশ [২]। কারণ প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক লেনদেন দুই বা ততোধিক পক্ষের চুক্তির মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংকিং-এর গঠন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, অর্থায়ন, আমানত গ্রহণ, মূলধন সংগ্রহসহ সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংক গ্রাহক ও শেয়ার হোল্ডারদের নানা বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়[৩]।

সুতরাং ইসলামী শরীআহ্‌তে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি, চুক্তির শর্ত, কার্যকারিতা, নীতিমালাও শর্তের বৈধতা প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্যায়ে আলোকপাত করা হল :

❐ চুক্তির ধারণা

ইসলামী শরীআহ্‌তে যে কোন বৈধ চুক্তি 'আক্‌দ নামে পরিচিত। 'আক্‌দ এর আভিধানিক অর্থ মিলন বা বন্ধন। এর ইংরেজী শব্দ হল Contract । এটি ল্যাটিন শব্দ Contructum শব্দ হতে এসেছে। যার অর্থ একত্রীকরণ[৪]। চুক্তির জন্য মূলত, যে বিষয়ের প্রয়োজন তা হলো দু'বা ততোধিক ব্যক্তির সম্মতির ভিত্তিতে মিলন বা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হওয়া বা মিল হওয়া। তবে সম্মতি বা মতের মিল হওয়া শরীআহ্‌সম্মত পদ্ধতি ও পন্থায় হতে হবে।[৫]

স্যামন্ড-এর মতে, "চুক্তি দ্বারা দায় অথবা দায়িত্ব সৃষ্টি এবং চিহ্নিত হয়।"[৬]

স্যার উইলিয়াম অ্যানসন-এর মতে,

"A contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons by which ritghts are acquired by one or more to acts or forbearances on the part of the other or others."

ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মতে,

"চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি করাই চুক্তি আইনের মূল উদ্দেশ্য। অঙ্গীকার পালনের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই চুক্তির সূচনা হয়। চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের অধিকার বা আচরণের ক্ষেত্রে যদি কোন নিয়ন্ত্রণ নথাকতো তাহলে সমাজে লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কাজেই চুক্তির পক্ষসমূহের অধিকার বা আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পক্ষসমূহকে তাদের পারস্পরিক অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই চুক্তি আইন মূলত প্রণীত হয়েছে।"[৮]

---

১. Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Meezan's Guid to Islamic Banking* (Karachi: Darul ishaat. 2003 A.D), p.17
২. ibid
৩. সৈয়দ হাসান জামিল, *চুক্তি আইন* (ঢাকা: সামছ পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্যার ফ্রেডরিক পোলক-এর মতে,

"Every agreement and promise enforceable at law is a contract."[১]

❐ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান

চুক্তির ক্ষেত্রে সম্মতি এবং উক্ত সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে আইনের দ্বারা কোন সম্মতি বলবৎযোগ্য তখনই হবে যখন আইনে নির্দিষ্ট চুক্তির বিভিন্ন উপাদানসমূহ কোন সম্মতিতে স্থান পাবে। যে কোন চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ নিম্নরূপ : [২]

১. দুই বা ততোধিক পক্ষ (Two or more parties);

২. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer and acceptance);

৩. বৈধ প্রতিদান (Lawful considerations);

৪. স্বাধীন সম্মতি (Free conscent);

৫. পক্ষগণের যোগ্যতা (Capacity of the parties);

৬. আইনসঙ্গত সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় (Conscent to creat lawful relations);

৭. উদ্দেশ্যের বৈধতা (Legale object);

৮. আইনের প্রক্রিয়াকে ব্যহত করা চলবে না (Uninterruptable legale process);

৯. লিখিত এবং নিবন্ধিত হওয়া (Written and Registration) ;

১০. নিশ্চয়তা (Confirmation) এবং

১১. চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা (Possibility of performance)।

সুতরাং কেবলমাত্র সম্মতিই চুক্তি সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। যে সম্মতিতে বর্ণিত আবশ্যকীয় উপাদান নেই, তা আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না এবং তা ইসলামের নীতিমালারও পরিপন্থী। তাই সম্মতির মধ্যে উপরোক্ত প্রত্যেকটি উপাদান বর্তমান থাকা চুক্তি সম্পাদনের জন্যে অপরিহার্য।[৩]

❐ চুক্তির শর্তাবলি ঃ ইসলামের নীতিমালা

কোন একটি চুক্তির শর্তাবলি বৈধ (হালাল) বা শরীআহ্‌তে অনুমোদিত কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ফকীহ্‌গণ কয়েকটি মৌলিক মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ : [৪]

১. ইসলামে নিষিদ্ধ এমন কোন শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
২. চুক্তিপত্রের উদ্দেশ্য বিরোধী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন শর্ত থাকতে পারবে না।
৩. প্রচলিত আইন বিরোধী কোন কাজের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে তা যদি শরীআহ্‌সম্মত হয়, তাহলে উভয়ের সম্মতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
৪. প্রচলিত আইনবিরোধী না হয় কিন্তু তা ইসলামী নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, এ ধরনের কোন শর্তের অন্তর্ভুক্ত বৈধ নয়।

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৬
৩. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. যার মধ্যে প্রতারণা, ধোঁকা অকল্যাণ নিহিত রয়েছে কিংবা আশংকা রয়েছে এমন কোন কাজের শর্ত চুক্তিপত্রের অন্তর্ভূক্ত বৈধ হবে না।

৬. নৈতিকতা, সমাজ বিধ্বংসী ও জনস্বার্থবিরোধী কোন কাজের শর্তারোপ করা যাবে না।

এছাড়াও বিবাহে বাধাদানমূলক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন নিরোধমূলক, আইনের স্বাভাবিক গতি ব্যহত করে এবং প্রতারণামূলক বা বানোয়াট, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চুক্তি শরীআহ্সম্মত নয়।

❒ চুক্তিতে অধিকার, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য : ইসলামী শরীআহ্র নির্দেশনা

চুক্তির জন্য অবশ্যই একাধিক পক্ষের প্রয়োজন হয়। প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রস্তাব প্রদান করার পর প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথেই পক্ষসমূহের মধ্যে একটি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গীকারই হলো চুক্তির ভিত্তি। সাধারণত, চুক্তি করা হয় কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা হতে বিরত থাকার জন্যে। ফলে এ ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষসমূহের মধ্যে কিছু অধিকার দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়।[১]

ফিকাহ্বিদ্দের মতে, এমন কিছু চুক্তি আছে যেখানে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর অনুকূলে যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কাজ করে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তানো থাকে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, ইস্তিস্না এবং বাই'সালাম প্রভৃতি চুক্তিপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে।[২]

❒ ক্রয়-বিক্রয় ঃ ইসলামী শরীআহ্র নীতিমালা

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প কলকারখানায়, বিনিয়োগ ও অর্থায়নের বহুবিধ নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের এসব নিয়মনীতির ঢালাওভাবে রহিত করেননি বা বহালও রাখেননি। বরং এসব নিয়মনীতি, পন্থা-পদ্ধতি বা কৌশল যা নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের মানদন্ডে হীন, কুৎসিত, প্রতারণাপূর্ব, মানব-প্রকৃতি বিরোধী, ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী, ইসলামী শরীআহ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, এবং ন্যায় ও সুবিচারের আদর্শ থেকে বিচ্যুত বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন, এগুলোর সংস্কার ও পূণর্বিন্যাস করেছেন। সুদ ও জুয়ার নিষেধাজ্ঞা, জোর-যুলম, ছিনতাই, প্রতারণা, চুক্তিপত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া, স্পষ্ট হওয়া, অযৌক্তিক শর্ত আরোপ না করা, মালিক নয় এমন বস্তু বিক্রি করা, ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন কোন কিছু না করা, এসবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে গোটা অর্থব্যবস্থাকে কল্যাণমুখী ও জনস্বার্থমুখী করে তোলেন।[৩]

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে। এ পর্যায়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ধারণা, রুকন, শর্তাবলি, প্রকারভেদসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪০৩
২. প্রাগুক্ত
৩. সাইয়েদ কুতুব,

Dhaka University Institutional Repository

❒ ক্রয়-বিক্রয় (বাই')

আরবী ভাষায় বাই' শব্দটি বিক্রয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে ক্রয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফিকাহ্-এর গ্রন্থাবলীতে কিতাবুল বুয়ূ' বলতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প, উৎপাদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য এসব কিছুকে বুঝানো হয়েছে।[১]

ইসলামী শরীআহ্র পরিভাষায় একজনের মাল অপরজনের মালের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করাকে ক্রয়-বিক্রয় (বাই') বলা হয়। ফকিহ্গণ এ বিষয়ে একমত যে, বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করা শরীআহ্ দ্বারা সমর্থিত। আল-কুরআন, সুন্নাহ্ ও উম্মাতের ইজমা '(ঐকমত্য) দ্বারা তা বৈধ প্রমাণিত হয়েছে এবং মানবীয় বৃদ্ধিবৃত্তি তাকে বৈধ প্রমাণ করে।[২] তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদের বিনিময় পক্ষদ্বয়ের স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে। অন্যথায় উক্ত বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে না।

❒ ক্রয়-বিক্রয়ের উপাদান

ক্রয়-বিক্রয়ের উপাদান (রুকন) নিম্নোক্ত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত[৩]

ক. ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে একজনের প্রস্তাব (ইজাব) ও অপরজনের সম্মতি (কবুল) এবং

খ. মালিকানা হস্তান্তর।

কোন ব্যক্তির কোন বস্তু ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ এবং অপর ব্যক্তির সেই বস্তু বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অতএব ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য যে কোন একপক্ষের প্রস্তাব প্রদান এবং অপর পক্ষের সম্মতি প্রদান অপরিহার্য। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজাব কবুলের পর্ব শেষ হলে ক্রেতা বিক্রেতার মালিকানায় ক্রয়মূল্য এবং বিক্রেতা ক্রেতার মালিকানায় বিক্রিত মাল সোপর্দ বা হস্তান্তর করলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে। মূলত, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় মালিকানা হস্তান্তর করা।

❒ ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলি

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর্ত রয়েছে। ফকীহদের মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলি নিম্নরূপ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত :[৪]

ক. ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত বা সংঘঠিত হওয়ার শর্তাবলী (শারতুল-ইন'ঈক্বাদ)

খ. ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার শর্তাবলী (শারতুন্-নিফায)

গ. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী (শারতুস্-সিহাহ) এবং

ঘ. ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলী (শারতুল-লুযূম)

ক. ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার শর্তাবলি

আল্লামা শামী-এর মতে, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তগুলো নিম্নরূপ :[৫]

১. ক্রেতা-বিক্রেতাকে বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে;

২. ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি পক্ষ থাকতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, পিতা, পিতার নিয়োগকৃত ওসী এবং আদালত একই সময়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে;

৩. প্রস্তাবের সাথে সম্মতির সামঞ্জস্য থাকতে হবে;

---

১. বুরহান উদ্দীন আলী-ইবন আবূ বকর আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৮৭
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪. বিনিময়যোগ্য বস্তুর মধ্যে মাল-এর বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে;

৫. মাল বিদ্যমান থাকতে হবে;

৬. বিক্রিত মালের উপর বিক্রেতার মালিকানা থাকতে হবে;

৭. বিক্রিত মালের মধ্যে মাল-এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে;

৮. প্রস্তাব ও সম্মতি প্রদানকারীদ্বয়কে পরস্পরের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে হবে এবং

৯. প্রস্তাব ও সম্মতি একই মজলিসে প্রদান করতে হবে।

খ. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কার্যকর হওয়ার জন্যও কিছু শর্তাবলি রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ : [১]

১. বিক্রেতাকে মালের মালিক অথবা ওয়ালী হতে হবে এবং

২. মালের উপর কারো অধিকার থাকবে না।

গ. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : এক্ষেত্রে দু'ধরনের শর্তাবলি রয়েছে, তা হল : [২]

▫ সাধারণ শর্তাবলি, যা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার শর্তাবলীর অনুরূপ।

▫ বিশেষ শর্তাবলি, এর মধ্যে রয়েছে :

১. ক্রয়-বিক্রয় নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য হবে না;

২. মাল ও এর মূল্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে ;

৩. ক্রয়-বিক্রয়ে অতিরিক্ত কোন শর্ত যুক্ত থাকবে না;

৪. বিক্রীতব্য মাল ও এর মূল্য নির্ধারিত হতে হবে;

৫. বিক্রীতব্য মাল ও এর মূল্য হস্তান্তরের সময় নির্ধারিত হতে হবে;

৬. স্থানান্তরযোগ্য মাল ক্রয় করলে তা ক্রেতার হস্তগত হতে হবে;

৭. যেসব মালের পারস্পরিক বিনিময়ে কম-বেশি হলে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে সে সব ক্ষেত্রে বিনিময়কৃত মালের পরিমাণ সমান সমান হতে হবে;

৮. ক্রয়-বিক্রয় সুদমুক্ত হতে হবে;

৯. বাই'সারফ-স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময় হলে পক্ষদ্বয়ের পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে বিনিময়কৃত মাল হস্তান্তরিত হতে হবে;

১০. ক. বাই'মুবারাহা বা লাভযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় (Sale at a profit);

খ. বাই'তাওলিয়া বা লাভহীন ক্রয়-বিক্রয় (Release at cost price);

গ. বাই'ইশতিরাক বা অংশ ক্রয়-বিক্রয় (Sale of a portion) এবং

ঘ. বাই'ওয়াদিয়া বা লোকসানে বিক্রয় (Sale at a loss)

উপরোক্ত সকলক্ষেত্রে সকল অবস্থায় সে সময়ের বাজার দরে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হতে হবে।[৩]

---

১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খ.১, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলি :

ফকীহ্গণের মতে, ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলি এই যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখানের কোন শর্ত না থাকা এবং ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ার চতুষ্টয় ও অন্যান্য বিষয়াদি থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং ঐ ক্রয়-বিক্রয় কোন পক্ষই প্রত্যাখান করতে পারবে না। ইসলামী শরীআহ্তে ক্রয়-বিক্রয়ের রায় বা হুকুম হল এ অবস্থায় ক্রীত মালের উপর ক্রেতার এবং উহার মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা-স্বত্ত্বাধিকার বর্তাবে।[১]

❐ ক্রয়- বিক্রয়ের প্রকারভেদ

বিশ্বনবী (সা:) এর আবির্ভাবের সময় আরব সমাজে বহুবিধ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির প্রচলন ছিল যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে পরবর্তীকালে শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন নামে এসব ক্রয়-বিক্রয়কে নামকরণ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয়েকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। তাদের মতে, সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় নিম্নরূপ চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত :[২]

১. বাই'নাফিয় (কার্যকর ক্রয়-বিক্রয়) যা তৎক্ষণাৎ বহাল-ক্রয়-বিক্রয়ের পরই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিজ নিজ বস্তুর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
২. বাই'মাওকুফ (স্থগিত ক্রয়-বিক্রয়) যা কোন এক পক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে কার্যকর হয়।
৩. বাই'ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়) যেখানে ক্রীতমাল হস্তগত করার পর ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
৪. বাই'বাতিল (অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়) যা আদৌ ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে গণ্য হয় না।

আবার বিক্রিতব্য বা বিক্রিত বস্তুর ধরন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার :[৩]

১. বাই'মুকায়াদা ঃ বস্তুর বিনিময়ে বস্তবিক্রি করাকে বাই'মুকায়াদা বলা হয়।
২. বাই'সারফ ঃ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করাকে বাই'সারফ বলা হয়।
৩. বাই'সালাম ঃ বস্তুর বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা। একে বাই' সিলআও বলা হয়।

❐ অনুরূপভাবে মূল্য নির্ধারণ ও সাব্যস্ত করার দিক থেকেও ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার :[৪]

১. বাই'মুসাওয়ামা ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর মিলে যে মূল্য নির্ধারণ করবে সে মূল্যের উপর কোন বস্তু বিক্রয় করাকে বাই'মুসাওয়ামা বলা হয়।
২. বাই'মুবারাহা ঃ পূর্ব মূল্য থেকে অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে লাভের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বাই'মুবারাহা বলা হয়।
৩. বাই'তাওলিয়া ঃ পূর্বমূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বাই'তাওলিয়া বলা হয়।
৪. বাই'ওয়াদীআঃ লোকসানে বিক্রয় করাকে বাই'ওয়াদিআ বলা হয়।

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫০
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে আবার ক্রয়-বিক্রয় সাধারণত দু'ধরনের হয় : [১]

ক. বাই বিন্ নাক্‌দ এবং খ. বাই বিল আজল

ক. বাই বিন নাকদ ঃ এই পদ্ধতিতে মালের মূল্য নগদে অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হয়।

খ. বাই বিল আজল ঃ এই পদ্ধতিতে মালের মূল্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। মূল্য বিলম্বিত হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো তারিখে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধিত হয়ে থাকে।

▫ সহীহ বাই বা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় এর উপাদান

কোনো ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে, যদি তাতে নিম্নোক্ত চারটি উপাদান বর্তমান থাকে এবং প্রযোজ্য শর্তগুলো অনুসরণ করা হয়। উপাদান চারটি নিম্নরূপ : [২]

১. চুক্তি বা আক্‌দ (Contract)
২. বিক্রিত জিনিস বা মাবি' (Sold goods);
৩. মূল্য বা ছামান (Price) এবং
৪. দখল বা সরবরাহ কবজা (Possession or Delivery)।

❒ ক্রয়-বিক্রয়ের খিয়ার বা অধিকার ঃ ইসলামী শরীআহ্‌র নীতিমালা

খিয়ার শব্দটি আরবী। এর অর্থ ইখতিয়ার বা অধিকার। ক্রয়-বিক্রয় একটি চুক্তি। এ চুক্তির কার্যকারিতার প্রশ্নে, বৈধতা, দায়-দায়িত্ব, প্রতিকার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কিংবা চুক্তিটি বহাল রাখা বা বতিল করার বিষয়ে ইসলামী শরীআহ্ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ইখতিয়ারকে শর্ত হিসেবে রাখার বৈধতা দিয়েছে। অনুমোদন দিয়েছে। এই ইখতিয়ার বা অধিকারকে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় খিয়ার বা অধিকার বলা হয়। খিয়ারের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ অধিকার বা খিয়ারকে ফকীহ্‌গণ সর্বমোট আঠারোটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ : [৩]

১. খিয়ারুশ-শর্ত : ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি তিন দিন কিংবা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকার শর্ত করাকে খিয়ারুশ মর্ত বলা হয়।

২. খিয়ারুর-রূইয়াত : ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন কালে ক্রেতা মাল দেখেনি, এ অবস্থায় মাল দেখার পর সে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহালও রাখতে পারে আবার বাতিলও করতে পারে। ক্রেতার এ ইখতিয়ারকে খিয়ারুর রূয়াত বলা হয়। এটি কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৩. খিয়ারুল-আয়েব : ক্রেতা যদি মালের মধ্যে এমন ত্রুটি দেখতে পায় যার কারণে এর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখতে পারে আবার বাতিলও করতে পারে। একে খিয়ারুল আয়েব বলা হয়। এ অবস্থায় খরিদকৃত মাল রাখতে হলে পূর্ণ মূল্য দিয়েই রাখতে হবে।

৪. খিয়ারুল-ইসতিহকাক : যদি ক্রয়কৃত বস্তুর অন্য কোন মালিক বের হয়ে আসে এবং তা মালামাল হস্তগত করার আগে হয় তবে এই সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

---

১. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.২
২. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৮৯-৪৯৫ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত
৩. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৯৬-৫২৬ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি মালামাল হস্তগত করার পর এমনটি ঘটে তবে যাওয়াতুল কিয়াম যথা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বস্তুর ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে, কিন্তু যাওয়াতুল আমসাল যথা দান, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি বস্তুর ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে না। এ ইখতিয়ারকে খিয়ারুল ইসতিহকাক বলে।

৫. খিয়ারুত-তাগরীর আল ফি'লী : যেমন গাভীর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে পরে তা বিক্রি করা। এরূপ করার পেছনে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতাকে এ কথা বুঝানো যে, এটি অনেক দুধের গাভী এবং এভাবে তার থেকে অধিক মূল্য লাভ করা। এরূপ ধোঁকা খেয়ে কেউ যদি কোন গাভী খরিদ করে তবে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে এটি রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে। একেই খিয়ারুত তাগরীর আল ফি'লী বলা হয়। অবশ্য এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, এ জাতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না তবে সে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে।

৬. খিয়ারুত-তা'য়ীন : দুই বা ততোধিক জিনিসের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে এর মধ্য হতে তার পছন্দমত কোন এক বা একাধিক জিনিস বাছাই করে নেওয়ার ইচ্ছা প্রদান করাকে খিয়ারুত-তা'য়ীন বলা হয়।

৭. খিয়ারুল-গাবান : ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে চরম ঠকবাজি করে বা বিক্রেতা ক্রেতার সাথে ঠকবাজি করে অথবা দালাল তাদের কোন একজনের সাথে চরম ঠকবাজি করে তবে যার সাথে ঠকবাজি করা হয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। ইখতিয়ারকে খিয়ারুল গাবান বলা হয়।

৮. আল-খিয়ার ফী তাফরীকিস্-সাফাকা : মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি এর কিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন যে ইখতিয়ার হাসিল হয় তাকে খিয়ার ফী তাফরীকিস-সাফাকা বলা হয়।

৯. আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিত-তাওলিয়া : অর্থাৎ বিনা লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতার পক্ষ হতে খিয়ানত প্রকাশ পায়-চাই তা তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক বা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হোক। এ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে এই মাল ফেরত দিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে খিয়ানত পরিমাণ মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা রেখে দিবে। যদি বিক্রেতা এ ব্যাপারে রাজি থাকে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে আল খিয়ার ফী খিয়ানাতিত তাওলিয়া বলা হয়।

১০. আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিল মুরাবাহা : মুরাবাহা অর্থাৎ লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার খিয়ানত প্রকাশ পাওয়া। চাই তা তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক বা দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হোক। এরূপ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ মালামাল পূর্ণমূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। অথবা তাতে ফেরত দিয়ে দিবে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিল মুরাবাহা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১. আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবী' মারহুনান : কোন বাড়ি বা ঘর ক্রয় করার পর এ কথা প্রকাশ হলো যে, এটি বন্ধকের বাড়ি বা ঘর। তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে আক্দকে বহাল কিংবা বাতিল করার ব্যাপারে। এই ইখতিয়ারকে আল খিয়ার ফী যুহুরিল মাবী' মারহুনান বলা হয়।

১২. আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মুসতাজীরান : কেউ কোন বাড়ি খরিদ করার পর যদি একথা প্রকাশ পায় যে, বাড়িটি ভাড়া দেওয়া আছে, তবে এ ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এ আক্দ বহাল রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বাতিলও করে দিতে পারবে। একে পরিভাষায় আল খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মুসতাজীরান বলা হয়।

১৩. আল-খিয়ার ফী আকদিল ফুযূলী : মালিক বা মূল ক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে তৃতীয় কোন অতিরিক্ত ব্যক্তি যদি কোন আক্দ সম্পাদন করে তবে মালিক বা মূল ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে অনুমতি দিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারবে। একে আল খিয়ার ফী আকদিল ফুযূলী বলা হয়।

১৪. আল-খিয়ার ফী ফাওয়াতি ওয়াসফিন মারগূবিন ফীহ্ : বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা মালের যে গুণ ও মানের বর্ণনা দিয়েছে, হস্তান্তরের সময় মাল সেই গুণ ও মান অনুযায়ী না হলে ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার বা বাতিল করে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। বহাল রাখতে হলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে হবে এই ইখতিয়ারকে আল খিয়ার ফী ফাওয়াতি ওয়াসফিন মারগূবিন ফীহ্ বলা হয়।

১৫. খিয়ারুল-কবুল : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কোন এক জনের পক্ষ হতে ঈজাব করার পর অপর জনের ইখতিয়ার থাকে। ইচ্ছা করলে সে ঐ মজলিসে তা কবুল করবে আবার ইচ্ছা করলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে। এই ইখতিয়ারকে খিয়ারুল কবুল বলা হয়।

১৬. খিয়ারু-কাশফিল হাল : যেমন কেউ এমন পাত্র বা এমন বাটখারা দিয়ে কোন কিছু খরিদ করল যার পরিমাণ তার জানা নেই তবে পাত্র বা বাটখারার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার ইখতিয়ার থাকবে। এই ইখতিয়ারকে খিয়ারু কাশফিল হাল বলে।

১৭. খিয়ারুন-নক্দ : ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে মালের মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত থাকা অবস্থায় ঐ সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার অথবা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে এই ইখতিয়ারকে খিয়ারুন নকদ বলা হয়।

১৮. খিয়ারুল-কাম্মিয়্যা : যেমন কেউ বলল, এই মটকিতে যা কিছু আছে আমি তা খরিদ করলাম। তারপর সে দেখল যে এতে তেল বা অন্য কিছু আছে। এ অবস্থায় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বাতিলও করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

❐ ইকালা বা চুক্তি বাতিলের অধিকার

'ইকালা' আরবি শব্দ। এর অর্থ দূর করা, উঠিয়ে নেয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ বা বাতিল করতে পারবেন এবং তারা তাদের প্রাপ্য ফেরত নিতে পারবেন। চুক্তি সম্পাদনের পর বিক্রেতা ও ক্রেতা কেউ এককভাবে চুক্তি লংঘন করতে পারেন না। সাধারণত, ক্রেতা মাল ক্রয়ের পর চুক্তি ভঙ্গ করতে আগ্রহী হন। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতি জরুরি। কোনো চুক্তি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক এই সম্মতিকে 'ইকালা' বলা হয়।[১]

অতএব, শরীআহ্‌র পরিভাষায়, ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং বিক্রীত মাল অর্পণের পর ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়াকে 'ইকালা' বলা হয়। একটি হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের সাথে ইকালা সম্পন্ন করবে এবং সে তার এই লেনদেনকে পছন্দ করবে না, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।[২]

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ইকালার অধীনে পণ্য বা দ্রব্যের যে দাম ফেরত দেয়া হবে তা অপরিবর্তিত থাকবে। তৃতীয় পক্ষের ওপর প্রভাব : ইকালাকে নতুন বিক্রয় চুক্তি বলে বিবেচনা করা হয়, যেন পক্ষগুলো আসল চুক্তি বাতিল করে নতুন এক চুক্তি সম্পন্ন করল।[৩]

---

১. বুরহান উদ্দীন আলী-ইবন আবূ বকর আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৮৮

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের তহবিল
(Bank's Fund)

অন্যান্য ব্যবসার মতো ব্যাংক ব্যবসারও মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা, বিভিন্ন খাতে ব্যাংক তার তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। তবে এই বিনিয়োগের জন্য আগে চাই তহবিলের নিশ্চয়তা। তহবিল ছাড়া বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোও আমানত সংগ্রহ করার মাধ্যমে তাদের তহবিল গঠন করে এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকও বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার তহবিল গঠন করে থাকে্ সংগৃহীত তহবিল ব্যাংক যতটা সুপরিকল্পনা ও দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে পারে ব্যাংকের মুনাফাও ততটা বেশি হয়।

অতএব, ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তার সমষ্টিকে ব্যাংকের তহবিল বলে। অভ্যন্তরীণ উৎস বলতে শেয়ার মূলধন ও সঞ্চিতি তহবিল এবং বাহ্যিক উৎস বলতে সরাসরি আমানত ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সংগহীত অর্থের সমষ্টিকে বুঝায়। A.D Clark-এর মতে, ব্যাংক তহবিলের সংজ্ঞা হলো, "Banker's fund means the fund created by the bank from its interanal sources and external sources with a view to profitable investment."[১]

M.C. Vaish-এর মতে ব্যাংক তহবিল হলো,
"Like any other commercial dealer, the stock in trade of a bank consists of its paid-up capital and reserves, deposits received from the public and sister banks borrowings made from the central bank."[২]

❐ ব্যাংক তহবিলের উৎস

ব্যাংক ইচ্ছা করলে যেনতেনভাবে তহবিল গঠন করতে পারে না। ব্যাংক কতগুলো নির্দিষ্ট উৎস থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে তার তহবিল গঠন করে। ব্যাংকের তহবিলের উৎস প্রধানত দু'টি : [৩]

১. ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল (Owner's Equity) এবং
২. কর্জকৃত তহবিল (Borrowed Fund)

❐ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল : যে তহবিল ব্যাংকের ভেতরে ব্যাংকের মালিক, ব্যাংকের লাভ বা ব্যাংকের অন্যান্য নিজস্ব খাত থেকে গঠিত হয়, তাকে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল বলে। ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল নিম্নরূপ তিনভাগে বিভক্ত : [৪]

ক. পরিশোধিত মূলধন (Paid up Capital);
খ. সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) এবং
গ. অবন্টিত মূনাফা (Undistributed Profit)

ক. পরিশোধিত মূলধন (Paid up Capital) : প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানির উদ্যোক্তা বা মালিকগণ তাদের শেয়ারের বিপরীতে যে অর্থ পরিশোধ করেন, তাকে পরিশোধিত মূলধন বলে। অর্থাৎ পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে ব্যাংকের মূলধনের সেই অংশ যা ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার বা মালিকগণ কোম্পানিকে পরিশোধ করে দেন। এটা ব্যাংক মূলধনের অন্যতম উৎস।

---

১. Professor A.D Clark (সূত্র: প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
২. M.C. Vaish, ibid, p. 257-258
৩. ibid
৪. ibid

Dhaka University Institutional Repository

খ. সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) : ব্যাংক তহবিলের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সঞ্চিতি তহবিলসমূহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মানুসারে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ১৪ ধারা মতে প্রতিটি ব্যাংককে তার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্যাংকের আয় থেকে একটি অংশ দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন সঞ্চিতি তহবিল করে। এ অর্থকে সংরক্ষিত তহবিল বলে। যেমন মূলধন সঞ্চিতি তহবিল, বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল, সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল, লভ্যাংশ সমতাকরণ সঞ্চিতি তহবিল, অবচয় তহবিল, বিনিয়োগ সমতাকরণ তহবিল ইত্যাদি এ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত। এটি করপূর্ব নিট আয়ের ২০%। এ তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যাংকের ভিত্তিকে মজবুত করা। এটা ব্যাংকের তহবিলের একটা স্থায়ী উৎস এ তহবিলকে মূলধনেও রূপান্তর করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ সঞ্চয় বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইচ্ছা করলে সংরক্ষিত তহবিলের হার কমাতে বা বাড়াতে পারে। সংরক্ষিত তহবিলের উৎস প্রধানত তিনটি [১]। তা হল :

১. সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve)
২. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি (Statutory Reserve)
৩. বিবিধ সঞ্চিতি (Other Reserve)

১. সাধারণ সঞ্চিতি : বংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মুনাফার একটি অংশ স্বেচ্ছায় জমা রাখতে পারে। এ ধরনের সঞ্চয়কে সাধারণ সঞ্চিতি বলে। ব্যাংকের আপদ-বিপদ মোকাবেলা করার জন্য এ সঞ্চয় কাজে লাগে।
ব্যাংকের ঋণদান ও বিনিয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের সঞ্চিতির প্রয়োজন হয়। এ সঞ্চিতির কোনো নির্দিষ্ট হার নেই। ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ মুনাফার ওপর ভিত্তি করে এরূপ তহবিল গঠন করে।[২]

২. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি : বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত হারে যে সঞ্চিতি সংরক্ষণ করে, তাকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী আদায়কৃত মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ২০ শতকরা হারে মুনাফা দিয়ে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল গঠন করতে হয়। এ সঞ্চিতি ব্যাংকের অন্যতম রক্ষাকবচ। এ জন্য বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিলকে মূলধন সঞ্চিতি তহবিলও বলা হয়। [৩]

৩. বিবিধ সঞ্চিতি : সাধারণ ও বিধিবদ্ধ সঞ্চিতির বাইরে ব্যাংক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সঞ্চিতি তহবিল গঠন করে থাকে। অবচয় সঞ্চিতি, লভ্যাংশ সমতাকরণ সঞ্চিতি, নিমজ্জিত সঞ্চিতি, অদাবিকৃত সঞ্চিতি, প্রিমিয়াম সঞ্চিতি বিবিধ সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্তি। তা ছাড়া মন্দ বিনিয়োগের বিপরীতে রিজার্ভ বা ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি ও শেয়ার প্রিমিয়ামও ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মধ্যে পড়ে। নিচে এসব সঞ্চিতির পরিচয় তুলে ধরা হলো:[৪]

৪. ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি (Loss offsetting Reserv): বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি ব্যাংক তার শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে একটি ফান্ড গড়ে তুলবে। এটাকে মন্দ বিনিয়ো গের বিপরীতে রিজার্ভ বা ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি বলে। প্রতি বছর ব্যাংক তার লাভ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে এ ফান্ড তৈরি করে। এ সঞ্চিতি ব্যাংকের তহবিল হিসেবে বিবেচিত।

৫. শেয়ার প্রিমিয়াম (Share Premium) : ব্যাংক তার শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (Face Value) বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে যে লাভ করে সেই লাভের অংক শেয়ার প্রিমিয়াম হিসেবে বিবেচিত। শেয়ার প্রিমিয়াম হিসেবে যে ফান্ড তৈরি হয় তা ব্যাংকের তহবিল হিসেবে কাজে লাগে।

৬. অবন্টিত মুনাফা (Undistributed Profit) : কোনো কোনো সময় ব্যাংক মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের অংশীদারদের মধ্যে বন্টন না করে নানা কারণে তা ধরে রাখে, এটাকে অবন্টিত মুনাফা বলে। এটাও ব্যাংকের তহবিলের একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত।[৫]

---

১. M.C. Vaish, ibid, p. 258-263
সূত্র : J.M Keyenes, A Treatise on Money (1993), p. 130-131
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ ব্যাংকের ঋণকৃত বা কর্জকৃত তহবিল

যে তহবিল ব্যাংকের উৎসের বাইরে থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাকে কর্জকৃত তহবিল বলে। এই তহবিল ব্যাংকের দায় হিসেবে বিবেচিত। কর্জকৃত তহবিলকে প্রধানত নিম্নরূপ তিনভাবে ভাগ করা যায় : [১]

১. সকল ধরনের আমানত,

২. অন্যান্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান তেকে গৃহীত ঋণ,

৩. প্রদেয় বিল বা অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল।

১. সকল ধরনের আমানত : ব্যাংক ফান্ডের প্রধান উৎস হচ্ছে জনগণের আমানত। প্রচলিত ব্যাংকগুলো চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ ক রে। আর ইসলামী ব্যাংকগুলো আল-ওয়াদিয়াহ ও মুদারাবা হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ৭নং ধারা মোতাবেক জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাংক এ আমানত গ্রহণ করে। বস্তুত জনসাধারণের এ আমানতই ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও উন্নত করে।

২. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক থেকে কর্জ : সাধারণত, ব্যাংক তার আর্থিক প্রয়োজনে কখানো কখনো অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের ধার হয় স্বল্পমেয়াদি।

৩. অন্যান্য উৎস : প্রদেয় বিল তথা পেমেন্ট অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফটের অর্থও ব্যাংকের ব্যবহারযোগ্য তহবিলের অন্যতম উৎস। তা ছাড়া ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ঋণপত্র ইস্যু করে জনগণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করতে পারে। আমানত সার্টিফিকেট, সেভিংস বন্ড প্রভৃতি দলিলের মাধ্যমেও ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে তার তহবিল গঠন করতে পারে। এ ছাড়াও অনেক সময় বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন ঃ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রমুখ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কাতওয়ারী ব্যবহারের জন্য বিশেষ আর্থিক মঞ্জুরী দিয়ে থাকে এসব অনুদান ও ঋণ ব্যাংকের তহবিলের উৎস।

❒ ব্যাংকের তহবিল ব্যবহার

ব্যাংক যে তহবিল সংগ্রহ করে, তা অলসভাবে ফেলে রাখে না। এ তহবিল ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনই ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকও সঠিক নীতিমালার ভিত্তিতে এ তহবিল ব্যবহার মুনাফা অর্জনসহ আর্থিক অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করে থাকে। সার্বাধিক নিরাপত্তা, অধিক তারল্য, আমানতকারীদের আস্থা ও মুনাফা অর্জন-এ নীতির ভিত্তিতে ব্যাংক তার তহবিল ব্যবহার করে থাকে। ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে তার অংশ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করে। ব্যাংক তহবিলকে এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাতে তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। ব্যাংককে সাধারণত দু'ধরনের সম্পদে তহবিল বিনিয়োগ করতে হয়। [২]

---

১. M.C. Vaish, ibid, p. 261
সূত্র: D.R. Hodgman, Commercial Bank Loan adn Investment Policy (1963), p. 120-123

২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

১. অলাভজনক সম্পদ (Non-Earning Assets)

২. লাভজনক সম্পদ (Earning Assets)

১. অলাভজনক সম্পদ (Non-Earning Assets) : ব্যাংক এর পুরো তহবিল লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। কিছু নিয়ম-নীতি মেনে ব্যাংককে তহবিল ব্যবহার করতে হয়। বিনিয়োগের আগে ব্যাংককে তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। আর এ তারল্য সংরক্ষণ করতে যে সম্পদ ব্যাংক রেখে দেয়, তাকে অলাভজনক তারল্য সম্পদ বলে। এ সম্পদ দু' ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

ক) নগদ স্থিতি

খ) মূলধন সম্পদ।

ক. নগদ স্থিতি : ব্যাংকের নগদ স্থিতি থেকে কোন প্রকার লাভ আসে না। বরং ব্যাংক তার নিরাপত্তা বিধানের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। নগদ টাকা তরল সম্পদ হিসেবে পরিচিত। ব্যাংক তার তরল সম্পদ বা নগদ স্থিতি নিম্নরূপ তিনভাবে সংরক্ষণ করে থাকে ।[১]

১. নগদ সংরক্ষণ

২. বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি

৩. অন্যান্য ব্যাংকে স্থিতি।

১. নগদ সংরক্ষণ : আমানতকারীদের চাহিদা মেটাতে ব্যাংক তার ভল্টে নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়, এটা থেকে কোনো মুনাফা আসে না। চলতি দায় মেটানোর জন্য এ সংরক্ষণ ব্যাংক তার অভিজ্ঞতার আলোকে করে থাকে। দৈনন্দিন গ্রাহক চাহিদা পূরণ করতে এই নগদ ব্যাংকের জন্য অপরিহার্য।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি : বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অর্থের একটা অংশ সংরক্ষিত রাখতে বাধ্য থাকে। এ সংরক্ষণ দু'ধরনের হয়ে থাকে :[২]

ক. ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও,

খ. স্টেটিউটরি লিকুউডিটি রিজার্ভ।

ক. ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (Cash Reserve Ratio-CRR)

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ২৫ আর্টিকেল অনুযায়ী প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক তার মোট মেয়াদি ও তলবি বা চাহিবামাত্র দায়ের (Time and Demand Liabilities) একটি নির্দিষ্ট অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে বা তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকে নগদ আকারে জমা রাখতে বাধ্য। বর্তমানে এ হার ৫ শতাংশ। এ রিজার্ভ ব্যাংকের তারল্য সঙ্কট নিরসন করে এবং আমানতকারীদের দাবি তাৎক্ষণিক পূরণ করতে সহায়তা করে । বাংলাদেশ ব্যাংক এ ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও সময় সময় পরিবর্তন করতে পারে। ২০০৫ সালের অক্টোবর থেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য এই নগদ জমার হার (CRR) কার্যকর আছে। উল্লেখ্য, ব্যাংকসূমহ গড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ৫.০ ভাগ নগদ তহবিল সংরক্ষণ করে থাকে এবং এ জমার হার দৈনিক ভিত্তিতে কোনক্রমেই শতকরা ৪.০ ভাগের কম হবে না।[৩]

---

১. T.T. Sethi, ibid,p.262-264
সূত্র : Samuelson, Economics, (1983), p. 281

২. ibid

৩. বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০০৬-২০০৭ পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

খ) স্টেটিউটরি লিকুইডিটি (Statutory Liquidity Reserve)

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ধারামতে ব্যাংক তার মেয়াদি ও চাহিবামাত্র জমা বা দায়ের (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) নির্দিষ্ট অংশ নগদ অর্থ,স্বর্ণ বা কোনো সিকিউরিটি পেপারের মাধ্যমে নিজের কাছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে সোনালী ব্যাংকের কাছে জমা রাখবে। এটাকে বিধিবদ্ধ তরল সঞ্চয় (S L R) বলে। অন্যান্য ব্যাংকের মতো ইসলামী ব্যাংক যেহেতু কোনো মুদী সিকিউরিটি পেপার ক্রয় করতে পারে না, তাই তাকে নগদ আকারেই এসএলআর সংরক্ষণ করতে হয়। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তা ১৮% এর পরিবর্তে নগদ আকারে ১০% করা হয়েছে। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সিআরআর হিসেবে ৫% এবং এসএলআর হিসেবে ৬% সহ মোট ১০ শতাংশ নগদ আকারে রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয়। তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার ১ অক্টোবর, ২০০৫ থেকে কার্যকর রয়েছে।[১]

গ. অন্যান্য ব্যাংকে স্থিতি :

ইসলামী ব্যাংকগুলো তহবিল ব্যবহারের পর যদি কোনো উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই তহবিল বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। সাধারণত, এই তহবিল চলতি হিসাবে জমা রাখা। নানা কারণে এই জমার প্রয়োজন হয়। এটাও তরল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের তহবিল রাখার প্রয়োজন হলে তা মুদারাবা হিসাবেও রাখা যেতে পারে।

ঘ. মূলধন সম্পদ : ব্যাংক তার প্রয়োজনে ব্যাংকের তহবিল দালানকোঠা, আসবাবপত্র, গাড়ি ও অন্যান্য স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদে বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে যে সম্পদ ব্যাংক অর্জন করে, তাকে মূলধন সম্পদ বলে। তবে এগুলোকে অলাভজনক সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।। তবে বাস্তবে এই সম্পদ একেবারে অলাভজনক নয়।[২]

ঙ. লাভজনক সম্পদ (Earning Assets) : লাভজনক বলতে সেইসব সম্পদে বুঝানো হয়, যেখানে তহবিল বিনিয়োগ করার ফলে মুনাফা অর্জিত হয়। ব্যাংকিং ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। গ্রাহকের কাছ থেকে অথবা অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাংক যে তহবিল সংগ্রহ করে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যাংক যে তহবিল সংগ্রহ করে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে এই মুনাফা অর্জিত হয়। অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলো মুনাফা অজর্নের জন্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ধার হিসেবে বা কলমানি হিসেবে অর্থ ধার দেয়। এই ধার খুবই স্বল্প সময়ের জন্য হয়। সাধারণত সাতদিনের জন্য এই ধার দেয়া হয় এবং বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ মোতাবেক এই ধরনের ধারের সুদ নির্ধারিত হয়। তা ছাড়া স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিল, বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সচ্ছয়পত্র প্রাইজবন্ড, আয়কর বন্ড সরকারি বা আধা-সরকারি সিকিউরিটিজ, অন্যান্য আপমানত, জয়েন্ট স্টক কোমপানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ব্যাংকের তার বিনিয়োগ করে থাকে।[৩]

১.বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০০৬-২০০৭, পৃ.২৫
২. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository
প্রচলিত ব্যাংকের বেলায় এই ধরনের খাতে তহবিল খাটাতে কোনো বাধা নেই। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ধরনের সুদনির্ভর খাতে তার তহবিল খাটাতে পারে না। তাই ইসলামী ব্যাংকের একমাত্র খাত হলো সরাসরি বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক-এর তহবিল ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো হলো ; বাই'মুরাবাহা, বাই'ইসতিসনা, বাই'সালাম, হায়ার পারচেজ, মুশারাকা ও মুদারাবা।

❒ ব্যাংকের আমানত (Bank Deposit)

ব্যাংকের আমানত বলতে এখানে আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ বুঝানো হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক এর বিভিন্ন আমানত হিসাবে গ্রাহদের নিকট থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে ব্যাংক আমানত বলে।

Oxford Dictionary of Business-এ আমানত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"Bank deposit means a sum of money placed by a customer with a bank. The deposit may or may not attract interest and may be instantly accessible or accessible at a time by the two parties.''[১]

ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং তা বিতরণ অর্থাৎ সেই আমানত ঋণ বা বিনিয়োগ কাঁযক্রমে ব্যবহার । ব্যাংকের একেবারে প্রাথমিক কাজ হলো আমানত সমাবেশ করা। সমাজের মানুষের কাছে যে অলস অর্থ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, তাকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সমাবেশ করে। এ আমানতকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংক যা আয় করে তার একটি অংশ প্রচলিত ব্যাংকগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সুদ আকারে জমারকারীকে প্রদান করে। ফলে সুদী ব্যাংকে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার।[২]

ইসলামী ব্যাংক ও তার বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। কেননা, সঞ্চয় নিক্রিয়ভাবে পড়ে থাকা এবং তা আর্থ-সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত না হওয়াকে ইসলামী অপছন্দ করে। তাই ইসলামী ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে এটাকে কাঁযক্রমে ব্যাপৃত করে, আর তা থেকে আয় হলে গ্রাহক বা আমানতকারীকে লাভ প্রদান করে, আর লোকসান হলে আমানতকারী লোকসান নিতে বাধ্য থাকে। ফলে ইসলামী ব্যাংকে আমানতকারী ও ব্যাংকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। ব্যাংক যে আমানত সমাবেশ করে তা ধরনের দিক থেকে নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে[৩] :

১. চাহিবামাত্র আমানত (Demand Deposit) : যে সব আমানত ব্যাংক আমানতকারীর আদেশে চাহিবামাত্র প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে, তাকে ডিমান্ড ডিপেজিট বা চাহিবামাত্র আমানত বলা হয়। এইসব আমানতকারীকে চেক বই ইস্যু করা হয়। চলতি হিসাব ও সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব এ ধরনের আমানতের অন্তর্ভূক্ত।

---

১. Oxford Dictionary of Business, 3rd Edn, p. 5 (সূত্র : মোঃ ইসমাইল কাজী, ব্যাংকিং ও বীমা , পৃ. ১৫৩
২. Alan E. Hammad, *Islamic Banking : Theory and Practice* (Ohio: zakat and Research Foundation, 1989), p. 33
৩. ibid, 43-50 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

২. মেয়াদি জমা (Time Deposit) : যে সব আমানত নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রদেয় তাকে টাইম ডিপোজিট বলা হয়। এইসব আমানতকারীকে চেক বই দেয়া হয় না। সকল মেয়াদি জমা ও বন্ড এ ধরনের আমানতের অন্তর্গত।

৩. কল ডিপেজিট (Call Deposit) : ব্যাংক তার সাময়িক অর্থ সঙ্কট মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে যে অর্থ ধার নেয়, তাকে কলমানি এবং এর দ্বারা গঠিত আমানতকে কল ডিপেজিট বলে।

৪. কস্ট ফ্রি ডিপোজিট : যেসব আমানত বা ডিপোজিটের জন্য ব্যাংক সুদ বা মুনাফা দিতে হয় না, তাকে কস্ট ফ্রি ডিপোজিট বলে। যেমন ঃ চলতি হিসাবের আমানত, পেমেন্ট অর্ডার ও সানড্রি ডিপোজিট ইত্যাদি।

৫. কস্ট ডিপোজিট : যেসব আমানতের ওপর প্রদেয় সুদ বা মুনাফার হার বেশি অথবা যেসব আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ বা মুনাফা প্রদান করতে হয়, তাকে হাই কস্ট বিয়ারিং ডিপোজিট বলে। মেয়াদি জমা ও বিভিন্ন ধরনের বন্ড হাই কস্ট বিয়ারিং ডিপোজিটের অন্তগর্ত।

❒ ব্যাংক হিসাব :

ব্যাংকের হিসাব বলতে সেই হিসাবকে বোঝায় যার মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের আমানত গ্রহণ করে এবং চাহিবামাত্র বা নিয়ম অনুযায়ী তা পরিশোধ করে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, ব্যাংকে আমানতকারীর নামে যে হিসাব খোলা হয়, তাকে ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে বিভিন্ন অথনীতিবিদ বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো,

Oxford Dictionary of Business পুস্তকে ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"Bank account is an account maintained by a bank in which a deposit of depositor's money is kept.[১]

E. Lewis Davids বলেন,

"Bank account is a contractual agreement between a bank and its customer allowing the customer to use bank services for a fee.''[২]

R.N Dover বলেন,

Bank account means the record of customer financial transactions maintained by the banker''[৩]

---

১. Oxford Dictionary of Business, ibid, p.5
২. E. Lewis Davids, Dictionary of Banking and Finance, p.10
সূত্র : মোঃ ইসমাইল কাজ, ব্যাংকিং ও বীমা, পৃ. ২১৫
৩. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী; প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

❒ ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য (Objectives)

ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক স্থাপনের একটি অন্যতম উপায় হলো ব্যাংক হিসাব। ব্যাংক হিসাবের মূল যে উদ্দেশ্য সেগুলো হলো,[১]

১. অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ ;
২. সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি ;
৩. মুনাফা অর্জন ;
৪. জাতীয় মূলধন গঠন ;
৫. মিতব্যয়িতা অর্জন ;
৬. বিনিয়োগ সুবিধা লাভ ;
৭. নিকাশ সুবিধা এবং
৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

❒ আমানত সংগ্রহের ইসলামী পদ্ধতি

প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেমন নানা প্রকারের হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করা হয়, ইসলামী ব্যাংকের বেলায় তাই। তবে ইসলামী ব্যাংক শরীআহ্র নিয়মনীতি মেনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। অর্থাৎ আমানত সংগ্রহে ইসলামী নিজস্ব নীতিমালা আছে। ইসলামী ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ নীতিমালা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর নীতি ও পদ্ধতি থেকে আলাদা। ইসলামী ব্যাংক নিম্নরূপ দু'টি নীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে :[২]

১. আল-ওয়াদিয়াহ পদ্ধতি এবং
২. মুদারাবা পদ্ধতি।

১. আল-ওয়াদিয়াহ নীতি :

সঞ্চয় সমাবেশের একটি ইসলামী কৌশল হলো আল-ওয়াদিয়াহ। 'আল-ওয়াদিয়াহ' শব্দটি এসেছে 'ওয়াদিয়ূন' থেকে। এর অর্থ সংরক্ষণ করা, জমা করা, বাদ দেয়া ও পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। আল-ওয়াদিয়াহ একটি চুক্তি। এখানে দু'টি পক্ষ থাকে ; জমাগ্রহণকারী ও জমাকারী। ব্যাংকের বেলায় যে হিসাব পরিচালনা করে বা ব্যাংকে যে বা যিনি অর্থ জমা রাখেন, তাকে 'মুয়াদ্দি' আর জমাগ্রহণকারী হিসেবে ব্যাংককে বলা হয়, মুয়াদ্দা ইলাইহি' । আর যে বস্তু বা অর্থ জমা করা হয় তা হলো 'মুয়াদ্দা' ।[৩]

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে। 'আল-ওয়াদিয়াহ' মানে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা। ব্যাংক আমানতদার হিসেবে আমানত সংরক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং চাহিবামাত্র আমানতদারের অর্থ গ্রাহককে ফেরত দেয়। । আল-ওয়াদিয়াহ নীতিতে আমানত সংগ্রহ করার সময় ব্যাংক আমানতকারীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয় যে, ব্যাংক আমানতের অর্থ ব্যবহার করবে।

---

১. M. C. Vaish, ibid, p. 362-263
২. Muazzam Ali (ed) , *Islamic Banks and Strategies of Economic Co-operation* (London: New Century Books, 1982 A.D), p. 160-161
৩. ibid, p. 162

Dhaka University Institutional Repository

যদি ব্যাংক এই আমানতের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে, তা হলে আমানতকারী এর থেকে কোনো অংশ পাবে না, আর ব্যাংকের কোনো লোকসান হলেও আমানতকারী সেই লোকসান বহন করবে না। আল-ওয়াদিয়াহ নীতির সাথে প্রচলিত ব্যাংকের চলতি হিসাব পদ্ধতির কিছুটা মিল রয়েছে। তবে প্রচলিত ব্যাংকে চলতি হিসাবের বিপরীতে অতিরিক্ত উত্তোলন গ্রহণের সুযোগ আছে, যা ইসলামী ব্যাংকে নেই। প্রচলিত ব্যাংকের চলতি হিসাব এবং ইসলামী ব্যাংকের আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবের পার্থক্যের ওপর আলোকপাত করা হলো :

ক. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাবের পার্থক্য [১]

১. আল-ওয়াদিয়াহ একটি ইসলামী নীতির আর চলতি হিসাবের বেলায় ইসলামী শরীআহ্‌র নীতির কোনো বালাই নেই। এটি সুদী ব্যাংকিং ধারার সৃষ্টি।

২. আল-ওয়াদিয়াহ নীতিতে আমানত গ্রহণের বেলায় আমানত ব্যবহারের জন্য আমানতকারীর অনুমতি নেয়া হয়। কিন্তু চলতি হিসাবের বেলায় তা নেয়া হয় না।

৩. আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবে গৃহীত আমানত শরীআহ্‌বিরোধী কোনো খাতে ব্যবহার করা হয় না। বিপরীতপক্ষে, চলতি হিসাবে আনীত অর্থ সুদী ব্যাংক ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম কিছুই বিবেচনা করা হয় না।

খ. আল-ওয়াদিয়া ও আল-আমানাহ্‌র পার্থক্য :

কোনো কিছু জমা বা গচ্ছিত রাখার একটি পদ্ধতি হলো আল-আমানাহ্। আর আল-ওয়াদিয়াহও জমা রাখা বা আমানত রাখার একটি ইসলামী নীতি । উভয় নীতির উদ্দেশ্যই হলো সম্পদের নিরাপত্তা। তবে এ দুয়ের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য আছে তা নিম্নরূপ :[২]

১. আমানাহ্‌র গচ্ছিত বা জমা অর্থ বা বস্তু আমানদতার ব্যবহার করতে পারে না। আল-ওয়াদিয়াহ নীতিতে জমাকৃত অর্থ বা বস্তু আমানতদার ব্যবহার করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ বা বস্তু চাহিবামাত্র জমাকারীকে ফেরত দিতে হয়।
২. আমানাহ্‌র গচ্ছিত বা জমা অর্থ বা বস্তু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই ফেরত দিতে হয়। আল-ওয়াদিয়াহ্‌র অর্থ অবিকল ফেরত দিতে হয় না। তবে একই মূল্যমানের অর্থ ফেরত দিতে হয়।
৩. আমানাহ্‌র অর্থ থেকে আমানতদারের কোনো লাভ হয় না এবং সাধারণত, লোকসানেরও কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু আল-ওয়াদিয়াহ্‌র অর্থ বা বস্তু ব্যবহারে আমানতদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাভ হতে পারে এবং লোকসান হওয়ারও ঝুঁকি থাকে।

---

১. Ataul Haq (Edn), ibid, p.69-70
২. ibid, p. 80-81

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুদারাবা নীতি

'মুদারাবা' আমানত সংগ্রহের বহুল আলোচিত একটি ইসলামী পদ্ধতি। এ নীতিতে ব্যাংক আমানতকারীদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং শর্ত থাকে যে, সেই আমানত ব্যবহারে ব্যাংকের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং এই আমানত ব্যবহার করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা একটি সম্মত অনুপাতে ব্যাংক ও আমানতকারীর মধ্যে বন্টিত হবে, আর লোকসান হলে তা আমানতকারী বহন করবে। 'মুদারাবা' আরবি শব্দ 'দারব' বা 'দারবুন' থেকে এসেছে [১]। এর অর্থ আল্লাহর রহমতের তালাশে সফর করা। 'মুদারাবা' অংশীদারী কারবারের একটি পদ্ধতি। এতে একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন। তাকে বলা হয় 'সাহিবুল-মাল' বলা হয়। অন্যপক্ষ, তার মেধা, যোগ্যতা ও সময় ব্যয় করে। যিনি ব্যবসা পরিচালনা করেন, তাকে বা ব্যাংককে 'মুদারিব' বা উদ্যোক্তা বলা হয়।[২]

মুদারাবা নীতিতে ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে। প্রচলিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব পদ্ধতি অনেকটা মুদারাবার মত হলেও উভয়ের মধ্যে নীতিগত তফাত অনেক। প্রচলিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে আমানতকারী সম্পূর্ণ অর্থসহ লাভ বা সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবার অর্থ গ্রাহককে ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। ব্যাংকের লাভ হলে সম্মতি লাভ আমানতকারী পেতে পারেন। অর্থাৎ মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন করা হয়। আর ব্যবসায় লোকসান হলে তা সাহিবুল মাল বা আমানতকারীকেই বহন করতে হয়।[৩]

❒ ইসলামী ব্যাংকের হিসাবসমূহ

আগেই বলা হয়েছে, আল- ওয়াদিয়াহ ও মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে থাকে। তবে আমানত সংগ্রহের কতগুলো হিসাব আছে। নিচে আমানত সংগ্রহের হিসাবগুলোর আলোকপাত করা হল [৪]:

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
৩. মুদারাবা মেয়াদি হিসাব
৪. মুদারাব শর্ট নোটিশ হিসাব
৫. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব।

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব : এই হিসাব খোলার নিয়ম পদ্ধতি অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাব মতোই। যে কেউ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে এই হিসাব খুলতে পারেন। হিসাবধারী যে কোনো সময় তার ইচ্ছামাফিক এ হিসাবে টাকা জমা দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে দৈনিক যতবার ইচ্ছা হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন[৫]।

---

১. আল্লাম ইবন মানযূর খ.৫, পৃ. ৪৭৮
২. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, খ. ৩, পৃ. ৬২৩
৩. প্রাগুক্ত
৪. Alan E. Hammad, ibid, p.60-65
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব খোলার নিয়মাবলি

কোনো কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, সংস্থা, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের হিসাব খুলতে পারেন। হিসাবধারীকে যেসব কাগজপত্র জমা দিয়ে বা পূরণ করে হিসাব খুলতে হবে তা হলো, [১]

ক. আবেদনপত্র, ওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী পূরণ।

খ. নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেয়া।

গ. গ্রাহকের দুই কপি ছবি (গ্রাহক দ্বারা বা যথাযথ পরিচিত দ্বারা সত্যায়িত)।

ঘ. নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট বা পাসপোর্ট বা আইডেনটিটি কার্ডের সত্যায়িত কপি।

ঙ. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির বেলায় ট্রেড লাইসেন্স-এর সত্যায়িত কপি।

চ. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বেলায় মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর সত্যায়িত কপি ও হিসাবে পরিচালনা সংক্রান্ত পরিচালকবৃন্দের বোর্ড রেজুলেশন।

ছ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বেলায় সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন।

জ. গ্রাহক দ্বারা সত্যায়িত নমিনির এক কপি ছবি (ক্ষেত্র বিশেষ)।

❒ আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবের সুবিধা

ক. দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায় ও উঠানো যায়।

খ. চাহিবামাত্র চেকের টাকা পরিশোধ করতে ব্যাংক বাধ্য।

গ. এই হিসাবের মাধ্যমে সহজে টাকা স্থানান্তর করা যায়।

❒ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব :

এটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর সঞ্চয়ী আমানত হিসাব। ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যে কোন দিন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে এ হিসাব খোলা যায়। এ হিসাবের সাথে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঞ্চয়ী হিসাবের কিছুটা মিল থাকলেও লাভ-লোকসান বন্টন-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ধরনের হিসাব থেকে মাসে অনধিক চারবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তবে সাতদিনের নোটিশ দিয়ে প্রয়োজন মতো টাকা উঠানো যায়। টাকা উঠানোর শর্ত ভঙ্গ করলে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট মাসে স্থিতির ওপর কোনো মুনাফা পান না। সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহকের অনুকূলে চেক বই ইস্যু করা হয়।[২]

---

১. Board of Dditors, A Test Book on Islaie Banking, ibid, p. 87
২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুদারাবা হিসাব খোলার নিয়মাবলি

নিচে বর্ণিত নিয়ম-কানুন মেনে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ বা দলিলপত্র জমা দিয়ে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কোনো সংস্থা মুদারাবা হিসাব খুলতে পারে। গ্রাহককে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে তা হলো :[১]

১. ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদনপত্র ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী পূরণ।

২. দু;কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত (যথাযথ পরিচিত দ্বারা) ছবি।

৩. ফরমের নির্ধারিত স্থানে যথাযথ পরিচিতি।

৪. নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট বা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি, অথবা আইডেনটিটি কার্ডের সত্যায়িত কপি।

৫. নমিনির এক কপি (গ্রাহক দ্বারা সত্যায়িত) ছবি।

❒ মুদারাবা মেয়াদি হিসাব :

ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের নিকট থেকে বিভিন্ন মেয়াদে আমানত গ্রহণ করে থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে এই আমানত গ্রহণ করা হয় বলে এটিকে মুদারাবা মেয়াদি হিসাব বলে। সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস ও ৩৬ মাসের জন্য এরূপ আমানত গ্রহণ করা হয়। মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে এই হিসাবে বেশি মুনাফা প্রদান করা হয়। ব্যাংক চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে মুদারাবা হিসাবের অর্থ খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জন করে, চুক্তি মোতাবেক তার নির্ধারিত অংশ আমানতকারীকে প্রদান করে এবং বাকি অংশ ব্যাংক পেয়ে থাকে।[২]

❒ মুদারাবা মেয়াদি হিসাব খোলার নিয়মাবলি

এ ধরনের হিসাব খুলতে ছবির প্রয়োজন হয়, কিন্তু পরিচিতি লাগে না্ মেয়াদি হিসাবের বিপরীতে চেক বই ইস্যু করা হয় না। তার পরিবর্তে গ্রাহকের অনুকূলে একটি অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ ইস্যু করা হয়। মেয়াদ শেষে বা তার আগে প্রয়োজনে এটি জমা দিয়ে গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করতে পারে। নমিনির এক কপি সত্যায়িত ছবির প্রয়োজন হয়।

❒ মেয়াদি হিসাবের সুবিধা

১. এ হিসাব খোলার ঝামেলা অনেক কম্

২. এ হিসাবে প্রদত্ত ব্যাংক মুনাফার হার বেশি।

৩. স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ৮০ % বা ৯০% ঋণ বা কার্জ গ্রহণ করা যায়।

৪. ব্যাংক এ হিসাবের আমানতের অর্থ দীর্ঘমেয়াদি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়।

৫. কোনো হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে চুক্তি নবায়ন করে চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা লাভ করা যায়।

---

১. ibid
২ ibid
৩ ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব

স্বল্প সময়ের নোটিশ (সাধারণত সাতদিন) অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তরের সুবিধা রেখে যে মুদারাবা হিসাব খোলা যায়, তাকে মুদারাবা শর্ট নোটিশ ডিপোজিট হিসাব খুলে। কোনো কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, সংস্থা ও ট্রাস্ট কিংবা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ হিসাব খুলে লেনদেন করতে পারেন। অন্যান্য সঞ্চয়ী ও আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবের মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে নির্ধারিত আবেদপত্র পূরণ করে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবে গ্রাহককে চেক বই ইস্যু করা হয়। এই হিসাবে লাভ দেয়া হয়। তবে স্বল্প সময়ের জন্য লেনদেনের সুযোগ আছে বলে এই ধরনের হিসাবে মুনাফার হার কম।[১]

□ মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব : মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা যায় এমন আরো কতগুলো সঞ্চয় হিসাব প্রকল্প চালু আছে ইসলামী ব্যাংক। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। নিচে ব্যাংকের এসব হিসাব আলোচনা করা হলো।[২]

❒ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ

□ মুদারাবা হজ্জ্ব সঞ্চয়ী হিসাব

হজ্জ্ব পালনে আগ্রহী যেসব মুসলমান হজ্জের প্রয়োজনীয় অর্থ একসাথে সংগ্রহ করতে পারেন না, তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এ ধরনের সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয় গড়ে তুলে হজ্জ্ব পালন করতে পারেন। শুধুমাত্র হজ্জ্ব পালনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ হিসাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয় গড়ে তুলে হজ্জ্ব পালন করতে পারেন। শুধুমাত্র হজ্জ্ব পালনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ হজ্জ্ব সঞ্চয়ী প্রকল্প নামে ১ বছর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের জন্য এ হিসাব খুলতে পারেন। প্রতিমাসে মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তি জমা করার ব্যবস্থা আছে এ হিসাব। এ হিসাব খুলতে পারেন। প্রতিমাসে মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তি জমা করার ব্যবস্থা আছে এ হিসাবে [৩]।

❒ মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড হিসাব

যারা অনধিক তিন বছরের বেশি মেয়াদি আমানত রাখতে ইচ্ছুক তাঁরা এ প্রকল্পের আওতায় ৫ (পাঁচ) ও ৮ (আট) বছর মেয়াদি সেভিংস বন্ড ক্রয় করতে পারেন। যে কোনো ব্যক্তি একক বা যৌথ নামে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব বা অলাভজনক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার থেকে শুরু করে ১০ লাখ টাকা মূল্যমানের যে কোনো পরিমাণ সঞ্চয় বন্ড ক্রয় করতে পারেন। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে বন্ড ভাঙানো হলে উক্ত বন্ডের ওপর কোনো লাভ দেয়া হয় না। মেয়াদ পূর্তির আগে কিন্তু এক বছরের পর বন্ড ভাঙালে সে ক্ষেত্রে মেয়াদ অনুযায়ী প্রযোজ্য ওয়েটেজের ভিত্তিতে লাভ প্রদান করা হয় [৪]।

❒ মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব

যারা অল্প অল্প টাকা জমা করে সঞ্চয় গড়ে তুলতে চান তাদের জন্য অন্যতম আমানত হিসাব হচ্ছে মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশণ) প্রকল্প। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত, কর্মজীবী ও চাকরিজীবী মানুষের উদ্দেশ্য এই প্রকল্পটি পরিকল্পিত। এ ধরনের হিসাব ৫ (পাঁচ০ ও ১০ (দশ) বছর মেয়াদের জন্য ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০, ১০০০ ও এক হাজারের গুণিতক ২০, ০০০ পর্যন্ত টাকা মাসিক কিস্তিতে জমার ভিত্তিতে খোলা হয়। যে কোনো সময় এই হিসাব বন্ধ করা যায় এবং জমাকৃত টাকা তুলে নেয়া যায়। তবে এক বছরের আগে হিসাব বন্ধ করা হলে হিসাবের আমানতের ওপর কোনো মুনাফা দেয়া হয় না। তবে এক বছরের বেশি, কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়ের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের প্রদেয় হারে লাভ দেয়া হয়। দশ বছর মেয়াদের হিসাব পাঁচ বছর পর বন্ধ করা হলে পাঁচ বছর হিসাবের প্রদত্ত হারে লাভ দেয়া হয় [৫]।

---

১. আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা বিবরণ

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের জন্য ব্যাংকের অনুমোদিত শাখাগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রায় এই হিসাব খোলা যায়। বিদেশে বসবাসকারী, কর্মরত ও উপার্জনক্ষম বাংলাদেশী নাগরিক, বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিক, বিদেশে নিবন্ধনকৃত ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী মিশন ও তাদের কর্মচারীবৃন্দ ন্যুনতম ১, ০০০ মার্কিন ডলার জমা দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে এ হিসাব খুলতে পারেন।[১]

❒ মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব

এই পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদে এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখা এবং মাসিক ভিত্তিতে এর মুনাফা প্রদান করা হয়। সাধারণত, অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, প্রবাসী ওয়েজ আর্নার যারা তাদের জীবনযাপনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো অথবা তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য মাসে মাসে মুনাফা উত্তোলনের সুবিধার্থে এ ধরনের হিসাব খুলতে পারেন। ট্রাস্ট ও কাউন্সিলসমূহ যারা ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড দেন, তারাও এই হিসাব খুলতে পারেন। হিসাব ৩ (তিন) ও ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মুনাফা মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাবে কমপক্ষে, ১, ০০, ০০০ (এক লাখ) টাকা বা তার গুণিতক অংক জমা করা যায়। এ হিসাবে চেক বই ইস্যু করা হয় না, তবে জমাকারীকে একটি হস্তান্তর অযোগ্য রসিদ প্রদান করা হয়।[২]

❒ মুদারাবা মোহর সঞ্চয়

মোহর এমন সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। এ মোহরের অর্থ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিশোধ করা ফরয। এটা স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার। আমাদের দেশে অনেকেই এটা অনুধাবন করতে পারেন না। ফলে তা চিরদিন অপরিশোধিত থেকে যায় বলে স্ত্রীগণ তাদের একটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং এর ফলে সমাজ কলুষিত হচ্ছে। এটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে মোহর পরিশোধের জন্য মেয়াদি সঞ্চয় হিসাবের প্রবর্তন করেছে।[৩]

❒ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট

কোনো মুসলমান কর্তৃক তার কোনো সম্পত্তি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কোনো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করাকে ওয়াক্‌ফ বলে। আর ক্যাশ ওয়াকফ এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। বিত্তবান মুসলমানরা তাদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে এই সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারেন । এই সঞ্চয় থেকে অর্জিত মুনাফা বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মতো মহান কাজে ব্যয় করতে পারেন।[৪]

❒ ক্যাশ ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্য

১. এটি শরীআহ্‌সম্মত দান হিসেবে বিবেচিত;
২. ব্যাংক ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াকফের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে।
৩. ওয়াক্‌ফ শাশ্বত চিরন্তন ও ওয়াকিফের দেয়া নামে চালু থাকে।
৪. বিভিন্ন সময়ের ঘোষিত সর্বোচ্চ মুনাফা ব্যাংক এই প্রকল্পে প্রদান করে।
৫. ওয়াকিফের জন্য নির্ধারিত সমুদয় অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিতে জমা দেয়া যায়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ নিম্নরূপ : [১]

মাসিক জমাভিত্তিক বিবাহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রকল্প

নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তাদের অভীষ্ট বিবাহকার্যে সহযোগিতা করার জন্য এ প্রকল্প গৃহীত। ২৫০, ৫০০ ও ১,০০০ টাকা মাসিককিস্তির ভিত্তিতে মুদারাবা পদ্ধতিতে ৩, ৫ ও ৮ বছর মেয়াদে এ হিসাব খোলা যায়। এ প্রকল্পের আওতায় বিবাহ কাজে সহায়তার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। এ বিনিয়োগ কেবলমাত্র বিবাহসামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ওয়াশিং মেশিন, সেলাই মেশিন, বাইসাইকেল, ফ্রিজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য বাই-মুয়াজ্জাল এবং ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেয়াদান্তে মুনাফাসহ সঞ্চিত অর্থের দ্বিগুণ বা ৩০, ০০০টাকা (যেটি কম) বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

❒ মাসিক মুনাফা প্রদানভিত্তিক মেয়াদি জমা হিসাব

অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য এ হিসাব চালু করা হয়েছে। এ ধরনের হিসাবধারীরা ব্যাংকে টাকা জমা রেখে মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা পেয়ে থাকেন। এই হিসাবে আমানতের মেয়াদ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর। ১, ০০, ০০০ টাকা এবং উহার গুণিতক যে কোনো পরিমাণ টাকা এ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা হয়।

❒ মাসিক জমাভিত্তিক মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প

মুদারাবা ভিত্তিতে প্রতিমাসে জমা দেয়ার শর্তে এ হিসাব ৫, ৮, ১০ ও ১২ বছরের জন্য খোলা হয়। এ প্রকল্পে মাসিক কিস্তির পরিমাণ ২০০, ৩০০, ৫০০, ১০০০, ১৫০০ ও ২০০০ টাকা। অনিবার্য কারণ দর্শানো ব্যতীত ৫ (পাঁচ) থেকে ২৫ (পঁচিশ) বছরের আগে এ হিসাব থেকে টাকা উঠানো যায় না। এ হিসাবে চেক বই ইস্যু করা হয় না। বিশেষ করে এ প্রকল্পের মাধ্যমে চাকরিজীবীগণ প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন।

❒ এককালীন হজ্জ্ব জমা হিসাব

যারা এককালীন টাকা জমা করে ভবিষ্যতে হজ্জ্ব করার পরিকল্পনা করেন তারা এ হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয় করেন, অত:পর টাকা তুলে হজ্জ্ব করতে পারেন। এ প্রকল্পের আওতায় ৫ থেকে ২৫ বছর মেয়াদের জন্য হিসাব খোলা হয়।

❒ মাসিক কিস্তিভিত্তিক হজ্জ্ব হিসাব

স্বল্পবিত্তের লোকেরা যারা ধীরে ধীরে টাকা জমা করে হজ্জ্ব করতে চান তাদের জন্য এ হিসাবের ব্যবস্থা রয়েছে। ১ থেকে ২০ বছরের জন্য এ হিসাব খোলা হয়। মাসে মাসে এ হিসাবে টাকা জমা দেয়া হয়।

❒ আল-আরাফাহ সেভিংস বন্ড

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি সাধনের জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একক বা যুগ্ম নামে এ বন্ড ক্রয় করতে পারেন। বন্ডে মূল্যমান, ১০, ০০০, ২৫,০০০ এবং ১,০০,০০০ টাকা। বন্ডের মেয়াদকাল ৩, ৫ ও ৮ বছর।

❒ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের জন্য ব্যাংকের অনুমোদিত শাখাগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রায় এ হিসাব খোলা যায়। বিদেশে বসবাসকারী, কর্মরত ও উপার্জনক্ষম বাংলাদেশী নাগরিক, বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিক, বিদেশে নিবন্ধকৃত ও বাংলাদেশে কর্তরত বিদেশী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী মিশন ও তাদের কর্মচারীবৃন্দ নির্দিষ্ট নিয়মে খুলতে পারেন এ হিসাব। মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং অথবা যে কোনো নির্বাচিত বা গ্রহণযোগ্য মুদ্রায় হিসাবধারীর ইচ্ছানুযায়ী এ হিসাব খোলা যায়। এছাড়াও রয়েছে পেনশনভোগী জমা প্রকল্প ও ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম।

---

১. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচিতি ম্যানুয়েল, জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২ খ্রি, পৃ. ২০-২৫ থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

❒ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ নিম্নরূপ :[১]

❒ মাসিক উপার্জন প্রকল্প

৫০,০০০ টাকা বা এর গুণিতক যে কোনো পরিমাণ টাকা এ হিসাবে জমা গ্রহণ করা হয় এবং গ্রাহককে অ-হস্তান্তরযোগ্য একটি রসিদ প্রদান করা হয়। এই হিসাবে ৫ বছর মেয়াদে জমা গৃহীত হয় এবং মেয়াদান্তে মূল আমানত ফেরত দেয়া হয়। ১, ০০, ০০০ টাকার বিপরীতে মাসিক প্রাক্কলিত মুনাফা ১, ০০০ টাকা দেয়া হয়। এই আমানত যে তারিখে গ্রহণ করা হয় পরবর্তী মাসের একই তারিখে মুনাফা শাখায় গ্রাহকের সঞ্চয়ী বা আল ওয়াদিয়াহ হিসাবে জমা জমা হয়। মেয়াদপূর্তির আগে এ হিসাবের টাকা উঠাতে চাইলে সঞ্চয়ী হিসাবের হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, তবে ১ বছরের আগে আমানত উত্তোলন করলে কোনো মুনাফা প্রদান করা হয় না।

❒ টাকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রকল্প

এ প্রকল্পে মুদারাবা ভিত্তিতে ১০, ০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব যে কোনো পরিমাণ টাকা জমা গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের টাকা ৮ বছর মেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ জমা ৮ বছরে দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এ হিসাবের অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ ব্যাংকে জমা রেখে তার ৮০% পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করা যায়।

❒ টাকা তিনগুণ বৃদ্ধি প্রকল্প

এ প্রকল্পে মুদারাবা ভিত্তিতে জমাকৃত টাকা ৯.৫ বছর মেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ জমা ৯.৫ বছরে তিনগুণ হয়। এ হিসাবের অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ ব্যাংকে জমা রেখে তার ৮০% পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করা যায়।

❒ মাসিক আমানত প্রকল্প

এ প্রকল্পের আমানত ৫, ৮ ও ১০ বছর মেয়াদের জন্য মুদারাবা ভিত্তিতে মাসিক কিস্তির মাধ্যমে করা হয়। এ প্রকল্পে মাসিক কিস্তির পরিমাণ ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০, ২৫,০০০ এবং ৫০,০০০। এ হিসাবের টাকা মেয়াদ পূর্তির আগে উঠালে ১০০ টাকা সার্ভিস চার্জ আদায় করে ব্যাংক আমানতকারীর হিসাব বন্ধ করে থাকে।৫ বছরের আগে এ হিসাবের টাকা উঠালে সঞ্চয়ী হিসাবের হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, কিন্তু ১ বছরের আগে কেউ জমা আমানত উঠাতে চাইলে কোনো মুনাফা প্রদান করা হয় না। ২ বছরের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার পর আমানতকারী আমানতকৃত অর্থের ৮০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

❒ মিলিয়নিয়ার প্রকল্প

এটি মাসিক কিস্তিতে দেয় একটি জমা প্রকল্প। দীর্ঘ মেয়াদে এ হিসাবে জমা গ্রহণ করা হয়। এ হিসাবের মেয়াদ ১২ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর এবং ২৫ বছর হয়ে থাকে। এ হিসাবে কিস্তি জমার সময় প্রতিমাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিস্তি খেলাপি হলে ২৫ টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে পরবর্তী মাসে কিস্তি পরিশোধে করা যায়।

❒ হজ্জ্ব ডিপোজিট প্রকল্প

সহজে হজ্জ্ব করতে আগ্রহী ব্যক্তি মাসিক জমার ভিত্তিতে এ হিসাব খুলে মেয়াদান্তে টাকা উঠিয়ে হজ্জ্ব সম্পাদন করতে পারেন। এ হিসাবে জমার মেয়াদ ১ বছর থেকে ২৫ বছর। মাসিক কিস্তির পরিমাণ মেয়াদ অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ হিসাবে কিস্তির পরিমাণ ও মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা হয় না।

---

১. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিনিয়োগ ও আমানত সংক্রান্ত জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ম্যানুয়েল, ২০১১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

❒ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাবসমূহ

এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিশেষ মুদারাবা হিসাব রয়েছে। হিসাবসমূহ নিম্নরূপঃ [১]

❒ মুদারাবা মাসিক আয় প্রকল্প

এটি মাসিক মুনাফা অর্জনের একটি জমা হিসাব প্রকল্প। ১,২৫,০০০ টাকা বা এর গুণিতক যে কোনো পরিমাণ টাকার আমানত রেখে এ হিসাব খোলা যায়। এ জমার মেয়াদ ৫ বছর। ১,২৫,০০০ টাকায় মাসে প্রদত্ত মুনাফার পরিমাণ ১,০০০ টাকা। এ প্রকল্পে জমার পের ৮০% পর্যন্ত গ্রাহককে কর্জ প্রদান করা যায়।

❒ মুদারাবা সুপার সেভিংস প্রকল্প

এটি দ্বিগুণ বা তার অধিক টাকা বৃদ্ধি প্রকল্প। এ প্রকল্প হিসাবে ন্যূনতম আমানতের পরিমাণ ১,০০০ টাকা, যার গুণিতক হিসেবে যে কোনো পরিমাণ টাকা এ প্রকল্পে রাখা যায়। মাসে মাসে এ হিসাবে টাকা জমা করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ বছর। মেয়াদান্তে গ্রাহক হিসাবের টাকা মুনাফাসহ একসাথে উঠিয়ে নিতে পারেন। জমার বিপরীতে ৯০% পর্যন্ত কর্জ বা বিনিয়োগ

❒ মুদারাবা মাল্টিপারপাস সেভিংস প্রকল্প

এটি দ্বিগুণ বা তার অধিক টাকা বৃদ্ধি প্রকল্প। এ প্রকল্প হিসাবে ন্যূনতম আমানতের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা, যার গুণিতক হিসেবে যে কোনো পরিমাণ টাকা এ প্রকল্পে রাখা যায়। মাসে মাসে এ হিসাবে টাকা জমা করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ১৩ বছর। মেয়াদান্তে গ্রাহক হিসাবের টাকা মুনাফাসহ একসাথে উঠিয়ে নিতে পারেন। জমার বিপরীতে ৮০% পর্যন্ত কর্জ বা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

❒ মাসিক কিস্তিভিত্তিক হজ্জ

বিভিন্ন মেয়াদে মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে এ প্রকল্পে টাকা জমা করা হয়। যারা হজ্জে টাকা একসাথে যোগাড় করে পবিত্র হজ্জ পালনে সক্ষম নন, তারা ধীরে ধীরে এ প্রকল্পে টাকা জমিয়ে হজ্জ পালন করতে পারেন। এ প্রকল্পে ৫, ৮, ১০, ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদে হিসাব খোলা হয়। মেয়াদ অনুযায়ী মাসিক কিস্তির পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

❒ মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প

এ হিসাব ৫, ৮, ১০ বা ১২ বছরের জন্য খোলা যায়। মাসিক কিস্তির পরিমাণ ২০০, ১,০০০, ২,০০০ ও ৫,০০০ টাকা। ৩ বছর কিস্তি নিয়মতি জমার পর কেউ ইচ্ছা করলে এ প্রকল্পে আমানতের ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নিতে পারেন।

---

১. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (২০১১) পরিচিতি ম্যানুয়াল পৃ. ১০-১৬ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ আল-ওয়াদিয়া ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে পার্থক্য

	আল-ওয়াদিয়া সঞ্চয়ী হিসাব		মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
১.	এটি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য।	১.	এটি ব্যক্তি ও স্বল্পজীবী মানুষের জন্য উপযোগী।
২.	এটি এক ধরনের হিসাব।	২.	এটি বিভিন্ন ধরনের হিসাব।
৩.	দৈনিক যতবার ইচ্ছা এ হিসাবের টাকা উঠানো যায়।	৩.	সপ্তাহে দু'বারের বেশি টাকা উঠালে নোটিশ লাগে।
৪.	গ্রাহক এ হিসাব থেকে যে কোনো পরিমাণ টাকা উঠাতে পারে।	৪.	গ্রাহক এ হিসাব থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উঠাতে পারে। বেশি উঠাতে হলে নোটিশ লাগে।
৫.	আমানতের ওপর লাভ দেয়া হয় না।	৫.	আমানতের ওপর লাভ বা মুনাফা দেয়া হয়।
৬.	ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য এ হিসাব খোলা হয়।	৬.	সঞ্চয় জন্য হিসাব খোলা হয়।

❒মুদারাবা সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবের পার্থক্য [২]

	মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব		মেয়াদি হিসাব
১.	হিসাব খোলার সময় পরিচিতির প্রয়োজন হয়।	১.	পরিচিতির প্রয়োজন নেই।
২.	গ্রাহককে চেক বই দেয়া হয়।	২.	গ্রাহককে চেক বই দেয়া হয় না।
৩.	এ হিসাবের কোনো মেয়াদকাল নেই।	৩.	এ হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদকাল আছে।
৪	এ হিসাব থেকে সপ্তাহে অন্তত দু'বার টাকা উঠানো যায়।	৪	এ হিসাব শেষে বা তার আগে এ হিসাবের টাকা একসাথে উঠানো যায়।

---

১. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত সংগ্রহের ওপর প্রকাশিত ম্যানুয়েল বার্ষিক প্রতিবেদন ও পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. প্রাগুক্ত.

৩. প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকেই জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকিং খাতে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং আমানত ঋণের সুদ হারের ব্যাপ্তির নিম্নমুখী প্রবনতা। ব্যাংকগুলোর আমানত, ঋণ, মূলধন পর্যাপ্ততা, শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের হার, মুনাফা ও উপার্জনশীলতা সকল সূচকই ইতিবাচক। ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ব্যাংকগুলোর আমানত ও ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪০২.২০% ও ৩৮১.৮২%। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার প্রসার ও আমদানি-রফতানি উভয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকসমুহ তাদের মূলধন ও আমানতকারীদের অর্থ ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে বিগত তিন দশকে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত, প্রচলিত সুদনির্ভর ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কর্মকৌশল ও অর্থায়ন পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ায় এই বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়।

যাহোক, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন, শাখা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ, আয় ও মুনাফা অর্জন, খাতওয়ারী বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ ও গৃহীত প্রকল্প সমূহের সাফল্য প্রভৃতি কার্যক্রমের ওপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হল :

❒ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে একটি পাবলিক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ৩০ মার্চ ১৯৮৩ সাল থেকে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক, যা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি। এর মূলধনের অংশীদারিত্বের শতকরা ৫৮ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি উদ্যোক্তা রয়েছে। শতকরা ৪২ ভাগ মূলধনের অংশীদার হচ্ছেন বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডারগণ। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ শেষে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রির্জাভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে : ২০০০০ মিলিয়ন টাকা, ১০০০৮ মিলিয়ন টাকা ও ১৮৯৯৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামি শরিআহ্‌ভিত্তিতে পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে একটি 'শরিআহ্‌ সুপারবাইজারি কমিটি রয়েছে।

❒আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৪২২৩৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৪৪৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ২৯৭৭৪৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৬০০০ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৭৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৩০৮৭০০ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে শেষে ব্যাংকের ঋণ অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩০৫৮৪০ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩২৭০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭১৬০৫৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমান ছিল যাথাক্রমে ১৭৮২৪৪ মিলিয়ন টাকা, ৩০১২০৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২৩৬৬০৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটি ১৮৮৬৩৮ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ ছিল ৪৮৪২৩ মিলিয়ন টাকার, ৬৪২৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং ৭৫৯৫৮ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১ এ সন্নিবেশিত হলো: [১]

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা সারণি -১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	২০০০০	২০০০০	২০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭৪১৩	১০০০৮	১০০০৮	১০০০৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬০৮১	১৮৯৯৪	২০৭০৫	২৩৬২৩
৪।	মোট আমানত	২৯১৯৩৫	৩৪২২৩৮	৩৫৬০০০	৩৭০০০০
	ক) তলবি আমানত	৩৭৮৮১	৪৪৪৮৯	৪৭৩০০	৪৯৬০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৫৪০৫৪	২৯৭৭৪৯	৩০৮৭০০	৩২০৪০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬৩২২৫	৩০৫৮৪০	৩২৭০০০	৩৪৫০০০
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৪৬৫৬	৫১২১	৫৬৮২	৬০০০
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকারা হার	১.৭৭	১.৬৭	১.৭	১.৭৪
৮।	বিনিয়োগ	১২২৯৬	১৬৯৩২	১৭৩০০	১৭৮০০
৯।	মোট পরিসম্পদ	৩৩০৫৮৬	৩৮৯১৮৮	৪০৩৭০০	৪১৮২০০
১০।	মোট আয়	৩০১২৯	৩৮৪০১	১১১৭৫	২২৪০০
১১।	মোট ব্যয়	২০৫৫৯	২৬১৫১	৭১৭৫	১৪৩০০
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	৯৫৭০	১২২৫০	৪০০০	৮১০০
১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৬০৯৭৩১	৭০৬০৫৮	১৮৮৬৩৮	৩৭৭২৭৬
	ক) রপ্তানি	১৪৮৮২১	১৭৮২৪৪	৪৮৪২৩	৯৬৮৪৬
	খ) আমদানি	২৪৬২৮১	৩০১২০৭	৬৪২৫৭	১২৮৫১৪
	গ) রেমিট্যান্স	২১৪৬২৯	২৩৬৬০৭	৭৫৯৫৮	১৫১৯১৬
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১০৩৫০	১১৪৬৫	১১৫১০	১১৭৬১
	ক) কর্মকর্তা	৮২৪৬	৯১৫৩	৯১৭৪	৯৩৭৪
	খ) কর্মচারি	২১০৪	২৩১২	২৩৩৬	২৩৮৭
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৩২	৯৪০	৯৪৫	৯৫০
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	২৫১	২৬৬	২৬৬	২৭৫
	ক) বাংলাদেশে	২৫১	২৬৬	২৬৬	২৭৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

১. সারণী-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯

Islami Bank Bangladesh, Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

❐ খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০১১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৩৬৫৫৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪৯৪৬৫০ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৬০৯১ মিলিয়ন টাকা ও ২৯৩৫৯০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৫০৬০ মিলিয়ন টাকা ও ১৫২৮৮০ মিলিয়ন টাকা এবং খাত দু'টিতে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭১৭ মিলিয়ন টাকা ও ১৫৫৮২৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতভিত্তিক ঋণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ২ এ উল্লেখ করা হলো।

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি -২ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	৪৮৯০	২১০৪৯	৯৯৭৩৯	১২০৭৮৮	১৯০৪১৩	৩১৬০৯১
	আদায়	৪৭৫৬	২০২২৫	৯৪০৩৪	১১৪২৫৯	১৭৪৫৭৫	২৯৩৫৯০
২০১১	বিতরণ	৫০৬০	৫৪৪১৩	৯৮৪৬৭	১৫২৮৮০	২০৭৬১৬	৩৬৫৫৫৬
	আদায়	৫৭১৭	৫৩১১৪	১০২৭১৩	১৫৫৮২৭	২৩৩১০৬	৩৯৪৬৫০
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	৭৫০৩	৫৭১৩৪	১০৩৩৯০	১৬০৫২৪	২০৮৩০৪	৩৭৬৩৩১
	আদায়	৭৫৫৩	৫৫৭৭০	১০৭৮৪৯	১৬৩৬১৯	২৩৫৬৫৮	৪০৬৮৩০
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	১০০১৫	৫৯৯৯০	১০৮৫৬০	১৬৮৫৫০	২১৪৪৪৬	৩৯৩০১১
	আদায়	৯০১৪	৫৮৫৫৮	১১৩২৪১	১৭১৭৯৯	২৪৫২৭৫	৪২৬০৮৮

❐ শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ বিনিয়োগ মুঞ্জুরী

২০১১ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০৮টি প্রকলেপর জন্য ৫৮১৬০ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্পের জন্য ২৬৫৩১ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১২সালের প্রথম তিন মাসে মোট ১০৪ টি প্রকল্পে ১৪৫০০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুর সারণি ৩ এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) মঞ্জুরী সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৫৯৪	৮৩২	--	১৪২৬
পরিমাণ	২১৬৮৮৭	৩৪২৭৭	--	২৫১১৬৪
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্প সংখ্যা	৪২	২৬৬		৩০৮
পরিমাণ	২৬৫৩১	৩১৬২৯	--	৫৮১৬০

Dhaka University Institutional Repository

			--	
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৬১০	৯২০	--	১৫৩০
পরিমাণ	২২৩৪৮৭	৪২১৭৭	--	২৬৫৬৬৪
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৮৮	--	১০৪
পরিমাণ	৬৬০০	৭৯০০	--	১৪৫০০
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৩০	১৫০	--	১৮০
পরিমাণ	১৩২৬৬	১৫৮১৫	--	২৯০৮১

❒ বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান

২০১১ সাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মোট বিনিয়োগের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০৫৮৪০ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সাল শেষে ছিল ২৬৩২২৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৬০২৩ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৮০৭৮১ মিলিয়ন টাকা, ব্যবসা বাণিজ্য খাতে ৯৮০৪০ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগয়োগ খাতে ৬৫১৩ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৬৩০০৮ মিলিয়ন টাকা, র্নিমাণ খাতে ১৭১১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি বিদ্যমান ছিল। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি সারণি ৪ এ এবং ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১২ সালের বিনিয়োগের খাতভিত্তিক মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণী-৫ এ দেয়া হল:

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি — সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৫৩৮০	৬০২৩	৭৫০০	৮০০০
	ক) শস্য	৩৯১০	২৪৬০	৩০০০	৩৪০০
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৪০	২৩৪১	২৯৫০	৩০০০
	গ) মৎস	৩৯০	৫১১	৭৫০	৭৮০
	ঘ) বনায়ন	৫৪০	৭১১	৮০০	৮২০
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	৮০০৪৮	৮০৭৮১	৮৭৬৬০	৯০২৫০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৭৮৪৬১	৭৯৫৪৬	৮৬৩২০	৮৮৭৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫৮৭	১২৩৫	১৩৪০	১৫০০
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৬৭৬০১	৬৩০০৮	৬৯৫০০	৭১৫০০

Dhaka University Institutional Repository

৪ ।	নির্মাণ	১২৭৪৬	১৭১১৩	১৮৫০০	১৯২০০
৫ ।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২৫০০	৪৩৮৪	৪৮৫০	৫০০০
৬ ।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫১৫২	৬৫১৩	৭০৫০	৭২৫০
৭ ।	ব্যবসা বাণিজ্য ক) পাইকারি ও খুচরা খ) রপ্তানি গ) আমদানি ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	৮৮০৭৪ ৬০২৬৯ ৫৪৭২ ২২৩২৩ ১০	৯৮০৪০ ৬৫০৭৫ ৭২১৯ ২৫৭০৩ ৪৩	১০৮৫০০ ৭২০৫০ ৭৯৫০ ২৮৪৫০ ৫০	১১২৪১০ ৭৫০০০ ৮১৫০ ২৯২০০ ৬০
৮ ।	দারিদ্র বিমোচন	১৭২৪	১৬৬০	১৮৪০	১৯৫০
৯ ।	অন্যান্য	০	২৮৩১৮	২১৬০০	২৯৪৪০
	সর্বমোট =	২৬৩২২৫	৩০৫৮৪০	৩২৭০০০	৩৪৫০০০

মুনাফার হার (%) সারণি -৫
(মিলিয়ন টাকায়)

সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৫.৩০	৩.৫০	৯.০০	৬.২৫	১১.৫০%	১১.৫০%	১১.৫০%	১১.৫০%
২০১১	৫.৩৫	৫.০০	১০.০০	৭.৫০	১০.৫০% ১৩.৫০%	১১.৫০%- ১৪.৫০	১১.৫০% ১৩.৫০%	১২.৩৩%
৩১ মার্চ ২০১২	৫.৫০	৫.০০	১১.০০	৮.৭৫	১৩.০০%	১৩.৫%- ১৪.৫০%	১০.৫০% ১৪.৫০%	১৩.১৭%
৩০ জুন ২০১২	৫.৫০	৫.০০	১১.০০	৮.৭৫	১৩.০০%	১৩.৫%- ১৪.৫০%	১০.৫০% ১৪.৫০%	১৩.১৭%

◈ সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ অন্যান্য কর্মসূচি

- দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য-বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী এলাকার গরিব সম্বলহীন মানুষের জন্য কৃষি ও অকৃষি খাতে বিনিয়োগ সীমা ১৫ (পনের) হাজার টাকা হতে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা নির্ধারণ;
- এমইআইএস খাতে বিনিয়োগ সীমা ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা হতে ৩ (লাখ) টাকা নির্ধারণ;
- স্বল্প শিক্ষিত বেকার কৃষিকর্মে নিয়োজিত ব্যাক্তিবর্গকে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ঋণ প্রদান;
- সীমিত আয়ের মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্তে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত সুযোগ সৃষ্টি ;
- দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনা জামানতে ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা থেকে ২৫ (পঁচিশ) লাখ পর্যন্ত বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি;
- ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা বিনিয়োগ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার লক্ষ্যে বিনা জামানতে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং
- পরিবহন ও গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ প্রদান ইত্যাদি।

❒ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড (সাবেক আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড) একটি ইসলামিক শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক, যা ২০ মে ১৯৮৭ থেকে তফসিলি বাংক হিসেবে বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১১-এর ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ১৫০০০ মিলিয়ন টাকা ও পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬৬৪৭ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত, ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১২৬১৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা ও ১১৯৩১ মিলিয়ন টাকা । মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২২৮৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৬৭০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১১৬১৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৪২২২ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ১৪২৯৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংক ৯৫৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিট্যান্স এর পরিমাণ যথাক্রমে ২১ মিলিয়ন টাকা, ৫৪৯ মিলিয়ন টাকা ও ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৫২২ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৪ মিলিয়ন টাকা, ৩৯০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৮ মিলিয়ন টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১ দেখানো হলো।[১]

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা — সারণি -১ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩
৪।	মোট আমানত	১৩৫৯৩	১২৬১৯	১২২৮৫	১৩৮২০
	ক) তলবি আমানত	১০৫৯	৬৮৮	৬৭০	৭৫৪
	খ) মেয়াদি আমানত	১২৫৩৪	১১৯৩১	১১৬১৫	১৩০৬৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৯০৪	১৪২২২	১৪২৯৫	১৪৮৮০
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৮৫৬৫	৮১৪৫	৮৩৯২	৭৩২৯
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	৬১.৬০	৫৭.২৭	৫৮.৭০	৪৯.২৫
৮।	বিনিয়োগ	১৩	১১	১১	১৩
৯।	মোট পরিসম্পদ	৪৬৬	৩৯৭	৩৫৬	৪৪৫
১০।	মোট আয়	৫০৬	৫৬৬	৪৫৩	৫২৯
১১।	মোট ব্যয়	৫৬৫	৫৩৬	৪৩৬	৫০৪
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	(৫৯.০০)	৩০.১২	১৭.০০	২৫.০০
১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৪৮১	৯৫৫	৫২২	৬০৪
	ক) রপ্তানি	১৩৯	২১	৮৪	৯৩
	খ) আমদানি	১০০	৫৪৯	৩৯০	৪২৯
	গ) রেমিট্যান্স	২৪২	৩৮৫	৪৮	৮২
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	৬৮১	৬৬৬	৬৭৩	৬৯০
	ক) কর্মকর্তা	৪৫৯	৪৪৬	৪৫৩	৪৭০
	খ) কর্মচারি	২২২	২২০	২২০	২২০
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৩	১৩	১৩	১৩
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
	ক) বাংলাদেশে	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯
ICB Islamic Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

❒ খাতভিত্তিক ঋণ বিরতণ ও আদায়

আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড ২০১১ সালে ১১৩১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৮১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। এ সময় বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৪২৩ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ এবং ৭০৮ মিলিয়ন টাকা ছিল অন্যান্য ঋণ।

আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২ এ উল্লেখ করা হলো : [১]

খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি -২ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	-	৬৩০	১৬৭	৭৯৭	৬৪২	১৪৩৯
	আদায়		৫৫৯	২৫৮	৮১৭	২২৩৭	৩০৫৪
২০১১	বিতরণ	-	২৫০	১৭৩	৪২৩	৭০৮	১১৩১
	আদায়		১৯৭	১৮১	৩৭৮	৪৩৬	৮১৪
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	-	১০০	৭৬	১৭৬	১২০	২৯৬
	আদায়		৮৫	৭০	১৫৫	১০৮	২৬৩
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	-	১৭০	১৫০	৩২০	৩০০	৬২০
	আদায়		১৬৫	১৪২	৩০৭	২৮০	৫৮৭

❒ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী : আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ শুরু থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ৪৬৬টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০৭৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে ২৫০৪ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৫৭৫ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ মঞ্জুর করে। ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি ৩ এ উল্লেখ করা হলো :

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৭০	১৯৩	--	৪৬৩
পরিমাণ	২৪৯৩	৫৭২	--	৩০৬৪
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৩	০	--	৩
পরিমাণ	১৯	০	--	১৯
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৭৩	১৯৩	--	৪৬৬
পরিমাণ	২৫০৪	৫৭৫	--	৩০৭৯
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	--	-
পরিমাণ	-	-	--	-
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১২	--	২০
পরিমাণ	৮০	৩	--	৮৩

Dhaka University Institutional Repository

❒ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০১১ শেষে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২২২ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সাল শেষে ছিল ১৩৯০৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি, মৎস ও বনায়ন খাতে ৩০ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ২২১৩ মিলিয়ন টাকা, ব্যবসা বাণিজ্য খাতে ৫০৬৪ মিলিয়ন টাকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৫১১ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৮৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি বিদ্যমান ছিল। আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের ঋণের স্থিতি সারণি ৪ এ এবং ২০১০ সাল থেকে জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৫ এ দেয়া হলো।

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৩২	৩০	৩০	৩১
	ক) শস্য	২২	২০	২০	২১
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	-	-	-
	গ) মৎস	৬	৪	৪	৪
	ঘ) বনায়ন	-	৬	৬	৬
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	১৭৩৪	২২১৩	২২২৪	২৩১৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৪৮	১৬৪১	১৬৫০	১৭১৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৮৬	৫৭২	৫৭৫	৫৯৮
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	১১৩০	৮৫১	৮৫৫	৮৯০
৪।	নির্মাণ	-	২০৮৭	২০৯৮	২১৮৩
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	-	-	-	-
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৩০	৫১১	৫১৪	৫৩৫
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য	৬৬৪০	৫০৬৪	৫০৯০	৫২৯৭
	ক) পাইকারি ও খুচরা	৩৬৬১	২৮৮১	২৮৯৬	৩০১৪
	খ) রপ্তানি	৪৭৩	৫৬০	৫৬২	৫৮৫
	গ) আমদানি	২৫০৬	১৬২৩	১৬৩২	১৬৯৮
	ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	-	-	-	-
৮।	দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
৯।	অন্যান্য	৩৮৩৮	৩৪৬৬	৩৪৮৪	৩৬২৯
	সর্বমোট =	১৩৯০৪	১৪২২২	১৪২৯৫	১৪৮৮০

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফার হার (%)								সারণি -৫ (মিলিয়ন টাকায়)
সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৬.০০	৬.০০	৮.৫০	৮.৬৫	১২.০০	১৫.০০	১৬.০০	১৫.৬৪
২০১১	৫.০০	৬.০০	১২.০০	৯.২৭	১৩.০০	১৩.০০	১৭.৫০	১৪.৫০
৩১ মার্চ ২০১২	৫.০০	৫.০০	১২.৫০	৯.৬৩	১৫.০০	১৮.০০	১৮.৫০	১৭.১৭
৩০ জুন ২০১২	৫.০০	৫.০০	১২.০০	৯.৫৬	১৩.০০	১৬.৫০	১৮.০০	১৫.৮৩

Dhaka University Institutional Repository

❒ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ থেকে ইসলামি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ইসলামি শরীআহ্ভিত্তিক পরিচালিত এ ব্যাংক সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ব্যাংক। ২০১১ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন, এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন টাকা, ৫৮৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৮৩৮ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত, ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি:-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৪৭১১ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৫০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ২৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯২৫০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭৩৪৩৪ মিলিয়ন টাকা। যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮৮৬০০ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম গতিধারা সারণি ১ এ দেখানো হলো।[১]

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা সারণি -১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৬৭৭	৫৮৯৩	৫৮৯৩	৭০৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩০০১	৩৮৩৮	৩৩০০	৩৫০০
৪।	মোট আমানত	৫৮৬৫৪	৮৪৭১১	৯৫০০০	১০০০০০
	ক) তলবি আমানত	৬৩৮৭	২১৬২	২৫০০	২৭০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৫২২৬৭	৮২৫৪৯	৯২৫০০	৯৭৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৩৫৮৩	৭৩৪৩৪	৮৮৬০০	৯০০০০
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৬১০	৭৫১	৭৫০	৭০০
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	১.১৮	০.৯৫	০.৯৪	০.৯০
৮।	বিনিয়োগ	২১৭৮.৮৩	৩৬২৯	৩৮০০	৩৮৫০
৯।	মোট পরিসম্পদ	৭৪০০৫	১০৩৫১৯	১০৫০০০	১০৬০০০
১০।	মোট আয়	৭৬২৩	১০৬৬৭	২৭৫৮	৫৫২০
১১।	মোট ব্যয়	৪৪৬২	৭০১২	১৭৯৭	৩৫৯৫
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	৩১৬১	৩৬৫৫	৯৬১	১৯২৫
১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৯২৪০৮	১৩৫১৯০	৩৩৯২৪	৬৭৮৪৮
	ক) রপ্তানি	৩২০৪২	৫২২০২	১২৭৩০	২৫৪৬০
	খ) আমদানি	৫৫৯৩৪	৭৬১১২	১৯২৯৫	৩৮৫৯০
	গ) রেমিট্যান্স	৪৪৩২	৬৮৭৬	১৮৯৯	৩৭৯৮
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১৭১১	১৮৪২	১৯২০	১৯৫০
	ক) কর্মকর্তা	১৪৮৫	১৫৮৯	১৭৬১	১৬৭৫
	খ) কর্মচারি	২২৬	২৫৩	১৫৯	২৭৫
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক	১৯	১৯	১৯	২০
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৭৮	৮৮	৮৮	৯২
	ক) বাংলাদেশে	৭৮	৮৮	৮৮	৯২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯

Al-Arafah Islamic Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

❒ খাতভিত্তিক বিনিয়োগ/ঋণ বিতরণ ও আদায়

আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি: ২০১১ সালে ৫১১৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৮৪৯৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৯৪৫৪ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ, ৪২৩ মিলিয়ন টাকা ছিল কৃষি ঋণ এবং ৪১২৫৩ মিলিয়ন টাকা ছিল অন্যাণ্য ঋণ । আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি: এ খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২ এ দেয়া হলো।

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) বিতরণ ও আদায় — সারণি -২ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	৫২	২০২৮	২৫২৭	৪৫৫৫	৩৮১২৫	৪২৭৩২
	আদায়	২১৩	৬২৫	১০২৫	১৬৫০	৩২১৫	৫০৭৮
২০১১	বিতরণ	৪২৩	৪২১৮	৫২৩৬	৯৪৫৪	৪১২৫৩	৫১১৩০
	আদায়	২২৩	২৩১৪	২১৩৬	৪৪৫০	৩৮২৫	৮৪৯৮
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	৩৮	১২৫৩	১৪২৫	২৬৭৮	৯০৫০	১১৭৬৬
	আদায়	২৮	৬৭৯	৯৪৫	১৬২৪	৭০৫০	৮৭০২
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	৮০	১৫০০	২৫০০	৪০০০	৯০০০	১৩০৮০
	আদায়	৬০	১২০০	১০০০	২২০০	৮০০০	১০২৬০

* সাময়িক।** প্রাক্কলিত।

❒ শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ শুরু থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ২৪৭০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩১৮০ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিযোগ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ১৬২৪৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৬৯৩৫ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। শুধু ২০১১ সালে এ ব্যাংক ৪২০ টি প্রকল্পে ৯৭৮৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ৯২৬৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ মঞ্জুরী সারণি ৩ এ দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) মঞ্জুরী সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				২৩৩০
প্রকল্প সংখ্যা	৮২০	১৫১০	-	২২০৪৩
পরিমাণ	১৫৭১৮	৬৩২৫		
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত			-	
প্রকল্প সংখ্যা	১৬৬	২৫৪		৪২০
পরিমাণ	৯২৬৫	৫২৪		৯৭৮৯
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৮৭০	১৬০০	-	২৪৭০
পরিমাণ	১৬২৪৫	৬৯৩৫		২৩১৮০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৫০	৯০	-	১৪০
পরিমাণ	৫২৭	৬১০		১১৩৭
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	১০০	১৫০	-	২৫০
পরিমাণ	৩০০০	১০০০		৪০০০

❐ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের/ঋণের স্থিতি

২০১১ সাল শেষে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি: এর মোট বিনিয়োগের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩৪৩৪ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সাল শেষে ছিল ৫৩৫৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে বৃষি, মৎস্য ও বনায়ন খাতে ৩২২২৯ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২২৩১ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৯৭৮৮ মিলিয়ন টাকা, র্নিমাণ কাতে ৬২৩৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের স্থিতি বিদ্যমান ছিল। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি: এর খাতভিত্তিক বিনিয়েগের স্থিতি সারণি ৪ এ, এবং ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান শতকরা মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৫ এ উল্লেখ করা হল :

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের (ঋণ) স্থিতি সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৪২৮	৬২৯	৬৬২	৬৬৫
	ক) শস্য	৩৩০	২৭০	২৮৯	২৯০
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩০	২৫৫	২৬২	২৬৫
	গ) মৎস	৬৮	১০৪	১১১	১১০
	ঘ) বনায়ন	-	-	-	-
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	২১৫৯৭	২২০৪৩	২৩১৮০	২৩৩০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫৪১৮	১৫৭১৮	১৬২৪৫	১৬৩০০

Dhaka University Institutional Repository

	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬১৭৯	৬৩২৫	৬৯৩৫	৭০০০
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৬৫১৬	৯৭৮৮	৯৭৯৮	৯৮০০
৪।	নির্মাণ	৫২৬৬	৬২৩৫	৬২৩৯	৬৩০০
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২৩০	২৪৫	২৫৫	২৬০
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭৫৬	২২৩১	২২৩২	২২৫০
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য	১৭৭৭৫	৩২২২৯	৪৬১৯৪	৪৭৩৮০
	ক) পাইকারি ও খুচরা	১১০৪১	২১২৬৩	৩৫১০২	৩৫৩৬৪
	খ) রপ্তানি	৪৭৭৯	৭৮৫৪	৭৮৭৯	৮০০০
	গ) আমদানি	১৬৫১	৩১০২	৩১৯৮	৪০০০
	ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	৪	১০	১৫	১৬
৮।	দারিদ্র বিমোচন	১৫	৩৪	৪০	৪৫
৯।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট =	৫৩৫৮৩	৭৩৪৩৪	৮৮৬০০	৯০০০০

মুনাফার হার (%)

সারণি -৫

(মিলিয়ন টাকায়)

সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৪.০০	৩.৫০	১১.০০	৯.৮৭	১৩.০০	১৩.০০	১০.০০-১৩.০০	১১.৯৭
২০১১	৪.০০	৩.৫০	১২.০০	১১.০৮	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০-১৬.০০	১৪.১৩
৩১ মার্চ ২০১২	৪.০০	৩.৫০	১২.৫০	১১.২০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০-১৬.০০	১৪.২০
৩০ জুন ২০১২	৪.০০	৩.৫০	১২.৫০	১১.৩০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০-১৬.০০	১৪.৩০

* সাময়িক ।** প্রাক্কলিত ।

Dhaka University Institutional Repository

❒ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) "দরদি সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ" এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ১৯৯৫ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংক লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মানিত গ্রাহকগণকে সুদমুক্ত আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করছে। এসআইবিএল সারা দেশে ৭৬টি শাখার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল গ্রাহকের জন্য আর্কষণীয় আমানত ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে। ২০১১ সাল শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬৩৯৪ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০ সালে ছিল ২৯৮৮ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত, ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে এসআইবিএল এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৬৮৫২ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলভি আমানত ১০০৬৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৫৬৭৮৪ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৮৬৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ১৩০৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৫৭৭৮৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৩৯০৯ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫৮২৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৮৩০৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমাদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮১৯৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৪৯৭৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৫১৩৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার পরিমাণ ৩১৮৪৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্স-এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০৯৮৪ মিলিয়ন টাকা ৯৬৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৮২ মিলিয়ন টাকা। এসআইবিএল-এর ব্যাংকিং কার্যক্রমসম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১ এ দেয়া হলো।

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা সারণি -১
(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৯৮৮	৬৩৯৪	৬৩৯৪	৬৩৯৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২১১	৩২৬৯	৩৬২৬	৪০০০
৪।	মোট আমানত	৪৪৮৫১	৬৬৮৫২	৭০৮৬৪	৭৬৫০০
	ক) তলবি আমানত	৮০৮২	১০০৬৮	১৩০৭৭	১৩৮০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৬৭৬৯	৫৬৭৮৪	৫৭৭৮৭	৬২৭০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৬৬৮০	৫৩৯০৯	৫৮২৩৯	৬৫০০০০
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৭৪৬	২১১৬	২২৫০	২২৫০
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	৪.৭৬	৩.৯৩	৩.৮৬	৩.৪৬
৮।	বিনিয়োগ	৩০৫০	৫২৪১	৫৪৫৯	৬০০০
৯।	মোট পরিসম্পদ	৫৫১৬৯	৮৪৩৮৪	৮৯২৫৩	৯০৫০০
১০।	মোট আয়	৫০৬৮	৮৫২৭	২৮১১	৬০০০
১১।	মোট ব্যয়	৩৪২৯	৫৯১৯	২০১৬	৪০০০
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	১৬৩৯	২৬০৮	৭৯৫	২০০০

Dhaka University Institutional Repository

১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৪৭৯৭০	১০৮৩০৮	৩১৮৪৪	৬৫৫০০
	ক) রপ্তানি	১৬৫৪০	৬৮১৯৯	২০৯৮৪	৪২০০০
	খ) আমদানি	২৯৯০০	৩৪৯৭৫	৯৬৭৯	১০০০০
	গ) রেমিট্যান্স	১৫৩০	৫১৩৫	১১৮২	১৩৫০০
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১০৮৬	১৩৭৫	১৩৮৬	১৩৮৬
	ক) কর্মকর্তা	৯৯৬	১২৫৩	১২৬৩	১২৬৩
	খ) কর্মচারি	৯০	১২২	১২৩	১২৩
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪২৭	৪২৭	৪২৭	৪৩০
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৬৪	৭৬	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৬৪	৭৬	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

❒ খাতভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

২০১১ সালে এসআইবিএল এর ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২১০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৯০০০ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০২০০ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালেল ৩১ মার্চ পর্যন্ত এসআইবিএল-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮২২৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৪৪১৬ মিলিয়ন টাকা। এসআইবিএল-এর ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত খাতভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২ এ উল্লেখ করা হলো :

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) বিতরণ ও আদায়

সারণি -২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	১১৮৭	৮৫৪৪	১০৬৮২	১৯২২৭	১৬৩২৭	৩৬৭৪০
	আদায়	৪৮৮	১৭০৯	৫৩৪১	৭০৫০	১২২৯১	১৯৮২৯
২০১১	বিতরণ	২১০০	১৩০০০	১৮০০০	৩১০০০	২৯০০০	৬২১০০
	আদায়	৮০০	২২০০	৮০০০	১০২০০	১৮০০০	২৯০০০
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	২৬৫৮	১৯১৪০	২৩৯২৮	৪৩০৬৮	৩৬৫৭২	৮২২৯৮
	আদায়	১০৯২	৩৮২৬	১১৯৬৮	১৫৭৯২	২৭৫৩০	৪৪৪১৬
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	৩০৫৬	২২০১০	২৭৫১৮	৪৯৫২৮	৪২০২৯	৯৪৬১৩
	আদায়	১২৫৮	৪৪০২	১৩৭৫৮	১৮১৬০	৩১৬৬০	৫১০৭৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❒ শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

এসআইবিএল ২০১১ সালে ২৪৩২টি শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৮৮৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করছে, যার মধ্যে ৪৫২টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১৮৭০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৮০ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১৭০০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। শুরু থেকে ২০১২ সালেল ৩১ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক ২৬৪৯টি প্রকল্পে মোট ২৩৩৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এসআইবিএল কর্তৃক শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী তথ্যাদি সারণি ৩ দেয়া হলো।

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯
Social Islamic Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) মঞ্জুরী সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪৫২	১৯৮০	-	২৪৩২
পরিমাণ	১৮৭০	১৭০০০	-	১৮৮৭০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৬২	১৫৫	-	২১৭
পরিমাণ	২৪০০	২১০০	-	৪৫০০
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৫১৪	২১৩৫	-	২৬৪৯
পরিমাণ	৪২৭০	১৯১০০	-	২৩৩৭০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৩২	১৬১	-	১৯৩
পরিমাণ	১৭৮০	১৯৫০	-	৩৭৩০
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৬৫	৯৬	-	১৬১
পরিমাণ	২৭০০	১৭৮০	-	৪৪৮০

❒ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) স্থিতি

খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখাযায়, ডিসেম্বর ২০১১ শেষে বিভিন্ন খাতে এসআইবিএল-এর মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৩৯০৯ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছির ৩৬৬৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ঋণের স্থিতির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য খাতে ২৪৭৭৭ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৬৪৪০ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৪৮৩৬ মিলিয়ন টাকা, নির্মাণ খাতে ১৭৮৬ মিলিয়ন টাকা, কৃষি ও মৎস্য খাতে ৫৪২ মিলিয়ন টাকা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৭২৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের স্থিতি বিদ্যমান ছিল। ব্যাংকটির অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি সারণি ৪ এবং ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত বিনিয়োগের খাতভিত্তিক অবদান এবং শতকরা মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৫ এ উল্লেখ করা হলো।

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের (ঋণ) স্থিতি সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৬২২	৫৪২	৬১৭	৭০০
	ক) শস্য	৭৫	১৬৫	১৮৮	২১৩
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৩৫	৩০৫	৩৪৭	৩৯৪
	গ) মৎস	১১২	৭২	৮২	৯৩
	ঘ) বনায়ন	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত) ক) বৃহৎ ও মাঝারি খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫০৬৪ ২৩৩১ ২৭৩৩	৬৪৪০ ৫৫৫৫ ৮৮৫	৭২৫০ ৬৩৫৩ ৮৯৭	৮৩০০ ৭৩১৮ ৯৮২
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৪৩৯৬	৪৮৩৬	৫০৭৮	৫২০০
৪।	নির্মাণ	১৬৩৭	১৭৮৬	১৮৫০	২০০০
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৯৫	৩১৩	৩৩৫	৩৬০
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬২১	৭২৯	৭৮৯	৮৫০
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য ক) পাইকারি ও খুচরা খ) রপ্তানি গ) আমদানি ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	১৪৩৮৩ ৯৫৬২ ১৭৮৯ ২৮১৮ ২১৪	২৪৭৭৭ ১৬৪৭২ ৩৩৮২ ৪৮৫৪ ৬৮	২৬৮৭৭ ১৭৮৬৮ ৩৩৪৩ ৫২৬৬ ৪০০	২৮০০০ ১৮৬১৫ ৩৪৮৩ ৫৪৮৬ ৪১৭
৮।	দারিদ্র বিমোচন	৩৬৬	৬১৮	৬৫০	৭০০
৯।	অন্যান্য	৯৪৯৮	১৩৮৬৮	১৪৭৯৩	১৮৮৯০
	সর্বমোট =	৩৬৬৮০	৫৩৯০৯	৫৮২৩৯	৬৫০০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

মুনাফার হার (%) সারণি -৫

(মিলিয়ন টাকায়)

সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৩.৫০	৩.০০	৮.০০ ১৩.০০	৬.৭৬	১০.০০	১৩.০০- ১৬.০০	১৩.০০- ১৬.০০	১৪.০৩
২০১১	৩.৫০	২.৭৫- ৩.৫০	১২.০০	৮.৭৯	১৩.০০	১৩.০০- ১৬.০০	১৭.৫০- ১৯.০০	১৩.৮৯
৩১ মার্চ ২০১২	৪.০০	৪.০০- ১০.০০	১২.০০	৯.৩৫	১৩.০০	১৫.৫০	১৭.৫০- ১৯.০০	১৩.৩৫
৩০ জুন ২০১২	৪.০০	৪.০০- ১০.০০	১২.৫০	৯.৪০	১৩.০০	১৫.৫০	১৭.৫০- ১৯.০০	১৩.৪০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

ইসলামী শরীআহ্ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংক হিসেবে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯৯ সালের ৩ আগষ্ট সাধারণ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ব্যাংকটি ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে সম্পূর্ণ ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য, তৈরি পোশাক শিল্প, গৃহায়ন, কৃষি, টেলিযোগাযোগ, রেমিট্যান্সসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকটি তার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেছে। ২০১১ সালে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৯২২৪ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সালে ছিল ৬৮৩২ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে এক্সিম ব্যাংক লিঃ এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৭৮৮১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ১৮৬১৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৮৯২৬৫ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৩৬৮৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ১৮১৯০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯৫৪৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৯৯৭০০ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮৯৭০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৪৪০৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২২২১৭ মিলিয়ন টাকা, ১২৮৪৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৭৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৭১৫৪৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রফতানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৯৯৪ মিলিয়ন টাকা, ৩৭৫০১ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৪৯ মিলিয়ন টাকা। এক্সিম ব্যাংক লিঃ এর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১ এ সন্নিবেশিত হলো :

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা সারণি -১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	২০০০০	২০০০০	২০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৮৩২	৯২২৪	৯২২৪	৯২২৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৬১৪	৫২৬১	৫৭৮৭	৬৯৪৪
৪।	মোট আমানত	৯৪৯৫২	১০৭৮৮১	১১৩৬৮৮	১১৮২৩৫
	ক) তলবি আমানত	১৪২৫৪	১৮৬১৬	১৮১৯০	১৮৩২৬
	খ) মেয়াদি আমানত	৮০৬৯৭	৮৯২৬৫	৯৫৪৯৮	৯৯৯০৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬৬১২৮	৯৯৭০০	৮৯৭০৬	৮৯৭০৬
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৮৫৫	১৬২৭	১৬২৭	১৬২৭
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার	১.৯৯	১.৬৩	১.৬৩	১.৬৩
৮।	বিনিয়োগ	৪৫২২	৭৬৫৪	৬৫৯৬	৭০৮৭
৯।	মোট পরিসম্পদ	১১৩০৪৭	১২৯৮৭৪	১৩৬৩৬৮	১৪৩১৮৭
১০।	মোট আয়	১৩৭৩৭	১৫৮০২	৫২৩৭	১০৬৮৭
১১।	মোট ব্যয়	৭৮৬২	১১৮৪৬	৩৮১১	৭৮২৯

Dhaka University Institutional Repository

১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	৫৮৭৬	৩৯৫৬	১৪২৬	২৮৪৯
১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	২২৭৯৬৭	২৫৪৪০৭	৭১৫৪৪	১৫৭১৮৭
	ক) রপ্তানি	৯৫৩৫৯	১২২২১৭	৩২৯৯৪	৭২৫৮৭
	খ) আমদানি	১২৯৫৭১	১২৮৪৪৬	৩৮৫০১	৮২৫০২
	গ) রেমিট্যান্স	৩০৩৬	৩৭৪৪	১০৪৯	২০৯৮
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১৬৮৬	১৭২৪	১৭১৪	১৮২৪
	ক) কর্মকর্তা	১৩৬৮	১৩৬১	১৩৫১	১৪৫৫
	খ) কর্মচারি	৩১৮	৩৬৩	৩৬৩	৩৬৯
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১৪	৩২৩	৩৩৫	৩৫০
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৫৯	৬২	৬২	৬৫
	ক) বাংলাদেশে	৫৯	৬২	৬২	৬৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❒ খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১১ সালে ১২০৮২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১১৯৮৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ২৪৫৯৬ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ, ৪৭২ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ এবং৯৫৭৫৭ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো।

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) বিতরণ ও আদায় সারণি -২ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	৩৫১	৯৮৪৮	১৪৫৩৩	২৪৩৮০	১০০৭৯৭	১২৫৫২৮
	আদায়	৪২৯	১১৫০৯	১৪৭২২	২৬২৩১	৮৫৩৯৫	১১২০৫৫
২০১১	বিতরণ	৪৭২	১০৫৫২	১৪০৪৪	২৪৫৯৬	৯৫৭৫৭	১২০৮২৪
	আদায়	৫১২	১০৪৪১	১৫৩৯৪	২৫৮৩৫	৯৩৫৩১	১১৯৮৭৮
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	১১১	১৬৩৬	৪৬৩০	৬২৬৫	১৪৮৪২	২১২১৮
	আদায়	১০২	১৯৮৪	৫৫৪২	৭৫২৬	২৩৫৮৪	৩১২১২
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	২২২	৩২৭১	৯২৫৯	১২৫৩০	৩৩৩৯৫	৪৬১৪৭
	আদায়	২০৩	৩৩৩৭	৯৪৪৪	১২৭৮১	৩৩৭২৯	৪৬৭১৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❒ শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

শুরু থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ১০৬৭টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬২৩২ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছেন, যার মধ্যে ৩৩৬৩০ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ২৬০৩ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মঞ্জুর করা হয়েছে। শুধু ২০১১ সালে এ ব্যাংক ১৯০টি প্রকল্পে ৩৬২৭ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে ৩১৯৬ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী তথ্যাদি সারণি ৩ এ উল্লেখ করা হলো :

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯
EXIM Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী				সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)
ঋণ মঞ্জুরী	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪৮৭	৫২৯	-	১০১৬
পরিমাণ	৩২৮৯৫	২৫১৬	-	৩৫৪১১
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৭৪	১১৬	-	১৯০
পরিমাণ	৩১৯৬	৪৩১	-	৩৬২৭
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৫০৬	৫৬১	-	১০৬৭
পরিমাণ	৩৩৬৩০	২৬০৩	-	৩৬২৩২
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	১৯	৩২	-	৫১
পরিমাণ	৭৩৫	৮৬	-	৮২১
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৪২	৬৯	-	১১১
পরিমাণ	১৪২৬	১৫৯	-	১৫৮৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❒ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০১১ সাল শেষে এক্সিম ব্যাংক লিঃ এর মোট বিনিয়োগের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯৭০০ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সাল শেষে ছিল ১৬৬১২৮ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ২১৩৪২ মিলিয়ন টাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে ৪৮৬৪৫ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১৮৫৩ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৭৫২৯ মিলিয়ন টাকা, নির্মাণ খাতে ৮৭৩৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের স্থিতি বিদ্যমান ছিল। এক্সিম ব্যাংক লিঃ-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি সারণি ৪ এবং মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৫ এ সন্নিবেশিত হলো :

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের (ঋণ) স্থিতি					সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)
ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৩৬০	৩৫৮	৪০৮	৪৫০
	ক) শস্য	১৭৫	২৫৫	২৭০	২৮০
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮১	১০০	১১০	১৩৫
	গ) মৎস	৩	৩	২৫	৩০
	ঘ) বনায়ন	১	১	৩	৫
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	১৮৩৯২	২১৩৪২	১৯৫৯৮	১৯৫৯৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৬৬১৭	১৯৪৯৬	১৭৯৩৬	১৭৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭৭৫	১৮৪৩	১৬৬১	১৬৬১
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৭৯৭৩	৭৫২৯	৬৭৭৬	৬৭৭৬
৪।	নির্মাণ	৮৪২৭	৮৭৩৩	৭৮৫৯	৭৮৫৯
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	০	০	০	০
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭৬০	১৮৫৩	১৬৬৭	১৬৬৭
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য	৫৪৪৪০	৪৮৬৪৫	৪৩৩৩৫	৪৩৩৩৫
	ক) পাইকারি ও খুচরা	১৫৭২৭	১৫৫৯৬	১৩৮৮০	১৩৮৮০
	খ) রপ্তানি	১৬৯৪০	১৩৩২২	১২৬৫৬	১২৬৫৬
	গ) আমদানি	২১৭৭৩	১৯৪২৭	১৬৫১৩	১৬৫১৩
	ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	০	৩০১	২৮৬	২৮৬
৮।	দারিদ্র বিমোচন	০	০	০	০
৯।	অন্যান্য	১৯৪৫	১১২৪০	১০০৬৩	১০০২১
	সর্বমোট =	১৬৬১২৮	৯৯৭০০	৮৯৭০৬	৮৯৭০৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

মুনাফার হার (%)

সারণি -৫

(মিলিয়ন টাকায়)

সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৪.০০	৩.০৪	৯.৭৫	৮.১৩	১০.০০	১২-১৬	১৩-১৬	১৩.১১
২০১১	৫.০৬	৩.২৫	১১.৯৪	৯.৭৬	১৩.০০	১২-১৭	১৩-১৭	১৩.৯৮
৩১ মার্চ ২০১২	৫.০০	৩.২৫	১১.৮৫	৯.৭৫	১৩.০০	১৩-১৭	১৩.১৭	১৪.১৫
৩০ জুন ২০১২	৫.০০	৩.২৫	১২.০০	৯.৮০	১৩.০০	১২-১৭	১৩.১৭	১৪.১৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু করেছে। ডিসেম্বর ২০০১ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যতাক্রমে ৪৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ৩২৪০ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত, ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর মোট আমানত ছিল ৭৮১৪৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৫০৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৭৩৬৪০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে মোট আমানত এর পরিমান দাঁড়িয়েছে ৮২৬৮৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৬৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৭৮০১০ মিলিয়ন টাক। ২০১১ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৬৯৪৬৭ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ১০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭৫১৫৮ মিলিয়ন টাক। ২০১১ সালে ব্যাংক ৪০৮০৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রপ্তানি ১০২৬০ মিলিয়ন টাক, আমদানি ২৯৫৩৪ মিলিয়ন টাকা ও রেমিট্যান্স ১০১১ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের প্রথম দিকে তিন মাসে ব্যাংকটি ৮৬৮০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রপ্তানি ১৯১০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬২৭০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিট্যান্স ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১-এ উল্লেখ করা হলো :

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকের গতিধারা — সারণি -১ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন' ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪৬০০	৪৬০০	৪৬০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩০৩৬	৩২৪০	৩৪০০	৩৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৭৯	১১২৭	১২১৬	১৪৩৪
৪।	মোট আমানত	৫৬৩৪৫	৭৮১৪৫	৮২৬৮৫	৮৬২৩১
	ক) তলবি আমানত	৩৭৫৫	৪৫০৫	৪৬৭৫	৪৮৭৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৫২৫৯০	৭৩৬৪০	৭৮০১০	৮১৩৫৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫২১২৪	৬৯৪৬৭	৭৫১৫৮	৭৯৬৫৩
৬।	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৩৬০	১৩৪০	১৩৪০	১৩৪০
৭।	শ্রেণীকৃত ঋণের শতকারা হার	২.৬১	১.৯৩	১.৭৬	১.৭৩
৮।	বিনিয়োগ	২৯৯৭	৩৯৭৭	৪১২৩	৪২০৫
৯।	মোট পরিসম্পদ	৬৩৬২০	৯০৯৫৬	৯৫৫০৪	১০২১৯০
১০।	মোট আয়	১০৯৪১	৯৪০৭	২৮০৬	৬০০৪
১১।	মোট ব্যয়	৯৭৩৭	৭৮১৭	২৫১৩	৫২৭৭
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	১২০৩	১৫৯০	২৯৩	৭২৭
১৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য	৩৫১০৩	৪০৮০৫	৮৬৮০	২০০০০
	ক) রপ্তানি	৫৮৬৯	১০২৬০	১৯১০	৩৯০০
	খ) আমদানি	২৮৩৯১	২৯৫৩৪	৬২৭০	১৫০০০
	গ) রেমিট্যান্স	৮৪৩	১০১১	৫০০	১১০০

Dhaka University Institutional Repository

১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১১৮৯	১৫৩৫	১৬৪৪	১৬৭৬
	ক) কর্মকর্তা	৯২৭	১২১৮	১২৯১	১৩১৬
	খ) কর্মচারি	২৬২	৩১৭	৩৫৩	৩৬০
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৪০	২০০	২০০	২০৫
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৬৬	৮৪	৮৪	৮৪
	ক) বাংলাদেশে	৬৬	৮৪	৮৪	৮৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❒ খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ ২০১১ সালে ৬৯৪৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৬৬০৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৫৩৬১ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ, ৩৯৩ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ এবং ৬৩৭১৩ মিলিযন টাকা অন্যান্য ঋণ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২ এ সন্নিবেশিত হলো :

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) বিতরণ ও আদায় — সারণি -২ (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০	বিতরণ	২৯৮	২৫২১	২৬২৪	৫১৪৫	৪৬৬৮১	৫২১২৪
	আদায়	১২	১৪৫	৪৪	১৮৯	৫৯৬১	৬১৬২
২০১১	বিতরণ	৩৯৩	২২৫৭	৩১০৪	৫৩৬১	৬৩৭১৩	৬৯৪৬৭
	আদায়	২১	৬৯৯	১০০৮	১৭০৭	৪৮৭৮	৬৬০৬
৩১ মার্চ ২০১২*	বিতরণ	৪৩৫	২৪১৫	৩১১৩	৫৫২৮	৬৯১৯৫	৭৫১৫৮
	আদায়	১৬	৭১৪	১১০২	১৮১৬	৪৮৮০	৬৭১২
৩০ জুন ২০১২*	বিতরণ	৪৭৬	২৬৭৭	৩৩৩৫	৬০১২	৭৩১৬৫	৭৯৬৫৩
	আদায়	২২	৭৩৩	১৩৪৫	২০৭৮	৪৭২৫	৬৮২৫

❒ শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ শুরু থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ৭২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪০০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে ২৩৪৭ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৯৩ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। শুধু ২০১১ সালে এ ব্যাংক ১৯টি প্রকল্পে ৬৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে, যার মধ্যে ৬০৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি ৩-এ সন্নিবেশিত হলো :

---

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯
First Security Islami Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী				সারণি -৩ (মিলিয়ন টাকায়)
ঋণ মঞ্জুরী	শিলেপর আকার		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪৩৯	২৫	-	৬৪
পরিমাণ	২১৬৮	৮৯	-	২২৫৭
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৭	১২	-	১৯
পরিমাণ	৬০৫	৬২	-	৬৬৭
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪৩	২৯	-	৭২
পরিমাণ	২৩৪৭	৯৩	-	২৪৪০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৪	৪	-	৮
পরিমাণ	১৭৯	৪	-	১৮৩
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	৩৩	-	৮২
পরিমাণ	২৫৫৫	৯৮	-	২৬৫৩

❒ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০১১ সাল শেষে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিৎ এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৯৪৬৭ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সাল শেষে ছিল ৫২১২৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩৯৩ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ২২৫৭ মিলিয়ন টাকা, ব্যবসা বাণিজ্য খাতে ৩৯৪০৪ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৮৫৪ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ৭৬৫০ মিলিয়ন টাকা, নির্মাণ খাতে ৭১৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি বিদ্যমান ছিল। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর খাতভিত্তিক ঋনের স্থিতি সারণি ৪ এবং ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৫ উল্লেখ করা হলো :

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের (ঋণ) স্থিতি					সারণি -৪ (মিলিয়ন টাকায়)
ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ ১২ (সাময়িক)	৩০ জুন ১২ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	২৯৮	৩৯৩	৪৩৫	৪৭৬
	ক) শস্য	১০	৩৯	৪৩	৪৯
	খ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮৬	২৪০	২৭৪	৩০২
	গ) মৎস	১০২	১১৪	১১৮	১২৫
	ঘ) বনায়ন	-	-	-	-
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	২৫২১	২২৫৭	২৪১৫	২৬৭৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৪৯৪	২১৬৮	২৩২২	২৫৭৯

Dhaka University Institutional Repository

	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৭	৮৯	৯৩	৯৮
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৬৪০১	৭৬৫০	৭৮২০	৭৯৭৫
৪।	নির্মাণ	৫০৩৩	৭১৯৩	৭২৩৫	৭২৫৪
৫।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	-	-	-	-
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪৯	৮৫৪	৯০৫	৯২৩
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য ক) পাইকারি ও খুচরা খ) রপ্তানি গ) আমদানি ঘ) হোটেল ও রেস্তোরা	২৭৫৮২ ১৬২৭৩ ৩৭২ ১০৯৩৭ -	৩৯৪০৪ ২৩৪৭৪ ৫৮৬ ১৫৩৪৪ -	৪০৬৬২ ২৪২৭৬ ৫৯৮ ১৫৭৮৮ -	৪৪০৫৫ ২৬৫৮৪ ৬২১ ১৬৮৫০ -
৮।	দারিদ্র বিমোচন	৫৭০	১০৭	১১৩	১১৯
৯।	অন্যান্য	৯৩৭০	১১৬০৯	১৫৫৭৩	১৬১৭৪
	সর্বমোট =	৫২১২৪	৬৯৪৬৭	৭৫১৫৮	৭৯৬৫৩

মুনাফার হার (%) সারণি -৫
(মিলিয়ন টাকায়)

সময়	আমানত				বিনিয়োগ (ঋণ) প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হিসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৬.৫০	৬.৫০	৯.৫০	৭.৮৩	১৩.০০	১৩.০০	১৪.৫০	১৩.৫০
২০১১	৬.৫০	১১.০০	১২.০০	৯.৮৩	১৩.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৫.০০
৩১ মার্চ ২০১২	৬.৫০	১১.০০	১২.০০	৯.৮৩	১৩.০০	১৪.০০	১৭.০০	১৪.৬৭
৩০ জুন ২০১২	৬.৫০	১১.০০	১২.০০	৯.৮৩	১৩.০০	১৪.০০	১৭.০০	১৪.৬৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাং লিমিটেড

দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নিমার্ণসহ কল্যাণমুখী আর্থ সামজিক সেবার লক্ষ্যে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১০ মে ২০০১ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং ইসলামী শরীআহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা থেকে আনুপাতিক হারে আমানতকারীদের মুনাফা প্রদান করা হয়। ২০১১ সাল শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে ৪৪৫৩ মিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সালে ছিল ৩৪২৫ মিলিয়ন টাকা।

❒ আমানত, বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য

২০১১ সাল শেষে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমান ছিল ৮৩৩৫০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৮৪৭৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৭৪৮৭৪ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১২ শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০৬৪১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানত ৯২১৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৮১৪২৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালের শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮০৫৯২ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০১২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮৭১৭৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৬৯০১ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯২২৪ মিলিয়ন টাকা, ৮২৩৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ৫৩৩৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৫৫৮০৪ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬৪০৫ মিলিয়ন টাকা, ২৮৬৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৭৪৩ মিলিয়ন টাকা। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় গতিধারা সারণি ১ এ দেয়া হলো : [১]

১. সারণি-১,২,৩,৪ ও ৫ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,যথাক্রমে ৭৪ ও ৭৯
Shajalal Islami Bank Ltd. Annual Report 2010, 2011 ও 2012 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১

ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় সূচকের গতিধারা (মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরন	২০১০	২০১১	৩১ মার্চ '১২ (সাময়িক)	৩০জুন'১২ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৪২৫	৪৪৫৩	৪৪৫৩	৫৫৬৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৩২২	৪৭৩৩	৫০৭৫	৪৫৬২
৪।	আমানত	৬২৯৬৫	৮৩৩৫০	৯০৬৪১	৯৭৯৩২
	ক) তলবি আমানত	৩৫১২	৮৪৭৬	৯২৭১	৯৯৫৯
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৯৪৫৩	৭৪৮৭৪	৮১৪২৪	৮৭৯৭৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬১৪৪০	৮০৫৯২	৮৭১৭৪	৯৩৭৯০
৬।	শ্রেনীকৃত ঋণের পরিমান	১১৭৩	১৫২৩	১৫৭৩	১৫১৩
৭।	শ্রেনীকৃত ঋণের শতকরা হার	১.৯১	১.৮৯	১.৮০	১.৬১
৮।	বিনিয়োগ	২২২৯	৫২৯২	৫৪৬৮	৫৬৪৩
৯।	মোট পরিসম্পদ	৭৮৮০০	১০৭২২৯	১১৭৯৩০	১২৮৬৩১
১০।	মোট আয়	৯৫০৯	১২০১২	৪১৭১	৮৩৪২
১১।	মোট ব্যয়	৫৯৮০	৯০০৯	৩১২৬	৬২৫১
১২।	পরিচালনাগত মুনাফা	৩৫২৯	৩০০৩	১০৪৫	২০৯১
১৩।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৫০৭৯	১৬৬৯০১	৫৫৮০৪	১১১৬০৬
	ক) রপ্তানি	৪৮৮৫৭	৭৯২২৪	২৬৪০৫	৫২৮১০
	খ) আমদানি	৬০০৬৬	৮২৩৪২	২৮৬৫৬	৫৭৩১১
	গ) রেমিট্যান্স	৬১৫৬	৫৩৩৫	৭৪৩	১৪৮৫
১৪।	মোট জনবল (সংখ্যায়)	১৬৭১	১৬২৪	১৮০৫	১৮৪৫
	ক) কর্মকর্তা	১২৮০	১১৫৪	১৩২৭	১৩৫৭
	খ) কর্মচারি	৩৯১	৪৭০	৪৭৮	৪৮৮
১৫।	বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১	৩৪	৩৪	৩৫
১৬।	মোট শাখা (সংখ্যায়)	৬৩	৭৩	৭৪	৭৪
	ক) বাংলাদেশ	৬৩	৭৩	৭৪	৭৪
	খ) বিদেশ	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

❒ খাতভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

২০১১ সালে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৭৯১৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্পে বিতরণ ১০৯০৮ মিলিয়ন টাকা ও কৃষি খাতে ১৮৭ মিলিয়ন টাকা) এবং এই সময় বিনিয়োগ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৩২৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৭৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্পে বিনিয়োগ ২৪২৯ মিলিয়ন টাকা ও কৃষি খাতে ৩৮৮ মিলিয়ন টাকা) শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২ এ উল্লেখ করা হলো :

সারণি-২

খাতভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায় (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০১০						
বিতরণ	১১০	২৭৭২	৮৪২৫	১১১৯৭	১৬৪৮৩	২৭৭৯০
আদায়	৭৯	১৪৩৩	৪২৬২	৫৬৯৫	৭৫০৪	১৩২৭৮
২০১১						
বিতরণ	১৮৭	২৬৯৭	৮২১১	১০৯০৮	১৬৮২৪	২৭৯১৯
আদায়	১১৪	১৫৩৩	৪০২৩	৫৫৫৬	৭৬২৮	১৩২৯৮
৩১ মার্চ ২০১২ *						
বিতরণ	৩৮৮	৭৩৪	১৬৯৫	২৪২৯	৩৭৬১	৬৫৭৮
আদায়	১৫	৩২৯	৮২৩	১১৫২	১৭৪৯	২৯১৬
৩০ জুন ২০১২ **						
বিতরণ	৬০০	২০০০	৪৫০০	৬৫০০	১০০০০	১৭১০০
আদায়	৪৫	৭৫০	২০০০	২৭৫০	৪০০০	৬৭৯৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❐ শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মুঞ্জুরী

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০১১ সাল ২৩৩টি শিল্প প্রকল্পের বিপরীতের মোট ১০০২১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করেছে, যার মধ্যে ৭৩টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ৯৮৭৩ মিলিয়ন টাকার এবং ১৬০টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১৪৮ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ করেছে। শুরু থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক ৬২৮টি প্রকল্পে মোট ৩৮৪০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ মঞ্জুর করেছে। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক শিল্পে আকারভিত্তিক বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি ৩-এ উল্লেখ করা হলো :

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ (ঋণ) মঞ্জুরী (মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিলোপর		অন্যান্য	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৯৪	২৮৬	-	৫৮০
পরিমাণ	৩৫৮৩৮	২৫২	-	৩৬০৯০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৭৩	১৬০	-	২৩৩
পরিমাণ	৯৮৭৩	১৪৮	-	১০০২১
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ মার্চ ২০১২ তারিখে *				
প্রকল্প সংখ্যা	৩১৫	৩১৩	-	৬২৮
পরিমাণ	৩৭৯৯৫	৪০৫	-	৩৮৪০০
১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত *				
প্রকল্প সংখ্যা	২১	২৭	-	৪৮
পরিমাণ	২১৫৭	১৫৩	-	২৩১০
১ জানুয়ারী হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত **				
প্রকল্প সংখ্যা	৫০	৭০	-	১২০
পরিমাণ	৫০০০	৪০০	-	৫৪০০

• সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

❐ অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক ঋণ স্থিতি

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেয়া যায়, ডিসেম্বর ২০১১ শেষে বিভিন্ন খাতে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৮০৫৯২ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৬১৪৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে মোট বিনিয়োগ স্থিতির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য খাতে ২৪৬৬৯ মিলিয়ন টাকা, চলতি মূলধনে অর্থায়ন খাতে ১৫৫৮২ মিলিয়ন টাকা, নির্মাণ খাতে৯৩৬৯ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত) ৮৫১৬ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২৮১৫ মিলিয়ন টাকা এবং কৃষি মৎস্য খাতে ৩৬২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ স্থিতি বিদ্যমান ছিল। ব্যাংকটির অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগ স্থিতি সারণি ৪ এবং ২০১০ সাল থেকে জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত মুনাফার হার সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫ এ সন্নিবেশিত হলো :

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বিনিয়োগের (ঋণ) স্থিতি সারণি-৪

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	খাত	২০১০	২০১১	৩১মার্চ'১৩ (সাময়িক)	৩০ জুন '১২ (প্রাক্কলিত
১।	কৃষি, মৎস্য বনায়ন	২৭০	৩৬২	৭৩২	৮৯০
	ক) শস্য	১৮	৫৭	৭১	৯০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২০৬	১৮৭	৫০৯	৬০০
	গ) মৎস্য	৪৬	১১৮	১৫২	২০০
	ঘ) বনায়ন	-	-	-	-
২।	শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	৬১৯৪	৮৫১৬	৯৩৭৪	১০৫০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬০২২	৮১৭৮	৮৯৪৭	১০০০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭২	৩৩৮	৪২৭	৫০০
৩।	চলতি মূলধনে অর্থায়ন	১১৯৯৪	১৫৫৮২	১৭৩৭৩	২০০০০
৪।	নির্মাণ	৬৮৬৩	৯৩৬৯	৯৮৭৮	১০৩৫০
৫।	বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৭১৪	১০২৫	১১৩৭	১৫০০
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৮৩৯	২৮১৫	২৯৮৩	৩১০০
৭।	ব্যবসা বাণিজ্য	১৭৮৬৯	২৪৬৬৯	২৬৭৮৮	২৮৪৫০
	ক) পাইকারি ও খুচরা	৬৩৬৯	৯৩৭৮	১০১১৭	১০৫০০
	খ) রপ্তানি	৪৪৯৭	৫২৭৩	৫৮২৪	৬৫০০
	গ) আমদানি	৬৩২০	৯০৮৬	৯৯২৩	১০৫০০
	ঘ) হোটেল / রেস্তোরাঁ	৬৮৩	৯৩২	৯২৪	৯৫০
৮।	দারিদ্রতা বিমোচন	১০৮	-	-	-
৯।	অন্যান্য	১৫৫৮৯	১৮২৫৪	১৮৯০৯	১৯০০০
	সর্বমোট	৬১৪৪০	৮০৫৯২	৮৭১৭৪	৯৩৭৯০

*সাময়িক। * প্রাক্কলিত।

মুনাফার হার (%) সারণি ৫

সময়	আমানত				ঋণ প্রদান			
	সঞ্চয়ী হিসাব	স্বল্প মেয়াদি হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদি হসাব	ভারীত গড় (Weighted Average)	কৃষি	শিল্প	সেবা	ভারীত গড় (Weighted Average)
২০১০	৪.০০	৩.৫০	১০.০০১৩.০০	৭.৯১	১১.০০	১৩.০০	১৪.০০	১১.৯০
২০১১	৪.০০	৩.৫০	১২.০০-১৪.০০	১০.০৬	১৩.০০	১৪.৫০	১৫.৫০	১৪.৮৯
৩১ মার্চ ২০১২*	৪.০০	৩.৫০	১২.৫০	১০.২৮	১৩.০০	১৫.৫০	১৬.০০	১৪.৯৮
৩০ জুন ২০১২**	৪.০০	৩.৫০	১২.৫০	১০.২০	১৩.০০	১৫.৫০	১৬.০০	১৪.৯০

*সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

Dhaka University Institutional Repository

❑ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ : পরিচিতি ও কার্যক্রম

'সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা / উইন্ডোধারী ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় অলাভজনক ইসলামী প্রতিষ্ঠান। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ এস-৯৯২২/০৯। ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পকে শরীআহর দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য ব্যাংকসমূহকে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং তাদের কার্যক্রম শরীআহর নিরীখে তত্ত্বাবধান করা এর মূল উদ্দেশ্য।

❑ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের ভিশন

⇒ বাংলাদেশে কমৃরত ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীআহ্ ও আইনের একই দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করাতে সামর্থ্যবান করা।

⇒ দেশের ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের চেষ্টা চালানো যাতে কল্যাণমুখী ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সামগ্রিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

⇒ ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিকশিল্পের ক্ষেত্রে একে একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শরীআহ্ রেফারেন্স সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

❑ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের মিশন

⇒ শরীআহ্ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বস্মৃত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরার্মশ প্রদান করা এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডে শরীআহ্ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা।

⇒ ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-র্জানাল সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ করা।

⇒ দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিকশিল্পের জন্য দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শরীআহ্ ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা।

⇒ ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক আর্থিক লেনদেন পরিচালনায় জনসাধারণের সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

❑ ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। এর অভাবনীয় সাফল্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও সহযোগিতায় এরপর থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন শরীআহ্ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়া দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংক তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা' চালু এবং কয়েকটি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রায় সামিল হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকান্ডের পরিসরও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে । ফলে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌর্হাদ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সম্মিলিতভাবে যৌথ ও একক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সময়ের অপরির্হায দাবিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরীআহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফাতওয়া) গ্রহণ ও বাস্তাবায়ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীআহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরীআহ্ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাপত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি আর্কষণ করে। নির্দেশনাপত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীআহ্ বোর্ড বা কাউন্সিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরীআহ্ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক সমাঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীআহ্ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয় একটি যৌথ শরীআহ্ বোর্ড (Common Shari' ah Board) গঠন করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।"

❒ কেন্দ্রীয় শরীআহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর একটি যৌথ শরীআহ্ বোর্ড বা সম্মিলিত শরীআহ বোর্ড গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্নভাবে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতঃপর ২০০১ ঈসায়ী সালের ১৬ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি যৌথ শরীআহ্ বোর্ড গঠনের একমত হয়। ঐতিহাসিক সে সভার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সেদিন-ই প্রতিষ্ঠিত হয়'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীআহ্ বোর্ড বা 'সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের শরীআহ্ কাউন্সিল/বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিববৃন্দ এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ পদাধিকারবলে 'সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ'-এর সদস্য। বর্তমানে এর সম্মিলিত সদস্যসংখ্যা ৫০ জন এবং সদস্য ব্যাংকের সংখ্যা ১৬ টি।

❒ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড-এর সদর্সব্যাংকসমূহ ঃ

০১. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০২. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
০৪. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
০৫. ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৬. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৭. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
০৮. এইচএসবিসি (আমানাহ শাখা)
০৯. এবি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১০. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১১. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১২. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৩. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৪. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৫. সাইথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৬. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (সাদিক শাখা)

Dhaka University Institutional Repository

❒ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড-এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় শরীআহ্ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাই সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ,শরীআহ্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ডে শরীআহ্ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-মতবিনিময় সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি।

❒ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবছর 'ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ড ক্রেস্ট সার্টিফিকেট এবং নগদ এক লক্ষ টাকা সম্মানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট বিষয়ে 'রচনা প্রতিযোগিতা' আহ্বান করা হয়। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় এবং উন্মুক্ত পর্যায়-এই তিন গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে নগদে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে।

৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী ও কর্মকর্তা, কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষক, মুফতী, ইমাম ও খতীবগণের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত ৫৯১ জন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণও রয়েছেন।

৪. প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন (খসড়া)' প্রণয়ন

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য প্রনীত 'ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১' দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথক আইন না থাকায় সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড একটি খসড়া 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন' প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে।

৫. আন্তঃইসলামী ব্যাংকমানি মার্কেট-এর নীতিমালার অনুমোদন

নীতিগতভাবে কোন ইসলামী ব্যাংকসমূহ তার তারল্যসংকট মোচনের জন্য প্রচলিত কলমানি মার্কেট থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের তারল্য সংকট বা উদ্বৃত্ত তারল্য পারস্পরিক সমঝোতা ও শরীআহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে যেন আদান-প্রদান করতে পারে সেজন্য সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড 'আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট'-এর নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

৬. ব্যাংকিং বিষয়ক শরীআহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়ন

শরীআহ্ভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর শরীআহ্ ম্যানুয়েল প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইসলামী ক্রেডিট কার্ড প্রচলন

সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলনের জন্য 'ইসলামী ক্রেডিট কার্ড' সম্পর্কে একটি 'রায়' প্রদান করেছে। আশা করা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে শীঘ্রই ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু হবে।

৮. মতবিনিময় সভা

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীআহ্ বোর্ড/কাউন্সিলের ফক্বীহ সদস্যবৃন্দকে একত্রীকরণ বা একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা হিসেবে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড-এর উদ্যোগে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে আসছে। ফক্বীহ্ সদস্যগণের মানোন্নয়ন, শরীআহ্ ব্যাংকিং বিষয়ে একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের এ ধরনের মতবিনিময় সভা ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯. সদস্য ব্যাংক সফর

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডের প্রতিনিধিদল বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকসমুহের প্রধান কার্যালয় সফর করে ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে আসছে। উক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ডে প্রতিনিধিদল ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবস্থান,অগ্রগতি সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিশেষ করে শরীআহ্ পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এ পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমপক্ষে একবার অনুরূপ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

❒ জেনারেল সেক্রেটারিয়েট

রাজধানীর ৫৫/বি, পুরানা পল্টনস্থ নোয়াখালী টাওয়ারের ১২ তলার সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অবস্থিত। বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল এর প্রধান নির্বাহি। তার অধীনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বাংলা-ইংরেজী-আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় দুই সহস্রাধিক পুস্তকের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে।

❒ সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড প্রকাশনা

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীআহ্ বোর্ড
- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা
- ইসলামে দারিদ্র বিমোচন
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ : করণীয় ও বাস্তবতা
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্ পরিপালন : করণীয় ও বর্জনীয়
- ইসলামী ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড জার্নাল
- ইসলামিক ফাইন্যান্স (বুলেটিন)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ইসলামী ব্যাংকটি বিগত ত্রিশ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে, যার সক্রিয় সহযোগিতায় আজকের মুসলিম দেশগুলো অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সাবলীল রয়েছে এবং যার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছে সেই ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank বা আইডিবি) সম্পর্কে এদেশে আলোচনা হয়েছে অতি অল্পই। মূলতঃ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো, যার অধিকাংশই মুসলিম, তাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে যে কয়টি আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর আজ খুব বেশী নির্ভরশীল ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক তাদের অন্যতম। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর (জিলক্বদ,১৩৯৩) মাসে সউদী আরবের জেদ্দায় মুসলিম দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ইসলামী মডেলের এই আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জেদ্দাতেই প্রস্তাবিত ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলী বা বোর্ড অব গর্ভনরসের উদ্বোধনী সভায় মুসলিম উম্মাহর আশা-আকাংখার প্রতীক ব্যাংকের উদ্বোধন করা হয়। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকটি কাজ শুরু করে ১৫ শাওয়াল, ১৩৯৫ (২০অক্টোবর, ১৯৭৫)।

উদ্দেশ্য

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. সুদবিহীন লেন-দেনবিনিয়োগ ও বাণিজ্য পরিচালনা;
২. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহে আর্থিক সহায়ক প্রদান;
৩. সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন;
৪. সদস্য দেশগুলোর সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ
৫. দেশ নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামজিক উন্নয়নের জন্যে যে কোন শরীআহ্সম্মত প্রয়াসেসহযোগিতা দান।

ব্যাংকের প্রধান অফিস সউদী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। যেকোন সদস্য দেশে আঞ্চলিক অফিস খুলবার জন্যে ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রধান অফিসের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে ইসলামী গবেষণাও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Islamic Research and Training Institute)। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ব্যাংকের তৎপরতা অব্যাহত রাখা ও পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যই এই ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালে মরক্কোর রাবাত ও ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ব্যাংকের দুটি আঞ্চলিক অফিস চালু হয়। মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকসমূহের সাথে আইডিবির ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের জন্যে ১৯৯৭ সালে কাজাখাস্তানের আলামাতায় খোলা হয়েছে তৃতীয় আঞ্চলিক অফিসটি। এছাড়া ইরান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখাস্তান, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, পাকিস্তান, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, সেনেগাল সুদান ও সিয়েরালিওনে মাঠ প্রতিনিধির অফিসও রয়েছে।

হিজরী সালই এই ব্যাংকের আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হয়। আরবী ভাষা ব্যাংকের সরকারী বা অফিসিয়াল ভাষা। এই ভাষাতেই ব্যাংকের সকল কাজ পরিচালিত হয়। তবে অধিকতর সুষ্ঠ সেবা প্রদান এবং সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্যে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাকেও 'কাজের ভাষা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের ৫৫টি দেশ এই ব্যাংকের সদস্য। শুরুতে বাইশটি দেশ মিলে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রিবা : পরিচিতি, শ্রেণীবিন্যাস ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

একটি শ্বাশত ও চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক রূপরেখা, নীতিমালা এবং সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বিধি-মালা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা চিন্তা-চেতনায় ও বাস্তব প্রয়োগে নীতি-নৈতিকতার শর্তারোপ করে। কারণ নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত অর্থব্যবস্থা মানব জাতিকে এক উদরসর্বস্ব প্রাণীতে পরিণত করে। সুতরাং মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম প্রদত্ত নৈতিক সীমারেখা ও বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ ও মেনে চলা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।[১]

মানব জীবনে অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের মূল উৎস সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল-কুরআন এমন কঠোর ভাষায় সুদের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে, সম্ভবত অন্য কোন অপরাধ বা গুনাহর ক্ষেত্রে এতটা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি।[২]

আল-কুরআনের মোট সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীস এবং ইজমা' দ্বারা সুদের অবৈধতা প্রমাণিত।[৩]

☐ রিবা'র আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক পরিচিতি

রিবা'র (ربا) শব্দটি আরবী ভাষায় সমার্থবোধক (مشترك) শব্দ। এর অর্থ হল; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, বিকশিত হওয়া, অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত প্রদান করা , সংখ্যাধিক্য বা ক্ষমতা প্রকাশ করা, ফুলে উঠা বা স্ফীত হওয়া শিশুর বেড়ে উঠা, মূল জিনিসের গানিতিক বৃদ্ধি, বরকতময় হওয়া ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচুঁ স্থান প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সবকয়টি অর্থ আরবী ভাষায় ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।[৪] আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পটুভূমি ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও রিবা শব্দটি বর্ণিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *গায়রে সূদী ব্যাংকারী* (করাচী: মাকতাবাতু মাআরিফুল কুর-আন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. আল্লামা ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫

৫. আল-কুরআন, ২২ : ৫, এ আয়াতে শব্দটি বিকশিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯ এবং ২: ২৭৬ এর দুটো আয়াতে রিবা শব্দটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-কুরআন, ৬৯ : ১০, এখানে অতিরিক্ত প্রধান অর্থ বুঝানো হয়েছে।

আল-কুরআন, ১৬ : ৯২ শক্তিশালী ক্ষমতাবান হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-কুরআন, ১৩ : ১৭, এখানে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচুঁ স্থান বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(সূত্র: তাফসীরে ইবন কাছীর, *তাফসীরে কুরতবী, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন* থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।)

Dhaka University Institutional Repository

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞ, ফকীহ্ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ রিবার অসংখ্য পরিচিতি,স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন । গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ইবনুল আরাবীর মতে, রিবা হল :[১] الز يادة علي اهل المال من غير تبا يع

আল্লামা আইনী বলেন,

"আমাদের মতাদর্শের অনুসারী ফকীহ্গণের মতে, "পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া মালের প্রবৃদ্ধিই হল রিবা"[২]

মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী এর মতে,[৩] والرباء الذي عليه عرف الشرع شيئان- تحري النساء والتفا ضل في العقودوفي المطعومات علي نبينه وغا لبه ما كانت العرب تفعله من قو لها للغريم- اتقضي ام تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطا لب عليه- وهذا كله محرم با تفا ق الا ئمة

ইবন হাজার আসকালানী-এর মতে , "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থ-ই রিবা"[৪]

রিবার পরিচিতি প্রসঙ্গে মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৫]

" كل زيادة مشرو طة في العقد خا لية عن عوض مشروعة-

ইমাম আবু বকর আল জাসসাস ও ফখরুদ্দীন আল- রাযী- এর মতে সুদ হল:[৬]

"هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال عليا المستقرض-

আশ-শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্-সাবূনী রিবার পরিচিতিতে বলেন,[৭]

وفي الشرع زيادة يا خذ ها المقرض من المستقرض مقا بل الاجل-

ড: সাইয়্যেদ আল হাওয়ারী এর মতে,[৮]

الزيا دة علي اهل الما ل من غير تبا يع-

---

১. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (আল-কাহেরা: ইসা'আল-বারী আল-হালবী এন্ড কো.১৯৬৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪২

২. বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৯৯

৩. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আজতামিল কুরআন তাফসীরুল কুরতবী* (কাহেরা: আল-মাকতাবাতু আত-তাওফিকীয়াহ, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৩০৫

৪. ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (আল-কাহেরা: আল-মাকতাবাতু আত-তাওফিকীয়াহ, ১৯৫২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৫

৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী: *সুদও ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: মাহিন পাবলিশার্স, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৭. মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন* (মদীনা: দার আস-সাবূনী, ২০০৭, খ. , পৃ.

৮.ড. সাইয়্যেদ আল-হাওয়ারী , *ইসলামী ব্যাংকিং* অনু:এম.এম.এ, এম. মুনাওয়ার আলী, একেএম মফিজুল ইসলাম (ঢাকা; কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ.৬১

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী ফকীহদের মতে,

"রিবা বলা হয় সম্পদের ঐ প্রবৃদ্ধিকে যা সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার জন্য শরীআহ্ আরোপিত শর্ত বহির্ভূত অন্য কোন বিনিময় থেকে আসে।[১]

মালেকী ফকীহ্ বিশেষজ্ঞগণ বলেন,

"বিরা' বলা হয় পৃকৃত ওজন বা সংখ্যার উপর প্রবৃদ্ধি অথবা ঋণ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়ার ধারণায় পূর্বে শর্তকৃত নির্দিষ্ট অর্থকে। [২]

শাফঈ বিশেষজ্ঞদের মতে,

" ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার ক্ষেত্রে অথবা সম্পদের বিনিময়ের বেলায় এমন চুক্তি সম্পাদন করা যা ইসলামী শরীআহতে অপরিচিতি"। [৩]

ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল ও তাঁর অনুসারী ফকীহগণ-এর মতে, "নির্দিষ্ট বিনিময় কিংবা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধিই রিবা। [৪]

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, উপস্থাপনায়, প্রকাশ, বর্ণনাভঙ্গী ও ব্যবহৃত শব্দ সম্ভারে ভিন্নতা থাকলেও মর্মার্থ-তাৎপর্য ও আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হল,প্রদত্ত ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত প্রবৃদ্ধি-ই রিবা বা সুদ।

---

১. ইবন আবেদীন, *তাসবীরুল আফসার* (আল কাহেরাঃ মাকতাবাতু ইয়ামামিয়া, ১২২৭ হি.) খ. ৫, পৃ. ১৬৯

২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-খারসী, *শরহে মুখতাসারে খলীল* (আল- কাহেরাঃ মাকতাবাতু আমিবিয়া, ১৮৯৯ খ্রি.) খ. ৫, পৃ. ৫৬

৩. মুহাম্মদ আহমদ সাঈদী, *আল-আদিল্লাতুল অফীয়া ফী ঈদাহিল মুআমালাতুর রবুবিয়্যাহ* (রিয়াদঃ মাতবাআতু দারুল হিলাল, তা. বি.), পৃ. ১১, ৪.

৪. ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী,* প্রাগুক্ত; খ. ৪, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন-এর মতে,

" প্রচলিত অর্থে রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তার-ই বিনিময় হিসেবে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করে। [১]

মাওলানা হিফজুর রহমান রিবার পরিচিতিতে বলেন,

"রিবা শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন বস্তু বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা বেশী হওয়া। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট যে কোন বস্তু নিছক বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা বেশি হওয়াকে পারিভাষিক অর্থে রিবা বলা যায় না এবং হারামও বলা যাবেনা। ইসলামী শরীআহ্‌র পরিভাষায় বস্তুত, সম্পদে একটা বিশেষ ধরনের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা। [২]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,

" ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শরীআহর পরিভাষায় রিবা বলতে শুধু মহাজনী সুদই নয়; বরং ঋণ এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের সাথেও শব্দটির অর্থ সম্প্রসারিত"। [৩]

ড. এম. উমর চাপরা- এর মতে,

" ইসলামী শরীআহ্‌তে রিবা বলতে ঐ প্রিমিয়ামকে বুঝায়, যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা মেয়াদ বৃদ্ধির শর্ত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়"। [৪]

শহীদ হাসান সিদ্দীকী বলেন,

"According to Quranic illustrations, the literal meaning of riba, is increase, addition of growth. In Shariah, it means addition, however slight over and above the principal. Riba is therefore, the premium that is recovered by the lender from the borrower alongwith the principal amount as part of lending arrangements, or for an extension in the maturity period of loan." [৫]

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী-এর মতে,

"ঋণ বা দেনার আসলের ওপর চুক্তি অনুসারে ধার্যকৃত যে কোন অতিরিক্ত হচ্ছে রিবা"।

---

১. ড. ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতদর্শ, অনু. আবদুল মতিন জালালাবাদী (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৬
২. মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. এম. উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭
৫. **Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p. 7**
৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

J.M. Keynes-এর মতে,

"Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time".[১]

Paul Samuelson-এর ভাষ্যে,

"Interest is the price or rental of the use of borrowed money."[২]

Alfred Marshall- এর মতে,

"Interest is the reward for waiting for future consumption."[৩]

Robertson- এর মতে,

"Interest is the price paid for the use of loanable fund."[৪]

□রিবা'র (সুদ) শ্রেণীবিন্যাস

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ তদানীন্তন আরবে প্রচলিত সূদী লেনদেনের বিভিন্ন ধরন উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত রিবা'র বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে তাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:

১. রিবা আন-নাসিয়াহ্ বা মেয়াদী সুদ এবং

২. রিবা আল- ফাদল বা বর্ধিষ্ণু সুদ।

১. রিবা আন-নাসিয়াহ

রিবা আন-নাসিয়া হল সময়ের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ। ঋণ মুলতবী করা বা ঋণ পরিশোধ বিলম্বিত করার **(Waiting)** বিনিময়ে আসলের ওপরে নির্ধারিত অতিরিক্ত হচ্ছে রিবা আল-নাসিয়া। সুতরাং বলা যায়, মূলধনের মূল্য হিসেবে হোক, পারিতোষিক কিংবা পারিশ্রমিক হিসেবে হোক এটি মুলত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় রিবা। নাসিয়া শব্দের মূল হল নাসায়া-এর অভিধানিক অর্থ হল বিলম্ব বা প্রতীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে ঋনের সেই মেয়াদকে নাসায়া বলা হয় যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়।[৫]

উল্লেখ্য, এ শ্রেণীর রিবা জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল বিধায় তাকে ربا الجاهلية, আল-কুরআন দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় ربا القران ঋণের বিপরীতে প্রদেয় বিধায় ربا القروض বলা হয়। তা ছাড়া এ রিবাকে ربا المضا عف, ربا الفا حش, رباالجلي , المباشرة প্রভৃতি বিশেষণেও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ অভিহিত করেছেন।[৬]

---

১. J.M Keynes , ibid, p. 167

২. Paul. A. Samuelson, Nordhaus, ibid, p. 50

৩. ibid, p. 51

৪. ibid

৫. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬

৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহগণ রিবা আন-নাসিয়ার অসংখ্য পরিচিতি তুলে ধরেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আশ-শায়খ আস-সাবূনী বলেন,[১]

ربا النسية : فهو الذي كان معروفا في الحا هلية وهو ان يقرضه قدرا معينا من المال الي زمن محدود كشهر اوسنة مثلا مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتدا د الاجل

জাহেলী যুগে এধরনের রিবা'র যেভাবে প্রচলন ছিল এরস্বরূপ বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন,[২]

ان الرجل في الجا هلية يكون له علي الرجل مال ا لي اجل- فا ذاحل الا جل طلبه من صا حبه فيقول الذي عليه الد ين اخر عني د ينك فازيد علي مالك -فيفعلان ذلك-فذالك هو ا لربا اضعا فا مضا عفة فنها هم الله عزجل في اسلا مهم عنه

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদিলেনদেন রিবা আন-নাসিয়ার অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তিনি আরো বলেন,[৩]

وهذا النوع من الربا هوا لمستعمل الان في البنوك والمصارف الما ليه- حيث ياخذون نسبة معينة في الما ئة كخمسة او عشرة في الما ئة ويد فعون الا موال الشركات والا فراد-

আবদুর রহমান আল-জুযাইরী রিবা আন-নাসিয়া'র সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন,[৪]

ربا النسية- وهوان بكون الزيادة المذكورة في مقا بلة تاخير الدفع -

রিবা আন-নাসিয়া নামকরণের কারণ উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন,[৫]

ومثا ل ذالك-ماذااشتري اردبا من القمح في زمن الشتاء باردب ونصف يدفعها في زمن الصيف فان نصف الاردب الذي زا د في الثمن لم يقا بله شيئ من المبيع وانما هو في مقابل الاجل فقط- ولذا سمي ربا النسية اي التا خير-

ড. সাইয়্যেদ আল- হাওয়ারী বলেন,

"রিবা গঠনের ক্ষেত্রে দুটি উপাদান একত্রে অথবা এককভাবে কাজ করে থাকে। প্রথমটি হল কাল বা সময় কিংবা মেয়াদ বিষয়ক উপাদান- গৃহীত ঋণ বিলম্বে ফেরৎ দেয়া এবং এর বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা। এধরনের রিবাকে শরীআহ্র পরিভাষায় রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ বলে কেননা আন-নাসিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিলম্ব করা দেরি করা বা কালক্ষেপন করা। দ্বিতীয় উপাদানটি হল ; হল অতিরিক্ত বা বৃদ্ধি। রিবার ক্ষেত্রে সময় বিষয়ক উপাদানের অনুপস্থিতি থাকলেও যে প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট দ্বারা দুটি পণ্যের তাৎক্ষণিক হাতে হাতে বিনিময় ঘটে এবং কোন একটির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পণ্য গৃহীত হয় তাকে রিবা আল-ফাদল বলে। কেননা এখানে আল-ফাদল শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত।

তিনি আরো বলেন, এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফকীহ্গণ রিবাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; তা হলো ১. রিবা আন-নাসিয়া এবং ২. রিবা আল-ফাদল।[৬]

---

১. আশ-শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্-সাবূনী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৯১
৪. প্রাগুক্ত
৫. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬
৬. ড. সাইয়্যেদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

☐ রিবা আন-নাসিয়ার বৈশিষ্ট্য

রিবা আন-নাসিয়ার সংজ্ঞাসমূহের বিশ্লেষণে এর যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত, তা নিম্নরূপ: [১]

১. অর্থনৈতিক লেনদেন বা ঋণসংক্রান্ত। ঋণসংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে এ রিবা'র উদ্ভব হয় ঋণ নগদ অর্থে হোক অথবা দ্রব্য- সামগ্রীর ক্ষেত্রে হোক ;

২. ঋণ পরিশোধের সময়সীমা চুক্তিবদ্ধ হোক কিংবা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হোক ;

৩. মূলধনের পরিমাণ নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট থাকা ;

৪. ঋণ প্রদানের শর্ত হিসেবে পূর্বনির্ধারিত হারে মূলধনের অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা ;

৪. অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয়, তার কোন বিনিময় না দেয়া ;

৫. সময়ের অনুপাতে মূলধনের অতিরিক্ত অংশের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া এবং

৬. উপরের বিষয়গুলোকে লেনদেনের শর্ত হিসেবে গণ্য করা।

☐ রিবা আল-ফাদল- এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

রিবা শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণের উপর ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। আল-ফাদল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত হওয়া, বাড়তি হওয়া বা বেশী হওয়া।[২] সমজাতীয় পণ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর হাতে হাতে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ রিবা আল-ফাদল এর উদ্ভব হয়। ওজন ও পরিমাপ দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় কোন জিনিস, বস্তু পণ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন কালে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তাকে শরীআহ্‌র পরিভাষায় রিবা আল-ফাদল বলা হয়। [৩] ব্যবসা- বানিজ্যে ক্রয়- বিক্রয়কালে বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের রিবার উদ্ভব হয় বলে তাকে বানিজ্যিক সুদ (রিব আল-বুয়ূ) এবং রাসূল (সা.)- এর এর সুন্নাহ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে বিধায় তাকে রিবা রিবা আস-সুন্নাহ বলা হয়।[৪] আল্লামা ইবন কাইয়্যিম এ শ্রেণীর রিবাকে অপ্রকাশ্য রিবা (রিবা আল-খাফী) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [৫]

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ রিবা আল-ফাদল-এর পরিচিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ আলী- আস-সাবূনী-এর মতে, [৬]

ربا الفضل فهو الذي وضحته السنة النبوية المطهرة - وهو ان يبيع الشي بنظيرة مع زيادة احد العوضين علي الاخر - مثا له ان يبيع كيلا من القمح بكيلين مع قمح اخر- اورطلا من العسل الشا مي برطل ونصف من العسل الحجازي وهكذا في جميع المكيلا ت والموزونات-

---

১. ড. আবদুল্লাহ হাসান আমীন, *আল- ওয়াদিউল মাসরাফিয়া আন-নুকূদিয়াহ ওয়া-ইসতিছমালুহা ফীল ইসলাম* (রিয়াদ: দারুশ্-শুরুক্, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৭৪

২. আল্লামা ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত , খ. পৃ.

৩. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী , প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. আশ-শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে যে ফিকহের সূত্রটি প্রয়োগ করে থাকেন-এর উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন,[১]

والقاعدة الفقهية في هذا النوع من التعا مل هي انه اذا اتحد الجنسان حرم الريادة والنساء واذااختلف الجنسان حل التفا ضل دون النساء-

আবদুর রহমান আল-জুযাইরী-এর মতে, [২]

ربا الفضل وهوان تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التنا خير فلم يقا بله شئ- وذالك كما اشتري اردبا من القمح باردب- وكيلة من جنسه مقا يضة بان استلم كل من البائع والمشتري ماله- وكما اذا اشتري ذهبا مصنوعا وزنته عشرة مثا قيل بذهب مثله قدرة مثقال-

মু'জামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থে রিবা আল-ফাদল- এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ;

পণ্য বা মালের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক পক্ষ অপর পক্ষকে তার যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে তাকে রিবা আল-ফাদল বলে। [৩]

☐ রিবা আল-ফাদল-এর বৈশিষ্ট্য

রিবা আল-ফাদল-এর পরিচিতি এবং বিশ্লেষণ থেকে-এর যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়,তা নিম্নরূপ:[৪]

১. ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময়ের জিনিস একই শ্রেণীভূক্ত বা সমজাতীয় হওয়া ;

২. ওজন বা পরিমাপের দ্বারা জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এমন জিনিসি হওয়া ;

৩. হাতে হাতে বা নগদ বিনিময় হওয়া এবং

৪. নগদ বা হাতে হাতে বিনিময়ের সময় কম-বেশী করে বিনিময় করা।

উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য যদি ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনের সময় এক সাথে পাওয়া যায়, তা হলেই তা সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে এবং রিবা আল-ফাদল-এর উদ্ভব ঘটবে। আর যদি কোন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকে তা হলে তাতে সুদের উদ্ভব বা সংযোগ ঘটবে না। তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে হাতে হাতে বা নগদ বিনিময় না হয়ে যদি বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় হয় এবং লেনদেনের শর্ত হিসেবে কমবেশী করে লেনদেন হয় , সে ক্ষেত্রে রিবা আন-নাসিয়ার উদ্ভব ঘটবে।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত

২. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, খ. ২, পৃ. ৫৩৬

৩. মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

❑ Usury, Interest, সুদ ও কুসীদ রিবা'র-ই প্রতিশব্দ: একটি বিশ্লেষণ

রিবা আরবী শব্দ। উর্দু ও ফারসী ভাষায়-এর প্রতিশব্দ হল সুদ (سود), বাংলা এর প্রতি শব্দ হল কুসীদ। কিন্তু বাংলা ভাষায় সুদ শব্দটি বহুল প্রচলিত ও সর্বাধিক ব্যবহৃত। উল্লেখ্য যে, আল-কুরআন ও সুন্নাহতে যে রিবা শব্দটি উল্লেখ রয়েছে এবং ইসলামে যে রিবা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, কেউ কেউ এ রিবা (ربا)' র ইংরেজী প্রতি শব্দ **Usury** এবং এর অর্থ ও মর্মার্থকে ব্যক্তিগত বা মহাজনী ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। এধরনের একটি প্রবনতা থেকে তারা এ অভিমতও পোষণ করেন যে, বিশ্ব নবী (সা.)- এর যুগে প্রচলিত রিবা ছিল **Usury** হিসেবে স্বীকৃত, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রহণকৃত ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ। এর উপর ভিত্তি করে তাঁরা আরো বলে থাকেন যে, ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে লগ্নিকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা **Interest** আল-কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত রিবা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের অভিমত হল **Usury** বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হতে পারে কারণ এতে শোষণ ও পীড়নের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে আদায় কৃত অর্থ কিংবা আমানতকারীদের প্রদানকৃত অর্থ হল সুদ বা **Interest** তা নিন্দনীয় বা পরিত্যাজ্য হতে পারে না ; বরং বৈধ। [১]

বর্ণিত আলোচনায় দেখা যায়, আরবী রিবা'র ইংরেজী প্রতি শব্দ **Usury** কিংবা **Interest** -এর মধ্যে পার্থক্য করার প্রবনতা লক্ষ্যণীয়। তাই শব্দ দুটোর আভিধানিক অর্থ-মর্মার্থ বিশ্লেষণ রিবা'র মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিধায় এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হল :

অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, **Usury** শব্দটি **Medieval Latin** শব্দ **Usuria** থেকে এসেছে । এর অর্থ হল **Interest** কিংবা **Excessive interest. Latin** ভাষায় এটাকে আবার **Usura**ও বলা হয়। এর পরিচিতিতে বলা হয়েছে ;

" Usury was defined originally as charging a fee for the use of money. This usually meant paying interest loans, although charging a fee for changing money (as at bureau de change) was also included in the original meaning. After moderate-interest, loans were made more easily available, usury gradually became an accepted part of the business world in the early modern age. Today , the word has changed its meaning to come to refer to the charging of unreasonable or relatively high rates of interest. The pivotal change in the English -speaking world seems to have come within restraint of usury of Henry viii in England in 1545 A.D.[২]

---

১. Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p.7

২. ibid, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

Oxford Dictionary তে উল্লেখ করা হয়েছে,

" The practice of lending money to people at unfairly high rates of interest." [১]

Cambridge Advanced Learner's Dictionary তে উল্লেখ করা হয়েছে,

" Formal disapproving the activity of lending some one money with the agreement that they will pay back a very much larger amount of money later."[২]

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত **English Bangla** অভিধানে বলা হয়েছে,

Usury- এর অর্থ সুদখোরী, সুদের কারবার, কুসীদ ব্যবহার, চোটা কিংবা চড়া সুদ। এর থেকে **Usurious**- কৌসীদ, চোটাঘটিত, সুদী লেনদেন বা নির্ধারিত হারে আদায়কৃত অর্থ। **Usurer** - সুদের কারবারি, সুদখোর বা কুসীদজীবি। [৩]

Interest শব্দটির ব্যাখ্যা

Interest- এর আভিধানিক অর্থ হল আগ্রহ, আকর্ষণ, আসক্তি অনুরূপ স্পৃহা ও আমোদ ইত্যাদি। যে গুণ কৌতুহল বা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, উদ্দীপ্ত করে কিংবা মনোযোগ আকর্ষণ করে আগ্রহ বা অনুরাগের বিষয় বা উপজীব্য। [৪]

Stiengass এর মতে, **"The word interest by and large has now been accepted and understood as riba".** [৫]

লর্ড. জে. এম. কেইনস-এর মতে, **"interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time".**[৬]

শহীদ হাসান সিদ্দীকী **Encyclopaedia Americana**'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

"Interest is a charge for the use of money. Interest has not always been considered a legitimate or even moral payment, until the end of middle ages, any charge for a loan was generally considered to be usury. The teaching of Christians, Judaic and Islamic religion, all condemned in varying degrees, the taking of interest. in more recent time, however, usury has come to be regarded as only the charging of illegal rates of interest."[৭]

Encyclopaedia Britanica' র উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন,

"The price paid for the use of credit or money. It may be expressed either in money terms or as a rate of payment. It defines usury as in the middle ages, practice of charging excessive interest for the loan of money. Originally all interest was termed usurious, but with expansion of trade in the 13th century, the demand for credit increased, necessitating a modification in the definition of usury".[৮]

---

১. A.S, Hornby, ibid, p. 1705
২. Combridge Advanced Learners Dictionary ibid, p. 1604
৩. Zillur Rahman Siddiqui, Bangla Academy English-Bangla Dictionary Dhaka : Shahida Khanam 2010 A.D), P. 859
৪. Dr. Muhammad Muslehuddin, ibid, p. 10
৫. Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p. 8
৬. A.S. Hornby, ibid, p. 1705
৭. J.M. Keynes, ibid, p. 167
৮. Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p.7

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় বিষয় হল; আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে বর্ণিত আরবী রিবা শব্দটির প্রতিশব্দ **Interest** নয় এ ধরনের পার্থক্য করার প্রবনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সপ্তদশ শতকে আধুনিক অর্থনীতির বিকাশ পর্বে যখন সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রূপ লাভ করে তখন সুদ সম্পর্কিত দুটি নতুন ধারণা বা পরিভাষা জন্ম লাভ করে। এর ভিত্তিতে সুদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তা হলঃ

এক. তিজারতী সুদ (বাণিজ্যিক সুদ) এবং দুই. সারফী সুদ (**Usury**)।[১]

এক. তিজারতী সুদ (বাণিজ্যিক সুদ) : কোন উৎপাদনশীল বা উর্পাজনশীল কাজে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের সুদ এ ধরনের সুদের অর্ন্তভুক্ত। পুজিবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে এটি উৎপাদনশীল ও মুনাফা ভিত্তিক খাতে নেয়া ঋণের ওপর প্রদেয় সুদ হিসেবে বিবেচিত।

দুই. সারফী সুদ (**Usury**) : এটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ ও খরচের জন্য গৃহীত ঋণের ওপর প্রদেয় সুদ হিসেবে বিবেচিত।

এ পর্যন্ত উল্লিখিত আমাদের অনুসন্ধান ও সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্তে বর্ণিত রিবা শব্দের অর্থ-মর্মার্থ যে **Usury** বা প্রচলিত পুজিবাদ অর্থব্যবস্থায় ব্যবহৃত ও গৃহীত **Interest** তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সুদ বা কুসীদ ও রিবা অর্থ-মর্মার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[২]

উল্লেখ্য যে, শরীআহর মৌলিক উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহতে রিবাকে তিজারতী সুদ এবং সারফী সুদ এ ধরনের বিভাজন পূর্বক একটিকে বৈধ (জায়েয) এবং অপরটি অবৈধ (নাজায়েয) করা হয়েছে মর্মে কোন বর্ণনা তত্ত্ব, তথ্য ও সিদ্ধান্ত এবং ইঙ্গিত - ইশারাও এযাবৎ কোথাও পাওয়া যায় নি। সুতরাং আমরা মনে করি সুদ কুসীদ, **Usury**, **Interest**, বাণিজ্যিক সুদ, মহাজনী সুদ, ভোগ্য ঋণের সুদ, বিনিয়োগ ঋণের সুদ, সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ কিংবা কোমল সুদ ও কঠোর সুদ, যে নামেই বিশেষায়িত ও অভিহিত করা হোক না কেন তা সন্দেহাতীত ও প্রশ্নাতীতভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবা'র অর্ন্তভূক্ত।[৩]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়,* অনু: মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন (ঢাকা: আইইআরবি,২০০৮ খ্রি.), পৃ.১২৫

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

□ রিবা সম্পর্কে ইসলামী শরীআহ্‌র সিদ্ধান্ত বা হুকুম

ইসলামে সকল প্রকার রিবাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আল-কুরআন [১] ও বিশ্ব নবী (সা.)-এর সুন্নাহ্‌[২] দ্বারা প্রমাণীত এবং ইজমা'[৩] দ্বারা সুদৃঢ়কৃত ও সাব্যস্ত। ইসলামী শরীআহ্‌ বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছেন যে, রিবা আন-নাসিয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম।[৪] আল-কুরআনের ভাষ্য রাসূল (সা.) সুন্নাহ ও ইজমা'-ই-উম্মাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ- সংশয় কিংবা মতবিরোধ -মতানৈক্য এবং বিতকের কোন অবকাশ ও সুযোগ নেই।[৫]

আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী ইসলামের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করে বলেন[৬]

لا خلاف بين ائمة المسلمين في تحر يم ربا النسية فهي كبيرة من الكبا ئر بلا نزاع- وقد ثبت ذالك بكتاب الله وسنة رسوله واجماع المسلمين -

মুহাম্মদ তাকী উসমানী আধুনিক কালে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও লেনদেনে যে সকল ধরন ও পদ্ধতিতে রিবার অনুপ্রবেশ ঘটে সেগুলোকে শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক ইসলামী শরীআহ্‌র সিদ্ধান্তকে নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তা নিম্নরূপ: [৭]

ক. ভোগ, উৎপাদন কিংবা বিনিয়োগ যে উদ্দেশ্যেই ঋণ নেয়া হোক; নির্বিশেষে সকল ঋণ বা লেনদেনের চুক্তিতে আসলের উপর ধার্যকৃত কম-বেশি যা-ই হোকনা কেন যে কোন অতিরিক্ত-ই হচ্ছে আল-কুরআনে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষিত রিবা। শরীআহর পরিভাষায় যাকে রিবা আল-কুরআন, রিবা আন-নাসিয়া , রিবা আল-জাহীলিয়্যাহ, রিবা আল-ফাহিস কিংবা রিবা আল-মুদাআ'ফ বলা হয়।

---

১. সুদ সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতসমূহ হল: ৩০: ৩৯, ৪: ১৬০-১৬১, ৩:১৩০, ২:১৭৫-২৮১

২. *ইসলামী ব্যাংকিং- শরীআহ্‌ পরিপালন*, সম্পা: আবদুর রকিব, প্রাগুক্ত, পৃ.

৩. রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ইজমা রয়েছে। এ বিষয়ে আশ-শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী বলেন, ان المسلمين قد اجمعوا على تحريم الربا قليلة وكثيرة- فهذا القول يعتبر خروجا علي الاجماع كما يخلو عن جهل باصول الشريعة الغراء- فان قليل الربا يد عوا الي كثيرة .فا الا سلام حين يحرم الشيئ بحرمه كليا اخذا بقا عدة سدا لذرائع- لانه لوا باح القليل منه يجر ذالك الي الكثير منه- والربا كا لخمر في الحر مة فهل يقول مسلم عا قل ان القليل من الخمر حلال-

৪. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩৬

৫. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৬. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৫৩৬

৭. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮,

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বিশ্বনবী (সা.) আরও কতিপয় লেনদেনকে রিবার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেগুলো হল :

খ. অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনে উভয় পক্ষের অর্থ যদি একই জাত ও শ্রেণীভূক্ত হয় এবং উভয় পক্ষ যদি সমান সমান পরিমাণের অর্থ লেনদেন না করে, তাহলে বিনিময় তাৎক্ষণিক হাতে হাতে ও নগদে (Spot Transaction) হোক অথবা বাকির ভিত্তিতে হোক সে লেনদেন হবে রিবা।

গ. বার্টার (Barter) বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়। সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো যদি ওজনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য হয়, একই জাত ও শ্রেণীভূক্ত হয় এবং যদি উভয় পক্ষের পরিমাণ অসমান হয় অথবা কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত বা বাকী রাখে, তাহলে এরূপ লেনদেন রিবার লেনদেনে পরিণত হবে।

ঘ. বার্টার (Barter) বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ের পর যদি ভিন্ন ভিন্ন জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং সেগুলো যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয় আর কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান স্থগিত বা বাকী রাখে তাহলে তা রিবা লেনদেনের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ইসলামী শরীআহতে খ, গ এবং ঘ শ্রেণীতে উল্লিখিত তিন ধরনের লেনদেন পদ্ধতিকে রিবা আস-সুন্নাহ কিংবা রিবা আল-ফাদল বলা হয়েছে। কারণ এরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বিশ্বনবী (সা.) এর হাদীস বা সুন্নাহ দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিবা আল-কুরআনসহ রিবার এই চারটি পদ্ধতি ও ধরনকে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে রিবা বলা হয়েছে।

উল্লিখিত চার ধরনের লেনদেনের মধ্যে শেষের দু'ধরনের (গ.এবং ঘতে বর্ণিত) লেনদেন আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়; কারণ আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বার্টার প্রথা ও পদ্ধতির লেনদেন নেই বললেই চলে। তবে আধুনিক কালের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে রিবা আল-কুরআন ও উপরে খ. নম্বরে উল্লিখিত অর্থের সাথে অর্থ বিনিময়ের যথেষ্ট সামঞ্জস্য-সাদৃশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তা ছাড়া ঋণ বা দেনার ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত কম হোক বা বেশি হোক, কোন অবস্থায়-ই রিবার নিষেধাজ্ঞায় কোন ব্যাতিক্রম করা হয়নি।

---

১. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৩৭

প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পরিভাষায় সরল সুদ কিংবা সুদের হার কমহলে তা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা যাবে না।

এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তিনি বলেন,

وهذا خطا صريح لان الغرض من الا ية الكريمة انما هوا لتنفير من اكل الربا- ولفت نظر المرابين لما عساه ان ينوول اليه امر الربا من التضعيف الذى قد يستغرق مال المدين- فيصبح بمر ورا لزمن وتراكم فوائد الر با فقيرا باساعا طلا في هذه الحياة بسبب هذااالنوع الفا سد من المعا ملة- وفى ذالك من ضرر على نظام العمران ما لا يخفي- ويكاد يتصور عا قل ان الله تعالي ينهي عن ثلاثه اضعاف- ولاينهي عن الضعفين اوالضعف علي انه لا يمكن لعا قل ان يفهم هذاالمعني بعد قوله تعالي وان تبتم فلكم رءوس اموا لكم- سورة البقرة- ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

□ ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হবার কারণ ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সুদের কতগুলো তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। এসব তত্ত্ব কয়েকটি অনুমিতির ওপর ভিত্তিশীল।[১] এই অনুমিতিগুলোর মধ্যে একটি মৌলিক অনুমিতি হচ্ছে যে, এতে অর্থকে একটি পণ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে, অন্যান্য সকল পণ্য যেমন ক্রয়- বিক্রয় করা যায় তেমনি অর্থকেও ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। একজন ব্যবসায়ী যেমন খরচ মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে; তেমনি একজন অর্থের মালিক তার অর্থকেও এর ফ্যাস ভ্যালুর চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করতে পারে। অর্থ সম্পর্কে এরূপ ধারণা বা অনুমিতি ইসলামী নিতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বরং তা শরীআহর পরিপন্থী।[২] অর্থ অর্থই আর পণ্য পণ্যই। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক । এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক।

শরীআহর বিশেষজ্ঞ, ফকীহ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ এমনকি পুঁজিবাদ মতাদর্শের অনুসারী অর্থনীতিবিদ, দার্শনিকসহ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী , বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও স্থগিত লেনদেনের মান।[৩] সুতরাং অর্থ সম্পর্কে শরীআহর নির্দেশনা হল; প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় সুদের তত্ত্বে অর্থকে যেরূপ একটি উৎপাদন-সামগ্রী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যা দৈনিক ভিত্তিতে নিশ্চিত মুনাফা বয়ে নিয়ে আসে; তেমনিভাবে অর্থকে উৎপাদন-সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[৪]

ইসলাম অর্থকে একটি উৎপাদন -উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, তবে এর পুরস্কার পূর্ব-নির্ধারিত করে বা তার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে দেয়নি। বরং পুঁজির পুরস্কার-প্রাপ্তির বিষয়টিকে উৎপাদনের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে।[৫] পুঁজির সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা বা পুরস্কার গ্রহণ ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলাম মনে করে অর্থকে লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্য বানানো হলে তা গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে এবং আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় বহুবিধ অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার জন্ম দিবে। অনুরূপভাবে ব্যবসা- বাণিজ্যের অর্থায়ন ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক ঋণের ওপর ভিত্তিশীল হলে তাও সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় এক ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করবে। বর্ণিত বিষয়গুলো ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হবার মৌলিক কারণ হিসেবে বিবেচিত।[৬]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৫. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০-৪১

৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হবার অসংখ্য কারণ ও যুক্তি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি কারণ ও যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল : [১]

১. সুদ মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক ত্রুটিমুক্ত উপার্জন পন্থা থেকে বিরত রাখে।

২. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের লোকদের সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার পরিবর্তে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

৩. সুদ বিনিময় ছাড়াই পরের অর্থ কেড়ে নেয়।

৪. সুদের পরিণাম ধ্বংস ও বিপর্যয়।

৫. সুদ ব্যবসা-বাণিজ্য কতিপয় লোককে অলস-অকর্মণ্য বানিয়ে দেয় আর সাধারণভাবে বেকারত্বের সৃষ্টি করে।

৬. সুদ দরিদ্রের আরো দরিদ্রতর করে, ধনীদের আরো বিত্তশালী বানায়।

আল্লামা ইবন কাইয়্যেম ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ (হারাম) হবার কারণ, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন,

"সুদ দু'প্রকার; একটা স্পষ্ট, প্রকট ও প্রত্যক্ষ, অপরটি অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন এবং প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে হারাম, আর দ্বিতীয়টি হারাম পরোক্ষভাবে, বড় হারামের কারণ হওয়ার দরুন।" [২]

এর ব্যাখ্যায় তিনি আরো বলেন,

"সুদী ব্যবসায় ঋণদাতা যেহেতু বিপুলভাবে অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে নেয় আর এর ফলে তার ভাই যে কোনরূপ ফায়দা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এরূপ উপায়ে অর্থসম্পদ অর্জনটি রাসূল (সা.) 'ভাইয়ের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ'- এর বাণী'র অন্তর্ভুক্ত।

সুদের ভয়াবহতা ও এর নিষেধাজ্ঞায় কঠোরতার ওপর আলোকপাত করে তিনি আরো বলেন,

"অপর কোন কবীরা গুনাহ্র ব্যাপারে এত কঠিন ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী আল-কুরআনে আসেনি যতটা এসেছে সুদ সম্পর্কে। অতএব, সুদ হচ্ছে বহু কয়টি কবীরা গুনাহ্র মধ্যে অতি বড় কবীরা গুনাহ্।"[৪]

সাইয়েদ কুতব শহীদ ইসলামে 'রিবা' নিষিদ্ধ হবার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন আল-কুরআনের 'রিবা' সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায়। সুদ নিষিদ্ধ হবার কারণ, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং দুনিয়ায় ও পরকালে-এর ভয়াবহ পরিণামের উপর আলোকপাত করে তিনি আটটি দিক থেকে সুদের বিষয়ে বিশ্বমুসলিমকে সতর্ক করেছেন। দিকগুলো নিম্নরূপঃ[৫]

এক. মুসলিম জনগণকে মনে রাখতে হবে ইসলামে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা-এ দু'টির মধ্যে চিরন্তন সংঘর্ষ ও স্থায়ী বৈপরীত্য বিদ্যমান। মানুষের জীবনে, চরিত্রে ও মন-মানসিকতায় দু'টির ফল ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরস্পর বিপরীত।

---

১. Ibn al-Qayyim Igathah al-Lahfan (Egypt: Matba'ah al-Maimaniyah, 1320 A.H), p. 190
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid
৫. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, অনু. হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ (লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমী, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৪, খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৩৭১

Dhaka University Institutional Repository
দুই. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিশ্বমানবতার উপর প্রলয়ংকর মহা-অভিশাপ। ঈমান, নৈতিকতা ও মানবিকতা পরিপন্থী-ই নয় শুধু বরং মানব-সমাজের অর্থনৈতিক শ্রম- বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা মানবতার সৌভাগ্য ও কল্যাণকেই চিরতরে ধ্বংস করে দেয়।

তিন. ইসলামে নৈতিক বিধান ও কর্মবিধান ওতপ্রোত-অবিচ্ছিন্ন। আর মানুষ তার সমগ্র কার্যকলাপে আল্লাহর 'খিলাফাতের' দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ জন্য তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এই দুনিয়ার সকল কর্মকান্ডের হিসাব দিতে বাধ্য হতে হবে পরকালে। ফলে নৈতিকতা ও কর্মতৎপরতা উভয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন। আর এটাই হল তার ইবাদাত। ভালো করলে ভালো ফল পাবে আর মন্দ করলে শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি নৈতিকতা বিবর্জিত হতে পারে না।

চার. সূদী ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তির মন-মানসিকতা, ঈমান-আকীদা ও নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য সুদখোর অনুভব পর্যন্ত করে না। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংস হতে বাধ্য। সুদভিত্তিক মূলধন জনগণের জন্য কল্যাণকর পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনে আগ্রহী নয় বরং অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের প্রতিই তাঁর ঝোঁক-প্রবণতা বেশী হয়। ফলে জনকল্যাণে সুদের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই।

পাঁচ. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ও অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মুখাপেক্ষহীন কারণ ইসলাম সমাজকে এমনভাবে গড়ে যে, সূদী লেনদেনের কোনো প্রয়োজনীয়তা-ই অনুভব হতে পারে না। তার কোনো অবকাশই থাকে না।

ছয়. ইসলাম সূদী লেনদেন ছাড়াই যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে। সমাজ ও রাষ্ট্র সুদের মলীনতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে।

সাত. সাধারণত, মনে করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটা জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন, যা ব্যতীত জীবন না দাড়াতে পারে, না অগ্রসর হতে পারে। এভাবে ইসলামের আরও কতগুলো ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়, অসুবিধার কথা বলা হয়। আসলে তা ইসলামের প্রতি ঈমান না থাকা ও মানব জীবনের প্রকৃত সমস্যা বুঝতে অক্ষম হওয়ারই ফলশ্রুতি।

আট. বর্তমান বা ভবিষ্যতের বিশ্ব অর্থনীতি সুদমুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাকে যারা কঠিন কিংবা অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করে, তারা আসলে চিন্তার দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে। কেননা এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং তা সরল প্রকৃতির লোকদের ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত, বর্তমান বিশ্ব সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নবতর আদর্শিক ভিত্তির উপর যেমন নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব তেমনি বর্তমান সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কঠিন বা অসম্ভব নয়।

ইমাম গাজালী-সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক কুফল, অশুভ প্রভাব ও এর পরিণাম সম্পর্কে বলেন,

"রিবা' এই জন্য নিষিদ্ধ যে, তা মানুষকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে। এটা এ জন্য যে, যার অর্থ-আছে তাকে যখন সুদের ভিত্তিতে সে অর্থ খাটিয়ে, তাৎক্ষণিক লেনদেন বা ঋণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর অর্থ উপার্জন করতে দেয়া হয়, তখন সে নিজেকে প্রকৃত অর্থনেতিক কাজে নিয়োজিত করে পরিশ্রম ও কষ্ট করার চেয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থ বৃদ্ধি করার কৌশলকে সহজতর মনে করে। এ অবস্থা মানবতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে, কারণ প্রকৃত বাণিজ্যিক উৎকর্ষতা এবং শিল্প, বিনিয়োগ ও বিনির্মাণ (Construction) ব্যতীত মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।"[১]

১. ইমাম গাজালী, এহইয়ায়ু উলূমুদ্দীন, (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফিকীয়াহ, ১৯৩৯ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

□ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার পরিভাষায় সুদকে ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের দাম, তারল্য-ত্যাগের পুরস্কার কিংবা বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকার পারিতোষিক হিসেবে গণ্য হলেও সুদের কুপ্রভাব, কুফল ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আধুনিককালে সুদের মারাত্মক ধ্বংসকারী ও ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে, পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও আশংকা ব্যক্ত করেছেন।[১] সমাজবিজ্ঞানী, দার্শানিক, অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মবিশারদগণ সুদের অশুভ ফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় দেখা যায় যে, সুদের অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আঘাত হানে। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বিধায় সংক্ষেপে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হলো :

ক. নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহ নিম্নরূপ :

- ⇨ সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে ফলপ্রসূ, কার্যকর ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ;
- ⇨ সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ-লিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে;
- ⇨ মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা-সহমর্মিতার মত গুণাবলীর চেতনা বিনষ্ট করে দেয়;
- ⇨ সুদ মানুষের মধ্যে শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে ;
- ⇨ সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে;
- ⇨ সুদ নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে;
- ⇨ সুদ সমাজে সহযোগিতা-সহমর্মিতার পরিবর্তে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং
- ⇨ সুদের প্রভাবে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে তা প্রকট আকার ধারণ করে এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র ও ধনী আরও ধনী হয়।

খ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

- ⇨ সুদের শোষণ সার্বিক , সুদূরপ্রসারী, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রকৃতির হয়ে থাকে। সমাজের গভীরে এর বিষাক্ত ছোবল ছড়িয়ে পড়ে;
- ⇨ অসহায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়;
- ⇨ একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট গড়ে উঠে;
- ⇨ অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পুঁজি আবর্তিত হয়। অর্থ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে;
- ⇨ সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

---

১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ২ , পৃ. ৩৫-৪০
ড. এম উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬২
ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৬
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৮৩
ড. নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৬
Dr. Muhammad Muslehuddin, ibid, pp.101-109
Shahid Hasan Siddiqui, ibid, pp.69-74
Dr. Sabahuddin Azmi, ibid, pp.40-42 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদ অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে;

⇨ সুদ দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে;

⇨ সুদ সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল সরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে;

⇨ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে;

⇨ সুদভিত্তিক ঋণে তৈরী শিল্প-কারখানা ক্ষতির সম্মুখীন হলে উদ্যোক্তা পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে;

⇨সুদভিত্তিক ঋণের কারণে ব্যক্তির কিংবা প্রতিষ্ঠানের দেওলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে;

⇨ সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার মুখ্য কারণ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে;

⇨ সুদের দীর্ঘমেয়াদী কুপ্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়;

⇨ সুদ অর্থ-সম্পদ বন্টনে অসমতার অন্যতম কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে;

⇨ সুদ কৃত্তিম মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন, সম্প্রসারণ ও মুদ্রার অবমূল্যায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে এবং

⇨ সর্বোপরি সুদ উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ ও ভোগের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে;

গ. রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

সুদ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । এ ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ:[১]

⇨সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে দেশকে আন্তর্জাতিক- অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকে ও সেবা দাসে পরিণত করে। বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার ফলে ধনী দেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তা যুদ্ধ,এমনকি বিশ্বযুদ্ধ ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে দেশকে নিয়ে যায়। গোটা জাতিকে বিদেশী ঋণদাতাদের দাসত্বের অধীনে ঠেলে দেয়।[২]

⇨ সুদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের প্রকৃত সম্পর্ক হয়ে পড়ে শাসক-শোষক-শোষিতের। উন্নত ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর বৈষম্য যে ক্রমশ: বৃদ্ধি পায় তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদী ঋণ ব্যবস্থা। সুদভিত্তিক বৈদেশিক ঋণ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্যে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত দেশগুলোর সুদভিত্তিক ঋণ আজ আন্তর্জাতিক শোষণের মুখ্য হাতিয়ার যা সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক নতুন রূপ। এরই কারণে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর সম্পর্ক এখন শোষক ও শোষিতের।

সবশেষে, যুক্তরাজ্যের পিটার ওয়ার বারটন (যিনি একজন উঁচুমানের আর্থিক কমেন্টেটর এবং অর্থনৈতিক ফোরকাস্টিং পুরস্কার বিজয়ী) -এর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন,
"ঋণ ও পুঁজির বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এর সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য তৈরী হও যা প্রাশ্চাত্যের আর্থিক ব্যবস্থার ভিতকে উলট-পালট করে দেবে। "[৩]

---

১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ২ , পৃ. ৩৫-৪০
ড. এম উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬২
ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২-২৬
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৮৩
ড. নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৬
Dr. Muhammad Muslehuddin, ibid, pp.101-109
Shahid Hasan Siddiqui, ibid, pp.69-74
Dr. Sabahuddin Azmi, ibid, pp.40-42 থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. প্রাগুক্ত

৩. Dept and Delusion, Allen Lane, London, (1999A.D), P.261 উদ্ধৃত করেছেন বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী , A Historic Judgement on Interest, Pakistan Supreme Court, Pakistan.

Dhaka University Institutional Repository

□ পূর্ববর্তী ধর্ম ও সভ্যতায় সুদ

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণের প্রচারিত আসমানী হিদায়াত ও ঐশী ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ছিল। হযরত মুসা (আ:) এর শরীআহতে - ইয়াহুদী ধর্মে রিবা নিষিদ্ধ ছিল। আল-কুরআনের বাণী - এর সাক্ষ্য বহন করে।[১] এছাড়া মূল তাওরাতের পরিবর্তন-পরিবর্ধন সত্ত্বেও এতে রিবা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার বিধান বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে। তাওরাত এর বিভিন্ন স্থানে এ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়।[২]

আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে হযরত ঈসা (আ:)-এর উপর ইনযিল শরীফ নাযিল করা হয়েছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইনযিল শরীফেও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যুগে যুগে। খৃষ্টান জগতে **New Testament** বা বাইবেল নামে আজো যতটুকু বিদ্যমান রয়েছে তাতেও সুদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইয়াহুদীদের মত খৃষ্টানদেরও রিবা পরিত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। ইঞ্জিল লূকে বর্ণিত হয়েছে, মাসীহ বলেন,

"যখন মুখাপেক্ষীদেরকে তোমরা ঋণ দেবে তখন এর বিনিময়ে কোন প্রবৃদ্ধি খোঁজ করবে কেন? বরং তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, তবেই তোমরা দৃষ্টান্তসহ পূণ্যের অধিকারী হবে।"[৩]

আল্লাহর প্রেরিত নবী হযরত শোআইব (আ.) -এর ইবাদত, সালাত কায়েম ও রিবা পরিত্যাগের দাওয়াত আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।[৪] পূর্ববর্তী সকল ঐশী ধর্মে রিবা নিষিদ্ধ ছিল এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করে **Yahia Adbul-Rahman** বলেন,

"In Jewish Bible, the Christian Bible and The Quran all Prohibit the act of charging rent for the use of money. In the old Testament, it is called Ribit, in the Quran, it is called Riba." [৫]

এ বিষয়ে ড. শহীদ হাসান সিদ্দীকী বলেন,

"In Bibilical times, all payments for the use of money were forbidden. Earliar in 340 B.C Lex Genocia prohibited interest in the Republic of Rome. When the Roman Empire was christianized in the fourth century, the Church forbade the clergy from taking interest in the early middle ages. Popes and councils continued to oppose all forms of payments for the use of money lent, as the money was mainly for the purpose of exchange and its principal use was its consumptions, whereby it was sunk in exchange." [৬]

তৎকালীন সময়ে আইন প্রণয়ন করে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেন,

"In those days, governments introduced laws to prohibit charges. In 1311 A.D Pope Clement V made prohibition of usury absolute end declared all legislations in favour of usury as null and void. " [৭]

খৃষ্টধর্মের শুরু হতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্য সুদখোরদের দেহপসারিনীদের সমতুল্য বলে গণ্য করেছিল।[৮]

---

১. আল-কুরআন, ৪: ১৬০-১৬১
২. ড. আবু সাহেবাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, হুলুল লি মুশকিলাতুর-রিবা (আল-কাহেরা: আল মাকতাবাসুস সুন্নাহ, তা. বি.) পৃ. ২৬৪
৩. ইঞ্জিল লূক, অধ্যায়, ৬, স্তবক, ৩৪-৩৫
৪. আল-কুরআন, ১১: ৮৭
৫. **Yahia, Abdul- Rahman The art of Islamice Banking and Finance New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2010 A.D), p.8**
৬. **Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p. 2**
৭. **ibid, p. 3**
৮. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository
হিন্দু ধর্মেও সুদকে ঘৃণ্য কার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মনু যাঁর নাম হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রকার গণের তালিকায় সবার শীর্ষে, তার রচিত ধর্মসূত্র ও বাণীগুলো গ্রন্থাকারে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা নামে লিখিত রূপপায়। এসব বাণীতে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইনকানুন ও বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছিল মর্মে উল্লেখ্য রয়েছে। [১] মনুসংহিতায় সুদকে এতটাই ঘৃণা করা হয়েছে যে, সুদখোরের অন্ন ভক্ষণ করতেও শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় সুদকে প্রকৃত বিরোধী উপার্জন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমেরিকান বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে, রোমান সভ্যতায় সুদকে অপ্রাকৃতিক উপার্জন, শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের হাতিয়ার বলা হয়েছে। তবে তাদের লিখিত পুস্তকাদির অনেক পূর্বে গ্রীকদের এ সংক্রান্ত অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়।[২] এ বিষয়ে **M.C.Vaish** বলেন,

"The Christians were forbidden by t he canon law to indulge in the sinful activity of lending money to the others on interest. Christianity took an attitude of contemptuous indifference toward wealth and christ 's teachings also displayed antagonism to wealth. "[৩]

এ বিষয়ে ড. শহীদ হাসান সিদ্দীকী বলেন,

"In the early years, the Roman Empire has also prohibited earnings on money-lending. "[৪]

দর্শন ও সাহিত্যে সুদ

মানব সভ্যতার সুচনালগ্ন থেকে দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা অর্থব্যবস্থা থেকে সুদ নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে আসছেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল সুদকে কৃত্তিম মুনাফা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যান্য পণ্যের মত অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্তিম জালিয়াতি ব্যবসা। [১] অর্থের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরিস্টোটল যে অভিমত পোষণ করতেন সে সম্পর্কে ড. শহীদা হাসান সিদ্দীকী বলেন,

" The doctrin of famous Greek philosopher Aristotle was, that as piece of money can not beget anothere piece, as the sole natural object of the use of money was to facilitate exchange and that money can not be used as a source of accumulating money at interest. Aristotte, Therefore, rejected interest on the basis that money is sterile and accordinly compared money to a barren hen which lays no eggs. Plato too condemend interest". [2]

---

1. K.C Shekhar, Lekshmy Shekhar, ibid, p.10
2. Dr. Shahid Hasan Siddiqui, ibid, p. 2

Dhaka University Institutional Repository
বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজালীর মতে, অর্থ মূল্যের পরিমাপক, বিনিময়ের একটি মাধ্যম এবং দাম পরিমাপের একটি হাতিয়ার। আর এ অর্থকে যারা সুদী কারবারে খাটায়, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার এবং অবিশ্বাস করে। কারণ দিনার ও দিরহামের আবিষ্কার আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের অন্যতম নেয়ামত। উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে অর্থের আবিষ্কার। কেবল অর্থের জন্যই অর্থের সৃষ্টি হয়নি। অর্থকে যারা বাণিজ্যিক পণ্য বানিয়েছে এবং খোদ অর্থের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে, তারা প্রকারান্তরে অর্থকে এমন একটি পণ্যে রূপান্তর করেছে, যা অর্থ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর যে উদ্দেশ্যে অর্থের সৃষ্টি তার বিপরীত উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারই হচ্ছে প্রকৃত জুলম বা বে-ইনসাফী।[১]

মানব জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবিই তো হল সাহিত্য। সুদখোররা তাদের অর্থ লিপ্সা, নিষ্ঠুরতার জন্য বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রুপের খোরাক হয়েছেন। ইতালীর অমর কবি দ্যান্তে তার বিখ্যাত **The Divine Commedy**-তে সুদখোরদের অগ্নি বৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। তার বক্তব্য সম্পর্কে শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন,

"In the Divine commedy Dante ploces the usurers in the inner ring of the seventh cirecle of hell, below even suicides."

ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট সেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি The Marchant of Vanice নাটকের শাইলকের নাম সুদখোরের চরিত্র হিসেবে ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে।[৩]

বাংলাসাহিত্য, গল্প উপন্যাস ও নাটকে সুদখোরদের শোষণ-পীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা, শওকত ওসমানের ইতা, আবূ ইসহাকের জোঁক, কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ্ , জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে, সহীদুল্লাহ্ কায়সারের সংশপ্তক প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস-এর সাক্ষ্য বহন করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে কিভাবে বাংলার মানুষ সুদখোরদের হাতে শোষিত-লাঞ্ছিত-নির্যাতিত ও অপমানিত হয়ে আসছে উপন্যাসগুলোতে সে রুঢ় বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে। [৪]

পরিশেষে প্লুটার্ক-এর মন্তব্যটি উল্লেখ করাযেতে পারে। তাঁর মতে, "বিদেশী আক্রমনকারীদের চেয়ে সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ প্রদানকারীরা অধিকর নির্যাতনকারী" ।[৫]

---

১. ইমাম গাজালী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৮-৮৯

২. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও শ্রেণীবিন্যাস

ইসলাম বিশ্বমানবের পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনের অতি সুন্দর ও সুফল ব্যবস্থা এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন থেকে মুসলিম অমুসলিমসহ সমগ্রবিশ্বের মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Complete Code of Life)। যে সুদী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা বিশ্বের কোন জাতির জন্য, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে, কোন যুগে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং আজ সমগ্রবিশ্বের বাস্তবতা। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও এটি আশাতীত বিস্তৃতি ও সফলতা লাভ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস সুদের ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ইসলামী রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে। সকল কার্যক্রমে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। তাই ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে সুদ বর্জন করে ইসলামী শরীআহ অনুমোদিত পদ্ধতি ও পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলাম অবৈধ (হারাম) পন্থায় অর্থ উপার্জন যেমন নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি অর্থ উপার্জনের বৈধ (হালাল) পন্থারও দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী শরীআহ'র উৎস আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা', কিয়াস, ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিদ্‌লাল, ইস্‌তিস্‌লাহ ইত্যাদি। এসবের আলোকে ইসলামী শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলিতে হালাল পন্থায় অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং এসব শরীআহসম্মত বিভিন্ন সুদমুক্ত পদ্ধতিসমূহ ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছেন।

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনুসরণীয় শরীআহ অনুমোদিত যেসব পদ্ধতি রয়েছে; তার মধ্যে বাই' মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা, বাই' মুয়াজ্জাল, বাই' সালাম, মুদারাবা, মুশারাকা ও ইজারা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো; সুদভিত্তিক লেনদেনই প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের পার্থক্যের একমাত্র মানদন্ড নয়; বরং আকীদাগত চিন্তাদর্শনের আলোকে তার অর্থব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যেসব সুক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে তারই পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের স্বরূপ চিহ্নিত করা সম্ভব। সুতরাং প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঋণদানের প্রকৃতি ও বিনিয়োগাত্মক প্রকৃতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী ব্যাংকের অর্থব্যবস্থা মূলত বিনিয়োগনির্ভর। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ইসলামী ব্যাংকের ধমনী হিসেবে গন্য করা হয়। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণ-গ্রহীতা এবং ঋণদাতার মধ্যকার সুদের পার্থক্যকে মুনাফা অর্জনের একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। যেহেতু ইসলামী ব্যাংক কোন প্রকার সুদের লেনদেন করে না, সেহেতু তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোন উপায়ও নেই। এসব বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যাংকের কেবলমাত্র অস্তিত্ব ও মুনাফার্জনের বিষয়টি জড়িত নয়, বরং এর সঙ্গে অর্থের প্রবাহ গতিশীল করা, বিনিয়োগমূখী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন, সামাজিক কল্যাণ অর্জনসহ ইসলামী অর্থনীতির সুফল প্রত্যেক মানুষের নিকট পোঁছে দেয়াও এর উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে, সেগুলোর পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ এবং এসবের অনুকূলে শরীআহ্‌র ভিত্তি সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ওপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত কর হল:

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমুহ শরীআহ্র নীতিমালার ভিত্তিতে শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে যে সব বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এই পদ্ধতিগুলোকে (Modes of Investment) প্রধানত নিম্নরূপ তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে[১]:

ক. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি;এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

১. বাই'মুরাবাহ, ২. বাই' মুয়াজ্জাল, ৩. বাই'সালাম এবং ৪. বাই'ইসতিসনা

খ. অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি' এতে রয়েছে-

১. মুশারাকা ২. মুদারাবা এবং

গ. মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান পদ্ধতি

(ইজারা বিল বাই' তাহ্তা শির্কাতিল-মিলক)।

বাই'মুরাবাহা

(চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়)

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরীআহসম্মত যে সব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে তন্মধ্যে বাই'মুরাবাহা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত একটি পদ্ধতি। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের অধিকাংশই বাই'মুরাবাহা পদ্ধতিতে করা হয়ে থেকে।

বাই'মুরাবাহা

'বাই'আলমুরাবাহা' শব্দ দু'টি আরবী। 'বাই' এবং 'রিবহুন' শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। 'বাই' শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং 'রিবহুন' শব্দটির অর্থ সম্মত মুনাফা বা লাভ (Profit) [২]। সুতরাং 'বাই' আল-মুবারাহার' অর্থ সম্মত মুনাফায় ক্রয়-বিক্রয়[৩]।

ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায়:

"প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলে[৪]।"

আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী-এর মতে,

"যদি কোন বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে, সেই মুনাফা ঐ পণ্যের ক্রয় মূল্যের উপর বর্ধিত করা হবে, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়কে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় মুরাবাহা বলা হয়[৫]।

---

১. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking* (Dhaka: IERB, 2008 A.D) p. 113
ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে:
Modes of investment of Islamic banks are broadly categorised into three groups, such as sharing mechanism, Ijarah mechanism and Bai mechanism.
এ পদ্ধতিগুলোর বিশ্লেষণে আরো উল্লেখ করা হয়েছে:
"In the sharing mechanism profits and losses of the business are shared by two or more persons/institutions. The main forms of the sharing mechamism practised by Islamic banks are Mudaraba, Musharaka, Muzara'a Musaqat. Ijarah mechanism includes three modes in which Nor-Fungible goods are leased out for a specific period for a fixed rental. These are; Ijarah, Financial Lease, Operation Lease, Ijarah wa Iqtisna or Ijarah Muntahiya Bit-tamleek, Hire Purchase under Shirkatul Milk etc.
Bai mechanism involves 'Bai' (buying) directly or indirectly through agent, of goods and services by the bank, and selling of the same. Buying on selling may take various froms there are; Bai-Murabaha, Bai-Muajjal, Bai-Musawama, Bai-Salam, Bai-Istisna, Bai-Istijrar etc"

২. আল্লামা ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩১

৩. প্রাগুক্ত

৪. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবু বকর আল মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ. ৯২

৫. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৫৫৩

Dhaka University Institutional Repository

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI [১] বাই মুবারাহার সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকেই বাই'মুরাবাহা বলা হয়। এই লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা থোকও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে সাধারণ মুরাবাহা (আল মুরাবাহাতু আল-আদিয়াহ) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে ব্যাংকিং মুবারাহা (আল-মুরাবাহাতু আল-মাসরাফিয়াহ) বলা হয়[২]।"

Islamic Development Bank (IDB) বাই'-মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে,

" Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract. [৩]"

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত' (প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'এ 'বাই-মুরাবাহা'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"বাই-মুরাবাহা' বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে যাহার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্যের সাথে উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত লাভ যুক্ত করিয়া তাহার নিকট বিক্রয় করিবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া মালামাল গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই চুক্তিতে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।[৪]"

---

১. AAOIFI-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.
ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কে শরীআহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুরোর হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা, মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহনযোগ্য শরীআহর মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ। AAOIFI ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য শরীআহ্ বিষয়ক মানদন্ড সংক্রান্ত যে গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেছে তা Shariah Standard বা 'আল মাআভীরিশ-শারীআহ্' নামে পরিচিত।
শরীআহ্ স্ট্যান্ডার্ড গ্রন্থে ১৭টি বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপঃ

1. Trading in currencies;
2. Debit card, charge card and credit card'
3. Default in payment by a debtor'
4. Settlement or debt by set-off;
5. Guarantees;
6. Conversion of a conventional Bank to an Islamic bank;
7. Hawala;
8. Murabaha to the purchase orderer;
9. Ijarah and Ijarah Muntahia Bit-tamleek;
10. Salam and parallel salam;
11. Istisna and parallel Istisna;
12. Sharika (Musharaka) and Modern corporations;
13. Mudaraba;
14. Documentary credit;
15. Juala;
16. Commercial Papers and
17. Investment Sukuk.

(সূত্র: *ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীআহ পরিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮)

২. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No. 8, (2002 A.D) P. 132

৩. Dr. M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulations and Supervision of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI/IDB, 2004 A.D) , p 79

৪. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়মূল্য ও তার ওপর নির্ধারিত লাভ এ দু'টি বিষয়ই মুরাবাহার মূল কথা। পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক পুনরায় কারো কাছে বিক্রি করা হলে তা ফিক্‌হের পরিভাষায় নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে হতে পারে [১];

ক. যে দামে পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে সেই দামে তা কারো কাছে বিক্রি করাকে বাই'তাওলিয়াহ বলা হয়।

খ. ক্রয়মূল্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম দামে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে বাই'ওয়াদী'আহ বলা হয়।

গ. ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ লাভ যোগ করে বিক্রি করাকে বাই'মুরাবাহা বলা হয়। এই মুরাবাহার মূল উপাদান হল; বিক্রেতার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তা ক্রেতাকে অবগত করে তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে নেয়া । এই মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের আকৃতিতে কিংবা শতকরার ভিত্তিতে নগদে কিংবা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পরবর্তীতে যে কোন তারিখেও হতে পারে [২]।

❒ বাই'মুরাবাহার প্রকারভেদ

দ্রব্য ও পণ্যের মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বাই'মুরাবাহাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়[৩]:

ক. মুরাবাহা বিন-নাক্বদ এবং খ. মুরাবাহা বিল-আজল।

মুবারাহার ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হলে তাকে মুরাবাহা বিন-নাক্বদ বলা হয়[৪]। আর পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোন সুনির্দিষ্ট সময়ে (বাকীতে) পরিশোধের অঙ্গীকার হলে তাকে মুরাবাহা বিল আজল বলা হয়[৫]। ক্রেতা-বিক্রেতা বা লেনদেনকারীর উভয়পক্ষের সম্মতি আছে কি নেই, এদিক থেকে ফকীহ্‌গণ মুরাবাহাকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন [৬]:

এক. সাধারণ বাই'মুরাবাহা (আল-মুরাবাহাতু আল-আদিয়াহ) এবং

দুই. ব্যাংকিং মুরাবাহা (আল-মুরাবাহাতু আল-মাস্‌রাফিয়াহ) বা যাকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই' মুরাবাহা (আল-মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশ্‌-শিরা) বলা হয়।

এক. সাধারণ মুরাবাহা (আলমুরাবাহাতু আল-আদিয়া)

ক্রেতার অনুরোধ বা সম্মতি ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক কোন পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে 'বাই' আল-মুরাবাহা আল-আদিয়াহ' বা সাধারণ মুরাবাহা বলা হয়। সনাতন ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে মুরাবাহা বলতে এ ধরনের মুরাবাহার কথাই বলা হয়েছে[৭]।

দুই. আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই'মুরাবাহা (বাই' আল-মুরাবাহাতু লিল-আমিরি বিশ্‌-শিরা)

ক্রেতার অনুরোধে তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে বাই মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্‌-শিরা বা আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই'মুরাবাহা বলা হয়। এ ধরনের মুবারাহাকে ব্যাংকিং মুবারাহাও বলা হয়ে থাকে [৮]।

ড. সামী হাসান হামুদ তাঁর 'তাতভীরুল 'আমাল আল-মাসরাফিয়াহ বিমা ইয়াত্তাফাকু আল-শারী'আতু আল-ইসলামিয়্যাহ শীর্ষক অভিসন্দর্ভে OIC ফিকাহ্‌ একাডেমীর সম্মেলনে এ মুরাবাহার ধারণা উপস্থাপন করেন[৯]। পরবর্তীতে এ ধরনের মুরাবাহাকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত মুরাবাহা লিল্‌ আমিরি বিশ্‌-শিরাকেই বোঝানো হয়[১০]।

---

১. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবু বকর আল মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ. ৯২
২. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ৫৫৪
৩. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবু বকর আল মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ. ৯৩
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৯৪
৭. আবদুর রহামান জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৫৫৫
৮. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No. 8, (2002 A.D) P. 132
৯. OIC ইসলামিক ফিক্বহ একাডেমী সম্মেলন সংস্থা-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা আল মোকাররমায় ওআইসির তৃতীয় ইসলামিক সম্মেলনে এটি গঠিত হয়। এটি জেদ্দাভিত্তিক একটি সংস্থা। ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিক্বহ), বিজ্ঞান, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের নিয়ে এ সংস্থা গঠিত।
১০. OIC ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী, সিদ্ধান্ত নং ৪১(৫/২৩৫/৩, কুয়েতে অনুষ্ঠিত ফিক্‌হ একাডেমীর পঞ্চম অধিবেশন, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত মুরাবাহাঃ মুরাবাহা লিল-আমিরি বিশ্-শিরা

ইসলামী ব্যাংকসমুহ সাধারণত সনাতন মুরাবাহার পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা ও মুরাবাহা বিল আজল পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। কারণ সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে মালামাল ক্রয় করে গুদাম বা দোকানে রেখে দেয়ার পরে তা বিক্রি করতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় আগে গ্রাহকের নিকট থেকে মালামালের অর্ডার নিয়ে সে অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করে তার কাছে বিক্রি করা ব্যাংকের জন্য সুবিধাজনক। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতির পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা (আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই' মুরাবাহা) নামক বিনিয়োগ পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলন করছে [১]। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক আগ্রহী গ্রাহকের অর্ডার পাওয়ার পরই কেবল বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে। অতঃপর উক্ত মালামাল গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে থাকে[২]।

❒ বাই মুরাবাহা, ব্যাংকিং মুরাবাহা বা মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা বৈধ হবার বিষয়ে শরীআহর ভিত্তি

বাই' মুরাবাহা ইসলামী শরীআহ্ অনুমোদিত একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহাকে একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তাদের অধিকাংশ অর্থায়ন কার্যক্রম মুরাবাহার ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। এ কারণেই বর্তমানে এই পরিভাষাটি অর্থনীতির পরিধিতে একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত।[৩]

আল-কুরআনের ঘোষণাঃ

"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"[৪]

জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত যে সব ক্রয়-বিক্রয়কে রাসুল (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে মুরাবাহা নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে মুবারাহা একটি হালাল ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি।[৫]

মুবারাহার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পূর্ব সম্মতি থাকায় এটি বৈধ, এতে কোন বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে আবু-সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেনঃ "ক্রয়-বিক্রয় সম্পদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।[৬]"

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ বর্ণিত হাদীস থেকে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, বাই'মুরাবাহায় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত লাভ যোগপূর্বক ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় বিধায় তা বৈধ। মুরাবাহা বৈধ হবার পক্ষে নিম্নরূপ হাদিসটিও প্রণিধাণযোগ্যঃ

"তাবিয়ী মুহাম্মদ ইবন সিরীন (র.) বলেন, "উসমান ইব্‌ন আফফান (রা.) উটের পাল কিনতেন এবং বলতেন, কে আছে যে আমাকে এগুলোর রশিগুলো লাভ হিসেবে প্রদান করবে? কে আছে যে আমার হাতে একটি দীনার প্রদান করবে?"[৮]

---

১. OIC ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী, সিদ্ধান্ত নং ৪১(৫/২৩৫/৩, কুয়েতে অনুষ্ঠিত ফিক্‌হ একাডেমীর পঞ্চম অধিবেশন, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.

২. প্রাগুক্ত

৩. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৪. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৫. আল্লামা ইবন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৬
মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১০
সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩ প্রমূখ তাফসীর বিশারদ এবং ফর্কীহ্ মুজতাহিদগণ বর্ণিত অভিমত পোষণ করেন।

৬. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাজাহ, সুনানু ইবন মাজাহ্, কিতাবুত-তিজারাহ অধ্যায়।

৭. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৮. সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, খ.২; পৃ. ২৫৩, হাদীছ নং ২০১৩ (লেখক বলেন, তিনি এই অর্থে আলী (রা.) থেকেও একটি হাদীস সংকলন করেছেন)

Dhaka University Institutional Repository

❒ ফকীহ্ মুজতাহিদগণের দলীল

মুরাবাহার বৈধতার পক্ষে যৌক্তিক দলীল প্রদান করে আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী বলেছেন :

"এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনীতা রয়েছে। কেননা, যিনি ব্যবসা ভাল বোঝেন না তিনি দক্ষ ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভর করতে পারেন। দক্ষ ব্যবসায়ী দেখেশুনে যে পণ্যটি ক্রয় করেছেন কিছু লাভ দিয়ে, সে পণ্যটি তার নিকট থেকে ক্রয় করতে পারলে উক্ত অদক্ষ ব্যক্তি খুশিই হবেন।"[১]

বাই মুরাবাহা বৈধ হবার বিষয়ে ইমাম শাওকানী বলেন,

"এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে আল্লাহ তাঁর বাণী 'পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা' এবং 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম'-এর দ্বারা অনুমোদন করেছেন। যতো ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত, তাতে যদি শরীআহ্র বিধি-নিষেধ না থাকে অথবা পারস্পরিক সম্মতি বিদ্যমান থাকে ।"[২]

❒ ব্যাংকিং মুরাবাহা বৈধ হবার বিষয়ে শরীআহ্র ভিত্তি এবং বৈধ হওয়ার ফতোয়াঃ

বাই' মুরাবাহা বিশেষ করে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা বা ব্যাংকিং মুরাবাহা বৈধ হওয়ার পক্ষে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলিম, ফকীহ এবং বিভিন্ন ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে সব ফতোয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

এক. ওআইসি'র ফিক্হ একাডেমীর ফতোয়া

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে কুয়েত অনুষ্ঠিত ওআইসি ফিক্হ একাডেমী-র সম্মেলনে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা ও ওয়াদা পরিপালন সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

"কোন পণের উপর শরীআহ্সম্মত উপায়ে অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতার মালিকানা ও দখল লাভের পর মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ-শিরা'র ভিত্তিতে বিক্রি করা হলে তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে গন্য করা হবে। তবে শর্ত হচ্ছে অর্ডারদাতা ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে তার দায়-দায়িত্ব অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। হস্তান্তরের পরে গোপন কোন ত্রুটির কারণে কিংবা অনুরূপ অনিবার্য কোন কারণে ফেরত দেয়া হলে তার দায়-দায়িত্বও অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলীও পালন করতে হবে। এখানে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা (যেটা ক্রয়ের অর্ডারদানকারীর অথবা অর্ডারপ্রাপ্ত যে কোন একপক্ষ থেকে করা হয়) পালন দ্বীনি দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক, তবে কোন ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।"[৩]

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে কুয়েতে ইসলামী ব্যাংকের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ওআইস'র ফিকহ একাডেমীর ন্যায় ব্যাংকিং মুরাবাহার বৈধতার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪]

---

১. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবু বকর আল মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ. ৫৫

২. মুহাম্মদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার* (বৈরুত: দারু ইয়াহাইয়া আত্ তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭২ খ্রি.) পৃ. ৪২৩

৩. OIC, ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী, মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বিধি সম্পর্কিত মিশরের প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ, জেদ্দা, ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ খ্রি.

৪. ড. আলী আহমদ আস-সালুস, মাওসূ'আতুল কাদায়া আল-ফিক্হিয়্যাহ্ আল-মু'আছারাহ ওয়াল ইকতিছাদিল ইসলামী (কাতারঃ দারুস্-সাক্বাফা, ১৯৮৩ খ্রি.) পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

সৌদি আরবের দাওয়াহ, ফাতওয়া ও গবেষণা বিভাগের সাবেক প্রধান শাইখ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আযিয বিন বায (রা.) ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত ব্যাংকিং মুবারাহা জায়েয বা বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেন[১]।

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী উসমানী ব্যাংকিং মুরাবাহাকে কিছু শর্তাধীন করে বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"This is the actual sense of the term Murabahah which is a sale, pure and simple. However, this kind of sale is being used by the Islamic banks and financial institutions by adding some other concepts to it, as a mode of financing. But the validity of such transactions depends on some conditions which should be duly observed to make them acceptable to shari'ah. Murabaha is not a loan given on interest. it is the sale of a commodity for a deferred price which includes an agreed profit added to the cost. [২]"

❒ ব্যাংকিং মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য

ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে ব্যাংকিং মুরাবাহার বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ [৩] :

১. এ পদ্ধিতিতে তিনটি পক্ষ থাকে।

ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী), খ. বিক্রেতা (যার নিকট থেকে প্রথমবার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে) এবং

গ. ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)[৪]

২. ব্যাংকিং মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে দেয়ার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করেন। ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী উক্ত পণ্য ক্রয় করে থাকে। পরবর্তীতে গ্রাহক তা ক্রয় করে নেয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন।

৩. বিক্রয়ের সময় মুরাবাহা পণ্যের ক্রয়মূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৪. লাভই মুরাবাহার মূলকথা। লাভ ছাড়াও ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে কিন্তু তখন তাকে মুরাবাহা বলা যাবে না। সুতরাং মুরাবাহার ক্ষেত্রে লোকসানের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক।

৫. মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সকল পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

৭. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলি কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

৮. চুক্তি অনুয়ায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যাবে না।

৯. চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

১০. ব্যাংক ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে মালামাল বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য এবং লাভ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হয়।

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, বাইউল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা কামা তুজরীহিল মাছারিফুল ইসলামিয়্যাহ (কুয়েত: দারুল কালাম, ১৯৮৪ খ্রি.) পৃ. ১৭

২. Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karacti: Idaratul Ma'arif, 1999 A.D) p. 96

৩. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০৩
ড. গরীবুর জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
ড. সামী হাসান হামুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

৪. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

❐ বাই মুবারাহার ক্ষেত্রে পালনীয় রুকন ও শর্তাবলি

মুবারাহা একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় রুকন ও শর্ত অনুসরণ করতে হয়। এ কারণে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রুকন ও শর্তসমূহ বাই মুরাবাহার ক্ষেত্রেও পরিপালন করতে হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন মূলত তিনটি তা নিম্নরূপ : [১]

ক. ইজাব ও কবুলের সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন। এর মধ্যে রয়েছেঃ ইজাব ও কবুলের পদ্ধতি ও ভাষা।

খ. ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন এবং

গ. বিক্রীত পণ্য ও মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন। এর মধ্যে রয়েছে পণ্যটি হালাল হওয়া, পণ্যটি উপকারী হওয়া, পণ্যটির বৈধ মালিকানা থাকা, পণ্যটি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া এবং পণ্য ও মূল্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার মত বিষয়গুলো।[২]

❐ মুরাবাহার সাধারণ শর্তাবলি

ফিকাহ্‌বিদদের মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের এমন আনুষঙ্গিক উপাদানকে শর্ত বলা হয়, যার অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হয়। বাই'হওয়ার কারণে মুরাবাহাতেও সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত পরিপালন করতে হয়। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ[৩]

১। পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া;

২। শর্তহীনভাবে বিক্রি করা;

৩। বিক্রয়মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া;

৪। বিক্রিতব্য পণ্যটি দৃশ্যমান হওয়া এবং

৫। বাইউল্ ঈনা না হওয়া (ব্যাক বাই) [২]

তবে মুরাবাহার সাধারণ শর্তাবলির পাশাপাশি ব্যাংকিং মুরাবাহা শরীআহ্‌সম্মতভাবে সম্পাদন করতে কিছু বিশেষ শর্তও রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

১। লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক;

২। সমজাতীয় জিনিস সুদের আশঙ্কার কারণে মূল্য হতে পারবে না;

৩। মূল্য জাতীয় জিনিস (একজাতীয় মুদ্রা) বাই' মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা এ জাতীয় জিনিসে শর্ত হলো সমান সমান হওয়া। অথচ বাই' মুরাবাহা হল ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রি করা;

৪। প্রথম চুক্তি শরীআহ্‌সম্মত হতে হবে। প্রথম চুক্তি ফাসিদ হলে মুরাবাহা জায়য হবে না;

৫। মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয়কৃত মালামাল উপস্থিত থাকতে হবে, যাতে ক্রেতা মালামাল দেখতে এবং সে সম্পর্কে জানতে পারেন। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য মালের ক্রয়মূল্য ও লাভের অংশ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক।[৬]

---

১. *আল-ফাতাওয়া আশ্-শার'ইয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ইকতিছাদিয়্যাহ* (কুয়েতঃ কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১-৪২
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ. ৪৩
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ ব্যাংকিং মুরাবাহা অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

ব্যাংকিং মুরাবাহা অনুশীলনের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় : [১]

১। মালামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বরাবর গ্রাহকের আবেদন;

২। গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক থেকে মালামাল ক্রয় করে নেয়ার অঙ্গীকার নামা;

৩। ব্যাংক কর্তৃক মালামাল ক্রয়;

৪। ক্রয়কৃত মালামালের উপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠা;

৫। মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা এবং

৬। মালামালের দখল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়া।

পরিশেষে বলা যায়, এ পদ্ধতিতে মানুষ প্রাচীনকালে যেমন ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন করেছে, তেমনি বর্তমানেও করছে। মানুষের প্রয়োজনেই এ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং মানুষের প্রয়োজনেই এ পদ্ধতিকে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ একটি বৈধ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে অব্যাহত রাখছে [২]। ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞাদের অনুমোদন সাপেক্ষে সনাতন মুবারাহা পদ্ধতির সাথে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির সমন্বয় করেছে মাত্র। বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের ৬৬ শতাংশ বাই'মুরাবাহা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।[৩]

বাই'মুয়াজ্জাল

(বাকীতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়)

❒ বাই' মুয়াজ্জাল

বাই'মুয়াজ্জাল ইসলামী ব্যাংকের একটি অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি। 'বাই' এবং 'আজল' শব্দযোগে গঠিত। বাই শব্দটির অর্থ ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। মুয়াজ্জাল শব্দটি 'আজল' শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'আজল' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিলম্ব, বাকি আর মুয়াজ্জাল শব্দের অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য এবং বাকী ও নগদের বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়।[৪]

ফকীহ্গণের পরিভাষায়:

"বাই'মুয়াজ্জাল হল এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়।[৫]"

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী বাই মুয়াজ্জালের পরিচিতিতে বলেন,

"যে ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়পক্ষ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, মূল্য পরে বা বাকীতে পরিশোধ করা হবে তাকে বাই'মুয়াজ্জাল বলা হয়।[৬]"

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩. Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Meezan banks Guid to Islamic Banking* (Karachi: Darul Isha'at, 2008 A.D.) p. 125
৪. আল্লামা ইব্ন মানযুর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫
৫. আলী হায়দার আমীন আফিন্দী, *দুরারুল হুক্কাম ফী ইলমিল আহ্কাম* (বৈরুত: দারুল কুতব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১৪৪
৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

'সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রণীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত (প্রস্তাবিত) 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন' এ বাই'-মুয়াজ্জালের' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"বাই-মুয়াজ্জাল বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বুঝাইবে, যেখানে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।"[১]

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত বাই' মুয়াজ্জাল পদ্ধতি

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহে বাই' মুয়াজ্জাল পদ্ধতি অনুশীলনে ভিন্নতা রয়েছে। আরব বিশ্বের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক যে ক্ষেত্রে নিজেদের পরিচালিত শোরুম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রাহকদের কাছে সরাসরি বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে সেক্ষেত্রে বাই'মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে[২]। এরূপ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়কালে ক্রয়মূল্য গ্রাহককে জানানো হয় না বা গ্রাহক জানতে আগ্রহী হয় না। আবার মুনাফা কত তাও জানানো হয় না বা গ্রাহক তা জানতে চান না। এখানে বিলম্বে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়।[৩]

❒ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে বাই'মুয়াজ্জাল-এর অনুশীলন

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বাই'মুয়াজ্জাল এর অনুশীলন কার্যত: বাই' মুরাবাহার অনুরূপ[৪]। ব্যাংকিং মুরাবাহাতে যেমন ক্রেতার অর্ডারের ভিত্তিতে ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পর উক্ত ক্রেতার কাছে লাভে বিক্রি করে তেমনি ব্যাংকিং বাই' মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রেও ক্রেতার ক্রয়ের আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংক অন্য স্থান থেকে মালামাল ক্রয়ের পর উক্ত গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে [৫]। এক্ষেত্রে ব্যাংক নগদ মূল্যে মালামাল ক্রয়-পূর্বক গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে বিক্রি করে। ব্যাংক মালামালের ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে গ্রাহকের কাছে বাকীতে বিক্রি করে এবং মুরাবাহার মতোই এক্ষেত্রে মালের ক্রয়মূল্য ও মুনাফা গ্রাহকের কাছে প্রকাশ করা হয়[৬]।

❒ বাই'মুয়াজ্জাল ও ব্যাংকিং বাই'মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার বিষয়ে শরী'আহ্'র ভিত্তি

বাই'মুয়াজ্জাল ইসলামী শরীআহ্ অনুমোদিত একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। আল কুরআনের ঘোষণা :

"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"[৭]

আল-কুরআনের বর্ণিত ঘোষণা বাই'মুরাবাহার ন্যায় বাই'মুয়াজ্জাল এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা জাহিলিয়্যাতের যুগে প্রচলিত যে সব ক্রয়-বিক্রয়কে রাসুল (সা.) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোর মধ্যে বাই'মুয়াজ্জাল (বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়) এর উল্লেখ নেই। অতএব, বাই'মুয়াজ্জাল একটি হালাল (বৈধ) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি।[৮]

---

১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৩. প্রাগুক্ত
৪. *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্ পরিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. আল-কুরআন, ২:২৭৫
৮. *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্ পরিপালন, প্রয়োগ পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র আল-কুরআন আরও ঘোষণা করছে :

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন ভবিষ্যতে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজেদের মধ্যে লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।"[১]

বাই'মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার পক্ষে হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে; হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন,

"মহানবী (সা.) এক ইহুদী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য বাকীতে ক্রয়-করেছিলেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।"[২]

ইবন মাজাহ্ গ্রন্থে সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেনঃ

"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে, মুক্বারাদা (মুদারাবা), আল-বাই' ইলা আজাল (বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়) এবং ঘরে খাওয়ার জন্যে গমকে যবের সাথে মেশানো; বিক্রয়ের জন্য নয়।"[৩]

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বলেন,

"ক্রেতার দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমত, নিজে ক্রয়কৃত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করার জন্য, দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যও হতে পারে, এ দু অবস্থাতেই ক্রয়-বিক্রয় কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' অনুযায়ী জায়েয।"[৪]

আল-কাসানী বাদায়েউস-সানায়ীতে উল্লেখ করেন, "বিলম্বের উপর ভিত্তি করে মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।"[৫]

❒ বাই'মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাই'মুরাবাহার ন্যায় বাই'মুয়াজ্জালের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফিকাহ্‌বিদ্‌দের দৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ[৬] :

১. ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে নির্ধারিত দাম পরিশোধের শর্তে বাকীতে বিক্রি;
২. Goods delivered, price deferred.
৩. মাল ক্রয় করে অর্থকে মালে রূপান্তর এবং মাল বিক্রি করে মালকে অর্থে রূপান্তর করতে হয়;
৪. মাল ক্রয় করে মালিকানা লাভ করার পর বিক্রয় করতে হয়;
৫. বাই'মুয়াজ্জালের চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে;
৬. বাই'মুয়াজ্জালে ব্যাংকের ক্রয়মূল্য ও লাভ বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক নয়;
৭. মাল ক্রয়ের পর ক্রেতার/গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংককে মালের ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং
৮. রূপান্তরের সুযোগ ও ঝুঁকি থাকার কারণেই এ পদ্ধতি বৈধ।

---

১. আল-কুরআন, ২:২৮২
২. ইমাম বুখারী, ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', ইমাম মুসলিম, ছহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুছাকাত।
৩. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ্, সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুত্ তিজারাহ্
৪. ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ, *মাজমা'আতুল ফাতাওয়া*, খ. ২৯, ফাতাওয়া নং ৪৯৯, পৃ. ২৮৬
৫. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
(সূত্রঃ বাদাউস্ সানাঈ, খ. ৬, পৃ. ৫৪)
৬. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No*-10,11, p. 132-133

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকের বাই'মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

ইসলামী ব্যাংকসমূহে বাই'মুয়াজ্জালের অনুশীলন বাই' মুবারাহার অনুরূপ। তাই বাই'মুবারাহার মত বাই'মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রেও নিম্নের প্রক্রিয়াসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয় :[১]

১. ব্যাংক কর্তৃক মালামাল ক্রয়পূর্বক মালিকানা ও দখল লাভ করা;

২. চুক্তিপত্রে বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য পরিশোধের মেয়াদ উল্লেখ করা;

৩. মালামাল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়া এবং

৪. গ্রাহকের নামে দায় সৃষ্টি করা ।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই' মুয়াজ্জালের প্রয়োগ

বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণত ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে।[২]

❒ বাই'মুরাবাহা ও বাই'মুয়াজ্জালের পার্থক্য

বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহে বাই'মুরাবাহা ও বাই'মুয়াজ্জাল পদ্ধতি অনুশীলিত হয়ে থাকে। এ দুটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। ফিকাহ্‌বিদ্‌দের দৃষ্টিতে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:[৩]

বাই'মুরাবাহা	বাই'মুয়াজ্জাল
১. নগদ অথবা বাকীমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।	১. শুধু বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।
২. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নির্ধারিত মুনাফাসহ মালামাল বিক্রি হয়।	২. মুনাফা ছাড়া এমনকি ক্রয়মূল্য বা উৎপাদান ব্যয়ের চেয়ে কম দামেও মালামাল বিক্রি হতে পারে।
৩. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানাতে হয়।	৩. ক্রয়মূল্য বা উৎপাদান ব্যয় ও লাভ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানানো জরুরী নয়। শুধু মোট বিক্রয়মূল্য জানালেই চলে।

পরিশেষে বলা যায়, বাই'মুয়াজ্জাল মূলত ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এ কারণেই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শরী'আহ্‌র সকল নীতিমালা এ পদ্ধতিতে পরিপালন করতে হয়। মুরাবাহা অধ্যায়ে বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন, শর্তাবলি, বিক্রয়ের পূর্বে পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভ ইত্যাদি শরীআহ্‌র নীতিমালা বাই'মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[৪]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩
২. আবদুর রকীব, শেখ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাই'সালাম
(অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়)

বাই'সালাম ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে বিনিয়োগের অর্থ সরাসরি প্রদান করে। এটা অনেকটা বাই'মুয়াজ্জালের বিপরীত[১]। বাই'মুয়াজ্জালে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করে তাকে বাকীতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু বাই' সালামে মালামালের মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং তার নিকট থেকে মালামাল নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে গ্রহণ করা হয়। বাই'মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক মালামালের ক্রেতা আর ব্যাংক হয় বিক্রেতা, কিন্তু বাই সালামে বিনিয়োগ গ্রাহক বিক্রেতা এবং ব্যাংক ক্রেতা [২]।

বাই'সালাম

অভিধানে বাই' সালাম-এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। আরবী ভাষায় 'সালামুন' অর্থ সমর্পন করা [৩]। বাই'সালামের আরেকটি ফিক্হী পরিভাষা হচ্ছে বাই' সালাফ। বাই সালাম হচ্ছে হিজাযে প্রচলিত পরিভাষা। ইরাকিরা এটাকে বাই' সালাফ বলে[৪]। অর্থের দিক থেকে দুটো পরিভাষায় প্রায় সমার্থক। সালাম অর্থ সমর্পন করা এব ং সালাফ অর্থ পেশ করা, অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বাই' সালাম বলা হয়। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বাই'সালাফ বলা হয় [৫]।

ফিকাহবিদ্দের পরিভাষায় :

"অগ্রিমমূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকেই বাই'সালাম বলে।"[৬]

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বাই'-সালামের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো,

"A Salam transaction in the purchase of a commodity for deferred delivery in exchange for immediate payment. It is a type of sale in which the price, known as the salam capital, is paid at the time of contraction while the delivery of the item to be sold, known as al-Muslam fihi (the subject matter of a salam contract), is deferred. The Seller and the buyer are known as al-Muslam ilaihi and al-Muslam or Rabb al-Salam respectively. Salam is also known as Salaf (lit borrowing)."[৭]

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রণীত ও প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ 'বাই-সালাম' এর সংজ্ঞা হলো :

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
২. প্রাগুক্ত
৩. আল্লামা ইব্‌ন মানসুর, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৬৬৪
৪. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
৫. আল্লাম আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৫৬
৬. প্রাগুক্ত
৭. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No.*10, p.180

Dhaka University Institutional Repository

'বাই-সালাম' বলিতে এমন এক ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিলে বুঝাইবে, যেখানে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করিবার শর্তে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত তাহার সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য আগাম পরিশোধ করিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ধরন, সরবরাহের স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে [১]।

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী-এর মতে,

"ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মতমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীআহ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রী অগ্রিম বিক্রয় করাকে বাই'সালাম বলে।[২]"

মালামালের মূল্য হিসেবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় রাসু-মাল সালাম বা সালামের মূলধন। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় 'আল-মুসলামু ফিহি' ক্রেতাকে বলা হয় মুসলিম এবং বিক্রেতাকে বলা হয় আল-মুসলামু ইলাইহি।[৩]

❒ শরীআহ্‌তে বাই'সালামের ভিত্তি

বাই' সালাম একটি শরীআহ্‌সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা আরা এর বৈধতা সাব্যস্ত ও স্বীকৃত। আল কুরআনের ঘোষণা, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[৪]" এবং আল্লাহর বাণীঃ

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন ধরনের লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।[৫]" বাই' সালামের বৈধতার সাক্ষ্য বহন করে । বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : "আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালাফ (বাই সালাম) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকৃত একটি চুক্তি। একে আল্লাহ তার কিতাবে হালাল করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বর্নিত আয়াত তিলাওয়াত করেন।"

ইব্‌ন আব্বাস আরো বলেছেন, এই আয়াত বিশেষভাবে বাই' সালাম সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে।[৬]

❒ বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে সহীহ্ হাদীস রয়েছে :

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুল (সা.) মদীনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ (বাই সালাম) করত। রাসুল (সা.) বললেন, খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ (বাই' সালাম) করলে সে যেন তা নিদির্ষ্ট পরিমাপ, পরিমাণ ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে।"[৭]

❒ বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে ইজমা' :

বাই' সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে ইজমা' হয়েছে মর্মে ইব্‌ন মুনযির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বাই সালাম বৈধ বলে সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট ধরনের পণ্যের, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে বাই' সালাম করতে পারে।"[৮]

তিনি আরো বলেন,

---

১. সেন্ট্রাল শরীআহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক্‌স অব বাংলাদেশ, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত ও প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন, ২০০০ খ্রিঃ

২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত ১৭৯ ৮. ইব্‌ন কদামাহ্ আলমুসনী, প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ.৩৮৫

৩. প্রাগুক্ত.

৪. আল-কুরআন, ২:২৭৫

৫. আল-কুরআন, ২:২৮২

৬. ইব্‌ন আব্বাস, তাফসীর ইব্‌ন আব্বাস, প্রগুক্ত, খ.১, পৃঃ ১৩৭
ইব্‌ন আল-জাওযী, যাদুল মাআদ ফী ইলমুত-তাকমীর, খ.১,পৃ৩১৬
ইব্‌ন কাসীর, তাফসারুল কুরআন আল-আযীম, খ.১, পৃঃ ৪৯৬

৭. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহুল বুখারী কিতাবুস-সালাম ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবস-সালাম।

Dhaka University Institutional Repository

"এ ইজমা' কে আরো শক্তিশালী করেছে যে বিষয়টি তা হল; বিশ্বনবী (সা.), আবূ বকর ও উমর (রাঃ)-এর যুগে সাহাবীগণ বাই' সালাম পদ্ধতিতে লেনদেন করেছেন এবং কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সকল মাযহাবের ফকীহ-ই বাই' সালাম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' (ঐকমত্য পোষণ) করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি।[১] উল্লেখ্য যে, এ বৈধতার অন্তর্নিহিত যুক্তি হচ্ছে, মানুষের বাস্তব প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধন। মাকাসিদ আশ-শরীআহ্ অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের কঠোরতা দূর করে সহজতা আনয়ন। অভাবী লোকদের অভাব পূরণের জন্য ইসলামী শরীআহ্ বাই' সালামকে বৈধতা দিয়েছে। এ কারণে বাই' সালাম কে মাহাভীজও বলা হয়।[২]

❒ বাই'সালামের বৈশিষ্ট্য

ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে বাই'সালামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ [৩]:

১. অগ্রিম ক্রয়, Price paid in advance, goods deferred;
২. অগ্রিম গৃহীত অর্থের দ্বারা মাল তৈরি করে সরবরাহ করা হয় বিধায়;
৩. মালামালের সম্পূর্ণ দাম চুক্তির সময়ই দিতে হয়;
৪. দ্রব্য-সামগ্রীর অস্তিত্ব ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ;
৫. দ্রব্য-সামগ্রীর অস্তিত্ব থাকলে বাই'সালাম হবে না। সেক্ষেত্রে বাই'মুয়াজ্জাল বা বাই'মুরাবাহা প্রযোজ্য এবং
৬. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, একক প্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
৭. বাই' সালামের পণ্য (ফানজিবল) পরিমাণযোগ্য, ওজনযোগ্য, গণনাযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে

❒ বাই'সালামের শর্তাবলি

বাই'সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ : [৪]

১. শরীআহ্‌সম্মত চুক্তি ও সাক্ষী;
২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, একক প্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে;
৪. মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে;
৫. চুক্তি সম্পাদনের সময় মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে;
৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন আদান-প্রদান করা যেতে পারে;
৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সর্ম্পূণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রীম গৃহীত সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এবং
৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে। উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরী নয়।

❒ প্যারালাল (Parellel) সালাম

যদি সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের পণ্য তৃতীয় কোনো বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে তবে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে (Parellel) সালাম বলে। প্যারালাল সালামে দু'টি আলাদা এবং স্বাধীন চুক্তির অস্তিত্ব থাকবে। এই দু'টি চুক্তির একটি অপরটির সম্পুরক হবে না।

---

১. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহুল বুখারী কিতাবুস-সালাম, ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, কিতাবুস-সালাম।
২. আস-সাইয়িদ সাবিক্, *ফিকহুস-সুন্নাহ* (কুয়েত: দারুল কিতাব আল-আরাবী-১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১২১
৩. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০
৪. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No.* 10, p.171
৫. ibid

Dhaka University Institutional Repository

ইস্‌তিস্‌না
(আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়)

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বাই'পদ্ধতির অন্যতম কৌশল হল ইস্‌তিস্‌না। ইসতিস্‌না এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি যেখানে পণ্য অস্তিত্ব আসার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় সংঘঠিত হয়ে যায়।[১] ইস্‌তিস্‌না পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়র জন্য অপরিহার্য হল, মূল্য উভয়ের সমঝোতা ও সম্মতিতে নির্ধারিত করে নিতে হয় এবং প্রত্যাশিত পণ্য-দ্রব্যের (যা তৈরি করা হবে) প্রয়োজনীয় গুণাবলীও নির্ধারিত করে নিতে হয়।[২]

❐ ইস্‌তিসনা

'ইস্‌তিস্‌না' শব্দটি আরবী 'সানউন' শব্দ থেকে উদ্ভুত। 'সানউন' শব্দের অর্থ শিল্প-কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।[৩] সুতরাং ইস্‌তিস্‌নার অর্থ কোনো উৎপাদানকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ফরমায়েস প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা অথবা কোন সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।[৪]

ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায়ঃ

"অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মতমূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীআহ অনুমোদিত পণ্য-সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারীর বা বিক্রেতার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্য-সামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইস্‌তিস্‌না বলে।[৫]"

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বাই' ইস্‌তিস্‌নার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলোঃ

"Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or buider (contractor) to deliver them to the customer upon completion."[৬]

Islamic Development Bank (IDB) বাই' ইস্‌তিসনার সংজ্ঞায় বলেছে,

"Istisna'a is a contract for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agrees to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured/constructed in conformity with that description within a certain time and for an agreed price."[৭]

❐ সমান্তরাল (Parallel) ইস্‌তিস্‌না

যদি চুক্তিপত্রে এমন কোন শর্ত না থাকে যে ফরমায়েশকৃত মালামাল বিক্রেতা নিজেই তৈরি করবে তবে বিক্রেতা তা সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট চুক্তিকৃত মালামালের অনুরূপ মালামাল সংগ্রহ বা বানিয়ে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সমান্তরাল (Parallel) ইস্‌তিস্‌না বলে। সাধারণত, প্রথম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য (Parallel) ইস্‌তিস্‌না প্রয়োজন হয়।[৮]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
২. ইব্‌ন আবেদীন, *রাদ্দুল মুখতার*, খ.৫, পৃ. ২২৩
৩. আল্লামা ইব্‌ন মানযুর, প্রাগুক্ত,খ. ৫পৃ.৪০৮
৪. আস-সাইয়্যিদ সাবিক্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৫. প্রাগুক্ত
৬. AAOIFI, *Shariah Standard*, Standard No.10, p.180
৭. Saleh Kamel, *Developent of Islamic Banking Activity: Problems and Practices* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998 A.D.), P.123
৮. আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইস্‌তিস্‌না চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে ইস্‌তিস্‌না চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ: [১]

১. মালের দাম অগ্রিম বা এককালীন/ কিংবা কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য;

২. Both delivery of goods & payment of price may be deferred;

৩. ফরমায়েশের ভিত্তিতে মাল তৈরি করানো ও পরে দাম দেয়া বৈধ;

৪. বাই' সালামের ন্যায় ইস্‌তিস্‌না পদ্ধতিতে মালের অস্তিত্ব ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় সংঘঠিত হওয়া শরীআহ্‌সম্মত ও অনুমোদিত এবং

৫. Manufacturing & Construction শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগযোগ্য।

❒ ইস্‌তিস্‌নার শর্তাবলি

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ ইস্‌তিস্‌না পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা শরীআহসম্মত হতে বেশ কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. শরীআহ্‌র নীতি অনুযায়ী ইস্‌তিস্‌না'র অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ চুক্তিটি শরীআহসম্মত চুক্তি ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়া বাঞ্চনীয়;

২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, একক প্রতি দাম, মোট দামসহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে;

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে;

৪. মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত না হলে, পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে;

৫. মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে;

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন আদান-প্রদান করা যেতে পারে;

৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রীম গৃহীত সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এবং

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই হবে। উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো আবশ্যক নয়।

❒ বাই'ইস্‌তিস্‌নার পক্ষে ইসলামী শরীআহ্‌র ভিত্তি

বাই'ইস্‌তিস্‌নায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো জিনিস নির্মাণ বা প্রস্তুত করার চুক্তি করা হয়। আর এই শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া ইসলাম বৈধ করেছে। পারিশ্রমিক কেবল জায়েযই নয় বরং ইসলাম শ্রম ও শ্রমিকের অপরিসীম মর্যাদা প্রদান করেছে। হযরত আবূবকর (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে বিশ্ব নবী (সা.) বলেছেন,

"আমি কয়েক কিরাতের (দিরহামের বারভাগের একভাগ) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।"[৪]

অন্য এক হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন,

"শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তার পরিশ্রমিক আদায় করে দাও।"[৫]

---

১. AAOIFI, *Shariah Standard*, Standard No.11, p.178-179

২. ibid, p.181-182

৩. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪. ইমাম বুখারী, *ছহীহুল বুখারী*, ইমাম মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*
(সূত্র: মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১-এ উদ্বৃত)

৫. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*
(সূত্র: মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২-এ উদ্বৃত)

Dhaka University Institutional Repository

❐ বাই'সালাম ও বাই' ইস্তিসনার পার্থক্য

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ বাই' সালাম এবং বাই' ইসতিস্না পদ্ধতির মধ্যে কতগুলো পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। পার্থক্যগুলো নিম্নের রেখাচিত্রে পাশাপাশি রেখে উল্লেখ করা হল [১]:

বাই'সালাম	বাই'ইসতিসনা
১. চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধিত হয়।	১. নির্ধারিত মূল্য অগ্রিম, এককালীন, কিস্তিতে মেয়াদের মধ্যে আগে বা পরে যে কোন সময় চুক্তির শর্তানুযায়ী পরিশোধিত হতে পারে।
২. মালামাল সব সময় উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন ছাড়া মালামাল অন্য উপায়ে সংগ্রহ করেও সরবরাহ করা যায়।	২. ফরমায়েশ অনুযায়ী মালামাল তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়।
৩. চুক্তি একবার কার্যকরী হলে তা কোনো পক্ষ এককভাবে বাতিল করতে পারে না।	৩. উৎপাদান শুরুর পূর্বে যে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
৪. মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী	৪. মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী নয়।

সবশেষে উল্লেখ্য, বাই ইস্তিস্না সর্বদা এমন জিনিসের উপর হয় যা তৈরী করার প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে সালাম সকল জিনিসেই হতে পারে, চাই তা তৈরি করার প্রয়োজন হোক কিংবা না হোক।[২]

❐ বাই'ইস্তিস্না চুক্তি বাতিল: ইসলামী শরীআহ্র নীতিমালা

পণ্য প্রস্তুতকারী বা তৈরিকারক তার কাজ শুরু করার আগে ইস্তিস্না চুক্তিবদ্ধ পক্ষের যে কোনো একজন নোটিশ প্রদান করে চুক্তি বাতিল করতে পারেন। একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে একপক্ষীয়ভাবে ইস্তিস্না চুক্তি বাতিল করা যায় না।[৪]

❐ বাই'পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত বাই'মুরাবাহা, বাই'মুয়াজ্জাল, বাই'সালাম ও বাই'ইস্তিস্না পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বাই'মুরাবাহা ও বাই'মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে বিক্রেতা বা সরবরাহকারীর কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করে তা সম্মতমূল্যে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে [৫]। অন্যদিকে বাই'সালাম ও বাই'ইস্তিস্নার ক্ষেত্রে সাধারণত কৃষিজাত , শিল্পজাত ইত্যাদি দ্রব্য অগ্রিম ক্রয় করে সরবরাহ প্রাপ্তির পর তা তৃতীয় কোনো বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে অথবা অন্য কোনো পক্ষের নিকট বিক্রি করা হয়[৬]।

---

১. AAOIFI, *Shariah Standard*, Standard No.11, p.180
২. ibid
৩. ড. গরীবুল জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৪. আস-সাইয়্যিদ সাবিক্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা

(অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য)

মুশারাকা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অংশীদারিত্ব পদ্ধতির (Share Mechanism) একটি বিনিয়োগ কৌশল। এ পরিভাষাটি ইসলামী অর্থায়ন (Modes of Financing)-এর ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত ও প্রচলিত [১]। ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে শিরকাত পরিভাষাটির ব্যবহার বেশী হলেও সমসাময়িক ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে 'মুশারাকা' শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে শিরকাত শব্দের তুলনায় মুশারাকা শব্দটির অর্থ সীমিত[২]। মুশারাকা মূলত একটি অংশীদারী ব্যবসা। মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন (Financing) পদ্ধতিও বলা হয়[৩]। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রির পরিবর্তে তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে [৪]।

❒ মুশারাকা ও শিরকাত

'মুশারাকা' আরবী শব্দ 'শিরক' শব্দমূল হতে উদ্ভুত। শিরক হচ্ছে অংশীদারিত্ব [৫]। অংশীদারীত্ব বুঝাতে আরবী ভাষায় 'শিরক' ও 'শিরকাত' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়। [৬]

Islamic Development Bank (IDB)'র প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মুশারাকা বলতে বুঝায়,

"Musharaka is an Islamic financing technique that adopts equity sharing as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entreprenuers, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio).[৭]"

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুশারাকা বিনিয়োগের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits.[৮]"

---

১. ড. মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, *শিরকাত ওয়া মুদারিবাত আসরি হাযির মে* (করাচীঃ ইদারাতুল আ'আরিফ, ২০০৬ খ্রি.) পৃ.১১১
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
৪. প্রাগুক্ত
৫. আল্লামা ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৪
৬. প্রাগুক্ত
৭. Saleh Kamel, ibid, p. 83
৮. AAOIFI, *Shariah Standard*, Standard No.11, p.230-231

Dhaka University Institutional Repository

Bank Company Act (Correction) ১৯৯৫-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"Musharaka means such an agreement under which a portion of capital of anything is provided by a bank conducted in accordance with the Islami Shariah and the other portion is given by the customer and in which profit is distributed in such proportion as mentioned in the agreement and loss is distributed in proportion to the capital."[১]

Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত (প্রস্তাবিত) 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"মুশারাকা এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহার অধীনে কোনো কারবারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের এক অংশ ব্যাংক কোম্পানি এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দিবে। উক্ত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বন্টিত হইবে।"[২]

❒ শিরকাতের প্রকারভেদ

ফিকাহ্শাস্ত্রে শিরকাতকে প্রথম দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:[৩]

ক. শিরকাতুল মিলক এবং খ. শিরকাতুল আকদ

ক. শিরকাতুল মিলক হচ্ছে মালিকানায় অংশীদারীত্ব বা যৌথমালিকানা (Joint Ownership)। যৌথ মালিকানা দু'ভাগে অর্জিত হতে পারে-একটি হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে কোন সম্পদের ওপর একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা অর্জন, এটাকে শিরকাতুল মিল্ক আল-জাবরিয়্যাহ্ বা বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা বলা হয়[৪]। যেমন কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদের ওপর উত্তরাধিকারীদের যৌথ মালিকানা। অপরটি হচ্ছে ঐচ্ছিকভাবে কোন সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা লাভ করা। এটাকে শিরকাতুল মিলক আল-ইখতিয়ারিয়্যাহ বা ঐচ্ছিক যৌথ মালিকানা বলা হয়। যেমন-দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কোন সম্পদ হেবা বা উপহার হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি[৫]।

শিরকাতুল মিলকের ব্যাপারে শরীআহ্র বিধান হচ্ছে, সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে তা মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে মালিকাগণকে বহন গ্রহণ করতে হবে। আর সম্পদ থেকে আয় অর্জিত হলে মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে অথবা পূর্ব চুক্তি মোতাবেক তা মালিকদের মধ্যে বন্টিত হবে[৬]। সকল মালিকের অনুমতি ব্যতীত এককভাবে কেউ সম্পদ ব্যবহার, বিক্রি বা দান করতে পারবেন না[৭]।

খ. শিরকাতুল আক্বদ হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারীত্ব। যেখানে চুক্তিই অংশীদারীত্বের ভিত্তি সেটিই শিরকাতুল 'আকদ[৮]। ব্যবসা পরিচালনার জন্য একাধিক অংশীদার শিরকাতুল আকদ বা অংশীদারী ব্যবসা (Partnership Business) চুক্তির অধীনে একত্রিত হয়। সংক্ষেপে এটাকে Joint Commercial Enterprise বলা যায়। মুশারাকা বলতে সাধারণতঃ এই শিরকাতুল আক্দকেই বোঝানো হয়ে থাকে[৯]।

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
২. সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন থেকে গৃহীত।
৩. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৩৯
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪০
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. ড. গরীবুল জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় :

" সুতরাং যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ ও কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ, ক্ষতি, ভোগ ও বহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে শিরকাত্ আল-আকদ বলা হয়।"[১]

অংশীদারীত্বের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে শিরকাতুল আক্‌দকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে [২]:

ক. শিরকাত আল-মুফাবাদা;

খ. শিরকাত আল-আবদান;

গ. শিরকাত আল উজূহ এবং

ঘ. শিরকাত আল 'ইনান।

ক. শিরকাত আল মুফাবাদা

ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মতে, "যে অংশীদারী ব্যবসায়ে সকল অংশীদার সাবালক হয়, সকলে সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়, প্রত্যেকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সমভাবে বহন করে এবং এভাবেই লাভ ও ক্ষতির বাগীদার হয় তাকে শিরকাত আল-মুফাবাদা বলা হয়।"[৩] এ ধরনের ব্যবসায় অংশীদারগণ প্রত্যেকে অপর সকলের পক্ষে কাজ করে এবং সকলে যৌথ ও পৃথকভাবে ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্ব বহন করে।[৪]

খ. শিরকাত আল-আব্‌দান

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো প্রকার মূলধন যোগান না দিয়ে শুধু তাদের মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করে অর্জিত আয় পূর্ব স্থিরকৃত অনুপাতে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় শিরকাত আল-আবদান বলা হয়[৫]। এ ধরনের ব্যবসাকে শিরকাতু-তাকাব্বুল বা শিরকাত উস সানাই'ও বলা হয়[৬]।

গ. শিরকাত আল-উজূহ

সুনাম, মর্যাদা সম্পন্ন, দক্ষ , অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো মূলধন যোগান না দিয়ে উক্ত গুণাবলির প্রেক্ষিতে বাকী মূল্যে মালামাল ক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করে নেয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলে ঐ ব্যবসা শিরকাত আল-উজূহ নামে অভিহিত।[৭]

ঘ. শিরকাত আল-'ইনান

ফিকাহাবিদদের মতে,. শিরকাত আল-ইনান এমন একধরনের অংশীদারী চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসাবে প্রত্যেকে সম্মতমূলধন যোগান দেয়, চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। অথবা লোকসান হলে স্ব স্ব মূলধন অনুপাতে বহন করে [৮]। এটিকে আবার শিরকাতুল আমওয়ালও বলা হয়।

উল্লেখ্য, এধরনের অংশীদারী ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের সাবালক হওয়া জরুরী নয়। এমনকি প্রত্যেকের সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়া এবং সমভাবে লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হওয়াও কোনো পূর্বশর্ত নয়। অংশীদারগণ অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এবং তারা যৌথভাবে ব্যবসায়ের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ীও হয় না।[৯]

---

১. আস্-সাইয়িদ সাবিক্ব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫
২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. প্রাগুক্ত,
৫. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪০
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪১
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সকল অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা-বাণিজ্য 'শিরকাত' নামে অভিহিত। মুশারাকা-এর কার্যক্রম শিরকাত আল-ইনান-এর কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ[১]। তাই সমসাময়িক ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ শিরকাত আল-'ইনান্‌কে 'মুশারাকা' নামে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত করেছেন। তাই এ পরিভাষাটি ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগ কার্যক্রমে একটি অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে শিরকাত আল ইনান থেকে বেশি পরিচিত লাভ করেছে।[২]

মুলত, মুশারাকা একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলধন যোগান দেয়, কেউ কেউ অথবা সকলে একত্রে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে।[৩]

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকার প্রয়োগ

ইতোমধ্যে আলোচিত মুশারাকার প্রকারগুলোর মধ্যে শিরকাতুল ইনান্‌-এর প্রয়োগ সহজ হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রচলন বেশি। শিরকাতুল ইনানে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া যেমন শর্ত নয়, তেমনি পুঁজি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং লাভ-ক্ষতি গ্রহণে প্রত্যেকের সম-অংশীদারিত্ব আবশ্যক নয়। পুঁজি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, মুনাফা বন্টন ইত্যাদি চুক্তি অনুযায়ী হবে, আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে অংশীদারকেই তা বহন করতে হবে [৪]।

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শিরকাতুল ইনান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্টাংশ প্রদান করে ব্যাংক। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুশারাকা হলে অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যাংকও পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে। ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত গ্রাহকের ওপর থাকে। তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। লাভ-লোকসান চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে ব্যাংক ও অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদাররাই তা বহন করে।[৫]

শরীআহ্‌ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের দিক থেকে এ ধরনের মুশারাকা পদ্ধতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তা হলোঃ [৬]

ক. চলমান বা স্থায়ী মুশারাকা (আল-মুশারাকাতু আল-মুশতামির্‌রা) এবং

খ. ক্রমহ্রাসমান মুশরাকা (আল-মুশারাকাতু আল মুতানাক্বিছা)।

ক. চলমান বা স্থায়ী মুশারাকা (আল- মুশারাকাতু আল-মুশতামির্‌রা)

কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকা চুক্তি করা হলে তাকে চলমান বা স্থায়ী মুশারাকা বলা হয়। ফিক্‌হী পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে মুশারাকা তাম্মা (আল-মুশারাকাতু আত-তাম্মাহ) ও স্থায়ী মুশারাকা (আল-মুশারাকাতু আদ-দায়িমাহ) বলা হয়। [৭] এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন ব্যবসায়ী কোম্পানীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে। হিসাব শেষে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ করে, আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোন মেয়াদ উল্লেখ থাকে না। উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংক ইচ্ছা করলে কোম্পানীতে বিনিয়োগকৃত তার সম্পূর্ণ অথবা শেয়ার অন্যের কাছে বিক্রি করে ব্যবসা থেকে বেরিয়েও আসতে পারে।[৮]

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. AAOIFI, *Shariah Standard*, Standard No.11, p.230-231
৫. ibid
৬. ibid
৭. আত-তামভীল বিল-মুশারাকা, *মায়কাযুল ইক্তিসাদ আল-ইসলামী, আল-মাছারিফুল ইসলামী আদ-দুয়ালী লিল-ইসতিমারী ওয়াত্‌ তানমিয়াহ্‌*, ইদারাতুল বুহুছ, দ্বিতীয় প্রকাশ জেদ্দা, সৌদী আরব, (১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ১১
৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কোন প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করার জন্য অর্থায়ন করতে পারে। মুরধনের শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমেও ব্যাংক কোন চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ জাতীয় স্থায়ী মুশারাকা সাধারণত বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে করা হয়, যদিও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রাহকদেরকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।[১]

খ. ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা (আল-মুশারাকাতু আল-মুতানাক্বিছা)

এটা একটি বিশেষ ধরনের মুশারাকা, যেখানে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের মুনাফার অংশ পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের উপর ব্যাংকের অংশও পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং সাথে সাথে গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২]

এ ধরনের মুশারাকার পরিচিতিতে OIC'র ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে,

এটি একটি নতুন ধরনের মু'আমালা বা বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন আয়বর্ধক বা উৎপাদনশীল প্রকল্পে দু'পক্ষ অংশীদার হয়। অংশীদারদ্বয়ের কোন একপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতার অংশের আয় থেকে তা ক্রয় করা কিংবা অন্য কোন উৎসের অর্থ থেকে তা ক্রয় করা উভয়ই সমান।"[৩]

এ ধরনের চুক্তির মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের শেয়ার মূলধনকে কিছুসংখ্যক এককে বিভক্ত করা হয় এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে প্রত্যেকটি একক ক্রয় করার জন্য অঙ্গকিারাবদ্ধ হয়। এভাবে ক্রয়ের ফলে গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেয়াদান্তে গ্রাহক সম্পদের বা ব্যবসার সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করে।[৪]

উল্লেখ্য, যে সকল সম্পদ থেকে নিয়মিত আয় হওয়া সম্ভব সে সমস্ত ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে সম্পদের উপর গ্রাহকের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা অর্জন সম্ভব বিধায় এটা গ্রাহককে উৎসাহিত করে।

❒ মুশারাকা বৈধ হওয়ার পক্ষে শরীআহ্‌র ভিত্তি

মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন শরী'আহসম্মত ও অনুমোদিত। তা আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

আল-কুরআনের নিম্নরূপ বাণীতে মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়ন এর বৈধতা প্রমাণিত।

"অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে থাকে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ নয় এবং এদের সংখ্যা কম।"[৫]

শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে, আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে এক অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতি যে অবিচার করে থাকে তা উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল অংশীদার যে অন্য অংশীদারের প্রতি অবিচার করেন না তাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ অংশীদারদের অংশীদারি ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনুমোদন করেছেন। অংশীদারী বা মুশারাকা ব্যবসা অবৈধ হলে আল্লাহ তা'আলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।[৬]

মুশারাকা ব্যবসা সম্পর্কে বিশ্বনবী (সাঃ) এর একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৩. *ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি, অর্থনৈতিক ও শরী'আহ্ বিষয়ক মিসরীয় গবেষণা প্রবন্ধ*, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ খ্রি./১৪ মহররম ১৩৯২ হি. জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থাপিত।

৪. প্রাগুক্ত

৫. আল-কুরআন, ৩৮:২৪, এ ছাড়াও আল-কুরআনের ৩৯:১৯, ১৮:১৯, ৪:১২, ২০:৩১-৩২ এবং ৮:৪১-এ সন্নিবেশিত আল্লাহর বাণীসমূহ মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বীকৃতি প্রদান করে।

৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুইজন অংশীদারের (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন ব্যবসা করলে তাঁদের) মধ্যে আমি (আল্লাহ) তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে অন্যের প্রতি কোনরূপ খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাই।"[১]

সায়েব ইবন আবি সায়েব আল-মাখযুমী নবী (সা.) এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিতি হলে রাসূল (সা.) তাকে বলেছিলেন,

"আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে স্বাগত যে তাঁর অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ ও বিবাদে লিপ্ত হয় না।"[২]

অন্য একটি হাদীসে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন,

"দু'জন অংশীদারের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত থাকে যতক্ষণ তারা একে অন্যের খিয়ানত করে না।"[৩]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন, ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টির বৈধতা প্রমাণিত এবং নি:সন্দেহে অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য একটি শরীআহ্সম্মত ব্যবসা পদ্ধতি।[৪] মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের পথ প্রশস্ত করার জন্যই ইসলামে অংশীদারী কারবারকে বৈধ করা হয়েছে। আল্লামা ইবন কুদামাহ্ বলেন, "মোট কথা হল, শিরকাত পদ্ধতিতে ব্যবসা করা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্র 'ইজমা রয়েছে।"[৫]

❒ মুশারাকার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :[৬]

১. দুই বা ততোধিক ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পুঁজি যোগান দেয়;
২. সকলেরই ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকে;
৩. লাভ হলে সম্মত হারে ভাগ করে নেয়া হয়;
৪. লোকসান হলে পুঁজির আনুপাতিক হারে সকলেই বহন করে এবং
৫. পুঁজি রূপান্তরের ও ঝুঁকি সকলেই বহন করে।

❒ মুশারাকার শর্তাবলি

মুশারাকা বা শিরকাত আল-ইনান অংশীদারদের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মুশারাকা চুক্তি সঠিক ও শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলী রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ[৭]:

১. চুক্তি সম্পর্কিত শর্ত : মুশারাকা ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে চুক্তি। শরীআহ্সম্মত চুক্তি ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে চুক্তি সম্পন্ন হতে হবে। চুক্তিতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।
২. মূলধন সম্পর্কিত শর্তাবলি:

ক. অংশীদারগণ সম অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে;

---

১. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ, সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৯৩৬
২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩২৩৪
৩. আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, আহমদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, বায়হাকী, শিরকাত অধ্যায় ১:৭৮
৪. মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫. আল্লামা ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী, কিতাবুশ্-শিরকাত
৬. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৫
মাওলানা মহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, ১৫০-১৫৮
আস-সাইয়িদ সাবিক্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮-৫৯
Shaid Hasan Siddiqui, Ibid, p. 77-78
ড. মাইয়েদ আল হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত

Dhaka University Institutional Repository

খ. মূলধন নগদে অথবা সম্পদেও দেয়া যায়। তবে সম্পদ হলে তা দক্ষ পেশাদার মূল্যায়নকারী দ্বারা মূল্যায়ন করে অংশীদারদের সম্মতিতে নির্ধারিত হতে হবে। এই নির্ধারিত মূল্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদারের শেয়ার মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. অংশদিারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিল এবং সত্তা হিসাবে পরিগণিত হয়।

ঘ. 'লাভের জন্য ঝুঁকি' এই নীতির উপর ভিত্তি করে মুশারাকা ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কোন অংশীদার অপর অংশীদারের মূলধনের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

২. অংশীদারদের ক্ষমতা সম্পর্কিত শর্ত

এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে সকলকেই যথাযথ সাবধানতা ও সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে অন্যান্য অংশীদারের স্বার্থহানি না হয় এবং কোনো প্রকার অবহেলা, অসদাচরণ, চুক্তির পরিপন্থী কোনো কাজ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক অংশীদারের মুশারাকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির অধিকার স্বীকৃত থাকা আবশ্যক।

৩. ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শর্ত

সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সম্মত হলে যেকোনো একজন অথবা সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো বাধা নেই।

উল্লেখ্য, যদি সকলে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকের কাজ সকলের কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

৪. লাভ-লোকসান সম্পর্কিত শর্তাবলি

ক. লাভ পরিমাপযোগ্য হতে হবে, অন্যথায় লাভ বন্টনের সময় অথবা চুক্তি বিলুপ্তির সময় বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

খ. অর্জিত লাভের উপর মুনাফা বন্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে। মূলধনের উপর কোনো নির্ধারিত হার অথবা কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংক মুনাফা বন্টনের ভিত্তি হতে পারবে না।

গ. চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদার মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় বেশি হতে পারে। তবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঘ. কোনো সক্রিয় অংশীদার মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় বেশি হতে পারে তবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঙ. সকল অংশীদার সক্রিয় হলেও মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সকলের সম্মতিতে তাদের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত কম-বেশি হতে পারে।

চ. ব্যবসায়ের লোকসান সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব স্ব মুলধন অনুপাতে বন্টিত হবে।

৪. মুশারাকা চুক্তি পরিসমাপ্তি সম্পর্কিত শর্তাবলি

ক. উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মুশারাকা বিলুপ্তি ঘটে।

খ. চুক্তির শর্তানুযায়ী কোন অংশীদার যে কোনো সময় অন্য অংশীদারদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুশারাকার বিলোপ ঘটাতে পারে।

গ. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অথবা কোনো অংশীদার বিকৃত মস্তিস্ক, উন্মাদ, পাগল, কান্ডজ্ঞানহীন বা এ রকম হলে এবং ব্যবসা পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হলে মুশারাকা ব্যবসায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঘ. যদি কোনো অংশীদার ব্যবসায়ের বিলোপসাধন চায়, পাশাপাশি অন্যরা ব্যবসা চালু রাখার পক্ষপাতি তখন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা চালু রাখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবা

(স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা ভাগাভাগিতে বিনিয়োগ)

ইসলামী ব্যাংকসমূহে 'মুদারাবা হল; অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়ন বা বিনিয়োগের একটি বিশেষ পদ্ধতি। 'মুদারাবা' শব্দটি 'দারবুন' শব্দমুল হতে উদ্ভুত। প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা প্রভৃতি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] আল-কুরআনে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

ইসলামী শরীআহ'র পরিভাষায়,

মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি ব্যবসা যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা, দক্ষতা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বন্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়"।[৩]

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুদারাবার নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে :

"মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্ত) শ্রম দেয়।"[৪]

মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে ছাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল আর ব্যবসা পরিচালনাকারী পক্ষকে মুদারিব বলা হয়। উল্লেখ্য, মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবদ্বয়ের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবদ্বয়ের অনুসারীরা মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন।[৫]

Islamic Development Bank (IDB) মুদারাবার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো:

"Mudaraba is a form of partnership share one party (Sahib al-Maal/Rabbul Maal) provides the fund while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Mangger). Any profit accrued is shared between the two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively born by the partner providing the capital (Sahib al-Maal)".[৬]

---

১. আল্লামা ইবন মানযুর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭৮
২. আল-কুরআন, ৭৩:২০
৩. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৬২৩
৪. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No-13, P. 238
৫. ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৬. Ausaf Ahmed, *Development and Problems of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI/IDB 1993 A.D), p. 97

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক কোম্পানি আইন (সংশোধন) ১৯৯৫-এ মুদারাবা বিনিয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"Mudaraba means such an agreement in terms of which a bank conducted in accordance with the Islamic Shariah provides capital for anything and the customer employs his efficiency, efforts, labour and intelligence."[১]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মুদারাবা ম্যানুয়ালে মুদারাবা সম্পের্কে বলা হয়েছে,

" Mudaraba is a partnership in profit where by one party provides capital and the other party provides skill and labour. The provider of capital is called 'Sahib al Maal' while the provider of skill and labour is called Mudarib." [২]

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত (প্রস্তাবিত) 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"মুদারাবা বলিতে এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বুঝাইবে, যাহাতে একপক্ষ মূলধন যোগান দিবে আর অন্যপক্ষ তাহার দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা কাজে লাগাইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিবে। মূলধন সরবরাহকারীকে 'সাহিবুল মাল' ও ব্যবহারকারীকে 'মুদারিব' বলা হয়। প্রাপ্তমুনাফা চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাতের ভিত্তিতে উভয়পক্ষের মধ্যে বন্টিত হইবে। কোনো ক্ষতি হইলে সাহিবুল মাল ক্ষতি বহন করিবে, তবে যদি সেই ক্ষতি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভংগের কারণে হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুদারিবকে ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। সাহিবুল মাল মুদারাবা চুক্তির অধীনে পরিচালিত ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।"[৩]

❒ আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'তে মুদারাবার ভিত্তি

মুদারাবার (স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা ভাগাভাগিতে বিনিয়োগ) ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যে কোনো বিনিয়োগে অর্থায়ন ইসলামে অনুমোদিত ও স্বীকৃত। তা আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত।

আল্লাহ'র বাণী : "অন্যরা ভ্রমণ করবে পৃথিবীতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে।"[৪]

আল-কুরআনের উক্ত আয়াত মুদারাবার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত বলে শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫] শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে, উল্লিখিত আয়াতে বিশ্বনবী (সা.)-এর সেসব সাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এসব ব্যবসায়ীর অনেকে মুদারাবার ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি নিয়ে মুনাফার লক্ষ্যে ভ্রমণ করতেন। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করা এ পদ্ধতি শরীআহ্সম্মত হওয়ার প্রকৃষ্ট ভিত্তি।[৬]

❒ সুন্নাহ'র ভিত্তি

জাহিলিয়াতের যুগে আরব সমাজে মুদারাবাহ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। বিশ্বনবী (সা.) নবুওয়াত লাভের পূর্বে মুদারাবার ভিত্তিতে হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট থেকে অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করতেন। পরবর্তীতে বিশ্বনবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমগণ এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন।[৭]

---

১. *Mannual for Investment under Mudaraba mode*, Published by Islami Bank Bangladesh Limited, p. 1
২. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
৩. প্রাগুক্ত
৪. আল-কুরআন, ৭৩:২০
৫. ইবন মাস'উদ আল-কাছানী, বাদায়ি'উস সানাঈ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.), খ.৫, পৃ. ৭৯
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বায়হাকী সংকলিত হাদীসগ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (ইব্ন আব্বাস) কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করলে মুদারিরের ওপর শর্ত আরোপ করতেন যে, তার মালামাল নিয়ে মুদারিব সমুদ্র পথে যাতায়াত করতে পারবেন না। এরূপ করলে তিনি দায়ী থাকবেন। ইবন আব্বাস (রা.) কর্তৃক এরূপ শর্ত করার বিষয়টি রাসূল (সা.)-কে জানানো হলে তিনি তা বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[১]

অন্য একটি হাদীসে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন,

"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকীতে বিক্রি, মুকারাদাহ (মুদারাবাহ) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।"[২]

❐ ইজ্‌মা'

একদল সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের হেফাজতে থাকা ইয়াতিমের সম্পদ মুদারাবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) ইবন মাসউদ (রা.), উমর (রা.)-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ (রা.), আয়েশা (রা.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের সমসাময়িক কেউ এর বিরোধিতা করেননি। শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এভাবে মুদারাবা পদ্ধতি বৈধ হওয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩]

❐ মুদারাবার শ্রেণীবিন্যাস

ফকীহ্‌গণ চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবা ব্যবসাকে দু'ভাগে করেছেন :[৪]

ক. সাধারণ মুদারাবা (আল-মুদারাবাতু আল-মুতলাক্বা) এবং

খ. বিশেষ বা শর্তযুক্ত মুদারাবাহ (আল-মুদারাবাতু আল-মুক্বাইয়্যাদাহ)।

ক. সাধারণ মুদারাবাহ (আল-মুদারাবাতু আল-মুতলাক্বা)

যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবকে কোনো রূপ শর্ত আরোপ ছাড়াই সাহিব আল-মাল (পুঁজি সরবরাহকারী পক্ষ) কর্তৃক ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয় তাকে সাধারণ মুদারাবা বা আল-মুদারাবাতু আল-মুতলাক্বা বলা হয়।[৫]

খ. বিশেষ বা শর্তযুক্ত মুদারাবাহ (আল-মুদারাবাতু আল-মক্বাইয়্যাদাহ্)

যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবের কোনোরূপ অযাচিত চাপ প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাহিব আল-মাল ব্যবসায়ের ধরন, মেয়াদ, স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে বিশেষ মুদারাবা বা আল-মুদারাবাতু আল-মুক্বাইয়্যাদাহ বলা হয়।[৬]

---

১. ইব্ন মাসউদ আল-কাছানী, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৭৯
২. ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্, সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুত-তিজারাহ
৩. আস-সাইয়্যিদ সাবিক্ব, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২০৬
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২০৭
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুদারাবার বৈশিষ্ট্য

মুদারাবা অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ ব্যবসায়িক পদ্ধতি। যে অংশীদারিত্বের এক শরীক অপরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহ করে। এ পদ্ধতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ: [১]

১. মূলধন যোগানদাতাকে সাহিব আল-মাল বা রাব্বুল মাল এবং উদ্যোক্তাকে মুদারিব বলা হয়;
২. একপক্ষের পুঁজি আর একপক্ষের শ্রম;
৩. লাভ হলে চুক্তি অনুসারে ভাগ করে নেয়া হয়;
৪. লোকসান হলে তা পুঁজির মালিককে বহন করতে হয়;
৫. পুঁজির মালিক অংশীদার হিসেবে পুঁজি দিয়ে বিনিয়োগ করে, এবং
৬. পুঁজি সরবরাহকারী পক্ষকে পুঁজির ঝুঁকি নিতে হয়।

❒ মুদারাবার শর্তাবলি

মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিনিয়োগ শরীআহ্সম্মত হওয়ার জন্য চুক্তি, মূলধন, জামানত ও লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। ফিকাহবিদ্দের মতে শর্তগুলো নিম্নরূপ : [২]

ক. চুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. দুটি পক্ষ। মূলধন সরবরাহকারী সাহিব আল-মাল অপর পক্ষ মুদারিব যিনি শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও সময় দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে।
২. চুক্তিটি শরীআহ্সম্মত পদ্ধতিতে সাক্ষীসহ সম্পন্ন হতে হবে।
৩. মুদারাবা চুক্তির উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি নিয়োগ অথবা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে।
৪. সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুদারাবা চুক্তি নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত পক্ষদ্বয়ের যে কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী বিলোপ করতে পারে।
   ক. মুদারিব কর্তৃক ব্যবসা ইতোমধ্যে শুরু করা হয়ে থাকলে চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষ মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি টানতে পারবে না।
   খ. উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোনো পক্ষ এককভাবে মুদারাবা চুক্তি বিলোপ করতে পারবে না।
৫. মুদারাবা একটি বিশ্বস্ততার চুক্তি। মুদারিব বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করবে। অবহেলা, অব্যবস্থা, অসাদচরণ ও চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে লোকসান হলে তার জন্য দায়ী হবে না।

❒ মূলধন সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. মুদারাবা মূলধন অর্থে দেয়া উচিত। মূল্যায়নের ভিত্তিতে পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে বাস্তব সম্পদও মুদারাবা ব্যবসায়ে মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।
২. মূলধনের পরিমাণ, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ও নির্ধারিত থাকতে হবে।
৩. সাহিব আল-মালের কাছে মুদারিব বা অন্য কারোও দেনা মুদারাবা ব্যবসার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে না।
৪. মুলধন সম্পূর্ণ অথবা ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে চুক্তির শর্তানুযায়ী পর্যায়ক্রমে মুদারিব তার ইচ্ছামাফিক মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫১
ড. মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১
আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২৫-৬৩০ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. Dr. M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulations and Supervision of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI/IDB, 2000 A.D), p. 130
ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

❒ জামানত সংক্রান্ত শর্ত

পুঁজির যোগানদাতা বা সাহিব আল-মাল মুদারিবের কাছ থেকে যৌক্তিক ও আদায়যোগ্য জামানত নিতে পারে; তবে শর্ত থাকে যে, মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থা, চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে জামানত কার্যকরী করা যাবে না।

❒ লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. উভয় পক্ষের সম্মতিতে মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারণ করে চুক্তিপত্রে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২. পরবর্তীতে মুনাফা বন্টনের অনুপাত পক্ষগণের সম্মতিতে পরিবর্তন করা যায়।

৩. যদি চুক্তিতে মুনাফা বন্টনের অনুপাত উল্লিখিত বা নির্ধারিত না থাকে সেক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মুনাফা ভাগ করে নেবে। যদি তাও সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য হবে। মুদারিব যে শ্রম বিনিয়োগ করেছে তার জন্য সাধারণ বাজার দর অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে।

৪. মুদারাবা ব্যবসায়ের মূলধন অক্ষত অবস্থায় না থাকলে মুনাফার স্বীকৃতি দেয়া বা দাবি করা যায় না।

৫. মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তিতে ব্যবসায়ের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর মুনাফা-বন্টন নির্ভর করে। চূড়ান্ত হিসাবান্তে যদি লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় প্রকৃত ক্ষতি সাহিব আল-মালের মূলধন থেকে বাদ যাবে। যদি মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, অসদাচরণ, চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ক্ষতি হয় তবে ট্রাষ্টি হিসেবে মুদারিব উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী হয় না।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ: আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে

ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই মুদারাবা পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট সুদ প্রদানের শর্তে জমাকারীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকের সাথে জমাকারী (Depositor)-এর সম্পর্ক হয় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহিতার সম্পর্ক (Debtor-Creditor Relationship)। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক জমাকারীদের অর্থ শরীআহ্ অনুমোদিত হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ নির্দিষ্ট অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টন করে। আর লোকসান হলে জমাকারীকেই তা বহন করতে হয়। এখানে ইসলামী ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে সম্পর্ক হয় মুদারিব ও ছাহিবুল মালের সম্পর্ক। ইসলামী ব্যাংক মুদারিব বা ব্যবসা পরিচলনাকারী উদ্যোক্তা আর জমাকারী হচ্ছেন ছাহিবুল মাল বা মুলধনের যোগানদাতা।[১]

জমাকারীদের টাকা ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে তা মুদারাবা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হয়।[২] ব্যাংকের হিসাব চূড়ান্তকরণের পূর্বে জমাকারীর হিসাবে সাময়িক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বছর শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার সময় জমাকারী আরো মুনাফা পাওনা হলে তা তাঁর হিসাবে প্রদান করা হয় আর ব্যাংক তাঁর কাছে পাওনা হলে তিনি তা ব্যাংকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।[৩]

---

১. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মুহাম্মদ শাসুদ্দোহা, সম্পাদনায় প্রফেসর ড. আবূ বকর রফীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

২. প্রাগুক্ত,

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শরী'আহ্সম্মত এ মুদারাবা নীতিতে ইসলামী ব্যাংকে বিভিন্ন ধরণের জমা হিসাব খোলা যায়। এর মধ্যে রয়েছেঃ[১]

১. মুদারাবা বিশেষ নোটিশ হিসাব ;
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ;
৩. মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (MTDR) ;
৪. মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব ;
৫. মুদারাবা সেভিংস বন্ড ;
৬. মুদারাবা বিশেষ (পেনশন) হিসাব ;
৭. মুদারাবা মাসিক মুনাফা-ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব ;
৮. মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব এবং
৯. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব ইত্যাদি।

❒ ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

ইসলামী ব্যাংকসমূহে জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হলেও সমাজে সততা ও নৈতিকতার অভাবসহ আরো কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর অনুশীলন এখানো সীমিত রয়েছে। মুদারাবা পদ্ধতিতে ছাহিবুল মাল বা পুঁজির মালিককে সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হয়। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করলে ব্যাংক হবে পুজিঁর মালিক আর বিনিয়োগ গ্রাহক হবেন মুদারিব। মুদারিব বা বিনিয়োগ গ্রাহকের ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে তার পুরোটা ব্যাংককেই বহন করতে হবে। মুদারাবা কারবারের পুজিঁ প্রদান ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে মুদারিবই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই সৎ ও দক্ষ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে মুদারিব (উদ্যোক্তা) হিসেবে নির্বাচন করা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মুদারিব সৎ না হলে তিনি লাভ-লোকসানের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ছাহিবুল মালকে ঠকাতে পারেন। এমতাবস্থায়, ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে তা ব্যাংককেই বহন করতে হবে। ক্ষতিটা মুলত জমাকারীদের ওপরই বর্তাবে। এ জন্য ব্যাংক মুদারাবা কারবারে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।[২]

সমাজে সততা ও নৈতিকতার অভাবসহ আরো কিছু বাস্তব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মুদারাবা অনুশীলন করছেঃ[৩]

১. যেসব ইসলামী ব্যাংকে আমানতের চাহিদা রয়েছে তাদেরকে মুদারাবা পদ্ধতিতে ফান্ড প্রদান করে থাকে সেসব ইসলামী ব্যাংক যাদের অতিরিক্ত পুঁজি রয়েছে। এক্ষেত্রে ফান্ডদাতা ইসলামী ব্যাংক ছাহিবুল মাল ও ফান্ডগ্রহিতা ইসলামী ব্যাংক মুদারিব হিসেবে কাজ করে। ফান্ডগ্রহিতা ব্যাংক ফান্ডদাতা ব্যাংককে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে মুনাফা দিয়ে থাকে।

২. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত 'মুদারাবা বন্ড' ক্রয় করে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ফান্ড বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী পুনঃমুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে অর্জিত লাভ বন্ড-ক্রেতা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বন্টন করে থাকে।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য ঃ

মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থায়নে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :[১]

মুশারাকা	মুদারাবা
১. সকল অংশীদার মূলধন যোগান দেয়।	১. শুধু সাহিবুল মাল মূলধন যোগান দেয়।
২. সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।	২. শুধু মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালিত হয়। সাহিবুল মালের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোন অধিকার নেই।
৩. সকল অংশীদার মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করে।	৩. সাধারণত মুদারিব কোন আর্থিক ক্ষতি বহন করে না।
৪. সাধারণত অংশীদারগণের দায় সীমাহীন। এ জন্য সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত দায় প্রত্যেক অংশীদারকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়।	৪. যদি সাহিবুল মাল মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় তবে তা (সাহিবুল মাল এরর) দায় মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে।
৫. মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগণের যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হয়। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের মূল্য (যদি হয়) সুবিধা সকলে পেয়ে থাকে।	৫. মুদারিব শুধু ব্যবসায়ে লাভের ভাগিদার, তাই সে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির কোন অংশ পায় না। এটা সাহিবুল মালের প্রাপ্য।

ইজারা

(Leasing, Hiring or Renting Mechanism)

শরীআহ্‌ভিত্তিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে ইজারা। এর অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগুলো হল ;

ক. ইজারা বা লিজিং

খ. ভাড়ায় ক্রয় বা হায়ার পার্চেজিং, এবং

গ. হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বা আল-ইজারাতু বিল-বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক।[২] পর্যায়ক্রমে এই তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হল :

ক. ইজারা

আল-ইজারাতু শব্দটি আরবী 'আজরুন' বা 'উজরাতুন' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হল, প্রতিদান, আয়, মজুরী ভাড়া ইত্যাদি [৩]। ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি, যেখানে ভাড়া গ্রহীতা নির্দিষ্ট ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়া গ্রহীতার নিকট থেকে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে [৪]।

ইসলামী শরীআহ্‌র পরিভাষায়,

"যে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় অথবা তৈরি করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাকে ইজারা বলে।[৫]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯
মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্তম পৃ,২৮৮-২৯০
আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৩. আল্লামা ইব্‌ন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮৪

৪. প্রাগুক্ত

৫. আল্লামা আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, খ.৩, পৃ. ৬৫৫

Dhaka University Institutional Repository

খ. হায়ার পার্চেজ বা ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া (আল-ইজারাতু বিল-বাই')

ফিকাহবিদদের মতে,

"যে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে একপক্ষ সমুদয় মূলধন যোগান দিয়ে কোনো স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তির মালিকানা অর্জনপূর্বক তা নির্ধারিত ভাড়ায় ও আসল অর্থ নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে অন্য পক্ষের নিকট ভাড়া দেয় বা বিক্রি করে তাকে হায়ার পার্চেজ বা আল-ইজারাতু বিল-বাই' বলে।"[১]

এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :[২]

১. পুঁজি দ্বারা মালক্রয় বা তৈরি করে মালের মালিক হওয়া;

২. হস্তান্তরযোগ্য মালের ঝুঁকি বহন করা এব ং

৩. দাম সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিক থাকা।

উল্লেখ্য, ইজারা পদ্ধতিতে শ্রম গ্রহণকারীকে মুছতাজির (ইজারাদার) এবং শ্রমদাতাকে আজীর (শ্রমিক) এবং প্রাপ্ত আয়কে উজরাত বা ভাড়া বলা হয়।

গ. হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে ইজারা বিল বাই' তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক। এটি ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি শরীআহ্‌সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইংরেজীতে Hire Purchase Under Shirkatul Meelk এবং আরবীতে আল-ইজারাতু বিল বাই'তাহ্‌তা শিরকাতিল মিলক নামে পরিচিত[৩]। লিজিং এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতিটি অনুশীলন করে থাকে। অবশ্য বিশ্বের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ইজারা বিল বাই তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক এর পরিবর্তে আল-ইজারাতু আল-মুন্‌তাহিয়া বিত-তামলিক পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকে[৪]।

❐ আল-ইজারাতু বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিলক

ইজারা বিল বাই' তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। পদ্ধতিগুলো হল[৫];

ক. ইজারা; খ. বাই' এবং গ. শিরকাতুল মিলক।

এখানে ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিটি মূখ্য। বাকী পদ্ধতি দু'টি হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া। এই বিনিয়োগ পদ্ধতিতে তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে হাইব্রীড বিনিয়োগ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন।[৬]

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে কোন সম্পদের মালিকানা অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হয় গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শরীআহ্‌র দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়ার কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।[৭] বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোন অসুবিধা নেই।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

২. Munawar Iqbal, *Islamic Banking and Finance: Current Develpment in Theory and Practice* (Leicester: The Islamic Foundation 2001 A.D), p. 77

৩. ibid

৪. ibid

৫. AAOIFI, *Shariah Standard, Standard No*-9, P. 131

৬. ibid

৭. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইজারা পদ্ধতিতে বিনিয়োগে শরীআহ্‌র ভিত্তি

ইজারা বিল বাই' তাহ্‌তা শিরকাতিল মিল্‌ক-এ ইজারা, বাই ও শিরকাতুল মিল্‌ক এ তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে এ পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বাই ও শিরকাতুল মিল্‌ক-এর বৈধতার পক্ষে শরীআহ্‌র ভিত্তি সম্পর্কে ইতোমধ্যে বাই ও শিরকাত শীর্ষক শিরোনামে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং এ পর্যায়ে ইজারা সম্পর্কে শরীআহ্‌র ভিত্তি নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হল:

ইজারা বৈধ হওয়ার পক্ষে শরীআহ্ বিশেষজ্ঞগণ আল-কুরআনের যে আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা হল: "তুমি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত কর তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই উত্তম।"[১]

তাফসীর বিশেষজ্ঞদের মতে, উল্লিখিত আয়াতে হযরত শুয়াইব (আ.) কর্তৃক হজযরত মূসা (আ.) কে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ইজারা বৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।[২]

❒ সুন্নাহ্'র ভিত্তি

বিশ্ব নবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার সময় পথ দেখানোর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন।[৩]

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

"আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন সকলেই মেষপাল চরিয়েছেন। তখন বিশ্ব নবী (সা.)-এর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও কি মেষ চরিয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি নির্ধারিত মুদ্রার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম।"[৪]

অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হিজরতের বর্ণনায় বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর (রা.) বনু দীল গোত্রের একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শককে ভাড়া করেন।"[৫]

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর আগেই প্রদান করবে।"[৬]

অতএব আল-কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা শরীআহ্‌সম্মত। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের মজুরি হচ্ছে তার সেবার বিনিময় মূল্য। শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বা সেবা বিক্রি করে থাকে। ইসলামী শরীআহ্'তে এটাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

❒ হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক-পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক যৌথমালিকানায় নির্ধারিত অংশ অনুপাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে নির্ধারিত সম্পদ ক্রয় করেন।

২. অংশীদারদের সম্মতির ভিত্তিতে ক্রয়কৃত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন তাদের যে কোনো একজন অথবা তৃতীয় পক্ষের নামে করা যায়।

৩ এ পদ্ধতিতে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেয়া হয়।

---

১. আল-কুরআন, ২৮:২৬
২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৩. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল-ইজারাহ।
৪. মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৯৬-এ উদ্বৃত
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৬ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করে না তবে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ঐ সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

৫. এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমশ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তার পূর্ণমালিকানা অর্জিত হয়।

৬. ব্যাংকের মালিকানাধীন কোন অংশ গ্রাহকের নিকট বিক্রি এবং হস্তান্তর হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক ঐ অংশের কোনো ভাড়া পায় না।

৭. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগ গ্রাহক পূর্ণ মালিকানা অর্জন করতে পারে।

৮. ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের স্ব স্ব পুঁজির অনুপাতে সম্পদের ঝুঁকি বহন করে।

৯. ব্যবহারকারী হিসেবে সম্পদটি ভালো এবং সচল অবস্থায় রাখার দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১০. ব্যাংকের লিখিত অনুমতি ছাড়া গ্রাহকের সম্পদের কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও স্থানান্তর ইত্যাদি করতে পারে না।

❒ হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক-এর শর্তাবলি

মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান যাকে বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় Hire Purchase Under Shirkatul Meelk সংক্ষেপে HPSM বলা হয়, বিনিয়োগ পদ্ধতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার শরীআহ্সম্মত হওয়ার বিষয়টি কিছুশর্তের উপর নির্ভরশীল। ফিকাহ্বিদদের মতে সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো নিম্নরূপ: [১]

১. যৌথ মালিকানায় অর্জিত সম্পদ এবং ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহৃত সম্পদের মুনাফা, সুবিধা কিংবা সেবা পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে হবে। যৌথমালিকানায় অর্জিত সম্পদ Non Fungible হতে হবে যা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে।

২. যৌথমালিকানায় অর্জিত সম্পদটি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে এবং ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির শর্তানুসারে সম্পদ ব্যবহার করবে।

৩. সম্পদ এবং তার থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা সেবা ইসলামী শরীআহ্র নীতিমালা অনুযায়ী হালাল হতে হবে।

৪. সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী হতে হবে, চুক্তির মেয়াদ এবং প্রতি একক সময়ের ভাড়ার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. চুক্তি যখনই হোক না কেন, সম্পদের দখল হস্তান্তরের দিন থেকে ভাড়া গণনা শুরু হবে। চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে অথবা কিস্তিতে পরিশোধিত হতে পারে।

৬. চুক্তির মেয়াদ অথবা ভাড়ার পরিমাণ অথবা উভয় পারস্পরিক সম্মতিতে পুনঃনির্ধারিত হতে পারে।

৭. ভাড়া গ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাষ্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই সম্পদটি তার অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস না হলে তার জন্য ভাড়া গ্রহীতা দায়ী হবে না।

৮. চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের মৌলিক মেরামত, সংরক্ষণ বা কোনো স্থায়ী যন্ত্রাংশের পরিবর্তন যে কেউ করতে পারবে।

---

১. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৫৮-৬৬৩
ড. মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৭ থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।

Dhaka University Institutional Repository

৯. চুক্তি অথবা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী না হলে ভাড়া গ্রহীতা সম্পদটি অন্য কারোও কাছে পুনরায় ভাড়া প্রদান করতে পারবে।

১০. মেয়াদ শেষে ভাড়া গ্রহীতা সম্পদটি মালিকের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য। তবে পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে চুক্তি নবায়ন হতে পারে কিংবা ভাড়া গ্রহণকারী সম্মতমূল্যে সম্পদটি ক্রয় করেও নিতে পারে।

১১. সম্পদটি ধ্বংস বা বিলীন হয়ে না গেলে কোনো এক পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

১২. চুক্তির মেয়াদের মধ্যে মালিক ভাড়া গ্রহীতার কাছে আংশিকভাবে অথবা একত্রে তার অংশ বিক্রি করতে পারে। যেই মাত্র আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সম্পদটি বিক্রি হয়ে যাবে তখনই ভাড়া চুক্তিটি ক্ষেত্র বিশেষে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে।

১৩. ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির মেয়াদের মধ্যে সম্পত্তিটি পর্যায়ক্রমে আংশিকভাবে অথবা মেয়াদান্তে ক্রয় করার এবং মালিকও এভাবে বিক্রি করার অঙ্গীকার করতে পারে।

১৪. ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার থেকে স্বতন্ত্র। ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহারের মূল্য। তাই ভাড়ার পরিমাণকে কখনও দাম বা মূল্যের সাথে এক করা যাবে না।

❒ হায়ার পারচেজ এবং হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত আল-মিলক-এর পার্থক্য

হায়ার পারচেজ ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত আল-মিলক-এর কতগুলো পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:[১]

হায়ার পারচেজ	হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত আল মিলক
১. বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পরই কেবল সম্পদের মালিক হবে।	১. বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের মূলধনের যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করেন, তিনি সম্পদের সে পরিমাণ মালিকানা লাভ করেন।
২. ব্যাংক সম্পদের মালিক বিধায় গ্রাহক যতদিন ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ না করবে, ততদিন ব্যাংক একই হারে ভাড়া আদায় করবে।	২. গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় মালিকের ভাড়ার পরিমাণও কমতে থাকে।
৩. গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সে ঐ পরিমাণ টাকা পরবর্তীতে পরিশোধ করতে পারে। তাতে ব্যাংক অতিরিক্ত কোনো ভাড়া দাবি করতে পারে না।	৩. কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানা বেশি থেকে যায়। ফলে ব্যাংক মালিকানা অনুপাতে ভাড়া আদায় করতে পারে।
৪. কিস্তির টাকা আলাদাভাবে জমা করা হয়।	কিস্তির টাকা মূল বিনিয়োগ হিসাবেই জমা করা হয়।

❒ ইস্তিস্না এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য

বাই'ইস্তিসনা এবং ইজারার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। ফিকাহ্‌বিদদের মতে পার্থক্যটি হল :[২] ইস্তিস্না চুক্তিপত্রে প্রস্তুতকারক স্বয়ং নিজের মাল দ্বারা দ্রব্য তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, সুতরাং এ চুক্তির আওতায় এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয় যে, কাঁচামাল যদি প্রস্তুতকারকের নিকট না থাকে তা হলে সে তা সংগ্রহ করবে এবং কাঙ্খিত জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে কাজ করবে। যদি কাঁচামাল গ্রাহকের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়, প্রস্তুতকারক থেকে শুধুমাত্র তার শ্রম এবং দক্ষতা দিয়ে জিনিস তৈরী করার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা ইসতিস্না চুক্তি হবে না। এ ক্ষেত্রে তা ইজারা চুক্তি হয়ে যাবে। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হয়।[৩]

১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৩
২. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়

❑ বৈদেশিক বাণিজ্য

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম ধারণা হলো বিশ্বায়ন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে "বিশ্বায়ন হলো বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা"[১]। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ স্থাপনসহ একটি সামগ্রিক কমিউনিটির মধ্যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াই হলো বিশ্বায়ন বা Globalization। বর্তমানে Globalization শব্দটি বিশ্বজনীন। বিশ্বসামাজিক সম্পর্ক, বিনিময়ের ব্যাপ্তির গভীরতা, গতি ও প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে ভৌগলিক অবস্থানের উর্ধ্বে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সারা বিশ্বজুড়ে একই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একই সাংস্কৃতিক নকশা তৈরি হচ্ছে। দূর্বল করে দিচ্ছে জাতি-রাষ্ট্রকে এবং পশ্চিমা রূপ ধারণ করছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, Globalization হলো বিশ্বব্যাপী একটি 'Global Economy' গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের সর্বশেষ সংযোজন[২]। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অভাব পূরণের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের জন্ম দিয়েছে[৩]। বিশেষীকরণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং বর্ধিত উৎপাদনশীলতা বিনিময়কে অপরিহার্য করে তোলে। এই উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিনিময় বাণিজ্যিক আদান-প্রদান নামে পরিচিত[৪]।

আন্তঃআঞ্চলিক শ্রমবিভাগ যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্ম দেয়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যেও উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য জনিত কারণে শ্রমবিভাগ জন্ম নেয়। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে। দেশের বাড়তি উৎপাদন অন্যান্য দেশের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান করা হয়, তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে[৫]। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

⇨ C. Jeevanandam বলেন,

"International trade refers to trade between the residents of two different countries. Each country functions as a sovereign state with its own set of regulations and currancy."[৬]

⇨ এ এ এম হাবীবুর রহমান-এর মতে,

"No country is self-sufficient in all goods. Some countries have special advantage to produce some items. Bangladesh can manufacture ready-made garments easily due to lower cost of labour. So Bangladesh is exporting ready made garments to USA, whereas USA is exporting machinery to Bangladesh due to their favourable production to that item. These kind of crose border transaction or exchange of goods is called foreign trade[৭].

---

১. সুকেশচন্দ্র জোয়ারদার, *প্রিন্সিপলস অব ইকোনমিকস* (ঢাকা: মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.) পৃ. ৭১
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. মোঃ আবদুল আজিজ, জি আর খান, *মুদ্রাতত্ত্ব ব্যাংকিং সরকারী অর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি* (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২২
৫. প্রাগুক্ত
৬. C. Jeevanandam, *Foreign Exchange, Practice, Concepts & Control* (New Delhi: Sultan Chand & Sons, 2004 A.D.), p.1
৭. এ. এ. এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: হেলেনা পারভীন ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

M. C. Vaish-এর মতে, "International trade may be defined as the exchange of goods and services among the citizens of independent or sovereign states or countries[১]"
বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বরূপ উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন,

"Consists of the exchange by each country of its lower prices from abroad then the prices at home.[২]"

বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায়, দুই বা ততোধিক স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মধ্যে কিংবা যদিকোন ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে অবস্থিত এক বা একাধিক দেশের স্বার্থে যে দ্রব্য- সামগ্রী ও সেবা-কার্যের আদান-প্রদান করা হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও ভৌগলিক বিশেষীকরণই হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য কালের গতি প্রবাহের সাথে সাথে তা শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। বিশ্বায়নের সুবাধে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিকাশের ফলে মানব সভ্যতা নবতর আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের ধারণায় সারাবিশ্ব এখন সকালের জন্য, সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীতো বটেই অধিকন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। Globalization-প্রক্রিয়ায় বিশ্ব-অর্থনীতি একটি Global Economy তে পরিণত হবার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে [৩]।

❒ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বৈদেশিক বাণিজ্যে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা থেকে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তা নিম্নরূপ:

বিনিময়জনিত সুবিধা: সাধারণত কোন দেশের উৎপাদিত পণ্যের অভ্যন্তরীণ মূল্যের তুলনায় আন্তর্জাতিক মূল্য অনুকূল হলে শেষোক্ত হারে বাণিজ্য করলে যে লাভ হয় তাকে বিনিময়জনিত লাভ বলে। যেমন, বাংলাদেশ কম খরচে পাট উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু তুলা উৎপাদন করতে বেশী খরচ হয়। এখন যদি বাংলাদেশ শুধু পাট উৎপাদন করে এবং মিশর থেকে তুলা আমদানি করে, আবার মিশর যদি শুধু তুলা উৎপাদন করে এবং বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করে, তবে উভয় দেশই অপেক্ষকৃত কম খরচে পাট এবং তুলা পাবে [২৩]। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়ার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে M. C. Vaish বলেন,

"The ultimate gains from trade consist of the additional economic utilities or satisfaction accruing to consummers"[৪].

---

১. M.C. Vaish, ibid, p.371-373
২. ibid, p.372
৩. ibid,
৪. ibid, p.372

Dhaka University Institutional Repository
আন্তঃদেশীয় বিনিময়জনিত বাণিজ্যিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো উল্লেখ করেন,

"Since exchange involves the giving away of abundant goods and services for those goods and services which are scarce on the part of both the parties involved in an exchange transaction, it follows that all parties procure from an exchange transaction net addition to their possession of goods." [১]

উৎপাদন বৃদ্ধি : প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও ভৌগলিক বিশেষীকরণের ফলে প্রত্যেক দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, সর্বোপরি মানুষের গঠন প্রভৃতি পার্থক্যের কারণে কোন বিশেষ দেশ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা লাভ করে। ফলে গড় হিসাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এতে বিভিন্ন দেশের মোট সম্পদ ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে T. T. Sethi-এর মন্তব্যটি প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলেন,

"Differences in comparative costs account for the existence of foreign trade and determine its composition magnitude. [২]"

প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার : সাগরের তলদেশ, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি খাল-বিল নদী-নালা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবকিছুতেই প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ রয়েছে। ভৌগলিক সীমারেখায় প্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ দেশ বা রাষ্ট্রের সকল প্রাকৃতিক সম্পদ–তেল-গ্যাস, স্বর্ণ-রৌপ্য, তামা-লৌহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যদি নিয়ন্ত্রণে নেই[৩]। প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং প্রত্যেক দেশের পক্ষে তার প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে M. C. Vaish বলেন,

"Since in the creation of earth and its inhabitants, natural resources and man's innate abilities were not uniformly apportioned by the Almighty God to all parts of the globe and to all persons, and since teqniques of production do not advance at equal rates among all the nations, regional specialisation in production offers ample scope for international trade."[৪]

ভোগকারীগণের সুবিধা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও ভৌগলিক বিশেষীকরণের কারণে একটি দেশ যে সব দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না, সে দেশের অধিবাসীগণ সে সব দ্রব্য-সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করে ভোগ করতে পারে। এর ফলে দেশের নাগরিকদের বা ভোগকারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে,

"No nation has ever had within its own boundaries all the facilities for economical production of all the goods and services required by her citizens. This is more so the case with modern nations. Even the United States of America, China, and the former টহরড়হ of Soviet Socialist Republics, which are most rich endowed with many natural resource, depend on the outside sources of supply for various raw materials and finished products that are not produced at home in sufficient supply."[৫]

---

১. T. T. Sethi, *Money Banking and International Trade* (New Delhi: S. Chand & Company Ltd. 1999 A. D.), p.615
২. ibid
৩. ibid
৪. M.C. Vaish, ibid, p.371-373
৫. R.C.Gupta, *History of World Civilization* (New Delhi: Kings Books, N.D), p. 58-59

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন ঘাটতির কারণে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে এর কুফল ভোগ করতে হয় না। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বদৌলতে উদ্বৃত্ত দ্রব্য-সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা যায় এবং কোন দ্রব্যের ঘাটতি থাকলে আমদানি করে তা পূরণ করা যায়। এর ফলে প্রত্যেক দেশ উৎপাদন-ঘাটতি বা উৎপাদন-উদ্বৃত্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে[১]।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের সুবিধাগুলো ভোগ করা যায়। Global Economy' র ধারণায় আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের প্রগাঢ়করণ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান, বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা, দক্ষ অদক্ষ জনশক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পণ্য ও দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষত্ব অর্জন করে। এরূপ বিশেষায়নের ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ভোগকারীগণ উপকৃত হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, "International trade which promotes the division of labour according to different endowments can improve the economic standard of living of the people of all the countries.[২]"

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একের সঙ্গে অন্যের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্ভব হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় [৩]। দ্বিপাক্ষিক কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে M. C. Vaish বলেন,

"Besides the weighty economic reasons, there are the cultural and humanistic reasons for trade. International trade, by giving rise to human intercourse, promotes mutual understanding of political institutions, habits of thought and philosophies of life. Such mutual understanding contributes more to mutual respect, friendliness and international peace than to competitive an-tagonism, animosities and war. [৪]"

❑ বাণিজ্যনীতি

বাণিজ্য নীতি (Trade Policy) : যে কোন দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্য রফতানি, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খাদ্য-শস্যসহ বিভিন্ন প্রকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি করতে হয়। এসব কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে সব নীতিমালা, বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তাকে সে দেশের বাণিজ্যনীতি বলা হয়।অর্থনীতিবিদদের মতে, "The external economic relations of a country are governed by its commercial or trade policy"[৫].

উল্লেখ্য যে, এধরনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেএে যে কোন দেশের বাণিজ্যনীতি দু ধরনের হতে পারে[৬]: ক. অবাধ বাণিজ্য এবং খ. সংরক্ষণ বাণিজ্য।

---

১. T. T. Sethi, ibid, p. 615
২. এম. এ. ইউসুফ, এম. আর. সিনহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩. M.C. Vaish, ibid, p.372
৪. ibid, p.373
৫. C. Jeevanandam, ibid, p. 1
৬. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতিও ব্যাংকিং* (ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স ২০১০ খ্রি:), পৃ. ৩২০-৩২১

Dhaka University Institutional Repository

❑ অবাধ বাণিজ্য (Free trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবধরনের বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতি হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য বা অবাধ বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সরকার যদি কোন রকম বিধি-নিষেধ বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে তবে বাণিজ্য অবাধে পরিচালিত হয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অবাধ বাণিজ্যকে এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন, যেখানে দেশী-বিদেশী পণ্যের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কৃত্তিম সুবিধা-অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন পরিচিতি প্রদান করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

⇨ এ্যাডাম স্মীথ-এর মতে,

"A system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and thus which neither imposes additional burden on the later nor grants any special favour to the former. [১]

⇨ জি. ভি. হ্যাবারলার-এর মতে,

"Free trade is the external trade system of liberalism, which opposes every interference by the state with the free play of economic forces. But it by no means follows from this that it is inconsistent to advocate, on the one hand, unrestricted free trade and, on the other hand, certain inferences with the free play of economic forces, for example on the labour market.[২]"

⇨ জগদীশ ভগবতীর মতে,

" A free trae policy requires complete absenec of all restrictions on the free movement of goods and services across national borders. Thus, free trade policy involves complete absence of tariffs quotas, exchange restrictions, taxes and subsidies on production, factor use and consumption.[৩]"

বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য ও উপস্থাপনার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও এর স্বরূপ ও প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই । মূলত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানে কোনরূপ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধ না থাকলে তাকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলে।

---

১. Adam Smith, *An Inquiry in to the Nature and causes of the Wealth of Nations* (New Delhi: Modern Library 1993 A.D.), p.424
২. G.V. Haberlar, ibid, p.225
৩. Jagadish Bhagwati, *International Trade*, (New Delhi: Penguin Edition, 1969 A.D.), P. 5

Dhaka University Institutional Repository

❑ সংরক্ষণ বাণিজ্য (Protection Trade) :

আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের উপর দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে বা বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য নীতি বলে। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে একটি দেশ ইচ্ছা করলেই অপর দেশে অবাধে পণ্য-সামগ্রী রফতানি করতে পারে না কিংবা বিদেশ থেকে যে কোন পণ্য-সামগ্রী অবাধে আমদানি করতে পারে না। সংরক্ষণ বাণিজ্য সম্পর্কে অথনীতিবিদগণ নিম্নরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন :

⇨ Harry, G. Johnson-এর মতে,

"Protection refers to those policies that create a divergence between the relative prices of commodities to domestic consumers and producers and their relative prices in world markets.[১]"

⇨ M C Vaish-এর মতে,

"The term proteetion means a commercial policy which is adopted by a country to encourage her, domestic industry by shielding its high-priced products against the competition from cheap imports either by subjecting the imports to import duties so as to bring their prices at par with the domestic prices of import competing goods or by restricting imports either by banning them altogether or by subjecting them to import quotas.[২]"

⇨ T. T. Sethi-এর মতে,

"Protection means a policy of deliberate regulation of foreign trade in order to give shelter to domestic industries form foreign competition"[৩].

সুতরাং সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায়, সরকার কর্তৃক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তাকে সংরক্ষণ বাণিজ্যনীতি বলে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি বা উপায় (Different Methods of Protection): সংরক্ষণ বাণিজ্য নীতিতে সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ. [৪]

Protection may take many different forms:

1) Import duties and tariffs;
2) Quotas and import Licenses;
3) Import embargo;
4) Export duties on raw materials;
5) Exchange control;
6) Bounties and subsidies on production,
7) Price discrimination
8) Commodity agreements,
9) State trading, and
10) Administrative protection, etc.

---

১. T. T. Sethi, ibid, p. 615
২. M.C. Vaish, ibid, p.372
৩. C. Jeevanandam, ibid, p. 10
৪. T. T. Sethi, ibid, p. 620

Dhaka University Institutional Repository

❑ বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য

বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে শিথিল করা হয়েছে। আমদানির উপর আবগাড়ি শুল্ক ও বিক্রয় করের পরিবর্তে বাণিজ্য নিরপেক্ষ মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রবর্তিত হয়েছে। অভিশুল্ক হারসমূহ হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে সর্বোচ্চ অভিশুল্ক হার ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে[১]। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর পরিমাণগত বাধা-নিষেধ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্য সংখ্যা ছিল ২৫৩, সেখানে ১৯৯৪ সনে তা ছিল ৪০[২]। বর্তমানে তা আরো কম। জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা স্থাপন, উৎপাদনমুখী শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানিমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তির অধিগ্রহণ, ক্ষুদ্র আমদানিকারকসহ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নবাগতদের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি সহজীকরণ ও উদারীকরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিদেশ হতে পণ্য আমদানির নিয়মাবলী ও আমদানি মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত নিয়মাচার যথাক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

❑ আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনবীয়তা

আমদানি নিয়ন্ত্রণ সাধারণত যে উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে আরোপ করা হয়, সেগুলো নিম্নরূপ:[৩]

ক. বৈদেশিক মুদ্রার পরিমিত ব্যয় নিশ্চিত করা;

খ. আমদানির প্রকৃতি, পরিমাণ এবং মূল্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হিসেব রাখা;

গ. স্পর্শকাতর পণ্য আমদানি সীমাবদ্ধ রাখা এবং

ঘ. প্রাপ্তব্য শিপিং স্পেসের সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করা

❑ আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

প্রতিটি অর্থ বছরের শুরুতে কর্তৃপক্ষ আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন অর্থ বছরের আমদানির বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত তালিকাসহ আমদানি নীতি ঘোষণা করা হয়। আমদানি নীতিতে যে বিষয়গুলো বিবেচিত ও নির্ধারিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ[৪]:

১. শিপিং পিরিয়ডের মধ্যে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা;

২. নগদ বৈদেশিক মুদ্রায়, বৈদেশিক সাহায্য এবং ওয়েজ আর্নার্স স্কীম-এর আওতায় আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা;

৩. আমদানি বাণিজ্যে নবাগতদের আসার পদ্ধতি;

৪. শিল্পের কাঁচামাল, বাণিজ্যিক আমদানি এবং ওয়েজ আর্নার্স স্কীম-এর আমদানি পদ্ধতি;

৫. আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য ও দ্রব্যের তালিকা;

৬. আমদানি গ্রুপ গঠনের পদ্ধতি;

৭. Repeat Licence এর জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়ার পদ্ধতি এবং

৮. Letter of Credit খোলার তারিখ, শিপমেন্ট তারিখ এবং লাইসেন্স লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন (LCA) লেটার অব ক্রেডিট এর বৈধতার পূনঃকার্যকারিতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানসহ আমদানি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়।

---

১. সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
২. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯
৩. L. R. Chowdhury, Ibid, p. 316-317
৪. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

❑ আমদানি নীতির উদ্দেশ্যাবলী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আমদানী-নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:[১]

১. ডাব্লিউটিও (WTO)-এর আওতায় বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ধারায় বৈদেশিক বাণিজ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে উহার আলোকে আমদানি নীতিকে আরো সহজীকরণ;

২. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার কল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান;

৩. রপ্তানিসহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজভাবে আমদানির সুবিধা প্রদান করে দেশীয় রফতানি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। এই লক্ষ্যে শিল্পনীতি, রপ্তানিনীতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে আমদানির সমন্বয় সাধন করা;

৪. পণ্যের আমদানির উপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে, শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৫. গুণগত মাণ বজায় রেখে স্বাস্থ্সম্মত পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং

৬. জনস্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিক আপৎকালীন পণ্য আমদানির সংস্থান করা।

❑ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য

বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস রপ্তানি খাত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে এই খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য সরকার একটি দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করেছে। এই কৌশল পত্রের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে আরো নিবিড় ও গতিশীল করতে সাহায্য করা এবং এসকল কর্মকান্ডের সাথে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সরকারের বর্ণিত দারিদ্র বিমোচন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার সুযোগ প্রদান করা ।[২]

পিআরএসপি'র বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ ও সরলীকরণ, ব্যবসায়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ, বাজার সম্প্রসারণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসার খরচ কমিয়ে আনা ও গভর্নেন্স অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নসহ কমপ্লায়েন্স সম্পৃক্ত বিষয়াদি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে রপ্তানি খাতকে সীমিত পণ্যনির্ভরতা হতে মুক্ত করে বহুমূখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে সরকার সার্ভিস সেক্টরে ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কনসালটেশন সার্ভিস, কনস্ট্রাকশন সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ।[৩]

---

১ ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪২
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository
দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিক সমিতি, চেম্বার, গবেষণা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও সংস্থা সমন্বয়ে গঠিত কনসালটেটিভ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার রপ্তানি নীতি ২০০৯-২০১১ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে বর্ণিত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথকভাবে একটি রপ্তানি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করা গেলে রপ্তানি-নীতি ২০০৯-২০১১'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজতর হবে[১]। এ পর্যায়ে রপ্তানি নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন কলাকৌশল, পরিধি ও পদ্ধতির উপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হল:

❑ রপ্তানি-নীতি ২০০৯-২০১১-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের রপ্তানি-নীতি ২০০৯-২০১১'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:[২]

১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি ব্যবস্থাকে (Trade Regim) যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা;
২. শ্রম (বিশেষ করে মহিলাশ্রম) নির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ,
৩. রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল সহজলভ্য করা;
৪. পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রীর মান উন্নয়ন, উন্নত, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, গুণগত মান নিশ্চিত করে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন করা;
৫. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমূখীকরণ;
৬. রপ্তানিমূখী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
৭. রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা;
৮. নতুন নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করা;
৯. উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিময়, লেনদেন পরিচালনার জন্য, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন অর্থনীতিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং
১০. পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-রীতিনীতি সম্পর্কে বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক ধারণা প্রদান করা ইত্যাদি।

❑ রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

আমদানির তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য তেমন সন্তোষজন নয়। দেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রকটভাবে। এতে এক দিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে তেমনি তা দেশকে পরনির্ভরশীল করে তুলছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাজেট প্রণয়ন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই বিদেশীদের সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ অবস্থা থেকে বুঝা যায় বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কত বেশি প্রয়োজন।

---

১. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬
২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository
পাশাপাশি এটাও পরিলক্ষিত যে এদেশেরই কিছু সংখ্যক রপ্তানিকারক ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিদেশী ক্রেতার সাহায্য-সহযোগিতায় বা যোগসাজশে রপ্তানিমূল্য 'Under Invoice' করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছে। এ অবস্থায় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক এবং বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব পদ্ধতি ও পন্থায় রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা নিম্নরূপঃ

ক. রপ্তানিকারকের রেজিস্ট্রেশন এবং

খ. রপ্তানির আবশ্যকীয় ও সহায়ক দলীলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে।

❑ বৈদেশিক বিনিময়ের উদ্দেশ্য, নীতি, কার্যাবলি এবং বিনিময় হার

বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব ধরনের বিধি-নিষেধ এখন উঠে যাচ্ছে। অতীতের যে কোন সময়ের অপেক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ছে। আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের রয়েছে নিজস্ব মুদ্রা ও মুদ্রানীতি। বাণিজ্যের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং মুদ্রার জাতীয়করণ এ দুটো পরস্পর বিরোধী বিষয় থেকেই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বা বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছে[১]। এ ক্ষেত্রে এটাও বলা যায় যে, পৃথিবীতে যদি শুধু একটি মুদ্রার প্রচলন হয়, তখন হয়তো পৃথিবীতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বলতে আর কিছুই থাকবে না।

বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange)

'বৈদেশিক বিনিময়' পরিভাষাটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে, বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত। এ পরিভাষাটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সাধারণত, বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলতে এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর করে আন্তঃদেশে লেনদেন নিষ্পত্তির পদ্ধতিকে বুঝানো হয়[২]। অনেক সময় দেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বিদেশে পরিশোধ্য বিনিময় বিল, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র, চেক ইত্যাদি নির্দেশ করতেও বৈদেশিক বিনিময় পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়। বৈদেশিক বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ [৩]

Mr. H. E. Evict-এর মতে,

"Foreign Exchange is that section of Economic Science which deals with the means and methods by which rights to wealth in one country's currency are converted into rights to wealth in terms of another country's currency.[৪]"

---

১. T. T. Sethi, ibid, p. 15

২. মোঃ আবদুল আজিজ, জি আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৩. এম এ ইউসুফ, এম আর সিনহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

D. F. Einzing-এর ভাষায় বৈদেশিক বিনিময় হলো,

"The System or process of converting one national currency into another and of transferring the ownership of money from one country to another.[১]"

এল আর চৌধুরী বলেন,

"Foriegn exchange means foriegn currency and includes- (i) all deposits, credits and balances payable in any foreign currency and any drafts, travellers cheques, letters of credit and bills of exchange, expressed or drawn in local currency but payable in any foriegn currency, and (ii) Any instrument payable, at the option of the drawee or holder there of or any other party there to, either in local currency or in foreign currency or partly in one and partly in the other." [২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে কোনো কোনো দেশে এর বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে আইন সভায় 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাশ করা হয়। এটি ভারত ও পাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশ নিজ নিজ দেশে অব্যাহত রাখে। এ বিধানটি নিম্নরূপঃ

"Anything that conveys a right to wealth in another country is foriegn exchange; these include foreign currencies (bank notes), deposits, credits and balances payable in foreign curency , drafts, travelers checques, letter of credit and bills of exchange payable in foreign currency. Hundi, a sub-continental version of bill of exchange, also comes under jurisdiction of the foreign exchange regulation Act." [৩]

বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় এ কথা বলা যায় যে, Foreign Exchange বা বৈদেশিক বিনিময় হলোঃ-

১. কোন দেশ কর্তৃক বিভিন্নভাবে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ;
২. দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া;
৩. দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের হার;
৪. আন্তঃদেশ লেনদেন নিষ্পত্তির পদ্ধতি;
৫. বিদেশে অর্থ প্রেরণের বা আনয়নের পদ্ধতি এবং
৬. বিদেশে প্রাপ্য প্রদেয় সকল ধরনের সম্পদ; ব্যাংক ড্রাফট, চেক, বিল এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটি প্রভৃতি[৪]।

---

১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০
২. সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩. L. R. Chowdhury, ibid, p. 3
৪. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❑ বৈদেশিক বিনিময়ের উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিকসহ বহুবিধ প্রয়োজনে বৈদেশিক বিনিময়ের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে ও সময়ের প্রয়োজনে বৈদেশিক বাণিজ্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:[১]

⇨ দুদেশের মধ্যে পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করা;

⇨ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বহুবিধ দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা;

⇨ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বা বিদেশে প্রদত্ত ঋণ বা অনুদান আদান-প্রদান;

⇨ স্বদেশে বিদেশী পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি করা বা বিদেশে পুঁজি বা বিনিয়োগ সৃষ্টি করা;

⇨ প্রবাসীদের আয় দেশে আনা অথবা স্বদেশে কর্মরত বিদেশীদের আয় প্রেরণ করা;

⇨ স্বদেশের লভ্যাংশ আনয়ন কিংবা বিদেশের লভ্যাংশ বা সুদ প্রদান করা;

⇨ বিদেশে ভ্রমণে নাগরিকদের অর্থ প্রদান কিংবা এ দেশে বীমা করা;

⇨ সরকারি পর্যায়ের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ও কুটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা;

⇨ আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যয় বা আয় মেটানো বা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

⇨ বিদেশী বৃত্তি, শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত দান-অনুদান গ্রহণ বা বিদেশে প্রেরণ;

⇨ আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে শেয়ার সিকিউরিটি প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা;

⇨ বিদেশে পরিশোধিত সুদ বা বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সুদের লেনদেন নিষ্পত্তি করা;

⇨ অন্য কোনো প্রকারে সৃষ্ট বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং

⇨ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনো প্রাপ্তি পরিশোধ করাসহ বৈশ্বিক পর্যায়ের যাবতীয় লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হলো বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

❑ বৈদেশিক বিনিময়ের নীতিসমূহ

তিনটি মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে Foreign Exchange কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিশেষজ্ঞ L. R. Chowdhuy মনে করেন। তিনি বলেন,

"There are three fundamental aspects of the general mechanism of foriegn exchange:[২]

i. Every country has its own currency legal tender distinctive unit of account;

ii. The conversion of one currency into another is effected by banks by book-keeping entry carried out in the two centers concerned.

iii. These exchanges are effected by means of credit instruments, viz, Draft, Mail Transfer, Telegraphic Transfer, etc".

---

১. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬
২. L. R. Chowdhury, ibid, p. 41

Dhaka University Institutional Repository

❑ বৈদেশিক বিনিময়ের কার্যাবলি

বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থায় উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয় তা নিম্নরূপ: [১]

- ⇨ বিনিময় হার (Rate of Exchange);
- ⇨ বিনিময় হার কিভাবে কাজ করে (How the Rate of Exchange Works);
- ⇨ অগ্রিম ও তাৎক্ষণিক বিণিময় হার (Forward & Spt Rate);
- ⇨ বিনিময় হার কোট করার পদ্ধতি (Methods of quoting Exchange Rate);
- ⇨ প্রিমিয়াম ও ডিসকাইন্ট;
- ⇨ বিনিময় হারের ঝুঁকি;
- ⇨ বিনিময় হার উঠানামার কারণ;
- ⇨ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ;
- ⇨ বিনিময় যোগ্যতা;
- ⇨ বিনিময় অবস্থা;
- ⇨ মধ্যবর্তী মুদ্রা;
- ⇨ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন;
- ⇨ বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা;
- ⇨ আমদানি ও রপ্তানি প্রত্যয়পত্র/ঋণপত্র;
- ⇨ বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক প্রত্যয়পত্র;
- ⇨ বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন;
- ⇨ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের প্রকৃতি ও কার্যাবলি;
- ⇨ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত নিয়মনীতিসমূহ এবং
- ⇨ বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক বিনিময়ে ব্যবহৃত বিনিময় অংশ।

বিনিময় হার ঃ

আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা মেটানোর জন্য এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় করতে হয়। কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট একক মুদ্রার পরিবর্তে অপর দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বলে[২]। সাধারণত দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের বাহ্যিক ক্ষমতাকে বিনিময় হার বলে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বলতে কি বুঝায় বা কি নির্দেশ করে, এর সংজ্ঞা কি? এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন।

---

১. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬
২. L. R. Chowdhury, ibid, p. 46

Dhaka University Institutional Repository
নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা হলো:

কারো মতে বিনিময় হার হলো,

"The rate of exchange is the price of one currency, in terms of another currency or in the other words, the number of units of one currency which exchange for a given number of units of another currency. [১]"

K. C. Shekhar, Lekshmy shekhar-এর মতে,

"The rate of exchange between two currencies is the amount of one currency that will be exchanged for one unit of another currency.[২]"

T.T.Sethi বলেন,

"The foreign exchange rate, more commonly referred to as the exchange rate (or the rate of exchange), is the rate between the value of two currencies. It is the price of a foreign unit of currency in terms of a country's domestic unit of currency. In fact, it refers to two prices simultaneously, because both the thing bought and the thing sold are money.[৩]"

❑ বিনিময় হার নির্ধারণের তত্ত্বসমূহ

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কি হবে তা নির্ভর করে দুই মুদ্রার চাহিদা-যোগান ও পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতার উপর। অর্থনীতিবিদগণ বলেন,

"The whole exchange rate system is determined by the debits and credits of the record of foreign exchange transactions, since the latter involves demand for and supply of the foreign currency.[৪]" তাছাড়াও কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময হার নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা,প্রচলন পদ্ধতি ও মুদ্রানীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরে। C. Jecvanandum-এর মতে, Foreign Exchange Rate কে যে বিষয়গুলো প্রভাবিত করে সেগুলো নিম্নরূপ:[৫]

i. Balance of Payments;
ii. Inflation;
iii. Interest Rates;
iv. Money Supply:
v. National Income;
vi. Resource Discoveries;
vii. Capital Movements;
viii. Political factors;
ix. Psycholgical Factors, speculation and
x. Technical and Market Factors.

উল্লেখ্য যে, কোনো মুদ্রার বিনিময হার অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় কি ধরনের হবে কিংবা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ রয়েছে সেগুলোকে Determinery Theories of Exchange Rates বলা হয়। তত্ত্বগুলো নিম্নরূপ:[৬]

---

১. L. R. Chowdhury, ibid, p. 5
২. K.C. Shekar, Leksmy Shekhar, ibid, p. 455
৩. T. T. Sethi, ibid, p. 495
৪. মজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩
৫. C. Jeevanandam, ibid, p.70
৬. ibid, p.71

Dhaka University Institutional Repository

১. মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব (Mint Parity Theory),

২. আই এম এফ পার ভ্যালু তত্ত্ব (IMF Par Value Theory);

৩. ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব (Balance of Payments Theory) এবং

৪. লেনদেন তত্ত্ব (Balance of Payment Theory)

❒ মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব

যখন সোনা অথবা রূপার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির হয়, তখন তাকে মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব বা স্বর্ণমান ব্যবস্থা বলা হয়[১]। যদি আমেরিকান ১ ডলার এবং বাংলাদেশের ৬৯ টাকায় সমপরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে আমেরিকান ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার হবে USD 1=tk 69/- [২]।

উল্লেখ্য যে, এ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ আর এখন নেই কারণ, এ তত্ত্ব গোল্ড অথবা সিলভার স্ট্যান্ডার্ড আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই Gold standard এবং Silver standard আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিদায় নেয় [৩]।

❒ আই এম এফ পার ভ্যালু তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ)-এর সকল সদস্য দেশে এ পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হতো। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মার্কিন ডলারের সাথে নির্দিষ্ট একক স্বর্ণের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করা হতো এবং আই এম এফ এর সদস্যভূক্ত সকল দেশ ডলার ও স্বর্ণের মান অনুযায়ী তাদের স্ব-স্ব দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ করতো। সদস্য দেশসমুহ ডলার বা স্বর্ণের মানের চেয়ে তাদের মুদ্রার মান ১% কম অথবা বেশি নির্ধারণ করতে পারতো [৪]। কিন্তু ১% বেশি নির্ধারণ করতে হলে আই এম এফ-এর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে হতো। উল্লেখ্য, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ন্যায় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই এম এফ)-এর পার ভ্যালু তত্ত্ব আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছে ১৯৭১ সালের ১৫ আগষ্টে [৫]।

❒ ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে ক্রয় ক্ষমতা তত্ত্ব বা পারচেজিং পাওয়ার তত্ত্বটি রচিত হয়েছে। একদেশের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার যে ক্রয় ক্ষমতা অন্যদেশে ততটুকু ক্রয় ক্ষমতা অর্জন করতে সে দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, সে অনুপাতকে বলা হয় ক্রয় ক্ষমতার সমতা। ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব-এর নীতি অনুসারে দুটো দেশের দুটো মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের সমতা তাদের স্ব-স্ব-দেশের দেশীয় মুদ্রা দিয়ে কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়, তার উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় [৬]।

---

১. ড. মঞ্জুর কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
২. এম এ ইউসুফ, এম আর সিনহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩. C. Jeevanandam, ibid, p.43
৪. এম এ ইউসুফ, এম আর সিনহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
৫. মোঃ আবদুল আজিজ, জি আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪
৬. মজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

❐ লেনদেন তত্ত্ব

এ তত্ত্বটি অত্যাধুনিক তত্ত্ব হিসেবে বর্তমানে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ এ তত্ত্বের মূলভিত্তি[১]। এ তত্ত্ব অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় এবং সরবরাহ বেশি হলে বিনিময় হার হ্রাস পায়। মুদ্রার বাস্তব চাহিদা ও যোগান এবং পণ্যের আমদানি-রপ্তানি এ সকল বিবেচ্য বিষয়কে সামনে রেখে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় বিধায় এ তত্ত্বটি বর্তমান বিশ্ব-বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে।

❐ আন্তর্জাতিক বিনিময় হার ব্যবস্থা

গোল্ড স্ট্যার্ন্ডাড বা স্বর্ণমান ব্যবস্থা এবং স্থির বিনিময় হারের অপর সংস্করণ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF)-প্যার ভ্যালু তত্ত্ব সত্তর দশকের শুরুতে দৃশ্য পট থেকে বিদায় নেয়[২] আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা এখন দাড়িয়ে আছে সঞ্চরণশীল বিনিময় হার ব্যবস্থায়। বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার বিনিময় হার তাদের তুলনামূলক অন্তর্নিহিত শক্তি এবং চাহিদা ও সরবরাহের আলোকে নির্ণীত হয়[৩]

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের মুদ্রা Float করারও তেমন একটি সুযোগ নেই। কারণ, প্রথমত এ সব মুদ্রা আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে তৃতীয় বিশ্বের মুদ্রা অবাধে রূপান্তর করা যায় না। এ অবস্থায় এসব দেশের মুদ্রাকে কোন একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত হতে হয়, যেমন মার্কিন ডলার, পাউন্ড কিংবা ইউরোর সাথে। ফরেন এক্সচেঞ্জে-এর ভাষায় একে বলা হয় পেগিং (Pegging)। যে মুদ্রার সাথে peg করা হয় তাকে বলা হয় মধ্যবর্তী মুদ্রা (Intervention Currency) [৪] দেশীয় মুদ্রার সাথে মধ্যবর্তী মুদ্রার বিনিময় হার বেধে দেয়া হয়। সে কারণে শেষোক্ত মুদ্রার সাথে বাকি বিশ্বের মুদ্রার দৈনন্দিন যে পরিবর্তন ঘটে সে সব মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারে শতকরা হিসেবে একই মাত্রায় পরিবর্তন আসে। মোট কথা হলো মধ্যবর্তী মুদ্রার বিনিময় হারে যে পরিবর্তন আসে তার সাথে মিল রেখে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন ঘটে[৫]।

সুতরাং বাংলাদেশের টাকাকে ডলারের সাথে পেগিং অবস্থায় রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডলারের সাথে তাল রেখে দেশীয় মুদ্রা একই সাথে ডুবে এবং একই সাথে ভাসে।

এ অবস্থায়, দেখা যায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিন ধরনের বিনিময় হার-এর কার্যক্রম চালু রয়েছে। সেগুলো হলো: [৬]

ক. স্থির বিনিময় হার (Fixed Exchange Rate):

খ. সঞ্চরণশীল বা ভাসমান বিনিময় হার (Floating Exchange Rate)

গ. বহুবিধ বিনিময় হার (Multiple Exchange Rate):

---

১. L. R. Chowdhury, ibid, p. 60-61
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid, p.62-63
৫. ibid
৬. ibid

Dhaka University Institutional Repository

ক. স্থির বিনিময় হার

যখন কোন দেশ তার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিনিময় হার একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির রাখে, তখন তাকে স্থির বিনিময় হার বলে। এই বিনিময় হার বাজারের চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত না হয়ে সরকারী বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ণীত হয়। একে আবার সরকারী বিনিময় হারও বলে [১]।

স্থির বিনিময় হারের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এই হার ঝুঁকি এড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক হয় এবং স্থিতিশীল বৈদেশিক বিনিময় বাজার রক্ষা করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার ক্রামগত পরিবর্তিত হওয়ায় স্থির বিনিময় হারের প্রভাব হ্রাস পেয়ে এমন এক অবস্থায় দাড়িয়েছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই বর্তমানে স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থা বাতিল করেছে [২]।

খ. সঞ্চরণশীল বা ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা

অর্থনীতিবিদদের মতে, চাহিদা ও সরবরাহের ফলে বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারে অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় নিরন্তর স্বাধীনভাবে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাকে ভাসমান বা সঞ্চরণশীল বিনিময় হার ব্যবস্থা বলে [৩]। চাহিদা এবং সরবরাহ অর্থনীতির আর দশটা দ্রব্যের মূল্যের উপর যে ধরনের প্রভাব ফেলে, তেমনি কোন মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের পরিবর্তন সে মুদ্রার বিনিময় হারে একই ভাবে পরিবর্তন ঘটায় [৪]। সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশী হলে বিনিময় হার বেড়ে যাবে এবং বিপরীত অবস্থায় তা কমে যাবে।

সঞ্চরণশীল বিনিময় হার তিন প্রকৃতির হতে পারে, তা হলোঃ

প্রথমতঃ বিনিময় হার নিজস্ব ভারসাম্য বিন্দুতে পৌছানোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে বিনিময় হার বৈদেশিক বিনিময় বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিনিময় হার বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার বিভিন্ন ধরনের নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়তঃ বিনিময় হার একটি নির্দিষ্ট সীমার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে উঠানামা করতে পারে।

গ. বহুবিধ বিনিময় হার

বিশেষজ্ঞদের মতে, একই মুদ্রার দুই বা ততোধিক বিনিময় হার থাকলে তাকে বহুবিধ বিনিময় হার বলে। বহুবিধ বিনিময় হার সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলোতে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয় [৫]। এ ব্যবস্থায় সরকারীভাবে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার বেধে দেয়া হয়। আদান-প্রদানের প্রকৃতি বা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমেই এ হার নির্ধারণ করে। বহুবিধ বিনিময় হার বিনিময় অবচয়ন (Depriciation) অপেক্ষা উত্তম।

---

১. এম এ ইউসুফ, এম আর সিনহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩. প্রাগুক্ত
৪. মাহমুদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❑ বাংলাদেশের বিনিময় হার ব্যবস্থা

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ মধ্যবর্তী মুদ্রা (Inervention Currency)হিসেবে পাউন্ড-ষ্টার্লিংকে বেছে নেয় এবং তখন থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের টাকা পাউন্ড-ষ্টার্লিং এর সাথে সম্পর্কিত ছিল [১]।

পরবর্তীতে আন্তজার্তিক মুদ্রা বাজারে পাউন্ড-ষ্টার্লিং-এর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকাকে মার্কিন ডলারের সাথে পেগিং অবস্থায় আনা হয়। মার্কিন ডলারের সাথে বিনিময় হার বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে এবং অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় হার লন্ডনের বিনিময় বাজারের আড়াআড়ি হারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। তবে বাংলাদেশের টাকাকে ডলারের সাথে পেগিং করায় ডলারের মূল্যের অবনতি হলেও রপ্তানি করে বর্তমান বিনিময় হার বাংলাদেশে একই পরিমাণ পণ্য দ্রব্যের বদলে পূর্বের মতো ডলার পাবে[২]। বিগত ১৯ মে ২০০৩ তারিখে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ টাকা ও ডলার বিনিময় হারকে সম্পুর্ণরূপে ভাসমান বা সঞ্চরণশীল করার ঘোষণা প্রদান করে। এর ফলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষণা, অধ্যাদেশ বা আদেশ দ্বারা দেশীয় বিনিময় হার কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রহিত হলো। উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, এ ব্যবস্থায় বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের প্রেক্ষিতে অবমূল্যায়ন বা পূর্ণমূল্যায়ন সাধিত হয়।

❑ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বৈদেশিক দেনা-পাওনার পরিমাণ গতি ও বিনিময় হার এসব কিছুই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মূলত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সরকারের Intervention এবং Restrictions পদ্ধতিতে। অর্থনীতিবিদদের মতে,

"Intervention denotes the activities of the Government in entering the exchange market either to purchage or sell foreign exchange in order to bring the rate of exchange up or down to the desire level. On the other hand, Restriction denote the activities of the Government in preventing the existing demand for or supply of the currency in which they are interested from reaching the exchange market. [৩]

বর্ণিত বক্তব্য অনুসারে দেখা যায় বিনিময নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। সরকার যে পদ্ধতিতে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তা হলো-[৪]

ক. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং

খ. দ্বিপাক্ষক চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ

ক. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণঃ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক বিনিময় প্রবাহ প্রত্যক্ষভাবে একাধিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উপায়গুলো হতে পারে ১. সরকারি হস্তক্ষেপ, ২.আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ৩. Exp পদ্ধতির প্রবর্তন, ৪. ভ্রমনকারীদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ এবং ৫. রুদ্ধ হিসাবের মাধ্যমে।

খ. দ্বিপাক্ষিক চুক্তিঃ আন্তঃদেশীয় পণ্য বিনিময় চুক্তি এবং ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির মাধ্যমে।

---

১. সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪
৩. L. R. Chowdhury, ibid, p.224
৪. মোঃ আবদুল আজিজ, জি আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সব মানুষেরই অতি পরিচিতি একটি বিনিময় প্রক্রিয়া। নিজের পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীকে অপরের পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর সাথে পারস্পরিক সম্মতি, সদিচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতে বিনিময় করে নেয়াই হল ব্যবসা। দ্রব্য বিনিময় প্রথা (Barter System) হিসেবে প্রাচীনকালে একটি পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে আরেকটি পণ্য বা দ্রব্য গ্রহণ করা হতো। আধুনিককালে মুদ্রা প্রবর্তিত হওয়ায় মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য ও দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সুতরাং লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ও সন্তুষ্ট চিত্তে পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় কিংবা সেবার বিনিময়কেই ব্যবসা বলা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় লেনদেন তা অভ্যন্তরীণ হোক কিংবা বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হোক ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী তাতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকতে হবে এবং উভয়পক্ষের সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কার্য সম্পন্ন হতে হবে।

❒ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের প্রেরণা

মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্ম ও শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, সেটাকে আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ (ফাদ্‌লুল্লাহ) বলে অভিহিত করেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্য বোঝাতে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনার প্রেক্ষাপটে সমগ্র কুরআন মজীদে শব্দটি ৩৭০ বার এসেছে [১]। ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সাথে উল্লেখ করে আল-কুরআন ঘোষণা করছে:

"(তোমার রব জানেন) তোমাদের কিছু লোক 'আল্লাহর অনুগ্রহ' সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করবে, আর কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করবে [২]।"

ইসলাম হালাল, বৈধ ও সৎপথে আয়-উপার্জনে নিয়োজিত থাকাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। আল-কুরআন ঘোষণা করছে:

"যখন সালাত আদায় শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনে বেরিয়ে পড়ো 'আল্লাহ অনুগ্রহ' সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্বরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে[৩]।"

ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করে আল-কুরআন ঘোষণা করছে:

"এমন বহুলোক আছে, যাদের ব্যবসা এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ, সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না[৪]।"

---

১. *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি*, মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বি এম হাবিবুর রহমান, সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪
২. আল-কুরআন, ৭৩:২০
৩. আল-কুরআন, ৬২:১০
৪. আল-কুরআন, ২৪:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফা হালাল ও বৈধ এবং সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় লেনদেন হারাম ও অবৈধ। বিশ্ববাসীর প্রতি এ শ্বাশত ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করে আল-কুরআন ঘোষণা করছেঃ

"আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করে দিয়েছেন আর হারাম করে দিয়েছেন সুদকে[১]।"

অনুরূপ সুন্নাহ্তে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত মুসলিমদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের ঘোষণা রয়েছে। বিশ্বনবী (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমের মাধ্যমে আয় উপার্জন করাকে উৎসাহিত করেছেন। আয়-উপার্জন কারীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। জীবনের প্রথম দিকে নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ছিল আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য (International Trade)। সুদক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যবসায়িক সাফল্য ও সুনামের মাধ্যমে তাঁর অনুপম আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল[২]। ইমাম-ই-আযম হিসেবে খ্যাত হানাফী মাযহাবের (School of Thought) প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ্ আবু হানীফাও ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন সফল ও বড় ব্যবসায়ী[৩]।

বিশ্বনবী (সা) সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

"সত্যবাদী -বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীকীন ও শহীদদের সাথী হবে[৪]।"

তিনি আরো বরেন, " বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথী হবে[৫]।"

পরমুখাপেক্ষীতা নয় বরং নিজের শ্রম দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে আয়-উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর আয়-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিশ্বনবী (সা) বলেন,

"সর্বোত্তম উপার্জন হল আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় ব্যবসা করা এবং গায়ে খেটে উপার্জন করা [৬]।"

ব্যবসা-বাণিজ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসায়ীরা অঢেল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হতে পারে। বিশ্বনবী (সা) বলেন, " ব্যবসায়ে দশ ভাগের নয়ভাগ সম্পদ রয়েছে [৭]।"

পরিশেষে উল্লেখ্য, মানুষ তার জীবন-যাপন, জীবিকা-নির্বাহ, জীবনের উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ এবং সমাজ পরিচালনা ও মানব কল্যাণের জন্য যা কিছু করে যদি তা আল-কুরআন নির্দেশিত, রাসুল (সা) প্রদর্শিত পন্থায় ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় তা সবই 'ইবাদত। অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ,বিনিয়োগ, আয়-উপার্জন, উৎপাদন, ব্যয়-বন্টন ও ভোগসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্ম-কান্ড ও 'ইবাদত হিসেবে গণ্য।

---

১. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, জামেউ' তিরমিঝি, অধ্যায় তিজারাহ
২. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাজাহ সুনানু ইবন মাজাহ অধ্যায়, বুয়ূ'
৩. ইমাম আবু দাউদ মুলাইমান ইবন আশযাস, সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়, তিজারাহ
৪. ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবন আল-নাসায়ী, সুনানু নাসায়ী, অধ্যায় বুয়ূ
৫. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাজাহ সুনানু ইবন মাজাহ অধ্যায়, বুয়ূ'
৬. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, জামেউ' তিরমিঝি, অধ্যায় তিজারাহ
৭. ইমাম আবু দাউদ মুলাইমান ইবন আশযাস, সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়, তিজারাহ

Dhaka University Institutional Repository

তবে এক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত রয়েছে। তা হল:[১]

⇨ অর্থ-সম্পদের মূল মালিক মানতে হবে আল্লাহকে, নিজেকে মনে করতে হবে রক্ষক ও আমানতদার। সুতরাং আয় ও ব্যয় করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুসারে;

⇨ ব্যবসায়িক কার্যাবলিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকতে হবে;

⇨ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পণ্য ও দব্যসামগ্রীর ব্যবসা করা যাবে না;

⇨ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত নিয়ম-পদ্ধিতিতে ব্যবসা করা যাবে না এবং

⇨ সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা ও মানবকল্যাণ হতে হবে ব্যবসায়ের আদর্শ।

❒ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামের নীতিমালা

যে কোন দেশের আর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তা অভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক বাণিজ্য যে পর্যায়ের হোক না কেন। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খাদ্য শস্যসহ বিভিন্ন প্রকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে এবং ব্যবহার ও প্রয়োগে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সমগ্রবিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করছে। তাই আধুনিক বিশ্বে 'Global Economy'র ধারণা-জন্ম নিয়েছে। এসব কারণে বর্তমান বিশ্বের যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ভরশীল। অভ্যন্ত রীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রদান করেছে। এসব নীতিমালা শরীআহ্‌র মৌল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহসহ অন্যান্য উৎস থেকে উৎসারিত। নীতিমালাসমূহ নিম্নরূপ:

⇨ সুদভিত্তিক যাবতীয় লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে;[২]

⇨ সম্মতি, সমঝোতা ও বিনিময় ছাড়া কারো অর্থ-সম্পদ হস্তগত কিংবা ভোগ ও দখল করা যাবে না;[৩]

⇨ ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয়ে কিংবা বিনিময়ে ওজন ও পরিমাপে কম-বেশি করা যাবে না; [৪]

⇨ যে কোন প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রসারকারী ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও বিপণন ইসলামে নিষিদ্ধ;[৫]

⇨ চাঁদাবাজি, দূর্নীতি, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ ও জবরদখল ইসলামে নিষিদ্ধ [৬];

⇨ ভেজাল, জালিয়াতি ও প্রতারণা পূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ[৭];

⇨ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে;[৮]

⇨ অর্থ-সম্পদ বিনিময় ও ভোগদখলে কারো উপর অন্যায় আচরণ বা জুলুম করা যাবে না;[৯]

⇨ অপচয়, অপব্যবহার ও অব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ [১০]

---

১. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৬
২. আল-কুরআন, ২:২৭৫
৩. আল-কুরআন, ৪:২৯
৪. আল-কুরআন, ৮৩:১-৫
৫. আল-কুরআন, ২৪:১৯
৬. আল-কুরআন, ৩:১৬১
৭. আল-কুরআন, ২৬:১৮৩
৮. আল-কুরআন, ২:২৮২
৯. আল-কুরআন, ৪:১০
১০. আল-কুরআন, ১৭:১৭

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া আরো কিছু মূলনীতি রয়েছে। তা হল:[১]

- ⇨ ঘুষ বা উৎকোচের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ;
- ⇨ মাদক ও মাদক জাতীয় পণ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদন বিপণনসহ ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ;
- ⇨ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার ইসলামে নিষিদ্ধ;
- ⇨ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যাবে না;
- ⇨ প্রতারণাপূর্ণ দালালির মাধ্যমে উচ্চ দামে বিক্রি করা যাবে না;
- ⇨ মিথ্যা-প্রতারণাপূর্ব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফায়দা হাসিল করা যাবে না;
- ⇨ মিথ্যা-শপথের আশ্রয় নেয়া যাবে না;
- ⇨ বিক্রিত মালামালের দোষ ত্রুটি গোপন করা যাবে না;
- ⇨ মজুদদারী'র মাধ্যমে বাজারে কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানো ইসলামে নিষিদ্ধ;
- ⇨ বিভিন্ন কৌশলে ভ্যাট ও রাজস্ব ফাঁকি দেয়া অবৈধ;
- ⇨ ধোঁকা, প্রতারণা, ব্যবসায়ের শর্ত ভঙ্গ করা এবং অনিশ্চিত পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ;
- ⇨ যৌথ ব্যবসায়ে অবিশ্বস্ততার কোন কার্যক্রম ও খিয়ানত করা যাবে না এবং
- ⇨ যে কোন অবৈধ পন্থা উপার্জিত অর্থ-সম্পদও ইসলামে অবৈধ হিসেবে গণ্য।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরীআহ্‌র নীতিমালা: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবাদে আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক হল অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ না করে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে পূর্ব নির্ধারিত হারে নিশ্চিত সুদ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে শরীআহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থলগ্নীর ব্যবসা করে না। এ সব ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ব্যাংক পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে এবং অতিরিক্ত অর্থ লাভ হিসেবে গ্রহণ করে।

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরীআহ্‌সম্মত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুশীলন করে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় কার্যক্রম পরিচারনা করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ের যাবতীয় লেনদেন পরিচালনা ও নিষ্পত্তির জন্য ইসলামী ব্যাংক বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলে।

---

১. আবদুর রহমান আল-জুযাইরী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে বিনাসুদে পরস্পরের জন্যে কার্যক্রম পরিচালনার শর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী ও অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তির অধীনে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহ একে অপরের জন্য কাজ করে থাকে। এ ছাড়া সমপ্রডাক্ট ঋণ ব্যবস্থা, আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব সংরক্ষণ এবং বাই'মুরাবাহার ভিত্তিতে পরস্পর আমানত সংরক্ষণ পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। যাহোক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় সম্পর্কে প্রচলিত রীতি-নীতির তাত্ত্বিক আলোচনার পর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়–আমদানি ও রফতানী বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অর্থায়ন পদ্ধতি ও বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে এ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হল।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরী'আহ্র নীতিমালা: রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

ইসলামী ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। রপ্তানি পণ্য-সামগ্রী সংগ্রহ ও তৈরী, প্যাকিং, জাহাজীকরণ ও পরিবহন প্রভৃতি কাজের জন্য ব্যাংক রপ্তানিকারকের সঙ্গে শরীআহ্ অনুমোদিত ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে। রপ্তানিকারক পুঁজি সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হলে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা, মুরাবাহা ও বাই'সালাম পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, অর্থ আদান-প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, ট্রাভেলার্স চেক ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম ব্যাংককে শরী'আহ্র নীতিমালা অনুসারে সম্পন্ন করতে হয়। বর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যে সব ক্ষেত্রে শরীআহ্র বিধি-বিধান পরিপালন ও অনুসরণ করতে হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

- ❒ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময়-সীমা নির্দিষ্টকরণ;
- ❒ বায়না ও বিক্রয় চুক্তি পার্থক্য;
- ❒ অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা;
- ❒ পণ্য ও দ্রব্য-সামগ্রীর রিস্ক পরিবর্তন;
- ❒ এগ্রিমেন্ট টু সেল সম্পন্ন না করা;
- ❒ চুক্তি ভঙ্গের কারণে লোকসান (Damage)-এর শরী'আহ্র ব্যাখ্যা;
- ❒ এক্সপোর্টের জন্য মূলধন সংগ্রহ;
- ❒ এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি;
- ❒ প্রি-শিপ্‌মেন্ট ফাইন্যান্সিং-এর ইসলামী পদ্ধতি;
- ❒ পোস্ট-শিপ্‌মেন্ট ফাইন্যান্সিং-এর প্রচলিত পদ্ধতি এবং
- ❒ বিল-ডিসকাউন্টিং-এর ইসলামী পদ্ধতি।

এ ছাড়াও ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এন্ড ফরওয়ার্ড বুকিং-এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শরী'আহ্র নীতিমালা পরিপালন ও প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। AAOIFI [১] অনুসারে তা হল:

Dhaka University Institutional Repository

- ঋণপত্র (Letter of Credit);
- দলীলসম্বলিত ঋণপত্রের বৈধতার ক্ষেত্রে শরী'আহ্‌র ভিত্তি;
- ঋণপত্র খোলার পূর্ব চুক্তি;
- ঋণপত্রের কমিশন ও অন্যান্য খরচ;
- ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রের অর্থায়নে ইসলামী পদ্ধতি;
- ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট;
- শরীআহ্‌র দৃষ্টিতে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা এবং ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট;
- মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি;
- বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিস্থিতি;
- ব্যাংক গ্যারান্টি: শরী'আহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গী;
- রপ্তানি বাণিজ্যে বাই মু'য়াজ্জালের প্রয়োগ এবং
- রপ্তানি বাণিজ্যে বাই' সালামের প্রয়োগ।
- আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময়-সীমা নির্দিষ্টকরণ

রফতানির ক্ষেত্রে বিক্রির পয়েন্ট অব টাইম বা সময় নির্দিষ্ট হওয়া শরীআহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক। আর এটা বাণিজ্য আইনেও প্রচলিত। বিক্রির পয়েন্ট অব টাইম কী? যে পয়েন্ট অব টাইমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেই পয়েন্ট অব টাইমের ভিত্তিতে দায় রফতানিকারকের জিম্মা থেকে আমদানিকারকের জিম্মায় বর্তায়[২]। এছাড়া আরো বহু বিষয় শারঈ' ও আইনিভাবে পয়েন্ট অব টাইম নির্দিষ্টকরণের উপর নির্ভর করে। অতএব পয়েন্ট অব টাইম নির্দিষ্টের জন্য বিক্রয় ও বায়না চুক্তি এবং এর পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

বিক্রয় ও বায়না চুক্তির পার্থক্য

শরীআহ্ ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে বিক্রি ও বায়না চুক্তির মাঝে পার্থক্য রয়েছে, যদিও Contract শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দ বিক্রয় ও বায়না চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

১. AAOIFI-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শর'ঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ।
Shariah Standard, Standard No-8(3/1/3-3/1/7), p.121-122

২. ibid

Dhaka University Institutional Repository

তবে উভয় Contract-এর মাঝে শরী'আহ্ ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ[১]:

প্রথমত: যে পণ্যের এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বায়না হয়, সে পণ্য বিক্রিত পণ্য নয়, শুধু এতটুকু যে বিক্রেতা পণ্যের ব্যবস্থা করবে আর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়। এতে কারো মালিকানা পরিবর্তন হয় না [২]।

দ্বিতীয়ত: প্রচলিত আইন হলো বিক্রয়ের পর পণ্যের মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে পণ্যের দায় ও পরিবর্তন হয়। যেমন কম্পিউটার ক্রয় করে বিক্রেতার নিকট রেখে দিলেও পণ্যের দায় থাকবে ক্রেতার উপর। প্রচলিত আইনানুযায়ী কম্পিউটার বিক্রেতার কাছ থেকে হারালে, নষ্ট হলে বা চুরি হয়ে গেলেও ক্রেতা বিক্রেতার কাছে পণ্যের দাবি করতে পারবে না; সম্পূর্ণ ক্ষতিটা ক্রেতার উপর দিয়ে যাবে। আইনের সাহায্যে বিক্রেতার কাছ থেকে ভর্তুকির দাবি করা চলবে না। কারণ, ক্রয়ের সাথে সাথে পণ্যের রিস্কও ক্রেতার দিকে পরিবর্তিত হয়, যদিও পণ্য বিক্রেতার হেফাজতে থাকে। পক্ষান্তরে শরী'আতের বিধান হলো, মলিকানা ও রিস্ক উভয়টি সম্পূর্ণ হোক। শুধু মালিকানা পরিবর্তন হলেই রিস্ক পরিবর্তন হয় না, রিস্ক পরিবর্তনের জন্য ক্রেতার কবজা বা দখল হওয়া জরুরি। অতএব কম্পিউটার ক্রেতার হেফাজতে না আসা পর্যন্ত তার রিস্ক ক্রেতার উপর বর্তাবে না, ক্রেতা নিজে কিংবা তার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্য বুঝে নিয়ে দখলে নিতে হবে [৩]।

তৃতীয়ত: এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর পণ্য অন্যের নিকট বিক্রি করা বৈধ; তবে তা অনৈতিক। নৈতিকতা ব্যবসায়ীদের অমূল্য সম্পদ।[৪]

চতুর্থত: এগ্রিমেন্ট টু সেল সম্পাদিত হওয়া অবস্থায় বিক্রেতা দেউলিয়া হলে ক্রেতা পণ্য দাবি করতে পারবে না। বিক্রেতা সে পণ্য অন্যের নিকটও বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু পূর্ণ বিক্রয় হয়ে থাকলে বিক্রেতা অবশ্যই পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেবে; অন্যথায় ক্রেতা তার কাছ থেকে যেকোনো উপায়ে পণ্য বুঝে নিতে পারবে। বিক্রেতা সে পণ্য অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে না[৫]।

---

১. ড. আব্দুল আজিম আবু যায়দ, *বাই'উল মুরাবাহাতি ওয়া তাত্ববিকাতুহুলা ম'আছারাহ ফীল মাছারিফিল ইসলামিয়া* (দামেশক: দারুল ফিকর, ২০০৪খ্রি.) পৃ. ২১৯-২২০)

২. প্রাগুক্ত

৩. বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু বকর আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, অনু: মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্ (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.) খ.৩, পৃ. ৩০৪

৪. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৩০৫

৫. *আল-ফাতাওয়া আশ্‌শার'ইয়্যাহ ফীল মাসাইলিল ইক্বতিছাদিয়্যাহ* (কুয়েত: কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, ১৯৮৫ খ্রি.) খ.১, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

❒ অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্ডারের সময় পণ্যের কয়েকটি অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন- অনেক ক্ষেত্রে অর্ডারের সময় বিক্রেতার কাছে পণ্য প্রস্তুতই থাকে না। বিক্রেতা পণ্য ক্রয়ের অর্ডার পেয়ে নিজের ফ্যাক্টরিতে অথবা অন্যের ফ্যাক্টরিতে বানায় কিংবা বাজার থেকে খরিদ করে। অথবা অর্ডারের সময় পণ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। অর্ডারপ্রাপ্তির সময় যদি অর্ডারি পণ্য পূর্ণ প্রস্তত থাকে তাহলে এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর কোনো প্রয়োজনই নেই। সেক্ষেত্রে সরাসরি পূর্ণ বিক্রয় হবে। বিক্রেতা মুল্য বুঝে নেবে আর ক্রেতা পণ্য বুঝে নেবে-এ অবস্থায় শরী'আহ্‌র কোনো আপত্তি নেই [১]।

অর্ডারের সময় যদি পণ্য অপ্রস্তুত থাকে অথবা নিজের বা অন্যের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করতে হয় কিংবা বাজার থেকে খরিদ করতে হয়, তাহলেও পূর্ণ বিক্রয় সম্ভব কারণ, প্রচলিত আইনে বিক্রির সময় পণ্যের মালিকানা জরুরি নয়। পক্ষান্তরে, ইসলামী শরী'আহ্‌র মতে, পণ্য বিক্রি করতে হলে মালিকানা, দখলস্বত্ব এবং পণ্য প্রস্তুত থাকা জরুরি। আর যদি এসব না থাকে তবে এগ্রিমেন্ট টু সেল হতে পারবে, পূর্ণ বিক্রয় হতে পারবে না[২]। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর কখন পূর্ণ বিক্রি হবে। 'এখন পূর্ণ বিক্রি সম্পন্ন হলো মালিকানা পরিবর্তন ও রিস্ক পরিবর্তন হলো-এ বিষয়গুলো কখন প্রয়োগ কিংবা প্রযোজ্য হবে? উত্তরে বলা যায়, এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর অর্ডার তৈরি সম্পন্ন হলে মাল ডেলিভারির অপেক্ষায় থাকে। সে ক্ষেত্রে দুটি পন্থায় পূর্ণ বিক্রি হতে পারে-অর্ডারি পণ্য তৈরি হয়ে গেলে ক্রেতার সাথে নতুন করে পূর্ণ বিক্রির ইজাব (প্রস্তাব) কবুল (গ্রহণ) করবে। এতেই পূর্ণ বিক্রি সম্পাদিত হবে। আমদানিকারকের সাথে পূর্ণ বিক্রির জন্য ইজাব কবুলের ক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়া জরুরি নয়, বরং যেকোনো উপায়ে ইজাব কবুল সম্পাদন হলেই যথেষ্ট [৩]। অপর পদ্ধতি হচ্ছে নতুন করে ইজাব কবুল ছাড়াই পূর্ণ বিক্রয় সম্পাদন, যা শরী'আহ্‌র পরিভাষায় 'বাই' তা'আতী' বলে পরিচিত [৪]। শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের নিযুক্ত প্রতিনিধি হওয়ার কারণে অর্ডারি পণ্য শিপিং কোম্পানিকে বুঝিয়ে দিলে 'বাই' তা'আতী' হওয়ায় পূর্ণ বিক্রি সম্পদিত হবে। তখন পণ্যের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব ইম্পোর্টারের উপর বর্তাবে [৫]।

সারকথা হচ্ছে, পণ্য প্রস্তুত থাকলে অর্ডারের সময় এগ্রিমেন্ট টু সেল না করে সরাসরি পূর্ণ বিক্রি করতে পারবে। আর যদি তখন পণ্য অপ্রস্তুত থাকে তবে ইম্পোর্টাবের এজেন্ট শিপিং কোম্পানি বুঝে নিলেই কেবল পূর্ণ বিক্রি হবে। অথবা নতুন করে ইজাব কবুল করে পূর্ণ বিক্রয় করবে। এছাড়া সরাসরি পূর্ণ বিক্রয় করতে পারবে না। এটা হলো বিক্রয়ের পয়েন্ট অব টাইম [৬]।

---

১. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No-8(3/1/3-3/1/7), p.123
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid
৫. ibid, p. 125
৬. ibid, p. 126

Dhaka University Institutional Repository

❒ পণ্যের রিস্ক পরিবর্তন

শিপমেন্ট পদ্ধতি সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে। যথা-(i) F. O. B. (ii) C and F [১]. (iii) CIF. FOB পদ্ধতিতে জাহাজ পর্যন্ত পণ্য পৌছে দিলেই এক্সপোর্টারের দায়িত্ব শেষ। জাহাজ ভাড়াসহ সকল প্রকার খরচাদি ইম্পোর্টার বহন করে। এক্ষেত্রে শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের এজেন্ট হওয়ার কারণে পণ্যের রিস্ক ইম্পোর্টারের জিম্মায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে[২]। CFR পদ্ধতিতে জাহাজ ভাড়া এক্সপোর্টারকে বহন করতে হয়; তবে শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এ পদ্ধতি শরী'আহর সাথে সংঘর্ষিক না হওয়ায় শিপিং কোম্পানি পণ্য বুঝে নিলে পণ্যের রিস্ক ইম্পোর্টারের দিকে পরিবর্তন হয়ে যাবে। CIF পদ্ধতি CFR পদ্ধতির অনুরূপ। তবে পার্থক্য হচ্ছে, এক্সপোর্টারকে ইম্পোর্টারের পক্ষ থেকে পণ্যের বীমা করে দিতে হয়। বীমার লাভ ইম্পোর্টার ভোগ করে। অতএব এ পদ্ধতির বিধান CFR পদ্ধতির অনুরূপ। FOB, CFR ও CIF শিপিং পদ্ধতিগুলো শরী'আহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় শিপিং কোম্পানি পণ্য বুঝে নিলে পণ্যের দায় ইম্পোর্টারের দিকে পরিবর্তন হয়ে যাবে[৩]।

❒ এগ্রিমেন্ট টু সেল পূর্ণ না করা

এগ্রিমেন্ট টু সেল করার পর এক্সপোর্টার ওয়াদা ভঙ্গ করলে ইম্পোর্টার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে কি না? অথবা ইম্পোর্টার অর্ডার নিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে কি না? এ ক্ষেত্রে শরীআহ্র নির্দেশনা নিম্নরূপ:

প্রচলিত আইনে এগ্রিমেন্ট টু সেল ভঙ্গ করলে যার ক্ষতি হবে সে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে। দাবি আদায় না করলে মামলা করে দাবি আদায় করতে পারবে [৪]। পক্ষান্তরে শারঈ বিধান হলো, ওয়াদা পূরণ করা জরুরি। কেননা, ওয়াদাটা চারিত্রিক বা নৈতিক বিষয় [৫]। এগ্রিমেন্ট টু সেল ওয়াদা হওয়ায় তা ভঙ্গ করলে শরীআহ্র পক্ষ থেকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি এক্ষেত্রে ওয়াদা ভঙ্গের পাপের অধিকারী হবে। পার্থিব জগতে এর কোনো বিহিত নিজেদের হাতে করা যাবে না। তবে ওয়াদা পূরণের নিমিত্তে তাকে প্রেসার দেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক ওয়াদার মূল্য অনেক বেশি। কারণ, অর্ডারপ্রাপ্তির পর বিক্রেতা পণ্য তৈরি শুরু করে দেয়। এতে বিক্রেতার অর্থ ব্যয় হয়। এমতাবস্থায় ক্রেতা পণ্য নিতে অস্বীকার করলে বিক্রেতার ক্ষতি হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ ফিকাহ্‌বিদ আদালতের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে দাবি আদায় করতে পারবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আদালত দুটি বিষয়ে উভয়কে ওয়াদা পূরণে বাধ্য করবে। যেমন যদি বিক্রেতা বিক্রি করতে অস্বীকার করে তবে বিক্রি করতে বাধ্য করবে আর যদি ক্রেতা কিনতে অস্বীকার করে তবে আদালত তাকে কিনতে বাধ্য করবে। অথবা যৌক্তিক কারণবশত, ওয়াদা পূরণে অক্ষম হলে কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ তার থেকে ড্যামেজ (লোকসান) আদায় করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন [৬]।

---

১. AAOIFI, *Shariah Standard, Standard No*-8(3/1/3-3/1/7), p.170
২. ibid
৩. ibid
৪. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী; *ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে সুদবিহীন ব্যাংকিং*, অনু: মাওলানা মুসাবিন ইযহারী (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ১২৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

❑ চুক্তি ভঙ্গের কারণে লোকসান (damage)-এর বিষয়ে শরী'আহ্র ব্যাখ্যা

শরীআহ্ অনুমোদিত লোকসান আর প্রচলিত লোকসান এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, বর্তমানে সম্ভাব্য লাভ (Opportunity Cost)-এর উপর ভিত্তি করে ড্যামেজ আদায় করা হয়ে থাকে। যেমন-কারো সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর ক্রেতা পণ্য নিতে অস্বীকার করায় পণ্য অন্যের নিকট বিক্রি করতে হয়। পূর্বের এগ্রিমেন্ট টু সেল-এ কত লাভ হতো, আর পরের বিক্রিতে কত লাভ হয়েছে এর মাঝের অংশটাকে ড্যামেজ হিসেবে ধরা হয়। আর এই ড্যামেজই আদালতের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। অথবা ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত টাকা জমা করে রাখল, ব্যবসায় খাটাল না, অর্ডারের ডেলিভারির সময় বিক্রেতা অর্ডার ডেলিভারি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্রেতার ক্ষতি হয় কারণ, ক্রেতা টাকা আটকে রেখেছিল, এতদিন অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে অনেক মুনাফা পেত। অতএব, ক্রেতা আদালতের মাধ্যমে বিক্রেতার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে[১]।

এ জাতীয় লোকসান (ড্যামেজ)-কে শরী'আহ্ সমর্থন করে না। শরী'আহ্ দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখে-লাভ না হওয়া এবং লোকসান হওয়া। লাভ না হওয়া দ্বারা যে পরিমাণ লাভের আশা করা হয়েছিল সেই পরিমাণ লাভ না হওয়া বোঝায় আর লোকসান হওয়া দ্বারা পণ্য তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সে টাকা অনাদায় থাকা বোঝায়। আজকাল লাভ না হওয়াকেও লোকসান বলে চিহ্নিত করা হয়। যেমন-কোনো ব্যবসায়ী দশ টাকা মূল্যমানের পণ্য পনের টাকা বিক্রি করে এতে পাঁচ টাকা লাভের আশা করে, কিন্তু কোনো কারণে পণ্যটি যদি বারো টাকায় বিক্রি করতে হয় তবে দেখা গেল আশার চেয়ে তিন টাকা কম মূল্যে পণ্যটি বিক্রি হলো। এটাকেও ব্যবসায়ীরা লোকসান বলে চালিয়ে দেন। অথচ এটি শরীআহ্র দৃষ্টিতে লোকসান নয়। দশ টাকা মূল্যমানের পণ্যটি যদি নয় টাকায় বিক্রি করা হয় তবে সেক্ষেত্রে বলা হবে, এক টাকা লোকসানে বিক্রি হয়েছে এটিই প্রকৃত শারঈ' লোকসানসম্ভাব্য লাভ (Opportunity Cost) হিসেবে যে লোকসান ধরা হয় তা শরীআহ্ সমর্থন করে না [২]।

❑ এক্সপোর্টের জন্য মূলধন সংগ্রহ (কালেকশন)

এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে 'ডকুমেন্ট ক্রেডিট' অতীব প্রয়োজনীয়। অর্ডার পাওয়ার পরই এক্সপোর্টার পণ্য বানানোর পরিকল্পনা করে। অর্ডারের সময় পণ্যের কোনো নাম-নিশানাও থাকে না। এমনকি এক্সপোর্টারের নিকটও অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূলধন থাকে না। অর্ডারি পণ্য তৈরি করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তা কালেকশনের জন্য এক্সপোর্টার ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার নিকট ধরনা দেয়। তাদের কাছ থেকে মূলধন কালেকশন করে অর্ডারি পণ্য তৈরি করে সাপ্লাই করে, একে 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সি' বলে [৩]। এ ব্যাপারে সকল ব্যাংক ও ঋণদাতা সংস্থাগুলো অনেক অগ্রগামী। তবে এদের লেনদেন অধিকাংশই সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং ইসলামী পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

---

১. Mahmud Hasan, *Foreign Exchange Business and Foreign Guarantee* (Dhaka: AKM Anisuzzaman 2002 A.D.), p. 135

২. *আত্তামভীল বিল মুশারাকা, মারকাযুল ইকতিসাদ আল-ইসলামী, আল-মাছারিফুল ইসলামী-আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারী ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ* (১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ১১

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং-এর ইসলামী পদ্ধতি

অর্ডার পাওয়ার পর এক্সপোর্টার মূলধন কালেকশনের জন্য ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেয়। প্রচলিত সকল পদ্ধতি সুদভিত্তিক হওয়ায় প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুদবিহীন পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার সাথে 'মুশারাকা' পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেন হতে পারে। অর্ডার থাকার কারণে পণ্য খরিদ বা পণ্য প্রস্তুতে যাবতীয় খরচ, লাভ ও পণ্যের এলসি (LC) খোলা থাকায় সরবরাহ খরচাদিও নির্দিষ্ট থাকে। অতএব খুব সহজে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার সাথে মুশারাকা বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদবিহীন অর্থ লেনদেন করা যায়। এক্সপোর্টার টাকা নিয়ে পণ্য তৈরি করে সাপ্লাই দিয়ে যে অর্থ উপার্জন হবে তা অনুপাতিক হারে ভাগ করে নেবে। এক্সপোর্টারের মূলধন থাকলে মুশারাকা পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে, আর যদি তার মোটেও মূলধন না থাকে তবে লেনদেনটি 'মুদারাবা' হয়ে যাবে। মুশারাকা থাকবে না। কারণ, মুদারাবাতে থাকে একজনের অর্থ অপরজনের শ্রম। বিনা পুঁজিতে যেহেতু কোনো এক্সপোর্টরের কিছু মূলধন ব্যবসায়ে থেকে যায়, সেহেতু এ লেনদেনকে 'মুশারাকা' বলা যায় [১]।

❒ পোস্ট-শিপমেন্টের ফাইন্যান্সিং-এর প্রচলিত পদ্ধতি

বিক্রেতা বিলের চেক পাওয়ার পর অর্ডার ডেলিভারি দেয়, কিন্তু বিলের টাকা নগদ পেতে দেরি হওয়ায় ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থায় বিলের কাগজ প্রদান করে টাকা নিয়ে নেয় আর টাকা ক্যাশ হলে তা থেকে তাদের টাকা তারা বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা প্রদান করে থাকে, যাকে 'বিল ডিসকাউন্টিং' বলে [২]। যেমন-এক লাখ টাকার চেক জমা দিলে ১০% কেটে রেখে নব্বই হাজার টাকা এক্সপোর্টারকে দেওয়া হয়। আর টাকা ক্যাশ হলে পুরো এক লাখ টাকাই ঋণ পরিশোধ হিসেবে নিয়ে নেয় ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থা। প্রচলিত এ বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতি সুদী হওয়ায় শরীআহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ (নাজায়েয)।[৩]

❒ বিল ডিসকাউন্টিং-এ শরী'আহ্‌সম্মত পদ্ধতি

প্রচলিত বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতিকে শরী'আহ্‌সম্মত করতে দুটি পদ্ধতি রয়েছে :

প্রথম পদ্ধতি; যদি বিক্রেতা পোস্ট-শিপমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে চায় তাহলে অর্ডার ডেলিভারির পূর্বে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থাকে মুশারাকা (অংশীদার) করে নেবে,তবে সে ক্ষেত্রে বিল ডিসকাউন্টিংয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না[৪]।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পদ্ধতি; এলসি'র কম মূল্যে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেবে এরপর সে এলসি মূল্যে ইম্পোর্টারের কাছে বিক্রি করবে। এ দুই বিক্রয়ের মাঝে যে পার্থক্য হবে সে অংকটাই মুনাফা হবে। যেমন এক লাখ টাকার এলসি থাকলে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার কাছে পঁচানব্বই হাজার টাকা বিক্রি করবে। এরপর তারা ইম্পোর্টারের নিকট এক লাখ টাকায় বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা করবে। বিল ডিসকাউন্টিং-এর পদ্ধতি এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্ণ বিক্রি হয়ে গেলে বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না [১]।

বিল ডিসকাউন্টিং-এর আরেকটি শরীআহ্সম্মত পদ্ধতি রয়েছে, যা কিছু শর্তসাপেক্ষ। এ পদ্ধতির শর্ত পূরণ হওয়া কঠিন এবং সাধারণত পূরণ হয় না বিধায় ব্যাপকভাবে নিষেধ করা হয়। তবে ইসলামী ব্যাংক ইচ্ছা করলে শর্তগুলো পালনের মাধ্যমে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারে। পদ্ধতিটি হলো;

বিক্রেতা বিল ডিসকাউন্টিং-এ আগ্রহী ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার সাথে পৃথক দুটি লেনদেন (ট্রানজেক্শন) করবে, ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থাকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ দিবে। তারা প্রতিনিধি হিসেবে ইম্পোর্টার থেকে টাকা আদায় করে এর জন্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করবে। এরপর ব্যাংক এলসি'র কম পরিমাণ টাকা এক্সপোর্টারকে বিনা সুদে ঋণ দিবে [২]।

যেমন-বিক্রেতা এক লাখ টাকার বিল ডিসকাউন্টিং করার লক্ষ্যে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থাকে এজেন্ট নিয়োগ দেবে, তারা টাকা উত্তোলন করে এক্সপোর্টারকে পাঁচানব্বাই হাজার টাকা দিয়ে বাকি পাঁচ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে গ্রহণ করবে। অপরদিকে ব্যাংক তাকে পঁচানব্বই হাজার টাকা বিনা সুদে ঋণ দেবে; ইম্পোর্টার থেকে এক লাখ টাকা উত্তোলন করে পঁচান্নবই হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করে নেবে আর পাঁচ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে নেবে। এভাবে লেনদেনটি শরী'আহ্সম্মত হতে পারে [৩]।

উপরিউক্ত পদ্ধতিটি শরীআহ্সম্মত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আরেকটি শর্ত হচ্ছে, সার্ভিস চার্জ বিল আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। সার্ভিস চার্জ বিলের মেচ্যুরিটি পিরিয়ডের সাথে রিলেটেড নয়। যেমন-বিল আদায়ে তিন মাস লাগলে চার হাজার আর চার মাস লাগলে ছয় হাজার টাকা দিতে হয়। এরূপ হলে বিল ডিসকাউন্টিং শরী'আহ্সম্মত থাকবে না বরং তা সুদী লেনদেন হয়ে যাবে [৪]।

---

১. AAOIFI, *Shariah Standard, Standard No*-8(3/1/3-3/1/7), p.170
২. ibid, p. 171
৩. ibid,
৪. ibid, p. 172

Dhaka University Institutional Repository

❒ ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এন্ড ফরওয়ার্ড বুকিং : ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি

আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক আমদানিকারক বা ক্রেতার অনুরোধে কোনো ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারক বা বিক্রেতার অনুকূলে যে পত্র দেওয়া হয় তাকে ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) বলে[১]। মূল্য পরিশোধের এ মাধ্যমটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আজকাল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মাধ্যমটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

AAOIFI কর্তৃক Documentary Credits-এর উপর ২০০৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত Shariah Standard No. (14)-এ Documentary Credit-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে:

"A documentary credit is a written undertaking of abank (known as the issuer) given to the seller (the beneficiary) as per the buyer's (applicant or orderer's) instruction or is issued by the bank own use, undertaking to pay upto a specitic amount (in cash or throught acceptancee or discounting of a bill of wxchange) items within a certain period of time, on condition the the seller presents documents for the goods conforming to the isnstructions.

In brief, a documentary credit is a undertaking by abank to pay subject to conformity of the documents to the contractual instructions."[২]

ক্রেতার (আবেদনকারী অথবা আদেশদাতা) অনুরোধে অথবা ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো ব্যাংক (ইস্যুকারী ব্যাংক) বিক্রেতাকে (বেনিফিসিয়ারি) যে লিখিত অঙ্গীকার দেয় তাকে দলিলসংবলিত ঋণপত্র বলে। এই লিখিত অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য নির্দেশানুযায়ী দলিলপত্র দাখিলসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালামালের মূল্য হিসেবে সীমিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদে অথবা স্বীকৃত কিংবা বিনিময় বিল-বাট্টাকরণের মাধ্যমে পরিশোধ করা সংক্ষেপে বলা যায় চুক্তির শর্তানুযায়ী দলিলপত্রের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারকে দলিলসংবলিত ঋণপত্র বা Documentary Credit বলা হয়[৩]।

❒ শরী'আহ্র দৃষ্টিতে দলিলসম্বলিত ঋণপত্র

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ে দলিলসম্বলিত ঋণপত্রের ব্যবহার দু'ধরনের হতে পারে:

১. দলিলপত্র পরীক্ষার মতো পদ্ধতিগত সেবা দানের প্রতিনিধিত্ব চুক্তি অথবা

২. আমদানিকারককে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করা।

উপরিউক্ত উভয় ধরনের প্রতিনিধিত্ব ও নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান বৈধ। সুতরাং উক্ত Standard অনুযায়ী দলিলসম্বলিত ঋণপত্র বৈধ[৪]।

---

১. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No-14(3/1/3-3/1/7), p.172
২. ibid,
৩. ibid,
৪. ibid,

Dhaka University Institutional Repository

খ. গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো ব্যাংক সব ধরনের দলিলসম্বলিত ঋণপত্র খোলা, ইস্যু অথবা কনফার্ম করতে শরী'আহ্তে কোনো বাধা নেই। নিচে গ-এ উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে যে কোনোভাবে এ ধরনের ঋণপত্রে সম্পৃক্ততা বা মধ্যস্থতাকরণ এবং এ ধরনের ঋণপত্র অবহিতকরণ, সংশোধন বা সম্পাদন ইত্যাদি কাজও অনুমোদনযোগ্য[১]।

গ. তবে নিম্নলিখিত কারণে উপরে খ-এ বর্ণিত কার্যাদি শরী'আহ্ অনুমোদিত নয় এবং বৈধ হবে না [২]:

যদি চুক্তির মালামাল শরীআহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ে থাকে এবং যদি ঋণের দলিলাদি বা পক্ষসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনোভাবে রিবা বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দলিলপত্রের মূল্য পরিশোধের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে ঋণের অতিরিক্ত আদায় করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা পক্ষসমূহ রিবার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। আবার যদি বিল-বাট্টাকরণ বা অপরিপক্ক বিল ক্রয়-বিক্রয় বা বিলম্বে পরিশোধ ইত্যাদির কারণে অতিরিক্ত অর্থের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়, তাহলে তা পরোক্ষভাবে রিবা বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। দলিলসম্বলিত ঋণপত্র বৈধতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় চুক্তি বৈধ হওয়া আবশ্যক। চুক্তিটি অবশ্যই শরী'আহ্সম্মত হতে হবে[৩]।

❒ ঋণপত্র খোলার পূর্ব চুক্তি:

ক. ঋণপত্রের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধিত হবে-এ মর্মে বিক্রয়চুক্তিতে শর্ত আরোপ করা বৈধ[৪]।

খ. যদি চুক্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা যেমন-Incoterms অথবা অন্য কোনো সূত্রের উল্লেখ করা হয় তবে তা শরী'আহ্র নিয়ম-নীতি পরিপন্থী নয় মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে [৫]।

❒ ঋণপত্রের কমিশন ও অন্যান্য খরচ প্রসঙ্গে

১. ঋণপত্র ইস্যুর জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রকৃত খরচ আরোপ ও আদায় বৈধ। প্রয়োজনীয় সেবা দানের জন্য ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত ফীও বৈধ [৬]। এ ধরনের ফী যে কোনো পরিমাণ একক অর্থ বা ঋণপত্রের মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারেও হতে পারে। তবে এ ধরনের কমিশন নিরূপণের ক্ষেত্রে কখনো ঋণপত্রের সময়কে বিবেচনায় আনা যাবে না। এ নিয়ম আমদানি ও রপ্তানি সকল ঋণপত্রের বেলায় একই [৬]।

---

১. ড. গরীবুর জামাল, আল-মাছারিফ ওয়া বুয়ুতুত তামভীলিল ইসলামিয়াহ (জেদ্দা: দারুশ শুরুক লিন্নাশরী ওয়াত তিবা'আহ, ১৩৯৮ হি.) পৃ. ৬৪
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. ড. আহমাদ আবদুল আজীজ আন্-নাজ্জার, আল ইত্তেহাদ আদ্দুয়ালী লিল বুনুকিল ইসলামিয়া (কায়রো: দারুল বুহুছ 'ইলমিয়াহ, ১৯৭৮ খ্রি.) পৃ. ২৯
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository
ঋণপত্রের উপর ফী বা কমিশন আরোপের সময় ব্যাংককে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয়:

ক. The aspect of guarantee perse (স্বতন্ত্রভাবে) must not be taken into account when estimating the fees for a documentary credit. অর্থাৎ, কোনো ঋণপত্রের ফি নির্ধারণের সময় গ্যারান্টির বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচিত হবে না। যেহেতু কোনো ঋণপত্রের সত্যায়ন (endorsement) গ্যারান্টি প্রদান ছাড়া কিছুই নয়, তাই কোনো ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র সত্যায়নের জন্য প্রকৃত খরচের অতিরিক্ত কোনো চার্জ আদায় করা বৈধ নয়[১]।

খ. ঋণ সুবিধায় কোনো প্রকার রিবা বা সুদের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করে ফী-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না[২]।

গ. ঋণপত্রের ক্ষেত্রে কয়েকটি চুক্তির সমাহার বৈধ নয়। যেমন-ঋণ, গ্যারান্টি ইত্যাদিকে ঋণপত্রের চুক্তির সাথে একীভূত করে সার্বিক বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশন আদায় করা যাবে না[৩]।

২. কোনো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্রের দায়ের নিরাপত্তা বিধানের জামানত গ্রহণ বা কোনো পরিশোধের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জামানত হিসেবে ঋণপত্র গ্রহণ উভয়ই বৈধ। তবে সুদভিত্তিক বন্ড, নিষিদ্ধ কার্যকলাপে নিয়োজিত কোম্পানির শেয়ার ইত্যাদি সুদভিত্তিক সম্পদ জামানত হিসেবে গ্রহণ বা প্রদান করা যাবে না[৪]। নগদ জামানত মুদারাবা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা বৈধ[৫]।

❒ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রের অর্থায়নে ইসলামী পদ্ধতি

দলিলসম্বলিত ঋণপত্র দ্বারা নিরাপদ কোনো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনে ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারে। এ অর্থায়ন মুরাবাহা, মুশারাকা বা যেকোনো শরীয়াহ্ অনুমোদিত উপযুক্ত বিনিয়োগপদ্ধতির মাধ্যমে করা যায়। তবে বিনিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হয়:[৬]

ক. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর ব্যাংকের বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকে না অর্থাৎ এ অবস্থায় ব্যাংকের বিনিয়োগ অনুমোদনযোগ্য নয়।

খ. মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন এবং ঋণপত্র খোলার আগে ক্রেতাকে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করতে হয় এবং পরবর্তীতে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামে অথবা ক্রেতা কর্তৃক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ক্ষমতার (Letter of Authority) ভিত্তিতে গ্রাহকের নামে (যদি দেশের প্রচলিত আইনে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামে আমদানির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ না থাকে) ঋণপত্র খুলতে হয়। এক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক বিক্রেতার কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে মাল ক্রয় করছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করার বৈধ স্বত্বাধিকারী এটা নিশ্চিত করতে হবে।

---

১. ড. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবু শুহবা, নাজারুল ইসলাম ইলার রিবা (আল-কাহেরা:মাজমা'উল বুহুছুল ইসলামিয়া, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ১২০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ. মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন এবং ঋণপত্র খোলার পূর্বে গ্রাহককে (ক্রেতা) বিনিয়োগের আবেদন করতে হয়। তারপর মুশারাকা চুক্তি সম্পাদনের পর যেকোনো পক্ষের নামে ঋণপত্র খোলা যায়। মালামাল প্রাপ্তির পর ব্যাংক এর অংশ কোনো তৃতীয় পক্ষ বা গ্রাহক অংশীদারের কাছে নগদ অথবা বিলম্বে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে মুরাবাহা পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারে। তবে গ্রাহক অংশীদারের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে এ সংক্রান্ত কোনো প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার অথবা মুশারাকা চুক্তিতে এ ধরনের কোনো শর্ত থাকতে পারে না[১]।

ঘ. অন্য ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত বিল-বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা যায় না অর্থাৎ মেয়াদপূর্তির আগে কোনো বিল কম মূল্যে ক্রয় করা বৈধ নয় [২]।

❒ ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিংএবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে শরীআহ্‌র নীতিমালা

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনুমোদিত পক্ষগণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত যে আগাম চুক্তি সম্পাদিত হয় তা ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট নামে পরিচিত। এ চুক্তি এডি ব্যাংকের সাথে আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের হতে পারে। এমনকি তা দুটি এডি ব্যাংকের মধ্যেও হতে পারে। সাধারণত আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পর পণ্যের আদান-প্রদান এবং তৎপর মূল্যের লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। আমদানি-রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিনিময় হারের হ্রাসের জন্য রপ্তানিকারক এবং বৃদ্ধির জন্য আমদানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য পক্ষগণ চুক্তি সম্পাদনের সময় অথবা তৎপরবর্তী কোনো বিদ্যমান হারে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিশ্চিত করে আগাম চুক্তি করে। এ ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের ব্যবসথাই হচ্ছে ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট [৩]।

❒ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা এবং ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্টাক্ট

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা এবং ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্টাক্ট-এর বৈধ্যতার বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা সম্পর্কে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution-এর Shari'ah Standards (2003)-এ বলা হয়েছে-[৪]

"It is permissible to trade in currencies provided that it is done in compliance with the following Shari'ah rules and precepts:

---

১. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No-14(3/1/3-3/1/7), p.213
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid

Dhaka University Institutional Repository

a. Both parties must take possession of the counter values before dispersing, such possession being either actual or constructive.
b. The counter values of the same curency must be of equal amount even if one of them is in paper money and the other is in coin of the same country, like a note of one pound for a coin of one pound.
c. The contract shall not contain any conditional option or deferment clause regarding the delivery of one or both counter values.
d. The daling in currencies shall not aim at establishing a monopoly position nor should it entail any evil consequences to the interest of individuals or societies.
e. Curency transactions shall not be carried out on the forward or futere market.

International Institute of Islamic Economics (IIIE'S) Blue Print of Islamic Financial System-এ উল্লেখ করা হয়েছে[১]:

"Forward trading of foreign exchange does not constitute a violation of the Ahkam on Riba if the exchange is carried out at the rate fixed at the time of initiating the transaction such that obligation would be indebted party/ parties are precisely determined and do not change later on."

এ বিষয়ে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution-এর Shariah Standards (2003)-এ বলা হয়েছে [২]:

"It is prohibited to enter into forward currency contracts. This rule applies whether such contracts are affected through the exchange of deferred transfers of debt or through the wxecution of a deferred contract in which to concurrent possession of both of the counter values by both parties dose not take place.

It is also prohibited to deal in the forward currency market even if the purpose is hedging to avoid a loss of profit on a particular transaction effected in a currency whose value is expected to decline.

It is permissible for the institution to hedge against the future devaluation of the currency by recourse to the following:

---

১. *International Institute of Islamic Economics* (IIIE, Blue Print of Islamice Financial System, 2005 A.D.) p. 23

২. AAOIFI, Shariah Standard, Standard No-14(3/1/3-3/1/7), p.213

Dhaka University Institutional Repository

a. To execute back to back interest free loans using different currencies without receving or giving any extra benefit provided these two loans are not contractually conectedc to each other.

b. Where the exposure is in respect of an account payable, to sell goods on credit or by Murabaha in the currency of the exposure [১].

ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট মূলত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের ওয়াদা শরীআহতে বৈধ [২] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চুক্তিটি বাধ্যতামূলক কি না। মুরাবাহার ক্ষেত্রে ওয়াদা বিল বাই' নিয়ে অনুরূপ বিতর্ক রয়েছে। সেখানে ইবন শুব্রমা (র)-এর মত গ্রহণ করে ফকীহগণ ওয়াদা বাধ্যতামূলক করাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন [৩]। Forward Contract-এর ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করা হলে তা বৈধ বিবেচনা করা যায় [৪]। এ বৈধতা শুধু একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, যখন Forward-Contractটি সঠিকভাবে পরিপালিত হয় এবং পেমেন্ট-এর তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার দাম যা-ই থাকুক না কেন, তাতে চুক্তিতে উল্লিখিত দামের কোনো হেরফের না হয় । কিন্তু কোনো কারণে যদি LC বাতিল করতে হয় কিংবা নতুন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হয় তাহলে চুক্তিতে উল্লিখিত দাম অনুযায়ী Forward Contract-টি সমন্বয় না করে বরং ভিন্ন নিয়মে সমাপ্ত হয়। যদি Forward Booking কোনো কারণে বাতিল হয়ে যায় এবং Exchange Rate আমদানিকারকের প্রতিকূলে যায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত চার্জ বহন করতে হয়। কিন্তু Rate তার অনুকূলে গেলে সে বিনিময় হার পরিবর্তন থেকে কোনো সুযোগ (Exchange Gain) পায় না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াদা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি শরী'আহ্‌র সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি যদি বাধ্যতামূলক ধরা হয়, তা হলে তা কার্যত সেটা আর ওয়াদা থাকে না বরং ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা যায়। আর এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্‌গণ একমত যে, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে On the Spot লেনদেন সম্পন্ন হতে হবে[৫]।

---

১. AAOIFI, *Shariah Standard, Standard No*-15(3/1/3-3/1/7), p.213
২. ibid
৩. ibid
৪. ড. গরীবুল জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

Dhaka University Institutional Repository

❒ কারেন্সি (মুদ্রা) বেচা-কেনার মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: কারেন্সি পরিবর্তন শরীআহ্সম্মত। কারেন্সির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মতিই যথেষ্ট। নিজেদের নির্ধারিত মূল্যই প্রযোজ্য। তবে যদি কোনো দেশে মুদ্রা বেচা-কেনার জন্য সরকারিভাবে মুদ্রার কোনো মূল্য নির্ধারণ করা থাকে, খোলা বাজারে বিক্রির অনুমতি না থাকে, সরকারি মূল্যের বাইরে বিক্রি করা নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে সেসব দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে মুদ্রা বেচা-কেনা করা যাবে না। কারণ, দেশের আইন শরীআহ্বিরোধী না হলে প্রতিটি নাগরিকের মান্য করা ওয়াজিব [১]। সে হিসেবে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের কম-বেশি করা শরীআহ্বিরোধী। এরূপ করা শরীআহ্ অনুমোদিত নয়, তবে সুদের অপরাধে নিষিদ্ধ নয় [২]। আর সরকারিভাবে ওপেন মার্কেটে (খোলা বাজারে) মুদ্রা বিক্রির অনুমতি থাকলে পরস্পরের সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। এতে কোনো আপত্তি নেই। যেমন-বাংলাদেশে ডলারের মূল্য ৬০ টাকা নির্ধারিত। দুজনের সম্মতিতে যদি একষট্টি টাকায় ডলার বেচা-কেনা হয় তাহলে তাদের বেচা-কেনা বৈধ হবে; তবে সরকারি আইনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাদের বেচা-কেনা 'মাকরূহ' বা অপছন্দনীয় হবে। কিন্তু তাদের কারবারকে সুদী বলা যাবে না[৩]।

দ্বিতীয় মূলনীতি: কারেন্সি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লেনদেনের মুহূর্তে কোনো এক পক্ষকে অবশ্যই মুদ্রা কবজা করতে হবে। অপর পক্ষ পরে কবজা করলেও কোনো ক্ষতি নেই [৪]।

তৃতীয় মূলনীতি: কারেন্সি পরিবর্তনের সময় একজন নগদ গ্রহণ করল, অপরজন তারিখ নির্ধারণ করল, তবে সে ক্ষেত্রে কারেন্সি মূল্য বাজারদর থেকে কম-বেশি হতে পারবে না। যেমন-এক হাজার টাকার ডলার অমুক তারিখে দিতে বলা হলে ডলারের মূল্য বাজারদর থেকে কম-বেশি হতে পারবে না। কম-বেশি হলে সুদের দরজা খুলে যাওয়ায় নিষিদ্ধ হয়ে যাবে [৫]। আবার এক হাজার রূপিতে তেত্রিশ ডলার পাওয়া যায়, কিন্তু তারা পরস্পর চল্লিশ ডলার লেনদেনে সম্মত হয়ে কারবার করলে এতে সুদের দরজা খুলে যাওয়ায় নিষিদ্ধ হবে। এসব মূলনীতি পূর্ণ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এগ্রিমেন্ট টু সেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি নির্দিষ্ট তারিখে ভাঙানোর চুক্তি করে উপস্থিত আদান-প্রদান না হয়, তবে তারা পরস্পর ইচ্ছানুযায়ী ডলারের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। পূর্ণ বিক্রির পর যদি এক পক্ষ নগদ গ্রহণ করে অপর পক্ষ তারিখ নির্ধারণ করে, তবে তারা বাজারদরের কম বেশি করতে পারবে না। কম-বেশি করলেই শরীআহ্র নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। এগ্রিমেন্ট টু সেলের সময় দু'জনের ইচ্ছানুযায়ী ডলারের মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। তবে এর জন্য কোনো ফি দাবি করা যাবে না, নির্দিষ্ট তারিখে আদায় করতে পারে বা না পারে সর্বাবস্থায় ফি প্রদান গ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ [৬]।

---

১. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No*-15(3/1/3-3/1/7), p.170
২. ibid
৩. ibid
৪. ibid, p.171
৫. ibid
৬. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❒ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিস্থিতি

বাংলাদেশের মুদ্রা দুর্বল হওয়ায় এর অবমূল্যায়নের সম্ভাবনা বেশি এবং এ কারণে এখানে বৈদেশিক মুদ্রার দাম খুব বেশি ওঠা-নামা করে। সকল দেশে এরূপ অবস্থা নেই। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে শুধু মালয়েশিয়ায় Forward Booking করা হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের বিশেষ অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিজ্ঞ শরীআহ্ কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে [১]।

১. চুক্তিটি সাধারণ নিয়মে সমাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে উক্ত খাত থেকে প্রাপ্ত আয় সন্দেহমুক্ত হবে এবং

২. চুক্তিটি বাতিলকরণ কিংবা নতুন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হলে উক্ত খাত থেকে আয় সন্দেহযুক্ত আয় বলে বিবেচিত হবে।

❒ ব্যাংক গ্যারান্টি: শরী'আহ্র দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যাংক গ্যারান্টি হচ্ছে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারনামা। এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের আবেদনক্রমে তৃতীয় পক্ষের অনুকূলে কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণের নিশ্চয়তা দান করে। এ ব্যবস্থায় গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের দাবি বা পাওনা পরিশোধের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। এই গ্যারান্টি বলবৎ থাকা অবস্থায ব্যাংক চাহিবামাত্র গ্যারান্টি প্রদানকৃত পরিমাণ অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। কোনো তৃতীয় পক্ষ তার নির্ধারিত কোনো কাজ সম্পাদন বা কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী পূর্বনির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে সরবরাহের নিমিত্তে গ্যারান্টি স্বরূপ সরবরাহকারী হতে ব্যাংক গ্যারান্টি দাবি করে থাকে। চুক্তির শর্তানুযায়ী সরবরাহকারী কার্য সম্পাদন কিংবা কাঙ্খিত পণ্য সঠিকভাবে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে গ্যারান্টি দাতা ব্যাংক তার পক্ষে চুক্তিতে উল্লিখিত সকল দায়-দায়িত্ব পূরণে বাধ্য থাকে[২]।

এক্ষেত্রে ব্যাংক দায়-দারিত্ব পালনে গ্রাহকের কফীল (প্রতিনিধি) অথবা ঋণদাতার অনুকূলে গ্রাহকের পক্ষে কফীল বা জামানতদাতা বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রেও এটি ওয়াকালাহ চুক্তি বা কাফালাহ্ চুক্তি যাই হোক না কেন, ব্যাংক এ জাতীয় গারান্টি ইস্যু করে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সার্ভিস চার্জ বা কমিশন আদায় করে থাকে। শরী'আহ্র দৃষ্টিতে 'ওয়াকালাহ' (Wakalah-প্রতিনিধি নিয়োগ) বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার পক্ষে এক বা একাধিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যক্তি নিয়োগ করাকে বোঝায়। যে ব্যক্তি নিয়োগ করবে তাকে মুওয়াক্কিল (মক্কেল) এবং যাকে নিয়োগ করা হয় তাকে 'ওয়াকিল' (উকিল) বলা হয় [৩]। অপরদিকে 'কাফালাহ' (Kafalah-যামিন) বলতে দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার সাথে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা সংযুক্ত করাকে বোঝায়। যে ব্যক্তি দাবি পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে 'কফীল' এবং যার পক্ষে থেকে দাবি পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় তাকে 'মাকফুল আনহু' বলা হয়[৪]। উল্লেখ্য, তৃতীয় পক্ষের নিকট এ জাতীয় ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণীয় ও শক্তিশালী জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

---

১. আব্দুর রকীব শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং: তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি* (ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ১৩৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৩. মুহাম্মদ উল্লাহ, *ব্যাংক গ্যারান্টি* (ঢাকা: মাজেদা আক্তার, ২০০৬ খ্রি.) পৃ. ১২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক শরী'আহ্র দৃষ্টিতে এ জাতীয় সেবা বা কর্ম হালাল নাকি হারাম? অথবা এক্ষেত্রে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় আছে কি? ব্যাংক গ্রাহকদের যেসব সেবা প্রদান করে থাকে, ব্যাংক গারান্টি ইস্যু তার অন্যতম। সরকার, কর্পোরেশন বা যেকোনো প্রতিষ্ঠান দ্রুত ও কোয়ালিটি কর্ম সম্পাদন ও কাঙ্খিত পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানে কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ীদের নিকট মোট মূল্যের ২% থেকে ১০% পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাবি করে থাকে। এ ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ সাধারণত ১ বছর বা যেকোনো মেয়াদের জন্য হতে পারে। সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে এবং যথাযথভাবে কার্য সম্পাদনে কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী ব্যর্থ হলেই সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাক্টরের নিকট গ্যারান্টি দাবি করে থাকে।

ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে এবং গ্রাহকের পক্ষে সরকার বা কর্পোরেশনের অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে। কোনো কোনো ব্যাংক ১০০% কভারেজের বিপরীতে এই গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে, তবে ব্যাংক এ জন্য গ্রাহককে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করে। অপরদিকে গ্যারান্টি ইস্যুর বিপরীতে প্রতি কোয়ার্টারের জন্য গ্রাহক হতে ২-৩% হারে (প্রতি হাজারে) কমিশন আদায় করে থাকে। অধিকাংশ শরীআহ্ বোর্ড বা সংস্থা ইসলামী ব্যাংকের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে উপরিউক্ত কোনো বিনিময় গ্রহণকে নাজায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছে। এ কারণে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকই এ ধরণের ব্যাংক গ্যারান্টি থেকে বিরত রয়েছে[১]।

গ্যারান্টি ইস্যু করে কিছু গ্রহণ করাকে ফকীহগণ নাজায়েয বলেছেন। কারণ, গ্যারান্টি প্রদান হচ্ছে কাফালা'র অন্তর্ভূক্ত। আর কাফালাহ হচ্ছে তাবাররু চুক্তির শামিল। তাবাররু-এর ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় নেওয়া শরীআহ্সম্মত নয়। শুধু সওয়াবের নিয়তে এ ধরণের কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে হ্যাঁ, ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে যাচাই, বাছাই, অনুসন্ধান ও স্টাডিতে যে শ্রম প্রদান করা হয় তার বিপরীতে পারিশ্রমিক নেওয়াকে ফকীহগণ জায়েয বলেছেন[২]। এটা হচ্ছে কাজের বিনিময়, কাফালতের বিনিময় নয়। এটাও আবার কূট কৌশলের দরজা খুলে দিতে পারে, যা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনতে পারে। অপরদিকে ব্যাংকের কাছে যদি কভারেজ থাকে সে ক্ষেত্রে শুধু কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া শরীআহ্সম্মত[৩]। ফকীহগণ এটাকে ওয়াকালাহ্ হিসেবে বিবেচনা করেছেন আর ওয়াকালাহর (এজেন্সি) ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরীআহ্তে জায়েয। তবে এ মতামতও স্পষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ, গ্রাহক বা কাস্টমার যখন ব্যাংকে ১০০% সিকিউরিটি বা কভারেজ প্রদান করছে তখন তাকে এর সাথে ব্যাংকের সেবা প্রদানের বিপরীতে পারিশ্রমিক প্রদান করতে হয়। আর যখন সে সিকিউরিটি বা কভারেজ প্রদানে ব্যর্থ হয় তখন ব্যাংকের জন্য তা ঝুঁকিবহুল এবং গ্রাহককে কাফালার কারণে কোনো কিছু প্রদান করতে হয় না। কভারেজ ব্যতীত ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে ব্যাংকের কোনো কিছু প্রদান করতে হয় না। কভারেজ ব্যতীত ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে ব্যাংকের গ্রাহক হতে কফীল হিসেবে শুধু ঝুঁকির বিপরীতে কোনো কমিশন বা বিনিময় আদায় করা শরীআহ্সম্মত নয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নেওয়াকে ফকীহগণ বৈধ বলেছেন[৪]।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯
২. প্রাগুক্ত
৩. আসসাইয়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুত: দারুসসাক্কাফা, ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ১২৪
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণ বা আংশিক কভারেজের ক্ষেত্রে ওয়াকীল ও কফীল হিসেবে ব্যাংকের গ্রাহক হতে যাথাক্রমে কমিশন ও সার্ভিস চার্জ আদায় করার ব্যাপারে শরীআহ্র আপত্তি নেই [১]। (ব্যাংক গ্রাহকের ওয়াকীল বা এজেন্ট আবার গ্রাহকের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের কফীল)। তবে কোনো অবস্থাতেই শুধু গ্যারান্টার হয়ে পারিশ্রমিক বা কমিশন গ্রহণ করা জায়েয নেই [২]। আল শেখ আবদুল হাদি আল সায়েহ্ (উপদেষ্টা, জর্দান ইসলামী ব্যাংক) লেটার অব গ্যারান্টি ইস্যু করে পারিশ্রমিক নেওয়াকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন [৩]। কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে কমিশন বা সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে না বটে কিন্তু এক্ষেত্রে তারা গ্রাহকের নিকট ২৫%-৩০% পর্যন্ত আংশিক কভারেজ দাবি করছে, যা ব্যাংকের নিকট জমা হিসেবে থাকে এবং সঞ্চয় বিনিয়োগ জমা হিসেবে পরবর্তীতে বিনিয়োগ আয়ের শেয়ার লাভ করবে।

কাফালাহ যা তাবাররু চুক্তি এ সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক দলিল নেই। চুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. উকুদে মুয়াওয়াদাহ যে চুক্তির বিপরীতে চুক্তির শর্তানুযায়ী বিনিময় বা পারিশ্রমিক নেওয়া যায় [৪]।

২. উকুদে তাবাররু-যে চুক্তির বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক বা বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। যেমন-কুরআন মাজীদ শিক্ষা চুক্তি, জানাযা নামাযের ইমামতির চুক্তি, তওবা করানোর চুক্তি ইত্যাদি। চুক্তির এই শ্রেণীবিভাগ ফিকাহ সিদ্ধান্ত বা মাসায়েল (বোঝার কৌশল) হিসেবে এগুলোর হুকুম-আহকাম অধ্যয়নের সুবিধার্থে করা হয়েছে মাত্র। একসময় কাফালা চুক্তি মানুষের নিকট আন্তরিকতা-মনুষত্বের পরিচায়ক বিবেচিত হতো। আবার যে ব্যক্তি কাফালাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে সে যদি ঝুঁকি অনুভব করে, তাহলে শরঈ কোনো বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে সে এতে আবদ্ধ হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কিংবা স্থান বা সময়ের পরিবর্তনে কোনো বিষয়ের হুকুম-আহকামেও পরিবর্তন এসে যায় [৫]।

উল্লেখ্য, একসময় কুরআন শিক্ষা দিয়ে এবং নামাযের ইমামতির বিপরীতে পারিশ্রমিক নেওয়া নাজায়েয ছিল। কারণ, পারিশ্রমিক দিলে এক্ষেত্রে ইখলাসের ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিত। যাদের সামর্থ্য ছিল তাদের জন্য সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাবি অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দেওয়া বা ইমামতি করা ওয়াজিব ছিল। এতদসত্ত্বেও সময়ের পরিবর্তনের কারণে কুরআন মাজীদ শিক্ষাদান এবং ইমামতি আজকাল একটি পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ কারণে পূর্বের হুকুম পরিবর্তিত হয়ে এ সমস্ত ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে ফকীহগণ জায়েয বলেছেন। কাফালার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য[৬]।

বিশেষত, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কাফালার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং ব্যাংক যদি অন্য দশটি কাজের মত এটিকেও পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে কোনো শরঈ বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে ব্যাংক লেটার অব গ্যারান্টি ইস্যু করে কফীল হিসেবে সার্ভিস চার্জ কমিশন আদায় করতে পারবে। এটি সুদানের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক শরীআহ্ কাউন্সিলের ফতোয়া। ব্যাংক গ্যারান্টির দাবি (Claim) পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট গ্যারান্টির বিপরীতে ও কাস্টমস গ্যারান্টির ক্ষেত্রে কোনো নগদ জামানত না থাকলে এবং গ্রাহক প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমাদানে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ হিসাব সৃষ্টি করে উক্ত গ্যারান্টির দাবি পরিশোধ করা যাবে না[৭]।

---

১. ড. সাইয়েদ আলহাওয়ারী, *ইদারাত আল-বুনুক আল-কাহেরা* (কাহেরাঃ মাকতাবাতু আইন শামস, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৮৪.

২. ড. আহমাদ আবদুল আজিজ আলন্নাজ্জার ও অন্যান্য, *মিয়াতু সুয়াল ওয়া মিয়াতু জোয়াব হাওলাল বুনুকীল ইসলামিয়াহ* (কায়রোঃ আল-ইত্তেহাদ আদ্দুয়ালী লিল বুনকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৮ খ্রি.) পৃ. ২৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত শরী'আহ্‌র নীতিমালা: আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরী'আহ্ অনুমোদিত পন্থায় ও দেশের প্রচলিত আমদানি নীতির অধীনে বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, ভোগ্য ও অন্যান্য পণ্য এবং উপকরণের আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমদানি বাণিজ্যে ব্যাংকের প্রধান প্রধান কাজ হল [১]:

১. গ্রাহকের পক্ষে এলসি বা ঋণপত্র খোলা;

২. আমদানিকৃত মালামালের বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান এবং

৩. বিদেশী সরবরাহকারীর ক্রেডিট রির্পোট সংগ্রহ ইত্যাদি।

দেশের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বিধি-বিধান অনুসারে ব্যাংক নগদ-বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক পণ্য সাহায্য, ঋণ বা মঞ্জুরী এসব উৎসের মাধ্যমে আমদানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করলে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের বিনিময়ে পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করে থাকে। আমদানিকারকের পক্ষে পণ্যের মূল্য পরিশোধ সম্ভব না হলে ইসলামী ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাই'মুরাবাহা, বাই'মুয়াজ্জাল, বাই'সালাম, পদ্ধতির আওতায় বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে এর সাথে নির্দিষ্ট মুনাফা যোগ করে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহককে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে আমদানি বিল ছাড়করণের সময় বা পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে। এ পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এ আমদানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীআহ্‌সম্মত উপায়ে অর্থায়ন কার্যক্রম যে ভাবে সম্পন্ন করা হয় তা নিম্নরূপ[২]:

⇨ বাই' মুরাবাহা পদ্ধতির প্রয়োগ;

⇨ মুরাবাহা ইমপোর্ট বিলস (MIB) ও মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট বিলস (MPIB) এবং

⇨ আমদানি বাণিজ্যে বাই' মুয়াজাল পদ্ধতিতে ব্যাকটু ব্যাক এলসি

পর্যায়ক্রমে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হল:

❒ আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহা পদ্ধতির প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকগুলো বিদেশ থেকে মালামাল আমদানি করে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করার ক্ষেত্রে মুরাবাহা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিদেশ থেকে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাঙ্খিত মালামাল এলসি'র মাধ্যমে আমদানিপূর্বক নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। তবে ব্যাংক বিদেশী রপ্তানিকারককে নগদে মালামালের মূল্য পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে মুনাফাসহ মালামালের মূল্য বাবদ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে দেয়া হয়। আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহা পদ্ধতির অনুশীলন প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে [৩]:

---

১. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No*-8(3/1/3-3/1/7), p.122

২. ibid, p.123

৩. ibid

Dhaka University Institutional Repository

❐ মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল্স (MIB) ও মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট বিলস্ (MPIB)

বিনিয়োগ গ্রাহক বিদেশ হতে যে ধরনের মালামাল আমদানি করতে চান তার বিবরণসহ ইসলামী ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন। বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করে নেবেন মর্মে আবেদনপত্রে অঙ্গীকার করেন। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মালামাল আমদানি করার জন্য ব্যাংক একটি এলসি খোলে। আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকের নামেই এলসি (L/C) খুলে থাকে, যদিও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইসলামী ব্যাংক সরাসরি নিজ নামে এলসি খুলে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে মালামাল আমদানি ও ক্রয় করে থাকে [১]।

বাংলাদেশে মালামাল আমদানি করার জন্য লাইসেন্স, IRC ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রাহকের নামে থাকে এবং ব্যাংকের জন্য সরাসরি আমদানির সহায়ক প্রয়োজনীয় কোন আইন নেই। ফলে ব্যাংকের নামে সরাসরি এলসি খোলা যায় না। এমতাবস্থায়, ব্যাংকের নামে সরাসরি এলসি করে মালামাল আমদানির পক্ষে সহায়ক আইন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য শরী'আহ বিশেষজ্ঞ ও ফক্বীহগণ শরী'আহ্ পরিপালনে একটি বিকল্প পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, গ্রাহক ইসলামী ব্যাংককে মালামাল ক্রয় ও আমদানি এবং আমদানির জন্য একটি ক্ষমতাপত্র (Letter of Authority) প্রদান করবেন। এ ক্ষমতাপত্রের বলে ইসলামী ব্যাংক বিদেশী বিক্রেতার নিকট হতে মালামাল ক্রয় ও মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে [২]।

গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক মালামাল আমদানির জন্য এলসি খোলে এবং বিদেশী বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট মালামাল নির্দিষ্ট দামে বিক্রির জন্য প্রস্তাব করে। বিদেশী বিক্রেতার কাছে এলসি-র শর্তাবলি গ্রহণযোগ্য হলে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এভাবে ইসলামী ব্যাংক ও বিদেশী বিক্রেতার সাথে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব দান ও গ্রহণ) সম্পন্ন হয় এবং যথারীতি ব্যাংক সম্পদের মালিকানা অর্জন করে কিন্তু সম্পদের ওপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে ব্যাংক তা বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারে না। অবশ্য জাহাজিকরণ ডকুমেন্টস ব্যাংকের হস্তগত হলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলসি-র টার্মস-কন্ডিশন্স অনুযায়ী বিদেশী বিক্রেতা মালামাল জাহাজিকরণ করে এতৎদসংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট ও বিল ইসলামী ব্যাংকের কাছে দ্রুত ডাকযোগে প্রেরণ করলে এবং মালামালের মূল্য তাঁর দেশের নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করলে আন্তর্জাতিক ব্যবসার নিয়মানুযায়ী ব্যাংক বিল পাওয়ার পর পরই (at sight বিল হলে) মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য। প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক রীতি-নীতি অনুযায়ী বিদেশ হতে আমদানিকৃত মালামাল জাহাজিকরণের (Bill of Lading) ডকুমেন্ট প্রাপ্তি মালামাল বুঝে পাওয়ার শামিল [৩]। কারণ মালামাল জাহাজিকরণের পর রপ্তানিকারকের দায়িত্ব শেষ। মালামাল জাহাজে উঠিয়ে দেয়ার অর্থ তা বুঝিয়ে দেয়া। ইসলামী ব্যাংক বিদেশী বিক্রেতার সাথে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে মালামালের মালিকানা অর্জন করে এবং জাহাজিকরণের ডকুমেন্ট প্রাপ্তির মাধ্যমে দখল লাভ করে। এভাবে মালিকানা অর্জন ও দখল লাভের মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা শরী'আহ্সম্মত [৪]।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমাধান*, অনু: মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৯৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে AAOIFI-এর শরী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ড ২০০২ -এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

"বৈদেশিক বাজার হতে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) অথবা তার উকিল বা এজেন্ট কর্তৃক জাহাজিকরণের ডকুমেন্ট বুঝে পাওয়াই পরোক্ষ দখল (আল-কাবজ আল-হুকমী) বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে গুদামজাতকরণের ডকুমেন্টসমূহ বুঝে পাওয়া-যার মাধ্যমে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়ায় গুদাম থেকে মালামাল শনাক্ত করা যায়-তাও পরোক্ষ দখল বলেই গণ্য হবে[১]।"

মালামালের ওপর দখল লাভের পর ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহার ভিত্তিতে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ পর্যায়ে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে মুরাবাহা চুক্তি (আক্‌দ আল-মুরাবাহা) সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে আমদানিকৃত মালের মুল্য (L/C Value) ও আনুষঙ্গিক খরচের ওপর নির্ধারিত হারে মুনাফা ধার্যের বিষয়টি উল্লেখ থাকে। মালামালের ট্যাক্স, ভ্যাট, ক্লিয়ারিং, ফরওয়ার্ডিং ইত্যাদি চার্জ হিসাব করে তার ওপর ব্যাংকের নির্ধারিত মুনাফা ধার্যপূর্বক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মালামালের মালিকানা গ্রাহকের কাছে চলে যায় এবং শিপমেন্ট ডকুমেন্টস গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মালামালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়[২]।

উল্লেখ্য, যখন গ্রাহকের কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে মালামাল বিক্রি সম্পন্ন করা হয় এবং ডকুমেন্টস-এর মাধ্যমে মালামাল তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তখন মালামাল সাধারণত দেশের বন্দরে এসে পৌছে না, বরং তা দেশীয় বন্দরে পৌছার পথে থাকে। এ পর্যায়ে বন্দরে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগ গ্রাহকের[৩]। উল্লেখ্য, এরূপ মালামালের ইন্স্যুরেন্স করা হয়ে থাকে। ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন গ্রাহক। তিনিই তা ক্লেইম করবেন এবং মালামালের ক্ষতিপুরণ আদায় করার চেষ্টা করবেন। আবার মালামাল বন্দরে পৌছার পর বা তা জাহাজ থেকে অবমুক্ত করার পর এর মূল্য বাজারে বহু গুণে বেড়ে গেলেও যেমন ব্যাংক তার অংশ দাবি করতে পারবে না, তেমনি মূল্য কমে গেলেও ব্যাংক তা বহন করবে না[৪]।

মালামাল পোর্টে আসার পর গ্রাহক তা অবমুক্তকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। মুরাবাহা প্লেজ-এর ক্ষেত্রে মালামাল বন্দর থেকে খালাসের পর তা ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত গুদামে সংরক্ষণ করা হয় এবং গ্রাহক ডিও-র বিপরীতে কিস্তিতে ক্রয়মুল্য ব্যাংকে জমা দিয়ে মালামাল ছাড় করিয়ে নেয়[৫]। আর মুরাবাহা টিআর-এর ক্ষেত্রে মালামাল গ্রাহকের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তিনি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকে জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মুনাফা নেয়া হয় এবং গ্রাহককে রেয়াত (রিবেট) দেয়া হয়।

---

১. *AAOIFI, Shariah Standard, Standard No*-8(3/1/3-3/1/7), p.123
২. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫
৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository
এ পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকগুলোর অনুশীলন একটু ভিন্ন। কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস কর্তৃক আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহা অনুশীলনের প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের শরী'আহ্ বোর্ডের কাছে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহার অনুশীলন প্রসঙ্গে নিম্নরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে বাই মুরাবাহা যে প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে, সে ব্যাপারে শরী'আহ্ বোর্ডকে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়:[১]

প্রথমত, কুয়েতের বাইরের কোন রপ্তানিকারকের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন এবং আবেদনকৃত পণ্য ক্রয়ের বিষয়টি তাঁর অনুমোদনের সাথে শর্তযুক্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস নিজ নামে এলসি খুলে পণ্য আমদানি করে থাকে। কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস ও বিদেশী রপ্তানিকারকের সাথে মলামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ইজাব ও কবুল সম্পাদিত হবে সেই তারিখে যে তারিখে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস পণ্য গ্রহণ করবে এবং বিনিয়োগ গ্রাহক তা অনুমোদন করবেন। এ শর্তের ওপর বিদেশী রপ্তানিকারকও সম্মত থাকেন।

তৃতীয়ত, বিদেশী রপ্তানিকারক কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের নামে পণ্য জাহাজিকরণ সম্পন্ন করেন এবং কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের কাছে পণ্য জাহাজিকরণের ডকুমেন্ট প্রেরণ করেন।

চতুর্থত, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের কাছে ডকুমেন্ট পৌছলে গ্রাহককে বিষয়টি অবহিত করা হয় এবং ডকুমেন্ট হস্তান্তর করা হয়। এ সময় কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের পাওনা নিরাপদ করার জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে একটি সাময়িক প্রমিসরি নোট নেয়া হয়।

পঞ্চমত, গ্রাহক কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের পক্ষে পণ্য বুঝে নেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এরপর তিনি পণ্যটি ক্রয় করতে সম্মত হলে তা কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসকে অবহিত করেন।

ষষ্ঠত, উক্ত পণ্য গ্রহণে গ্রাহকের সম্মতি পেলে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস বিদেশী রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করে।

সপ্তমত, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস ও বিনিয়োগ গ্রাহক পণভ্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (আক্দ আল-মুরাবাহা) স্বাক্ষর করেন এবং বিনিয়োগ গ্রাহক পণ্যের আনুষঙ্গিক খরচ ও মুনাফাসহ সমমূল্যের একটি অথবা একাধিক প্রমিসরি নোট স্বাক্ষর করেন।

অষ্টমত, উক্ত প্রমিসরি নোটের মাধ্যমে মেয়াদপূর্তির তারিখে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস গ্রাহকের হিসাব (একাউন্ট) থেকে পাওনা কর্তন করে নেয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের জবাবে শরী'আহ্ বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে যে, উপরিউক্ত অবস্থার আলোকে আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহা পদ্ধতি অনুশীলনে কোন সংশয় নেই। এক্ষেত্রে এটিই মু'আমালার মূলনীতি।

---

১. *আল ফাতাওয়া আশ-শারইয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ইকতিছাদিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১*

Dhaka University Institutional Repository

❒ আমদানি বাণিজ্যে বাই' মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি

গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিকগণ সাধারণত তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য বিদেশী ক্রেতাদের নিকট থেকে এলসি (L/C) পেয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতাগণ পোশাক তৈরির কাঁচামাল যেমন-কাপড়, সুতা, বোতাম ইত্যাদি তাঁদের কাঙ্খিত দেশ হতে আমদানিপূর্বক পোশাক তৈরির শর্ত দিয়ে থাকেন। এমনকি কোন কোন বেদেশী ক্রেতা তাঁদের পোশাক তৈরিতে কোন দেশের কাঁচামাল ও এক্সেসরিজ ব্যবহার করতে হবে- তারও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এলসিতে রপ্তানির সময়সীমা ও মূল্য পরিশোধের তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীগণ তাঁদের প্রাপ্ত রপ্তানি এলসিটি ব্যাংকের কাছে লিয়েন (জামানত) রেখে এলসিতে উল্লিখিত এক্সেসরিজ বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি (Back to Back L/C) খুলতে চান। এক্ষেত্রে ব্যাংক বিদেশ থেকে মালামাল আমদানি করে দেবে এবং মালামালের মূল্য এক্সপোর্ট এলসির মূল্য থেকে গ্রহণ করবে[১]।

ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের সাথে এলসি খোলার পর পরই একটি বাই'মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) চুক্তি সম্পাদন করে এবং মূল্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় দেয়। চুক্তিতে ব্যাংক হয় বিক্রেতা আর বিনিয়োগ গ্রাহক হন ক্রেতা [২]। ব্যাক টু ব্যাক এলসিতে মালামালের মূল্য পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যাংকের। BL (Bill of Lading) ও BE (Bill of Exchange) ব্যাংকের অর্ডারেই তৈরি হয় এবং এলসির আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্রের ধারায় মালামালের মালিকানা ব্যাংকের অধীনে থাকার বিষয় উল্লেখ থাকে। এ কারণে মালামালের মালিকানা ব্যাংকের কাছে থাকে। অধিকন্তু, গ্রাহকের আমদানি লাইসেন্স (IRC) ব্যবহার করে মালামাল আমদানি করার জন্য গ্রাহক ব্যাংককে ক্ষমতাপত্র (Letter of Authority) দিয়ে থাকেন। ফলে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামালের মালিকানা ব্যাংকের নিকট থাকে এবং ব্যাংক তার মালিকানাধীন মালামাল গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রির চুক্তি করে।[৩]

পরবর্তীতে ব্যাক টু ব্যাক-এর মালামাল আমদানি ও তা দ্বারা তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানিপূর্বক মালামালের মূল্য প্রাপ্তির পর গ্রাহকের বাই 'মুয়াজ্জাল হিসাবটি সমন্বয় করা হয়।[৪]

---

১. আবদুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ রপ্তানি বাণিজ্যে বাই' মুয়াজ্জাল ও বাই'সালামের প্রয়োগ

রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন পণ্য বিশেষত খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন। এসব রপ্তানি দ্রব্যের কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়ের জন্য তাঁদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক নগদ অর্থ ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে না[১]। তাই বিনিয়োগ গ্রাহক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্যাংকের নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করার আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হলে ব্যাংক কাঙ্খিত পণ্য বাজার থেকে নগদে ক্রয়পূর্বক তাঁর কাছে বাকিতে বিক্রি করে[২]। এক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত মুনাফা চার্জ করে থাকে। এভাবে ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্যে বাই' মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে[৩]।

বাই' সালাম হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি[৪]। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহক থেকে ভবিষ্যতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে এবং পণ্যের মূল্য গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করে। গ্রাহক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে উক্ত পণ্য উৎপাদনপূর্বক ব্যাংককে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করে। ইসলামী ব্যাংক উক্ত পণ্য সরাসরি তার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কিংবা বিনিয়োগ গ্রাহককে (ব্যাংকের কাছে অগ্রিম পণ্য বিক্রেতাকে) উকিল নিয়োগ করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে থাকে[৫]। এক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফা[৬]। সাধারণত বাই' সালামের ভিত্তিতে অগ্রিম ক্রয়মূল্য কম ধরা হয় যাতে ব্যাংক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে[৭]। উল্লেখ্য, গ্রাহক বাই' সালাম চুক্তি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম মূল্য ফেরত দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন[৮]। এখানে গ্রাহক থেকে প্রথম ক্রয়টি বাই'সালাম আর দ্বিতীয় বিক্রি ব্যাংক কর্তৃক সাধারণ বিক্রি হিসেবে গণ্য হবে [৯]। বাংলাদেশের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পোশাক তৈরি করে দেয়ার জন্য এলসি (Letter of Credit) খোলে থাকে[১০]।

---

১. *আল ফাতাওয়া আশ-শারইয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ইকতিছাদিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর (Remittance)

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন বা বাংলাদেশ থেকে যে কোনো দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকে[১]। আরও যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা নিম্নরূপ [২]:

- ⇨ বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নার্সদের পরিবার-পরিজনদের নিকট দ্রুততর ও নিরাপদে অর্থ পৌঁছানোর জন্য ব্যাংক এমটি, ডিডি, টিটি-এর মাধ্যমে তা সুসম্পন্ন করে।
- ⇨ শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য আইনানুগ প্রয়োজনে ব্যাংক বিদেশে ড্রাফট বা টিটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করে থাকে।
- ⇨ ব্যাংক SWIFT-এর মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ ও দ্রততার সাথে এলসি ও রেমিটেন্সসহ বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- ⇨ গ্রাহকদের পক্ষে চেক ও বিল সংগ্রহ করে থাকে।
- ⇨ বিদেশ ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে ।
- ⇨ বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু করে থাকে ।
- ⇨ বিদেশী পর্যটক বা ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশ সফরকালে তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা ভাঙানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে ।
- ⇨ চলতি বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে ।
- ⇨ কমিশন ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে ।
- ⇨ SWIFT সার্ভিস ছাড়াও রয়টার, ইমেইল (E-Mail), ইন্টারনেট, ডিলিং রুম (Dealing Room) ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্ভিস প্রদান করে থাকে ।

---

১. আবদুর রকীব শেখ মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭
২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: সাফল্য সম্ভাবনা ও সমস্যা

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্য ও অগ্রযাত্রা মুসলিম বিশ্বসহ পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি মুসলিম উম্মাহ্‌সহ বিশ্ববাসীর প্রবল আকর্ষণ এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তারই পরিচয় বাহক। তাদের ধারণা ছিল অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর চালিকা শক্তি হিসেবে সুদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়। কিন্তু সুদের শূন্য হার যে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তির ভূমিকা স্বতঃস্ফূর্ত করতে পারে-এ বিষয়ে অর্থনীবিদদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সুদের শূন্য হার প্রয়োগ করে লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ-অর্থায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও ধারাকে বেগবান করতে সক্ষম হয়েছে, একই সাথে শিল্পোন্নয়ন, নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম দুই দশক পেরিয়ে এসে আজ বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনেকেই এর বাস্তবতাকে স্বীকার করে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ কেউ প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং থেকে সরে এসে ইসলামী ব্যাংকিং ধারায় কার্যক্রম শুরু করতে উৎসাহ বোধ করছে। ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক উভয়ই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। তা হল; মুনাফা অর্জনই প্রচলিত ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, মুনাফা অর্জন কোনক্রমেই একটি ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন সম্পাদনের মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহকারী ও পুঁজি ব্যবহারকারীর ন্যায্য স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হল ইসলামী শরী'আহ্। শরী'আহ্‌বিহীন ব্যাংক নিষ্প্রাণ দেহের সমতূল্য। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরীআহ্ পরিপালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে যেখানে অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে সুদকে গ্রহণ করা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি ধর্মপ্রাণ মুসলিম হলেও যেখানে অর্থনীতির বিষয়ে রয়েছে অপরিসীম অজ্ঞতা, যে খানকার অর্থনীতির উপর সুদভিত্তিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব ও দাতাগোষ্ঠীর অবাধ নিয়ন্ত্রণ, সেখানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সত্যিকার অর্থেই একটি কঠিন প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

শরীআহ্ পরিপালনে, প্রয়োগে ও পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনাগত ও আইনগতভাবে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা ও প্রতিকূলতা রয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীআহ্র নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রয়োগে যথার্থ পথ-পন্থা উদ্ভাবন ও কার্যকর করা হলেও মুদ্রা বাজার, পুঁজিবাজার, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়সহ অনেক ক্ষেত্রে এখনও ইসলামী বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও মুদারাবা ও মুশারাকা এই দুটি বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। বাই' মুরাবাহা, বাই' মুয়াজ্জাল ও ইজারা পদ্ধতি অনুসরণেও ক্রয়-বিক্রয়ের সকল শর্ত পরিপালিত হচ্ছে না। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অজ্ঞাতসারে শরীআহ্ লঙ্ঘনের বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে।

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সব আইন-কানুন-বিধি-বিধান রয়েছে, তা সবই সুদী ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত ও প্রণীত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পরিপূর্ণ কোন নীতিমালা ও বিধি-বিধান এখনও প্রণীত হয়নি। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও গবেষণা সম্প্রসারণ হচ্ছে না। গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন ইসলাম সম্পর্কে যেমন রয়েছে অস্বচ্ছ ধারণা, তেমনি অভাব রযেছে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের ও ধারণার। উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে সু-সমন্বয়ের অভাব। ইসলামী ব্যাংকারদের সামনে আজ যে চ্যালেঞ্জটি উপস্থিত তা হল ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্য, সমস্যা সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতার ওপর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হল :

❒ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: অগ্রগতি ও সাফল্য

প্রথম দিকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এককভাবে সম্পূর্ণ নতুন ধারার একটি ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার মুকাবিলা করে এ ক্ষেত্রে একটি মডেল উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীদের পাথেয় হয়েছে। এ ব্যাংকটির সার্বিক পরিচালনাগত সফলতা এদেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেছে। কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকসহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো খুলতে এগিয়ে এসেছে। দু'টি সুদভিত্তিক ব্যাংক ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি ব্যাংক এই লক্ষ্যে এ কাজ শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বয়স প্রায় চার যুগ অতিক্রম করতে চলেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল ও বিরূপ অবকাঠামো সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে আপাত:দৃষ্টে যে ব্যাপক সাফল্য ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে, তাতে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল ঘন বসতিপূর্ণ মুসলিম দেশে আরো অধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ খুবই যুক্তিযুক্ত ও অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

❐ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৭টি ইসলামী ব্যাংকের মোট ৫২০টি শাখা এবং ৭টি প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের ১৮টি ইসলামী শাখার কার্যক্রমের (ডিসেম্বর২০০৯, খ্রি.সমাপ্ত বছর পর্যন্ত) একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নের সারণীতে দেয়া হল:

ইসলামী ব্যাংক[১] (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	শাখা সংখ্যা	মোট জনশক্তি	মোট আমানত	মোট বিনিয়োগ	লাভ - লোকসান
০১	ইসলামী ব্যাংক বাং লিঃ	১৯৮৩	২৩১	৯৫৮৮	২৪৪২৯২	২৩৯০০০	৬৫১৮
০২	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক	১৯৮৭	৩২	৭১৩	১৩০৪৬	১৩৪১০	(-)
০৩	আল- আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৫	৬০	১২৯৬	৩৮৩৫৫	৩৬১৩৪	১৭৪৯
০৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৫	৪২	৯৬৫	৩১৫৮৮	২৪৯৩৮	১১০২
০৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	২০০১	৫১	১২৯৯	৪৭৪৫৯	৪৩৯৫৮	২০৪১
০৬	এক্সিম ব্যাংক	২০০২	৫২	১৪৪০	৭৩৯৩৫	৬৮৬১০	৩২০৩
০৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	১৯৯৯	৫২	৯৯৫	৪২৪২৩	৩৮৭২৬	৭৬৬
	মোট=		৫২০	১৬২৯৬	৪৯০৯৯৮	৪৬৪৭৭৬	১৫৩৭৯

সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা[২]

০১	প্রাইম ব্যাংক	১৯৯৫	৫	৯৩	১২৬৭৭	৯৪২৮	৬৪০
০২	ঢাকা ব্যাংক	২০০৩	২	২৫	৪৩৫৯	২২৫৫	১২৮
০৩	সাউথইস্ট ব্যাংক	২০০৩	৫	১০৩	১০৩০৭	৪৮৪২	৩১২
০৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক	২০০৩	২	৩২	৩৩৫৬	১২৬৬	৫৪
০৫	যমুনা ব্যাংক	২০০৩	২	৪৪	২৩৬৬	২৭৫০	১৫৮
০৬	সিটি ব্যাংক	২০০৩	১	২৫	৭৬৮	৬৯৪	৪৫
০৭	এবি ব্যাংক	২০০৫	১	১৭	৩০৮৪	১৭৫৬	১৯২
	মোট =		১৮	৩৩৯	৩৬৯১৭	২২৯৯১	১৫২৯
	সর্বমোট =		৫৩৮	১৬৬৩৫	৫২৭৯১৫	৪৮৭৭৬৭	১৬৯০৮

---

১. Islami Bank Bangladesh Limited,
ICB Islami Bank Ltd.
Al-Arafah Islami Bank Ltd.
Social Islami Bank Ltd.
Shajalal Islami Bank Ltd.
Exim Bank Ltd,
First Security islami Bank Ltd, এর Arinuel Report, 2009 থেকে সংগৃহীত।

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ৩১.১২.২০০৯ তারিখের মোট জমার পরিমাণ ছিলো ৩০৪২.৮৩ বিলিয়ন টাকা। তার মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসহ ইসলামী ব্যাংকিংসমূহের মোট জমা ছিলো '৫২৭৯১৫.০০ মিলিয়ন টাকা। এটি দেশের মোট জমার শতকরা ১৭.৩৫ ভাগ । দেশীয় অর্থনীতিতে এ সময় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ২৫৩১.১০ বিলিয়ন টাকা । তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিংসমূহের বিনিয়োগ ছিলো ৪৮৭৭৬৭.০০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগ শতকরা ১৯.২৭ ভাগ।[১]

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, এবি ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, তাদের বর্তমান সংগঠন কাঠামোর মধ্যেই পৃথকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে।[২]

রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং বেসরকারী খাতের পূবালী ব্যাংক লিমিটেডসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুদভিত্তিক কনভেনশনাল শাখার অভ্যন্তরে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু আছে।[৩]

এসব ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো ইসলামী শরীআহ্ নীতিমালা অনুসারে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে উল্লিখত শাখা/ উইন্ডোসমূহের উন্নয়নধারা সন্তোষজনক।[৪]

❒ জমা সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অর্ধশত ব্যাংকের মোট প্রায় ছয় হাজার শাখা কাজ করছে। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশ[৫]। ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো গ্রাহক আকর্ষণের দিক দিয়ে বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৯ সাল নাগাদ তার ২৩১টি শাখার মাধ্যমে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে[৬]। এটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিশেষ জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বর্তমানে (জুন ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত) এর শাখা সংখ্যা ২৭৫। আদর্শিক বিবেচনা ছাড়াও উন্নততর গ্রাহক সেবা ইসলামী ব্যাংকের জমার প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জমা সংগ্রহের ওপর জরিপ চালিয়ে ড. মিহির কুমার রায় উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ;

"The customer who are trying to avoid interest strongly suport this system of banking. Not only religious injunction but also better banking services of IBBL have been influencing the customers preference to a great extent. Accordingly, IBBL is able to mobilise a great bulk of deposits"[৭].

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. প্রাগুক্ত,
৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে *ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, মাসিক দারুস্-সালাম পত্রিকা, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সঞ্চয় আহরণে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকসমুহের সামর্থ্য ও নীট অবদান সুদী ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক বেশি হারে সঞ্চয় আহরণের ফলে জাতীয় আর্থ-সামাজিক খাতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব কমছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিবাচক অংশীদারিত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের দিকে তাকালেও এক্ষেত্রে তাদের সামাজিক লক্ষ্য ও তার অবদান স্পষ্ট হবে। যৌতুকের মত অপরাধ নির্মূলে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিবাহিত পুরুষদের 'মোহর' আদায়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং জগতে প্রথমবারের মত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব চালু করেছে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকও মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক পৃথক মুদারাবা দেনমোহর সঞ্চয় স্কীমও চালু করেছে।[১]

❒ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিবেচনা

ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণই হলো সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়ন সমাজের সকল মানুষের জন্য। সুদী লেনদেনের নীতি ও কৌশল এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সুদমুক্ত হওয়ার কারণে তা সুদের বহুমাত্রিক ও জটিল উপসর্গ থেকে মুক্ত। পূর্বনির্ধারিত সুদের হার এবং জমার সুদ ও ঋণের সুদের মধ্যকার পূর্বনির্ধারিত ব্যবধানের কারণে সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নানাভাবে নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন পূর্বনির্ধারিত তহবিল-মূল্য ((Prefixed cost of fund) না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রেখে কাম্য মানের বিনিয়োগ (investment equilibrium) নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কম লাভজনক প্রকল্প গ্রহণেও নিরুৎসাহিত হন না। এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে[২]।

২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মোট বিনিয়োগ ছিল ২৩,৯০০০.০০ কোটি টাকা। ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত তা আরো ১৬১৭.৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,৫১৭.৮০ কোটি টাকায়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২,৪৯৩.৮০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ সময়ে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬১৩.৪০ কোটি টাকা। একই সময়ে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৩৯৫.৮০, ৬,৮৬১ ও ৩,৮৭২ কোটি টাকা। অন্যান্য দেশীয় কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাকিং শাখাসমূহের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২,৩০০ কোটি টাকা [৩]।

---

১. উল্লিখিত ব্যাংকসমূহের আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ম্যানুয়েল থেকে সংগৃহীত।
২. আবদুর রকীব সম্পাদিত, শরীআহ্ পরিপালন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩. Islami Bank Bangladesh Limited,
ICB Islami Bank Ltd.
Al-Arafah Islami Bank Ltd.
Social Islami Bank Ltd.
Shajalal Islami Bank Ltd.
Exim Bank Ltd,
First Security islami Bank Ltd, এর Annuel Report, 2009 থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকেগুলো উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয় এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ টাকার পরিবর্তে সরাসরি পণ্যের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না, পণ্যের ব্যবসায় অংশ নেয়। সুতরাং তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত (Diversion of Fund) হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে বিনিয়োগ মন্দ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইসলামী পদ্ধতির বিনিয়োগের এটিও একটি ইতিবাচক দিক। ২০০৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর খেলাপী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩% এরও কম। দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং সেক্টরের পরিস্থিতির তুলনায় শুধু নয়, আন্তর্জাতিক মানেও এ অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এটিও ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনার আন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ।[১]

❒ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের উপকারভাগী কারা

২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ২,৩১,৪৩৬ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ৩৮৭৩ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৪৮১ জন, এক্সিম ব্যাংকের ৩৮৭৩ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ৪৮১ জন, এক্সিম ব্যাংকের ২৭০৬ জন। ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৯,৩৬৭ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ৯৮৮ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ১৬৯ জন এবং এক্সিম ব্যাংকের ২৭০৬ জন[২]।

৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৯৩৬৭ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ৯৮৮ জন, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ১৬৯ জন এবং এক্সিম ব্যাংকের ছিল ৯৮৮ জন্ ১০ লাখ থেকে ২৫ লাখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক ৪,৮৯৫ জন, সোস্যার ইসলামী ব্যাংকের এই অংকের বিনিয়োগ গ্রাহক ১৭৭৫ জন, এক্সিম ব্যাংকের ছিল ৬১৯ জন এবং শাহজালার ইসলামী ব্যাংকের ছিল ১৮৩ জন। ২৫ লাখ থেকে ৫০ লাখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের ১৫৩৮ জন, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ছিল ৮০৯ জন, এক্সিম ব্যাংকের ৩৩৮ জন, শাহজালার ইসলামী ব্যাংকের ৯৫ জন। ইসলামী ব্যাংকের ৫০ লাখ টাকার ওপর বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৭৪ জন। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের বৃহদায়তন বিনিয়োগ গ্রাহক ছিল ১৯৫৯ জন, এক্সিম ব্যাংকে ছিল ৬৭১ জন এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে ছিল ২৯৬ জন্ এ চিত্র থেকে দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত না করে ইসলমী অর্থনীতির লক্ষ্য অনুযায়ী তা সাধারণ জনগণের মাঝে সম্প্রসারিত করার নীতি অনুসরণ করেছে।[৩]

---

১. আবদুর রকীব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

২. Islami Bank Bangladesh Limited,
ICB Islami Bank Ltd.
Al-Arafah Islami Bank Ltd.
Social Islami Bank Ltd.
Shajalal Islami Bank Ltd.
Exim Bank Ltd,
First Security islami Bank Ltd, এর Annuel Report, 2005 থেকে সংগ্রহীত।

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট বিনিয়োগের আতওয়ারী বন্টন থেকেও জাতীয় উন্নয়নে তার নীতি ও কৌশল স্পষ্ট হবে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ২০০৯ সালে শিল্পখাতে ৫৪%, বাণিজ্যিক (ক্রয়-বিক্রয়) খাতে ৩৩%, কৃষি ও সার খাতে ৭%, পরিবহণ খাতে ২% এবং পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্প, ডাক্তার প্রকল্প, কনজুমার প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পোল্ট্রি ও ডেইরি প্রভৃতি খাতে ৬% বিনিয়োগ করেছে। এর মাধ্যমে দেশে সরাসরি ১০ লাখের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা তারচেয়ে অনেক বেশি। আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের ২০০৯ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ [১]

বিনিয়োগের খাত	ব্যাংকের নাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)				
	আল-আরাফাহ্	সোস্যাল	শাহ্জালাল	এক্সিম	ফার্স্ট সিকিউরিটি
শিল্প	১৩৮৮৪	৪২২০	৫৭১৯	১৮৮০৩	১৪৫২
বাণিজ্য (আমদানি রপ্তানি ও ক্রয় বিক্রয়সহ)	১৩৪২৫	১১৯৮৫	১১০১৫	৩১১১৫	২২৪৬৯
কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন	৫৮৮	৫১৮	৩৯৯	১২০৬	২২৪
নির্মাণ	১৮১৩	১৩৬৪	৫২৩৯	৫৪২১	১৯৮৯
পরিবহন ও যোগাযোগ	১২৩৬	৫১৭	২০৬২	১৬৮১	৭৯
দারিদ্র্য বিমোচন	১৬	৬০৫	২০৮	-	৬৭০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২১০	৭৯	৭৬৫	-	-

❐ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামষ্টিক অর্থনীতির (macro economy) স্থিতিশীলতা, যার পূর্বশর্ত হলো মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহার, সন্তোষজনক অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাঞ্ছিত পরিমাণ রিজার্ভ। এসব শর্ত পূরণে সঞ্চালক শক্তিরূপে ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। সুদী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা বিনিয়োগে শুধু সুদের পরিমাণকেই বিবেচনা করে। এই কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তাদের বিবেচ্য নয়। উৎপাদন ও তার উপকরণের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সুদভিত্তিক কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপাদন ও তার উপকরণের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সুদভিত্তিক কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি ছাড়াই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুদ এবং জমাকারী ও ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে কৃত্রিম উপপয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বেড়ে যায় এবং উৎপাদান কম হলে তার ওপর সুদের বাড়তি মূল্যও যোগ হয়। এ দুষ্টচক্রের ফলে অবাঞ্ছিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়[২]।

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২. Md. Abdul Awwal Sarker, *Islamic Banking in Bangladesh:Problems and Prospective* (Dhaka: IBBL, 2004) p.23

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা এবং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। এ প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে দুর্বল বিপুল মানুষের সম্পদ অধিক আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। সুদী কারবারের মধ্য দিয়ে এই নীরব সম্পদ হস্তান্তর (Silent resource transfer) ঘটার ফলে অর্থের বন্টন প্রবাহ ও সম্পদের মালিকানার ভারসাম্য নষ্ট হয়। কার্ল মার্ক্স্ এ প্রক্রিয়াকেই 'সিঁদেল চুরি' বলে গাল-মন্দ করেছেন[১]। সুদী ব্যাংকের মুনাফা বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়[২]। সুদের এমনি অসংখ্য কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই ইসলাম সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাও এখানেই নিহিত।

ড. মুহাম্মদ বদিউল আলম ও মুহাম্মদ আবু মিসির বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার ব্যাংকের সাথে সুদমুক্ত ব্যাংকের লাভ, উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান মূল্যায়ন করে তাদের একটি গবেষণা পত্রে উপসংহার টেনেছেন এভাবে:

"Therefore, it is clear that the interest-free banking system provides better service to the customers and contribute to the economy as a whole with high esteem of moral values then that of traditional banking system operating in our country"[৩].

❒ দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন

সম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা থেকে এখন এটা স্পষ্ট যে, জ্বালানি, শিল্প কিংবা কৃষিখাতের চাইতেও দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনিয়োগ করে বেশি আর্থ-সামাজিক রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের বিনিয়োগ থেকেই সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত হয়। কার্যকর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠী একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এর ফলে আর্থ-সামাজিক কর্মক্ষেত্রে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অসাম্য দূর হয় এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার বিনিয়োগ কার্যক্রম এই লক্ষ্যেই পরিচালিত করছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ব্যাংক দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদেরকে এককভাবে বৃহত্তম বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সামর্থ্য (Single party exposure) নিয়ে দেশের শিল্প-বিকাশে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে বিনা জামানতে ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পল্লীর হত-দরিদ্র ও সংকটপ্রবণ জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্যধারায় সম্পৃক্ত করেছে।

---

১. কার্ল মার্ক্স, মজুরি-শ্রম ও পুঁজি, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯

২. প্রাগুক্ত

৩. Dr. Muhammad Badiul Alam & Mohammad Abu Misir, *Analysis of Comparative Financial Performance in Banking Sector of Bangladesh: A Study of Interest free and traditional Banks, Thoughts on Economics*, IERB, Vol-7, No-3&4, 1997

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক এভাবেই আয়ের (সম্পদ) পুনর্বণ্টন ও সুযোগের পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-গরিব বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনের একটি কৌশলপত্র (PRSP) তৈরি করেছে। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দারিদ্র্য ৩.৩ ভাগ হারে কমাতে হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ জাতীয় উন্নয়নের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে[১]।

❒ শিল্পবিকাশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান

শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৯ সালে তার মোট বিনিয়োগের ৫৪ শতাংশেরও বেশি ছিল। তার মধ্যে রফতানিমুখী পোশাক ও বস্ত্রশিল্পে ব্যাংক তার মোট বিনিয়োগের ২৪% নিয়োজিত করেছে। ইসলামী ব্যাংক অনেক বৃহৎ শিল্প গ্রুপকে এককভাবে প্রকল্প বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ প্রদান করেছে।[২]

২০০৯ সাল নাগাদ ব্যাংকের মোট শিল্প-প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১১৫০। এর মধ্যে ২২৬ টি গার্মেন্টস, ১৯৪টি টেক্সটাইল, ১৬০টি কৃষিভিত্তিক, ৩২টি স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ২৭টি ঔষধ ও রসায়ন, ৩০টি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৭টি ফিলিং স্টেশন, ১৩টি কোল্ড স্টোরেজ, ৬২টি রাইস মিল, ৩টি ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ৬টি সিমেন্ট, ১৯টি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড প্লাস্টিক, ৬টি জুট অ্যান্ড কেমিক্যাল, ৮টি সল্ট এবং বাকি ৩৮৬টি অন্যান্য শিল্প। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শিল্পখাতে বিনিয়োগের চিত্র নিম্নে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো :[৩]

ব্যাংকের নাম	শিল্প প্রকল্পসংখ্যা		বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১৫০০	২৫১৫	২৪৩৭৮০
আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	৪১২	১২৫৬	১৩৮৮৪
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	২৫৭	১৮১৩	১৯৯৬৫
শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক	১৯৫	৫৯	১৮৬৪১
এক্সিম ব্যাংক	৩৯৯	২৯৭	৩০৯৫৬
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক	৩৫	১০	১৪৫২
সর্বমোট =	২৭৯৮	৫৯৫০	৩২৮৬৭৮

---

১. *Islami Bank 25 years of Progress* (Dhaka: Public Relations Deptt. IBBL, 2007), P.6, এবং Annuel Report, 2007, p. 13-14

২. *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ*, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এবং *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:* বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৯

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ২০০৯ সাল নাগাদ ৮০, ০০০ গ্রাহককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পে (Small and Medium Enterprises-SME) বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বিভিন্ন ধরনের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ খাতকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষিনির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু পালন কামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য যেকোনো ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে ব্যাংকের এযাবৎ প্রদত্ত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩৩২ কোটি টাকা।

ইতোমধ্যে ব্যাংকের সহায়তায় এসএমই খাতের কোন কোন উদ্যোক্তা বৃহৎ শিল্প একটি ত্রিমূখী উন্নয়ন ধারার ব্যাংক হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক নন-ফরমাল সেক্টরের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমই খাতে সার্ভিস ট্রেডিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদে ২ থেকে ৫ লাখ টাকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ২ থেকে ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে।[১] এছাড়া এস এম ই খাতে ফরমাল সেক্টরের আওতায় সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে। ব্যাংকের এস এমই খাতে ২০০৫ পর্যন্ত ৬৮৩ জন গ্রাহককে ৮০,৪৭,১১,২৬৯.০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

❐সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক

অগ্রাধিকার খাতসমূহে ও অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, মীরপুর রেশম তাঁতী বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীমিত আয়ের লোকদের আবাসন চাহিদা পূরণের জন্য গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ইসলামী ব্যাংক রাজধানী এবং বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বহুতল বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য দেশে এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী হাজার হাজার গ্রাহককে বিনিয়োগ দিয়েছে। ব্যাংক বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানিকেও বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। এ প্রকল্পে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪ ভাগ[২]।

---

১. *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ*, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। *এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৯*

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দেশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক পরিবহন, যানবাহন ও গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী নিয়েছে। পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বাস, মিনিবাস, ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল, রেন্ট-এ কার সার্ভিসের জন্য গাড়ি ক্রয়ে সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া ব্যাংক আর-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বেবীটেক্সি, টেম্পো ও পিকআপ-ভ্যান, কাল্পনিক ও হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর জন্য গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী চালু করেছে।

গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ২শ প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশু পালন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, এগ্রোফার্মিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন, ব্যবসা, দোকানদারী, পরিবহন, কৃষি উপকরণ, বনায়ন, লন্ড্রি, সাইনবোর্ড লেখা ইত্যাদি। এই খাতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুবিধাভোগী গ্রাহকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ হাজার এবং বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৩৩ কোটি টাকা [১]।

ইসলামী ব্যাংকের কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামীণ বেকার যুবকদের আয়-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল, মাড়াই কল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তাদানও এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

নির্দিষ্ট আয়ের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজীবীদের জন্য ইসলামী ব্যাংক দেশে প্রথম গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক এ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১, ৯০, ০০০ জন স্বল্পআয়ের চাকরিজীবী মানুষকে ৫৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ দিয়েছে। সীমিত আয়ের লোকদেরকে সৎভাবে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকের এই প্রকল্প অনেক প্রতিষ্ঠানকেই এ ধরনের প্রকল্প চালু করেত উদ্বুদ্ধ করেছে [২]।

❒ ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক বিনিয়োগ

বিভিন্নমূখী ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জন্মলগ্ন থেকেই গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুঃস্থ পুনর্বাসন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামাজিক খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুধেল গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা ও ভ্যান গাড়ি প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়-বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী। মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান এবং দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালন ও সাহায্য দানসহ শিক্ষা কর্মসূচী। মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকুপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী এতিমখানা প্রতিষ্ঠা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করার জন্য অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণপথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী।

---

১. প্রাগুক্ত

২. *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড*, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ক্ষুদে উদ্যোক্তা উন্নয়নের অংশ হিসেবে ক্ষুদে উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ মানবকল্যাণে বিভিন্নমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন-হাসপাতাল, কম্যুনিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে[১]।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক দক্ষতা ও সামর্থ্য মূল্যায়ন

ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL) নামক বহুজাতিক রেটিং সংস্থার ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী রেটিংয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর অবস্থান ছিল 'এ প্লাস' (A+) যা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক সামর্থ্য ও মজবুত ভিত্তি নির্দেশ করে [২]।

২০০৫ সালে CRISL ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান আরো উন্নীত করে 'ডবল এ মাইনাস' (AA-) এবং ২০০৯ সালে 'ডবল এ প্লাস (AA+) নির্ধারণ করেছে যা ব্যাংকের উচ্চতর আর্থিক সামর্থ্য, অধিক নিরাপত্তা, অধিক ক্রেডিট মান ও সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক[৩]। নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্লোবাল ফিন্যান্স 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাংক পুরস্কার' (World's Best Bank Awards)-এর আওতায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-কে তার কার্যক্রম ও কৃতিত্বের জন্য ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে 'বেস্ট ব্যাংক ইন বাংলাদেশ' এবং ২০০৮ সালে 'বেস্ট ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন' পুরস্কারে ভূষিত করেছে[৪]।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যরূপে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাহরাইনভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশনস (AAOIFI), জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট (IIFM), সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনসিলিয়েশন অ্যান্ড কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন সেন্টার, মালয়েশিয়াভিত্তিক ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বাংলাদেশ চ্যাপ্টার) ইত্যাদি[৫]।

জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম০, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB) , বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স এসোসিয়েশন (BAFEDA) , ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীআহ্ বোর্ড (CSBIB), ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (IBCF), ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য[৬]।

---

১. *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড*, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০-১১

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক*, *অর্থনীতি গবেষণা পত্রিকা*, সংখ্যা-৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ১০৫

৩. প্রাগুক্ত,

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দেশের বেসরকারী খাতের ব্যাংকগুলোর মধ্যে জমা, বিনিয়োগ, পরিচালনাগত মুনাফা, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স সংগ্রহ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দু'হাজার এবং এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পাঁচশ' ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মূলধনের পর্যাপ্ততা, পরিসম্পদের গুণাবলী, মুনাফা অর্জন ও যথার্থ তারল্য পরিস্থিতি প্রভৃতি মিলিয়ে ইসলামী ব্যাংক একটি সফল ব্যাংকের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

❑ একবিংশ শতকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংক সকল বিচারে একটি গণ-ব্যাংক ও সার্বজনীন ব্যাংক হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অনুসরণ করে দেশের ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ইসলামী আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য, ব্যাংকের সকল স্তরের জনশক্তির সৎ, আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত সেবা, প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম, ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক এ ব্যাংকের সার্বিক পরিবেশকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তকরূপে ইসলামী ব্যাংক দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গত প্রায় তিন দশকে যে অবদান রেখেছে তার আলোকে বলা যায়, দেশের সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে দেশের ছয় সহস্রাধিক শাখার এ বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের অভাবী মানুষের হতাশা মুছে ফেলতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করতে অসামান্য অবদান রাখতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেশের নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাতের অনেক শীর্ষ ব্যক্তি মনে করেন, একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি ও উদ্যম সৃষ্টি হবে।

সবশেষে বিখ্যাত পশ্চিমা সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট'-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'সার্ভে অব ইসলাম' শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়;

"অতীতে বিশ্ববাসী মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিল এবং ইসলামের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আইডিয়া গ্রহণ করতে পারে[১]।"

ইকনোমিস্ট-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব তার শিক্ষাপদ্ধতি। আর দীর্ঘকাল পর মানবজাতির প্রতি ইসলামের বর্তমান উপহার ইসলামী ব্যাংকিং। ইকনোমিস্ট-এর এ বক্তব্যের সারকথা হলো; 'Islami Banking is superior to conventional western modern Banking System.' পশ্চিমা আধুনিক ব্যাংকিং-এর সীমাবদ্ধতা অনেক আগেই অর্থনীতিবিদদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। তার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতি হিসেবে নয়, বরং সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে মুক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং হলো আর্থিক দুনিয়ায় এক অনন্য বিপ্লব [২]।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

❐ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে বাসেল-২ বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ ও কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমান ক্যাপিটাল নিরূপণ পদ্ধতি এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বাসেল-২ ক্যাপিটাল নিরূপণ পদ্ধতি সমান্ত রালভাবে চলবে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২০১০ সাল থেকে বাসেল-২ সম্পূর্ণভাবে চালু হবে সকল ব্যাংকগুলোতে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ৪০০ কোটি টাকা মূলধনের মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ হতে হবে ২০০ কোটি টাকা। ব্যাংকগুলোকে ২০০৯ সাল শেষে তাদের পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল মিলিয়ে মোট মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে। ২০১০ সালের জানুয়ারী থেকে বাসেল-২ বাস্তবায়নে কোন কোন ব্যাংক ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক শাস্তির বিধান থাকছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বাসেল-২ এর সফল বাস্তবায়ন করা বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে[১]।

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য শরীআহ্ ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি ও মান সমৃদ্ধ করার জন্য এখনো ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি হিসাব বিজ্ঞান ও মান সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপক গবেষণামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এসব অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যাংকিং এর হিসাব পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। তাই সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত শরীআহ্ ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতির উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ[২]।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচলিত ব্যাংকের ২/১টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে সুদ ভিত্তিক সেখানে ২/১টি শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিভাবে? কারণ শাখার তহবিল যোগান, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং এর মিশ্রণের ফলে সত্যিকারের শরীআহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো পরিচালনা করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা যায়।

বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশে কোন ইসলামী মানি মার্কেটে না থাকায় বিশেষ প্রয়োজনের সময় ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনা। তাছাড়া অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে মারাত্মক সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো মিলিতভাবে কনসোর্টিয়াম বা সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বড় অংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমে তেমন পরিলক্ষিত হয় না[৩]।

---

১. মুহাম্মদ নূরু হুদা, *অর্থনীতি গবেষণা পত্রিকা*, সংখ্যা-১০, ডিসেম্বর ২০০৮ পৃ. ১০২
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সফল পঁচিশ বৎসর পূর্তি হলেও এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য সরকারিভাবে কোন আইন বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয়। এতে সেন্ট্রাল শরীআহ বোর্ড এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি ফোকাস গ্রুপ প্রায় ২ বছর পরিশ্রম করে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুত করেন, কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে স্থায়ী কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমাকৃত তহবিলের উপর শরিআহ সম্মতভাবে মুনাফা প্রদান না করে সুদ দেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানতের উপর প্রদানকৃত সুদ তাদের মুনাফায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনা। ফলে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এসব অতিরিক্ত অর্থ (সুদ) বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে থাকে । বাংলাদেশ ব্যাংক জমাকৃত অর্থের উপর শরীআহ্ সম্মতভাবে মুনাফা প্রদান করা হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী হবে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একটি শক্তিশালী শরীআহ্ বোর্ড থাকলেও এদেশের অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের তেমন শক্তিশালী শরীআহ্ বোর্ড নাই। ফলে এসব ব্যাংকের আর্থিক কার্যক্রম সঠিক শরীআহসম্মত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লাভ-লোকসান ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি হলেও ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতি পুরোপুরি চালু করতে পারেনি। এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের মধ্যে সততা, দায়িত্ব জ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি উচ্চ মানের নৈতিক গুণাবলী থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বিনিয়োগ গ্রাহক খুঁজে পাওয়া সত্যি দুস্কর। ইসলামী ব্যাংকারদের এ ধরনের বিনিয়োগ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এ ব্যাপারে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকে-এর প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা-অনুসন্ধানে এ ব্যবস্থার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণসহ ইসলামী শরীআহ্র নীতিমালা পরিপালন ও অনুসরণে যে সব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ :

❒ প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

⇨ সুদভিত্তিক ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রায় তিনশ' বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এ সুদভিত্তিক ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও আবহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থার বিপরীত। ইসলামী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী নিজস্ব সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের লক্ষ্য অর্জন একটি দুরূহ কাজ।

⇨ ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হওয়ায় এর বন্টন-দক্ষতা কমে যায়। লাভ-লোকসানভিত্তিক বিনিয়োগপদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া উদ্যোক্তা, জমাকারী ও ব্যাংকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক আবহে পরিচালিত হবার কারণেই অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রধানত বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল এবং বাই'-সালাম তথা কেনা-বেচা পদ্ধতিতে তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা প্রচলিত ধারার প্লেজ ও হাইপোথিকেশনের জায়েয বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সাথে বেচা-কেনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও সাধারণ জনগণের কাছে সে পার্থক্যটি ব্যাপকভাবে বোধগম্য হয় না। এ কারণে জনগণের কাছে প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হচ্ছে না।

- ⇨ মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যশীল নয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এর কোন বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও ব্যাপকভাবে মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগপদ্ধতির চর্চা করতে না পারায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাধারণ্যে ধারণা সুস্পষ্ট হচ্ছে না।
- ⇨ অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থার পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে। ফলে এসব ব্যাংকে শরীআহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন, শক্তিশালী ও দক্ষতাসম্পন্ন শরীআহ্ সংস্থার মাধ্যমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান দরকার।
- ⇨ ইসলামী ব্যাংক এমন একটি পরিবেশে কাজ করছে যেখানে আইন, প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মানসিক বিন্যাস সুদভিত্তিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য পূরণেরই উপযোগী। এ পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ইসলামী ব্যাংকিং মূলনীতির বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- ⇨ গবেষণার ফলে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক অনন্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বাধীন পরিবেশে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার মাধ্যমেই অর্থনীতিতে তার কল্যাণকারিতার যথাযথ পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর রাখতে পারে।

❒ ইসলামী জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাংকারের ঘাটতি

- ⇨ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠার কারণে অধিকাংশ ব্যাংকারই পুঁজিবাদী অর্থনীতির আবহ, এর লক্ষ্য ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন। এ পরিবেশেই তারা প্রশিক্ষিত। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের অনেকেরই প্রত্যয় ও অন্তর্দৃষ্টি এবং মানসিক প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে। তাদের সার্বিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত ভিত্তি নির্মাণ, মোটিভেশন প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খুবই সীমিত।
- ⇨ ইসলামী ব্যাংকের জন্য অধিকতর মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং চ্যালেঞ্জ নেয়ার মতো ব্যাংকার প্রয়োজন। কারণ ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাজীবীদেরকে সদ্য বিকাশমান পদ্ধতির জন্য নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে শরীআহ্ আলোকে পূরণ করার মাধ্যমেই ইসলামী ব্যাংক তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে।
- ⇨ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নততর, স্বতন্ত্র ও বহুলাংশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগপদ্ধতির কারণে শিল্প, প্রযুক্তি এবং ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকারদের অনেক বেশি বাস্তব ধারণা ও জ্ঞান থাকা জরুরি। অধিকন্তু

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ে ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী অগ্রাধিকার এবং বৈধ ও অবৈধতার শারঈ সীমারেখা সম্পর্কে তাদের সচেতন থাকা জরুরি।

⇨ ইসলামী ব্যাংকের কর্মীবাহিনী যাতে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয় ভিত্তি অর্জন করতে পারে, সেজন্য ব্যাপক ও অব্যাহত পরিচর্যা দরকার, যাতে করে তারা ইসলামী পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা উন্নয়ন

⇨ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে এবং দীর্ঘদিন ইসলামী আর্থিক লেনদেন চালু না থাকার দরুন ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমিত কিংবা শূন্যের কোঠায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক।

⇨ অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহকেরই সুদ ও লাভের মধ্যে পার্থক্য, শরীআহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগপদ্ধতি, হালাল-হারামের জ্ঞান এবং ইসলামী আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা নেই।

⇨ শরীআহ্‌র মৌলিক জ্ঞান এবং হালাল-হারামের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা খুবই কঠিন। এজন্য গ্রাহককে সাধ্যমত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব।

⇨ গ্রাহকগণকে ইসলামী ব্যাংকিংমূখী করার প্রয়াস এখনো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। একদিকে গ্রাহকদের শরীআহ্ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র বাই'-মুরাবাহা ও বাই'-মুয়াজ্জালের মতো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার কারণে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা গ্রাহকদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।

⇨ প্রচলিত ব্যাংক-ব্যবস্থায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক দেনাদার-পাওনাদার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় এ সম্পর্ক হলো সাহিব আল মাল ও মুদারিব, মুয়াদ্দা-মুয়াদ্দি, ব্যবসায়ে অংশীদার, পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা ইত্যাদি। গ্রাহকদের কাছে এ বিষয়ে ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়।

⇨ অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহক তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং বিনিয়োগ সুবিধার ব্যাপারেই তারা বেশি আগ্রহী। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা এক দুরূহ কাজ। ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার সফলতার জন্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা ইসলামী ব্যাংকারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

❒ তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয়

⇨ প্রচলিত ধারার ব্যাংক-ব্যবস্থায় লেনদেন ও বিভিন্নমুখী সেবার প্রোডাক্টগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা নতুন। তবে ইসলামী পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অনেক বেশি সুযোগ এ ক্ষেত্রে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলো নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অব্যাহত প্রক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

- বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
- ইসলামী শরীআহ্র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সুদভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এমন আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির জন্য ইসলামী ব্যাংকার ও শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর ও সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।
- অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ও লোকবলের অভাব রয়েছে। এ অভাব ও ঘাটতি দূর করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্যও জরুরি।
- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও পেশাদার ব্যাংকারদের মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তার সমন্বয় (Knowledge sharing) প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই এ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাই বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন।
- গ্রাহকের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ইসলামী নীতির ব্যাপারে আপোস করার বা ইচ্ছামতো লাগসই করার একটি প্রবণতা অনেক সময় কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের কিছু কিছু ব্যাংকারের মধ্যে কাজ করে। অথচ ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীআহ পুরোপুরি প্রতিপালন করা। ইসলামী বিধি-বিধানের সীমার মধ্যে থেকেই তাদের কাজকে এগিয়ে নেয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে এবং তা এগিয়ে নিতে অভ্যস্ত হতে হবে।
- ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যারা ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন নিয়ে গবেষণা করেন তারা গ্রাহকের প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে বাস্তব কারণে যথাযথ ওয়াকিফহাল নন। পেশাদার ব্যাংকারদের অগ্রাধিকার এবং বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মনোভঙ্গীর মধ্যে ইসলামী সীমারেখার আওতায় কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা একটি জরুরি বিষয়।

❒ নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশ

- পৃথিবীর অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এমন পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে যেখানে জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে প্রবল আবেগ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সরকার ও প্রশাসনের মাঝে শরীআহ বিষয়ে আগ্রহ কম। ফলে ব্যাংকিং পদ্ধতিকে ক্রমশ ইসলামীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ ইসলামী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরামে বারবার এজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেও নিজ নিজ দেশে সে ব্যাপারে তাদের কার্যকর উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত বা অনুপস্থিত।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নিয়মনীতি ও আইনের মাধ্যমে দেশের সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অভিন্ন নিয়ম-কানুনের মাধ্যমেই (স্বল্প ব্যতিক্রম বাদে) ইসলামী ব্যাংকসমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র কর্মধারার সাথে এ অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ ইসলামী ব্যাংক এমন এক পরিবেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেখানে সকল আইন-কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সুদভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম প্রচলিত দেওয়ানী আইন-কানুনের সাথেও সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে দেশের দেওয়ানী আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ আইনগত ভিত্তি না থাকার কারণে এবং শরীআহ্‌র ব্যাপারে বিচারকদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় উপযুক্ত সমাধান দিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

❒ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

⇨ সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার আলোকে ঢেলে সাজাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তারা সবসময় স্বাধীনভাবে তাদের কাঙ্খিত ব্যবসাটি নির্বাচিত করতে পারে না। ফলে তাদের কার্যক্রম নিজস্ব চাহিদা মাফিক হয় না। প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং গ্রাহক নির্বাচনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমশ এক্ষেত্রে ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।

⇨ স্বল্পমেয়াদী কিছু তহবিল তাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বে উঠানো হয় না। তাই ব্যাংকারগণ সাধারণত এ তহবিলকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন। মেয়াদপূর্তির আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে এ তহবিল উত্তোলিত হলে প্রচলিত ব্যাংক সাধারণত বাইরের কোন উৎস হতে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও মূলধন বাজার না থাকায় আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাইরের কোন উৎস হতে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। ইসলামী পদ্ধতিতে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

❒ তারল্য ব্যবস্থাপনা

⇨ 'ট্রেজারি বিল' এবং অর্থবাজারে প্রচলিত অন্যান্য 'সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্ট' ব্যবহার করে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য (Liquidity) সংকট এড়াতে পারে। আবার অতিরিক্ত তারল্য কমানোর ক্ষেত্রেও তারা এসব ইনস্ট্রুমেন্ট কাজে লাগাতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের তারল্য সংকটে সুদভিত্তিক এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের সহযোগিতা নিতে পারছে না। এর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োজন।

⇨ ইসলামী ব্যাংকের তারল্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে পাকিস্তানে Participation Term Certificate (PTC) ও Mudaraba Certificate এবং মালয়েশিয়ায় Government Investment Certificate (GIC) চালু করা হয়েছে। অন্যান্য দেশেও এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

❐ অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণে ব্যর্থতা

সমাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উদ্যোগ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আশানুরূপ নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও ইয়াতীমখানা ইত্যাদিসহ বহু সামাজিক খাত এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।

❐ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার

⇨ উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং জগতের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি ও নতুন নতুন প্রোডাক্টের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন ও বৈচিত্র অনেক ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে এখানো প্রতিফলিত হয়নি।

⇨ উন্নত প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে এ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারবে না।

❐ প্রচার কার্যক্রম ও মিডিয়ার ব্যবহার

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনও প্রচারের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাফল্যজনক ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম, এর স্বতন্ত্র নীতি, পদ্ধতি, কর্মকৌশল এবং এর সফলতার নানা দিক সম্পর্কে এখনো অধিকাংশ মুসলমানই অবগত নন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমকে গণমুখী করার জন্য মিডিয়াকে কাজে লাগাতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে এ ক্ষেত্রেও তাদের তেমন কোন প্রচার নেই। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারনাগত ও প্রয়োগিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা ইসলামী ব্যাংকগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি বিদ্যমান। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।

❐ ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি

⇨ বাংলাদেশে ইসলামী অর্থবাজারের (Islamic Money Market) অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল অর্থাৎ সাময়িক অতিরিক্ত তারল্য 'সরকারী ট্রেজারি বিল', 'অনুমোদিত সিকিউরিটিজ' বা 'বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তারল্য-সঞ্চিতির অনুমোদিত অংশ এবং অতিরিক্ত তারল্য ঐ সমস্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে না।

⇨ ইসলামী ব্যাংককে তার সকল জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ টাকায় জমা রাখতে হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগবিহীন অবস্থায় থেকে যায়। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের ওপর এর অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ইসলামী মুদারাবা বন্ড' চালুর দাবি ছিল দীর্ঘদিনের, যা সম্প্রতি কার্যকরী হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেয়ায় Government Islamic Investment Bond (GIIB) নামে একটি শরীআহ্ অনুমোদিত বন্ড বাজারে এসেছে।

⇨ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি Islamic Mutual (IMF) প্রবর্তন করা হয়েছে। এটিও শরীআহ্ভিত্তিক হালাল ফান্ডে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অলস তহবিল বিনিয়োগে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। এ জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে। উপরন্তু ইসলামী কমন মার্কেট উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

❒ নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অভাব

⇨ বাংলাদেশ সরকার আইডিবি প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ হিসেবে এদেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ এখনো খুব আশাপ্রদ নয়।

⇨ আশির দশকের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলো, যা নানা কারণে সফল হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জাতীয়করণকৃত ব্যাংকিং খাত ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।

⇨ বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে উৎসাহজনকভাবে দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা দান রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অংশ। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) ও তত্ত্বাবধানমূলক (Supervisory) স্বতন্ত্র কাঠামো এখনো তৈরি হয়নি। অবিলম্বে এ ঘাটতি পূরণ হলে তা এদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শৃঙ্খলা বিধানে সহায়ক হবে।

⇨ ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন-ব্যবস্থা, লাইসেন্স-এর জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, ন্যূনতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদ শ্রেণীকরণের ব্যবস্থাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতন্ত্র সুবিবেচনাপ্রসূত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (Prudential Regulation) প্রণয়ন করা উচিত।

⇨ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপককে প্রধান করে একটি 'ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি 'গাইড লাইন' প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে এনেছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

⇨ সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কুয়ালালামপুরভিত্তিক Islamic Financial Services Board বা 'আইএফএসবি'-এর সদস্য হয়েছে। দেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

❒ সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব

⇨ কোন পদ্ধতিই কেবলমাত্র তার নিজস্ব উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে আরো অনেক সহযোগী (Supportive) প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্যও প্রয়োজন। কোন উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, নিরীক্ষক এবং এরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের সেবার দ্বারা লাভবান হতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে ওঠেনি।

⇨ সিনিয়র ইসলামী ব্যাংকারদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এদেশে গড়ে ওঠেনি।

⇨ গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্যও ইসলামী ব্যাংকসমূহের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে এ ধরনের সহযোগী ও মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি।

Text Book on Islamic Banking গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতিবিদ, ব্যাংক বিশেসজ্ঞ ও গবেষকগণ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক (Micro & Macro level) পর্যায়ে যে সব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ:

❒ Issues Related to Macro Operation

⇨ Liquidity and Capital;
⇨ Valuation of Bank Assets;
⇨ Credit Creation and Monetary Policy;
⇨ Financial Stability;
⇨ The Ownership of Banks;
⇨ lack of Capital Market and Financial Instruments and
⇨ Insufficient Legal Protection.

❒ Issues Related to Micro Operation of Islamic banks

⇨ Increased Cost of Information;
⇨ Control over Cost of Funds;
⇨ Mark-up Financing ;
⇨ Excessive Resort to the Murabaha Mode;
⇨ Utilization of Interest Rate for Fixing the Profit Margin in Murabaha Sales;
⇨ Financing Social Concerns and
⇨ Lack of Positive Response to the Requirement of Government Financing.

তাঁরা আরো উল্লেখ করে বলেন,

"These are some of the immediate problems confronting policy makers and regulations. Of course, it has to be kept in mind that these issues are at their elementary level of discussion. Much work has to be undertaken in terms of procedures, infrastructure, and allowing a new framework to develop and mature. The ensuing analysis should make some of these issues clearer, but the prograess so far has been less than substantial.

---

১. Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking*, ibid, p.391-392

Dhaka University Institutional Repository

❒ ইসলামী শরীআহ্‌র লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের করণীয় সম্পর্কে কিছু সুপারিশ

ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্যমন্ডিত সুখ-শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে (Society of excellence) ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ষাটের দশক থেকে যাত্রা শুরু করেছে । এ অগ্রবর্তী যাত্রায় প্রতিবছর শতকরা ১৫ ভাগ হারে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং এখন Global Banking-এর মর্যাদা লাভ করছে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাত যে সব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তা দূর করে একটা Dynamic ইসলামী ব্যাংকিং খাত সৃষ্টির লক্ষ্যের নিম্নোক্ত বিষয়াদি বাস্তবায়নের দিকে জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ঃ

⇨ ইসলামী আর্দশ, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণ, আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহককে সচেতন করে তোলার জন্য বাস্তবায়নযোগ্য (Implementable action-plan) কার্যকরী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা দরকার। ইসলামী ব্যাংকিং ও ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং এর মধ্যকার যথার্থ পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে দেশব্যপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যপদ্ধতি উপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির উপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে তা বিলি করা যেতে পারে। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের Orientation-Programme-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

⇨ ইসলামী শরীআহ্-র যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর Internal Audit-এর পাশাপাশি External Audit-এরও ব্যবস্থা করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং অডিট ডিভিশনের মাধ্যমে উপযুক্ত অডিট ম্যানুয়েল দ্বারা অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

⇨ ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা ব্যবস্থাপকরা তাদের স্ব-স্ব ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধি বা দূত। এ শাখাপ্রধানদের মাধ্যমে মূলত আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকরা ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে পরিচিত হয়ে থাকে। শাখা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Islamic Code of Business Ethics তৈরী করে সে আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকসহ ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আচরণকে পরিশীলিতকরণ- এর ক্ষেত্রে এটি কার্যকরী হতে পারে।

⇨ প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র "শরীআহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড" (এদেশে শরীআহ্ কাউন্সিল বলা হয়)-এর ব্যাপক দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য–ইসলামী শরীআহ্-র লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগুচ্ছে কি-না, আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগুলো গুরুত্ব পাচ্ছে কি-না, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে কি-না ইত্যাদি বিষয়ে শরীআহ্ কাউন্সিল তার বাস্তব জ্ঞানভিত্তিক Guideline তৈরী করবে। শরীআহ্ কাউন্সিলকে যথাযথভাবে empowered করতে হবে। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের মৌলিক দাবী হচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নে নিশ্চিত হতে হবে। আর এ নিশ্চয়তার সনদপত্র প্রদান করবে শরীআহ্ কাউন্সিল।

⇨ Local level planning and Resource Management সংক্রান্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীআহ্সম্মত হতে হবে। আমানতকারীদের এলাকা প্রথম গুরুত্ব পাবে বিনিয়োগের জন্য। এ জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন দক্ষতা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরী করে তা অর্থায়ন করা। অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে Client-এর অবস্থা অনুযায়ী নির্ণয় করা যায়। মুদারাবা, মুশরাকা বা Profit-loss Sharing –এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট Moral Hazard Problem থেকে মুক্ত থাকার জন্য Collection Agency নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কৃষিখাতে বাই সালাম পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । ইসলামী ব্যাংকিং-এর সেবার হকদার এদেশের দরিদ্র স্বল্প আয়ের জনসাধারণ।

⇨ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ধনী-দরিদ্র ঈড়াবৎধমব- এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে এটি সত্য না হলেও একটি আদর্শবাদী ব্যাংকিং-এর জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর্থ -সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ, আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে Flow of financial resources হতে হবে গরীবমুখী । বিনিয়োগের গতিধারায় দেখা গেছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং -এর ন্যায় একটি চিহ্নিত ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে সিংহ ভাগ সম্পদ তুলে দিচ্ছে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ (Owners and Managers) আন্তরিক হলে সীমিত সম্পদের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্পূর্ণ সম্ভব।

⇨ জনগণের সঞ্চয় অভ্যাস বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদ ও শর্তের Interest free financial instruments তৈরী করা প্রায়োজন।

⇨ ইসলামী ব্যাংকিং-এর Profit variable –এবং Deposit variable-এ দুটো variable অন্যান্য ব্যাংককে তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলতে উদ্বুদ্ধ করছে। উপরের আলোচনায় দেখা গেছে, আমানত বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ কম করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর কাছে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত তারল্য রয়ে গেছে। এসব তারল্য যথাযথ বিনিয়োগের ক্ষেত্র বের করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকিং এর সহায়ক বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Academic and Training Institutions-ও প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

⇨ পুঁজিবাদী অর্থনীতি 'Economic man' বা ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত 'Rational man' তৈরীর কথা বলে। অপরদিকে ইসলামী শরীআহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক 'Islamic man'তৈরীর কথা বলে। ইসলামী শরীআহ্-ভিত্তিক ব্যাংক 'Islamic man'দের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। Internal Control System-এর মূলে থাকবে এ জাতীয় পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষগুলো। অন্যদিকে বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে পরিকল্পিতভাবে 'Islamic man-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য Entrepreneurship Development Institute (EDI) গঠন করা যেতে পারে।

⇨ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঈমানদারদেকে যেমন সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না-ঠিক সেভাবেই বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভেতরে Islamisation of the Islamic banks-জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন । ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশে দু'দশক পূরণ করেছে। এখনও 'শিশু' আছে বলা যাবে না। ২০ বছরের যুবককে যৌবনের প্রকৃত ব্যবহার কোন্ পথে-সে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। ৭টি ইসলামী ব্যাংকের সঠিক X-ray করা হলে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসবে । যারা ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক তারা চিন্তা-চেতনায়, পরিকল্পনা গ্রহণ ও

⇨ বাস্তবায়নে 'Islam Compatible' কি-না তা দেখা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনায় Islamic Man দরকার যা readymade পাওয়া না গেলে তৈরী করার জন্য বড় বড় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখা ভালো যে, ইসলামী ব্যাংকিং এর বর্তমান Deposit ও Profit variable-এর উর্ধ্বগতি দেখে ট্রাডিশনাল ব্যাংকগুলো যে ১৮টি শাখা খুলেছে এবং সোনালী, অগ্রণী, পুবালী ব্যাংক লিমিটেড তাদের কনভেনশনাল শাখার অভ্যন্তরে সে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করেছে তা যেন সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে সে জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে, যারা দারিদ্রসীমার বা যাকাত লাইনের নীচে অবস্থান করছেন,তাদেরকে কিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। অভিযোগ করা হয় যে,বেসরকারী সংস্থাগুলো (NGOs) সুদী ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব মানুষের উপর জুলুম করছে। এ জুলুমের হাত থেকে (Exorbitant rate of interest) অসহায় দুঃখী-গরীব মানুষদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ স্কীম (Micro Credit Scheme) গ্রহণ করা হলে গরীব-দুঃখী অসহায় মানুষ প্রকৃত অর্থেই Proverty Trap থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং প্রকৃত অর্থেই Graduation from poverty নিশ্চিত হবে। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেরাই Viable projects তৈরী করে উদ্যোক্তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে।

⇨ এখনও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েনি (Inter-Islamic banks competition) । বাংলাদেশের জনগণের Religious feelings তীব্র হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের Deposit বেড়ে চলছে। তাদের সেবার তুলনামূলক মান নিয়ে আমানতকারী ও বিনিয়োগ-গ্রাহকরা খুব একটা সচেতন নন। আগামীতে আন্তঃইসলামী ব্যাংক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এখন থেকেই তাদের সেবার মান বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

⇨ বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিয়াল খাতের ভূমিকাও অনেক বেড়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র Deposit এবং Investment –এর মধ্যেই তার কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ নয়-E-commerce, E-banking ও Integrated global finacial markets-এ অংশগ্রহণ করতে হলে ধীরে ধীরে transformation –এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। Hybrid financial system-এর আওতায় কাজ করতে হলে দক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে। financial derivatives-এর ইসলামী শরীআহ্ সম্মত রূপ ও তার বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়া বের করতে হবে। এ জন্য এখন থেকে R & D (Research & Development)-এর জন্য ভালো বাজেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

⇨ শরীআহ্ কাউন্সিল-এর ফকীহ্ সদস্যদের সাথে অর্থনীতি-ফিন্যান্স ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের মতামত বিনিময় হওয়া প্রয়োজন। Academics এবং Practitioners-দের মধ্যেও জ্ঞানের আদান-প্রদান হওয়া বাঞ্ছনীয় । ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন unresolved banking and finance issue-এর উপর নিয়মিত আলোচনার জন্য ফকীহ্ সদস্য ও অর্থনীতি-ফিন্যান্স ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

Dialogue-এর ব্যবস্থা করতে পারে। ডায়ালগ থেকে বিভিন্ন ইস্যুর ইসলামী শারঈ সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে।

⇨ ইসলামী ব্যাংকিং এ বিভিন্ন অর্থায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। মুদারাবা-মুশারাকা-এর প্রয়োগ খুবই সীমিত হলেও বাই'মুরাবাহা ও বাই'-মুয়াজ্জাল-এর ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োগ হচ্ছে। এ পদ্ধতিদ্বয় পূর্ব-নির্ধারিত মার্ক-আপ বা মুনাফার হার দ্বারা পরিচালিত হয় বিধায় যদি পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তা ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে না আনা হয় তাহলে তা বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেহেতু, মালের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকারদেরকে সৎ ও আন্তরিক হতে হবে। সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে, যখন আরবরা যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে, ব্যবসায় তো সুদের মত, তখন আল্লাহ ব্যবসায় ও সুদের মধ্যে যে apparent similarity আছে তা অস্বীকার করেননি, বরং সিদ্ধান্তমূলক ভঙ্গীতে বলেছেন যে, কিন্তু আল্লাহ ব্যবসায়ের অনুমোদন দিয়েছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের এ নীতিটি মনে রাখতে হবে যে, 'No ruling on Legal reasoning is allowed where a ruling exists in a Legal Taxt (Nass) [in the Quran or Hadith].

অতএব, ব্যবসায়িক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যবসায়িকভাবেই হতে হবে-নতুবা ক্রয়-বিক্রয়হীন বাই'-মুয়াজ্জাল এবং বাই'-মুরাবাহার জন্য দায় এড়ানো যাবে না।

❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে কিছু সুপারিশ

ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ নীতিমালার পরিপূর্ণ পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হলো :

⇨ ব্যাংকের উদ্যোক্তা, পরিচালক পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে শরী'আহ্ নীতিমালা অনুসরণের জন্য পূর্ণ আন্তরিক হতে হবে, এ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাদের থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শুধু ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকের স্বপ্নদ্রষ্টাগণ স্বপ্ন দেখেননি, তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর নবযাত্রাকে ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিন্তা করেছেন।

⇨ মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি শরী'আহ্-র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ব্যাংকের যাবতীয় কর্মসূচী ঢেলে সাজাতে হবে।

⇨ আয় ও বিনিয়োগে হালাল ও হারামের সংমিশ্রণ করা যাবে না।

⇨ ইসলাম বরাবরই মজলুমের পক্ষে কথা বলেছে। তাই বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যাকাত লাইনের নিচে অবস্থিত শতকরা ৮০ ভাগ গরীব-অসহায় দরিদ্র লোকদের Financing need বিবেচনায় আনতে হবে।

⇨ শরী'আহ্ কাউন্সিলগুলোকে Active ও Effecitive করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ্দের ও অর্থনীতি ব্যাংকিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠন করতে হবে, যারা আধুনিক সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

⇨ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা নৈতিকতার নিরিখে উঁচু মানের ধরে নেয়া যায়। মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক সমাজ–আলেমদেরকে আর্থিকভাবে এগিয়ে দেয়ার জন্য "উলামা ফাইনান্সিং স্কীম" চালুর বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। আলিমগণ যেহেতু সমাজে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেহেতু তাঁরা আর্থিকভাবে Sound হলে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে অগ্রসৈনিকের ভূমিকায় এগিয়ে আসতে পারবেন।

⇨ গবেষণা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

⇨ পিএলএস ব্যাংকি-এ যাওয়ার লক্ষ্যে Islamic man অথবা Honest entrepreneur তৈরীর জন্য Entrepreneurship Development Institute গঠন করা যায়।

⇨ বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলামী ব্যাংকিং-এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃতিকরণের জন্য Even geographical coverage policy গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে এবং ব্যবসায় কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না করে দেশব্যাপী গ্রামভিত্তিক সম্প্রসারণ করা দরকার।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহক–সাধারণ গরীব-অসহায় মানুষ বিপুলভাবে উপকৃত হবে। দেশে গরীব-ধনীর যে Eighty-twenty Society-এর (৮০/২০ সমাজ) সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যবধান অনেক কমে আসবে এবং ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রকৃত অর্থেই ইসলামী শরী'আহ্-র লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"শরীআভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পর্যালোচনা : মৌলতত্ত্ব ও পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ (১৯৮৩-২০০৫)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে ইসলামী শরীআহর ধারণা, উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য , প্রকৃতি , পরিধি ও পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । কেননা ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরীআহ্'র নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল কার্যক্রমেই সুদ পরিহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার চালিকা শক্তি-ই হল ইসলামী শরীআহ্ ।
আন্তর্জাতিক পরিসরে এবং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অগ্রগতি ও সাফল্যের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে ।

ইসলামী অর্থনীতির মুল বুনিয়াদ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত । এ অর্থনীতি একটি ব্যবস্থাপনা নির্ভর অর্থনীতি (Managed Economy) । পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মূলত, উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি (Open Economy) এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (Centrally Planned Economy) । সুতরাং আদর্শগত ও প্রয়োগগত পার্থক্যের কারণেই ইসলামী অর্থনীতির কর্মধারা এবং তার বাস্তবরূপও ভিন্নতর হতে বাধ্য । সে কারণেই সামাজিক সাম্য অর্জন, ইনসাফপূর্ণ বন্টন , দরিদ্র শ্রেণীর হক আদায় ও অধিকতর মানবিক জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান এবং ধনীদের বিলাসিতা , অপচয় ও অপব্যয় বন্ধের জন্য আয়ও বন্টেনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছে-এর আবেদন ও প্রয়োগ সার্বজনীন ও সর্বকালীন । সমগ্রবিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের ব্যাংকব্যবস্থাসহ সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির ভাবধারা ও নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হলে , এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিদের্শনা ও শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করা হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জনজীবনে স্বস্তি , নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই ।
ইসলামী ব্যাংক মৌলিকভাবেই একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবায়ন করছে । ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ সর্বক্ষেত্রেই এই ব্যাংকের নীতি ও কৌশল হচ্ছে সুদ বর্জন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হতে এর উচ্ছেদ করা । ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রায় সকল কাজেই ইতোমধ্যে শরীআহর বিধি-বিধান প্রয়োগে যথার্থ পদ্ধতি-পন্থা উদ্ভাবন ও কার্যকর করা হলেও মুদ্রা বাজার, পুঁজি বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে এখনও ইসলামী বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছেনা । এছাড়াও মুদারাবা ও মুশারাকা এই দুটি বিনিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি । বাই' মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা ও ইজারা পদ্ধতি অনুসরণেও ক্রয়-বিক্রয়ের সকল শর্ত পরিপালিত হচ্ছে না ।

গবেষণায় বাংলাদেশের সাতটি ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম, কতিপয় সূচকের গতিধারা ঋণভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ আদায়, শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগসহ মুনাফা হারের একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে । এই পর্যালোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এই দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরো দ্রুত সম্প্রসারণ ও বিকশিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে । সুতরাং এর স্থায়ীত্ব ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে । ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহককে সচেতন করে তুলতে হবে । ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম আরো গণমূখী , ব্যাপকভিত্তিক ও শেকড় সন্ধানী হতে হবে । তার বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে হতে হবে আরো বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত, সহযোগিতামূলক ও দরিদ্রের জন্যে প্রকৃতই উপযোগী আয়বর্ধক ও কর্মসংস্থানমূলক । তাহলেই নিশ্চিত হবে এ দেশের জনগণের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রকৃত অর্থেই ইসলামী শরীআহ্র কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশক ও সাল
	আল-কুরআন আল-কারীম	ইফাবা, ১৯৯৯ খ্রি.
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনুদিত	তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র.) অধ্যাপক আখতার ফারুক অনুদিত	তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
শাহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহ্‌মুদ আলূসী	তাফসীরে রূহুল মা'আনী	দারুইহ্‌ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.
আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.) সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত	তাফসীরে তাবারী শরীফ	ইফাবা, ১৯৯৪ খ্রি.
ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম ড. আবদুল্লাহ্ আল-মারূফ	আত্ তাফসীর আল-কাবীর	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
আবুল কাসেম জারুল্লাহ আল-যামাখশারী	তাফসীরে কাশ্‌শাফ	মাকতাবাতু মিশর, মিশর, তা.বি.
কাযী নাসিরুদ্দীন বায়দাভী	তাফসীরে বায়দাভী	আল-মাকতাবাতু আত্-তাওফীকিয়্যাহ মিশর, তা.বি
মুহাম্মদ রশীদ রেজা	তাফসীরুল মানার	দারুল ফিক্‌র,বৈরুত, লেবানন, তা. বি
শেখ ইসমাঈল হাক্কী আল-বারাসী	তাফসীরে রূহুল বায়ান	দারু ইহ্‌ইয়ায়িত-তুরাসিল আরাবী বৈরুত, লেবানন, ১৯৭৫ খ্রি.
কাযী মুহাম্মদ ছানা উল্লাহ পানীপথী, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত	তাফসীরে মাযহারী	ইফাবা, ১৯৯৭ খ্রি.
সাইয়েদ কুতুব শহীদ-হাফেজ, মুনির উদ্দীন আহ্মদ কর্তৃক অনূদিত	তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন	আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার ২০০৪ খ্রি.
আবূ বকর আহমাদ বিন আলী যাস্‌সাস (র.), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) কর্তৃক অনূদিত	আহকামুল কুরআন	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.
মুফতী মহাম্মদ শাফী, অনূ ও সম্পাদনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন	তাফসীর মা'আরিফুল কোরআন	ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.
শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্-সাবূনী	তাফসীরু আয়াতিল আহকাম্ মিনাল-কুরআন	দারুস্ সাবুনী, মদীনা, সৌদী আরব, ২০০৭ খ্রি.
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্মদ আল-কুরতবী	আল-জামিউ লি আহ্‌কামিল কুরআন (তাফসীর কুরতবী)	দারুল হাদীস আল-কাহেরা, মিশর, ১৯৯৬ খ্রি.
আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরাবী	আহকামূল কুরআন	দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৭ খ্রি.
মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী	তাফসীর ফাতহুল কাদীর	দারুল মাআরিফ, বৈরুত, লেবানন, তা. বি
A.Yusuf Ali	The Glorious Quran	Published by American Trust. America, 1977 A.D
Muhammad Khalilur Rahman	Clarion Call of the Eternal Quran	Published by Mrs. Hafsa Hossain & Associeates Lalmatia, Dhaka, 1991 A.D

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসিম হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ রাগিব ইসফাহানী	আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন	আল-মাকতাবা আত্‌তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, তা.বি
শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ, মুহাদ্দিস-ই দেহ্‌লভী	আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত্‌-তাফসীর	কিতাবিস্তান, দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া, তা.বি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সূরা ফাতিহার তাফসীর	খায়রুন প্রকাশণী, ২০০৭ খ্রি.
ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক	সূরা ফাতিহা মর্ম ও শিক্ষা	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
ড. মুহাম্মদ শাফিকুল্লাহ্‌	'উলূমুল-কুরআন	আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া ২০০২খ্রি.
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী	'উলূমুল-কুরআন	Quranic Studies, Karachi 2005 A.D.
আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী	সহীহ্‌ আল-বুখারী	মাকতাবাহ্‌ মোস্তফাইয়্যাহ দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, তা.বি.
আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী	সহীহ্‌ মুসলিম	কুতুবখানা রশিদিয়া , দিল্লী, ইন্ডিয়া , তা.বি.
আবূ-ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা	জামিউ তিরমিযি	আমিন কোম্পানী, উর্দূবাজার, দিল্লী, ভারত, তা. বি.
আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুআইব	সুনানু নাসাঈ	মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ ইউ,পি,ভারত, তা. বি.
আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস	সুনান আবূ দাউদ	আল মাকতাবা আল-মাজীদি কানপুর, ভারত, তা.বি.
আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজিদ	সুনান ইব্‌ন মাজাহ্‌	মাকতাবাহ্‌ মোস্তফাইয়্যাহ
মালিক ইবন আনাস ইবন্‌ মালিক মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনুদিত	মুআত্যা	ইফাবা, ২০০১ খ্রি.
আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী আল-বায়হাকী	আস-সুনান আল-কুবরা	দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, লেবানন, তা. বি
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্‌-দারেমী	সুনানু দারেমী	কাদীমি কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান তা.বি
আলী ইব্‌ন উমর আদ্‌-দার কুতনী	সুনানু দার কুতনী	ইলমুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮২খ্রি.
ইবনুল আসির	জামিউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল (সা.)	দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্‌ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮০ খ্রি.
আহমদ ইব্‌ন হাম্বল অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনূদিত	সুনানু আহমদ ইব্‌ন হাম্বল	ইফাবা,২০০৩খ্রি.
শেখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌	মিশকাতুল মাসাবীহ্‌	দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্‌ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮০ খ্রি.
শাহাবুদ্দীন আহমদ ইব্‌ন হাজার আসকালানী	ফাতহুল বারী	দারু ইহ্‌ইয়ায়িত্‌ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.
বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্‌ন আহমদ আইনী	উমদাতুল কারী	তুরাসিল আরাবী; বাইরুত লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.
ইমাম বাগভী	শারহুস্‌ সুন্নাহ	আল-মাকতাবাহ্‌ আল-ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

		১৯৭৯ খ্রি.
শেখ আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী	কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্ওয়াল ওয়াল আফ'আল	আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩৬৪ হি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০খ্রি.
মুফতী মুহাম্মদ আবূ ইউসুফ	ইলমুত তাফসীর	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.
মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান	ইলমুল হাসীদ	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.
ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান	ইলমুল ফিক্হ	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.
ড. মুহাম্মদ আ-তাহাহান অনু. ড. মুহাম্মদ জামালউদ্দীন	হাদীসের পরিভাষা	ইফাবা, ২০১০ খ্রি.
ইবনুস সালাহ	উলূমুল হাদীস	আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়াহ মদীনা, সৌদী আরব, ১৩৮৬ হি.
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী অনু.ড. মাহফুজুর রহমান	ইসলামী শরীআতের বাস্তবায়ন	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি
মুহাম্মদ তাকী আমিনী; অনু. আবদুল মান্নান তালিব	ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামী শরীআতের উৎস	খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬ খ্রি.
লেখক মন্ডলী	ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
ড. মুসতফা হুস্‌নী আস-সুবারী অনু. এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম	ইসলামী শরীআহ্ ও সুন্নআহ্	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম	ইমাম আযম আবূ হানীফা	ইফাবা ২০০৭ খ্রি.
ড. আ.ক.ম আবদুল কাদির	ইমাম মালিক(র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা	ইফাবা ২০০৪ খ্রি.
আবদুর রহমান আল-জুযাইরী	আল-ফিকহু আলা আল-মাযাহিবিল আরবাআহ্	আল-মাকতাবাতু আল-আসরিয়াহ বৈরুত, লেবানন ২০০৩ খ্রি.
সম্পাদক, বাদশাহ আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর, ইফাবা কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী	ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.
বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর (র.) অনূঃ মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্	আল-হিদায়া	ইফাবা, ২০০১ খ্রি.
খালিদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-জুরাইসী	আল-ফাতাওয়া আশ-শারইআহ্ ফিল-মাসাইলিল আসরিয়াহ	আল-মামলাকাতুল আরাবিয়া আল-সাউদিয়া, ১৯৯৯ খ্রি.
আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র.) অনূ. হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, সম্পাদনায় অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান	মিনহাজুস্ সালেহীন	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন	ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	যাকাত ও সাদাকার মাসআলা-মাসায়েল	ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী	শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

অনু: মোঃ কারামত আলী নিযামী	কারবার	
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) অনূ: মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম	কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে সুদ ঘুষ ও ঋণ গ্রহণের বিধান	দৃষ্টি প্রদাশ, ২০০৮ খ্রি.
মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আত্-তুয়াইজরী সংকলন: মোঃ নুরুল ইসলাম মনি মোঃ রফিকুল ইসলাম	রাসূল (সা.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে	পিস পাবলিকেশন্স ২০১১ খ্রি.
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামে হালাল-হারামের বিধান	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.
আল্লামা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল ইহসান অনু. ড. খ.আ.ন.ম. আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর	ফিকহুস্ সুনানি ওয়াল আছার (হাদীসভিত্তিক ফিক্হ)	ইফাবা, ২০১০ খ্রি.
শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের আওদা অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী	ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
গাজী শামছুর রহমান	মুসলিম আইনের ভাষ্য	খোশরোজ কিতবমহল ২০০১ খ্রি.
Dr. R.K Sinha	The Musim Law	Central Law Agency. Allahabad, India, 1995 A. D.
ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন ও শাহনাজ পারভিন	ইসলামিক জুরিপপ্রুভেন্স ও মুসলিম আইন	ধানসিড়ি 'ল' বুকসেন্টার ২০০৭ খ্রি.
অধ্যক্ষ এ এ এম মনিরুজ্জামান	ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন	সামছ পাবলিকেশন্স ২০০৯ খ্রি.
সৈয়দ হাসান জামিল	চুক্তি আইন	সামছ পাবলিকেশন্স ২০০০ খ্রি.
আহমদ হাসান অনূ. মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার	ইসলামী উসূলে ফিক্হ	বি.আই.আই.টি ২০০৪ খ্রি./১৪২৪ হি.
আল্লামা শাতিবী	কিতাব আল-ই'তিসাম	দার আল-ফিক্র বৈরুত, লেবানন, ২০০৩ খ্রি.
আল্লামা শাতিবী	আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিশ-শারীআহ্	আল-কাহেরা: মাকতাবাতু আত্-তাওফিকীয়া, ২০০৩ খ্রি.
আল্লামা মুল্লাজিওন	নুরুল আনোয়ার	আল-কাহেরা: মাকতাবাতু আত্-তাওফিকীয়া, ২০০৩ খ্রি.
নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	ইসলামী দর্শনের রূপরেখা	ইফাবা ১৪২০ হি.
ড. আমিনুল ইসলাম	মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি	নওরোজ কিতাবিস্তান ২০০১ খ্রি.
ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ অনূ. মুহাম্মদ লুতফুল হক	ইসলাম পরিচয়	ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.
লেখক মন্ডলী কর্তৃক রচিত	ঈমান ও ইসলাম	ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.
মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী অনূ. আব্বাস আলী খান	ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ	আধুনিক প্রকাশনী ২০০৭ খ্রি.
সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী অনূ. সৈয়দ আবদুল মান্নান	ইসলাম পরিচিতি	আধুনিক প্রকাশনী ২০০৪ খ্রি.
মুহাম্মদ সিরাজুল হক	ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন	ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান	ব্যবসায় আইন	যমুনা পাবলিশার্স ২০০৯ খ্রি.
ড. মঞ্জুর কাদের	ফরেন এক্সচেঞ্জ আইন ম্যানুয়েল	সামছ পাবলিকেশন্স ২০০৯ খ্রি.
সালামত আলী খান অনূ. মোহাম্মদ মোবারক শাহ্	ইসলামে ফৌজদারি আইন	বাংলা একাডেমী ১৯৯৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Abul Hasan M. Sadeq Aidit Ghazali (Edit.)	Readings in Islamic Economic Thought	IFABA, 2006 A.D
DR. Sabahuddin Azmi	Islamic Economics	Good word Books Pvt. Ltd. New Delhi, India 2009 A.D.
Farhad Nomani and Ali Rahnema	Islamic Economic Systems	Business Information Press. Kualalumpur, Malaysia, 1995, A.D.
Deina Abdel kader	Social Justice in Islam	Good word Books Pvt. Ltd. New Delhi, India 2003 A.D.
M. Zohurul Islam FCA	An Analysis of the Development of Socio-Economic Thought	BIIT, 2008 A.D
M. Zohurul Islam FCA	Accounting, Philosophy Ethics and Principles : The Islamic Perspective	BIIT, 2000 A.D
Professor Dr. Muhammad Loqman (Edit.)	Management Islamic Perspective	BIIT, 2008 A.D.
G.F Stanlake	Starting Economics	Longman, London 1999 A.D.
Michael Parkin	Microeconomics	Pearson Addition, New York, 2010 A.D.
Samuelson, Nordhaus	Economics	Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi, 2008 A.D
Robert E. Hall. John B. Taylor	Macro Econmics	W.W. Norton & Co. London, 1988 A.D
James C.Van Horne and John M. Wachowicz, JR	Fundamentals of Financial Management	FT Prentice Hall, Singapore, 2008 A.D
Ritter, Silber, Udell	Principles of Money Banking & Financial Market	Pearson Addison Wesley, New York, 2004 A.D
Shukesh Chandra Zoarder	Principles of Econmics	Millenium Publications 2010 A.D.
Dr. A.R. Khan	Bank Management : A Fund Emphasis	Decent Book House 2009 A.D
M.C. Vaish	Money Banking Trade and Public Finance	New Age International (p) Ltd. publishers New Delhi, India 1997 A.D.
T.T. Sethi	Money Banking and International Trade	S.Chand & Company Ltd. New Delhi, 1999 A.D
Prof. R.C Gupta	History of World Civilisations	King Book's New Delhi, 1998 A.D.
J.E. Swain	A History of World Civilization	Eurasia Publishing House (Pvt) Ltd. New Delhi, 1994 A.D.
K. C. Shekhar Lekshmy Shekhar	Bankin g Theory and Practice	Vikash Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, India 2006 A.D
Montosh Chakrabarti	International Economics	Economy Publishers 1997 A.D.
অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও প্রয়োগ	কনফিডেন্স, ২০০৩ খ্রি.
ড. এম উমর চাপরা অনূ. ড. মাহমুদ আহমদ	ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	বিআইআইটি ২০০০ খ্রি.
ইরফান মাহমুদ রানা	হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
অনূ. জয়নুল আবেদীন মজুমদার এম রুহুল আমিন	ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট	বিআইআইটি ২০০৩ খ্রি.
অনূদিত ও সম্পাদিত ড. এম. উমর চাপরা	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে	বিআইআইটি, ২০১১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

অনূ. ড. মাহমুদ আহমদ	অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ	
মাওলানা হিফজুর রহমান অনূ. মাওলানা আবদুল আউয়াল	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	ইফাবা, ২০০০ খ্রি.
ড. এম উমর চাপরা অনূ. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও সহযোগী বৃন্দ	ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	বিআইআইটি, ২০১১ খ্রি.
ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন অনূ. আবদুল মতিন জালালাবাদী	ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ	ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.
সদরুদ্দীন ইসলাহী অনূ. আবদুল মান্নান তালিব	ইসলামের সমাজ দর্শন	আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.
গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত সমীক্ষিত ও সম্পাদিত	আল-কুরআনে অর্থনীতি	ইফাবা, ২০০৩ খ্রি./১৪২৪ হি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামের অর্থনীতি	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.
মুহাম্মদ আকরাম খান অনূ. নুর হোসেন মজিদী	রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা	ইফাবা, ২০০৯ খ্রি.
শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম	গ্রন্থমেলা, ২০০৩ খ্রি.
এ. জেড . এম শামসুল আলম	ইসলামের অর্থনীতির রূপরেখা	ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী অনূ. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ	আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২৪ হি.
গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংকলিত	ইসলামী অর্থনীতি	ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.
এম.এ হামিদ অনু. ও সম্পাঃ প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	ইসলামী অর্থনীতি	লেখক, ২০০২ খ্রি.
এ.কে.এম রফিক উদ্দিন আহমেদ	ইসলামী অর্থনীতি	ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৭ খ্রি.
মোঃ হেদায়েত উল্লাহ্	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৯ খ্রি.
শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	ইসলামী অর্থনীতির নির্বাচিত প্রবন্ধ	দি রাজশাহী স্টুডেন্টসওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ খ্রি.
ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন	ইফাবা, ২০১০ খ্রি.
আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া	ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ	কাওমী পাবলিকেশন্স.২০০৩ খ্রি.
মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) অনূ. কারামত আলী নিযামী	ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা	ইফাবা, ১৪১৬ হি.
সাইয়েদ কুতুব শহীদ অনূ. আবদুল খালেক	ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা	আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.
ড. আব্দুল হামিদ আহমাদ আবু সুলাইমান অনূ. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার	ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	বিআই আই টি ২০০২ খ্রি.
আবদুল রশিদ মতিন অনূ. এ. কে. এম সালেহ উদ্দীন	রাষ্ট্র বিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত	বিআই আই টি ২০০৮ খ্রি.
মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত	কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.)	ইফাবা, ২০০৮ খ্রি.
গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	ইসলামী দর্শন	ইফাবা, ১৪২৫ হি.
গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত	সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম	ইফাবা, ১৪২২ হি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সুদমুক্ত অর্থনীতি	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.
ফারিশতা জ. দ. যায়াদ	যাকাতের আইন ও দর্শন	ইফাবা, ১৯৯২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

অনূ. হুমায়ুন খান		
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	যাকাত	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী অনূ. মাওলানা মহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামের যাকাত বিধান	ইফাবা, ২০০৮ খ্রি
আনু মাহমুদ	বাংলাদেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চিত্র	এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার	খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.
মোহাম্মদ লুৎফুর হক প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশের অর্থনীতি	বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ২০০১ খ্রি.
মোঃ মাসুম আলী,মোঃ নুরুল আলম	অর্থনীতি	আইডিয়েল লাইব্রেরী ১৯৯৫ খ্রি.
অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	মানব সভ্যতার ইতিহাস	বুক চয়েস, ২০০১ খ্রি.
এম আকবর আলী	বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	মালিক লাইব্রেরী ২০০২ খ্রি.
মোঃ আবদুল আজিজ, জি. আর. খান	মুদ্রাতত্ত্ব ব্যাংকিং সরকারী অর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি	আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৬ খ্রি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলাম ও মানবাধিকার	খায়রুন প্রকাশনী ২০০২ খ্রি.
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী অনূ. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ আখুঞ্জি	ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা	আহসান পাবলিকেশন্স ২০০৫ খ্রি.
মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা সম্পাদিত	বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)	ইফাবা, ১৪২৮ হি.
ড.মোহাম্মদ জাকির হুসাইন	আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ইফাবা, ১৪২৫ হি.
ড. মোঃ আশরাফ আলী খান ড. মোঃ আলাউদ্দীন	আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা	আজিজিয়া বুক ডিপো ২০০৯ খ্রি.
ড. শান্তি রঞ্জন দাশ ও সহযোগীবৃন্দ	ব্যাংকিং ও বীমা	সমন্বয় প্রকাশন, ২০০৮ খ্রি.
ড. এ. আর. খান	উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং	এস. এস. পাবলিকেশন্স ১৯৯৯ খ্রি.
মফিজুল ইসলাম ও সহযোগীবৃন্দ	আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি	বুক্সএন্ড বুকস পাবলিকেশন্স ১৯৯৬ খ্রি.
আর. এ. হাওলাদার সৈয়দ আশরাফ আলী	ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থা	আত্মপ্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.
মোহাম্মদ ওসমান গণি	প্রায়োগিক ব্যাংকিং ও শাখা ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল	মুক্তদেশ, ২০০৯ খ্রি.
.সৈয়দ আশরাফ আলী	ফরেনএক্সচেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন	মাওলা ব্রাদার্স ২০০৫ খ্রি.
কামাল উদ্দীন	বিশ্ব সভ্যতা পরিক্রমা ও বাংলাদেশ	প্রাচীন প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি.
ড. মোঃ লিয়াকত আলী খান ও সহযোগীবৃন্দ	অর্থ, ব্যাংকিং , আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সরকারি অর্থব্যবস্থা	সমন্বয় প্রকাশনী, ২০১১খ্রি.
মজিবুর রহমান সহ. মো: আবুল হাসানাত	ব্যাংকিং	মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রি.
মাহমুদ হাসান	বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা ও বৈদেশিক গ্যারান্টি	আলীগড় লাইব্রেরী, ২০০২ খ্রি.
এম. এ. ইউসুফ এম. আর. সিনহা	বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন রীতি ও পদ্ধতি	পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.
মহাম্মদ উল্লাহ্	ব্যাংক গ্যারান্টি	সাজেদা আক্তার, ২০০৬ খ্রি.
L. R. Chowdhury	A Text Book on Foreign Exchange	L. R. Chowdhury 2006 A.D.

Dhaka University Institutional Repository

C. Jeevanandam	Foreign Exchange Practice, Concepts & Control.	Sultan Chand & Sons. New Delhi, 2005 A.D.
H.L Bedi & Associates	Theory and Practice of Banking	Jeevandeep Prokashani, 1980 A.D.
M. Taheruddin	Banking and Development Issues in Bangladesh	Hakkani Publishers 2005 A.D
Lester V. Chandler	The Economics of Money and Banking	S. Chand & Comp. 1958 A.D.
M. H. De Kock	Central Banking	Longman, London 1956 A.D
Adam Smith	An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations	Longman, London 1956 A.D
J.M. Keyenes	The General Theory of Income, Employment and Interest	MacMillan, London, 1935 A.D.
O.S. Srivastava	Bank Management including Monetary Theory and Financial Management	Kalyani Publishers, New Delhi, India, 2002 A.D.
প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ও সহযোগীবৃন্দ	উচ্চতর ব্যাংকিং ও বীমা	কাজী প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.
প্রিন্সিপাল আছাদ উল্লাহ ও সহযোগীবৃন্দ	ব্যাংকিং ও বীমা	কমার্স পাবলিকেশন্স ২০০৫ খ্রি.
Board of Editors	Text Book on Islamic Banking	Islamic Economics Research Bureau. 2008 A.D
Shahid Hasan Siddiqui	Islamic Banking	Rayal Book Company Karachi, Pakistan 1994 A.D
Mohammad Muslehuddin	Banking and Islamic Law	Islamic Book Service Danh,Bew-Dekhi,2006 A.D
Mohammad Athar Ali	Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid	BIIT, 2001 A.D
Yahia Abudul-Rahman	The Art of Islamic Banking and Finance Tools & Techniques for community-Based Banking.	Yohn Wiley & sons,Inc. New yerey,U.S.A 2010 A.D
Moulana Mahammaad Imran Ashraf Osmani	Shirkar wa Mudharibat Asre Hazer me	Idaratu Maarif, Karachi, Pakistan, 2006 A.D.
Mufti Muhammad Taqi Osmani	Ghair-e-sudi Bankary	Quranic studies publishers 2009 A.D.
Al-Ghazali	Ihya'Ulum al-Din	Mustafa Babi al-Halabi cairo, Egypt, 1939 A.D.
Al-Ghazali	Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk	Maktaba al-Jundi cairo, Egypt, 1967 A.D
Al-Ghazali	Al-Mustafa min'Ilm al-Usul,	Maktaba al-Jundi cairo, Egypt,1322 A.H.
Ibn Taimiyyah,Ahmad Ibn Abd al-Halim	Al-Siyasah al- Shar'iyyah fi Islah al-Rai wa'l Raiyah,	Maktabah Dar al-Bayan,Damascus 1985 A.D.
Ibn khaldun	Muqaddiamah	Dar al-Qalam,Beirut Lebabon 1981 n.d.
Shah Wali Allah	Hujjah Allah al-Baligha	Dar Al Marifa,Beirut Lebabon, 1981 n.d.
Masudul Alam Chowdhury	Contributions to Islamic Economic Theory: A study in social Economics	MacMillan, 1986 4.D.
Ziauddin Sarder	Islamic futures : The shape of Ideas to come.	Monsel. London.1985 4.D.

Dhaka University Institutional Repository

Timur kuran	The Economic System in Contemporary Islamic thought.	Cambuidge Mass ,Harvard University Press,1971 A.D
Muhammad Nejatullah Siddiqui	Islam ka Nazariya-e Milkiyat.	Islamic Publications Lahore, Pakistan,1968 4.D.
Abraham L. Udovitch	Partnership and Profit in Medieval Islam	Princeton University press, Princeton N.D 1970 A.D.
Muhammad Nejatullah Siddiqui	Shirkat aur Mudarabat Ke Shar'sl Usul	Islamic Princeton, Lahoru, Pakistan 1969 A.D.
Muhammad Hifzur Rahman	Islamic Ka Iqtisadi Nizam	Naawat al-Musannifin Delhi , India, 1942 A.D.
J.A Schumpeter	History of Economic Analyssis	Oxford Urivesily Press, London, 1959 A.D
Barry Gordon	Economic Analysis Before Adam Smith Hesiod to Lessius	MacMillan, London, 1975 A.D.
Jeen David.C.Baulakia	Ibn Khalaun: A Fourteenth Century Economist : Journal of Political Economy	79 (5) Sept-Oct,1971 A.D
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী অনু. মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন	ইসলামী ব্যাংকিংও অর্থায়ন পদ্ধতি	মাকতাবাতুল আশরাফ ঢাকা, ২০০৫./১৪২৬হি.
ড. সাইয়েদ আল-হাওয়ারী অনু. এমএমএএম মনাওয়ার আলী একেএ ম মফিজুল ইসলাম	ইসলামী ব্যাংকিং	কামিয়াব প্রকাশন,ঢাকা,২০০৪খ্রি.
ড. আহমাদ আন নাজার ও অন্যান্য	মিয়াতু সুয়াল জোয়াব হাওলাল বুনুকিল ইসলামীয়াহ	জেদ্দা সৌদি আরব ১৯৭৮খ্রি./১৯৩৮হি.
ড. গরীবুল জামান	আল মাছারিফ ওয়া বুয়ুতুতু-তামবীলিল ইসলামীয়াহ	দারুশ্ শুরুক লিন্নশরী ওয়াত তিবায়াহ, জেদ্দা, সৌদি আরব, ১৩৯৮ হি.
আল ইত্তেহাদ আদ্দুয়ালী লিল বুনুকিল ইসলামীয়াহ	আল-মাওসুয়াহ আল আমালিয়া লিল বুনুকিল ইসলামীয়াহ	GCIBFI, 1991 A.D.
ড. সামী হাসান হামুদ	তাওবীরুল আমাল আল মাছরাফিয়াতি বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শারীআতুল ইসলামীয়াহ	দারুত তুরাছ ,আল-কাহেরা, মিশর,১৯৭৬খ্রি.
ড. শাওকী ইসমাইল সাহাতাহ্	আল বুনুকীল ইসলামীয়াহ	দারুস তুরাছ, আল কাহেরা , মিশর, ১৯৭৬ খ্রি.
মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী	ইসলামী ফিক্হের আলোকে সুদ বিহীন ব্যাংকিং : আপত্তি সমূহ ও তার পর্যালোচনা	মাকতাবাতুল ইসলাম ঢাকা, ২০১২ খ্রি.
আব্দুর রকীব, শেখ মোহাম্মদ	ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি	আল -আমীন প্রকাশন ২০০৪খ্রি.
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী অনুঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান	সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২খ্রি.
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বিএম হাবিবুর রহমান সম্পাদিত	ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীয়াহ পরিপালন প্রয়োগ পদ্ধতি	কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬খ্রি.
মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি, কেন কিভাবে ?	মাহিন পাবলিকেশন্স ২০০২খ্রিঃ

Dhaka University Institutional Repository

এ.এ.এম হাবীবুর রহমান	ইসলামী ব্যাংকিং	হেলেনা পারভীন (বীমা) উত্তর যাত্রাবাড়ী , ঢাকা ২০০৪খ্রি.
আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	ইফাবা ,২০০৪খ্রি.
ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী অনু. মুহাম্মদ কারামত আলী নিযামী	সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা	হাকীম মুহাম্মদ মুস্তফা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৫খ্রি.
ইমরান নযর হোসেন অনু. মাকসুদা বেগম ও ফারাজানা ইশরাৎ	কুরআন ও সুন্নাহ সুদ নিষিদ্ধকরণ	মাহমুদ ব্রাদার্স, ২০০৭খ্রি.
কাজী ওমর ফারুক	ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও অনুশীলন	মুক্তদেশ , ২০০৬খ্রি./ ১৪১৭হি.
কাজী ওমর ফারুক	ইসলামী ব্যাংকিং পূর্ব শর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব	আহসান পাবলিকেশন ২০০৬খ্রি.
বিচারপতি মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী	সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়	ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা ২০০৮খ্রি.
অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	সুদ এক ভয়াবহ অভিশাপ : পরিত্রানের উপায়	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , ঢাকা,২০১১খ্রি.
আবু হেনা মোস্তফা কামাল	মানব সম্পদ উন্নয়ন	ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.
হারুনুর রশীদ খান	ইসলামে শ্রমনীতি	ইফাবা,২০০৭ খ্রি.
সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী	'উশর	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার১৯৯৫ খ্রি.
ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকি ড. এ.কে.জাকী নাদাভী	ইসলামী ব্যাংকিং ও যাকাত	ইফাবা , ১৯৮৪ খ্রি.
মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান	দারিদ্র বিমোচন ও মানব মেধায় বিশ্বনবীর আদর্শ	ষ্টাডি পাবলিকেশন্স ২০০২ খ্রি.
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ	দারিদ্র বিমোচনে যাকাত প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	ইফাবা , ২০০৯ খ্রি.
ভি.আই লেনিন অনু. দাউদ হোসেন	বাজার প্রসঙ্গ	সংঘ প্রকাশন,২০০৮ খ্রি.
কার্ল মার্ক্স	মজুরি, শ্রম ও পুঁজি	সংঘ প্রকাশন, ২০০২ খ্রি.
নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম	ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.
অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন সম্পাদিত	দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম	ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খ্রি.
ড. আহমদ আলী	সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলামী দৃষ্টি কোন	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,ঢাকা-২০১১ খ্রি.
মুহাম্মদ শামছুল হুদা মুহাম্মদ শামসুদ্দোহ সম্পাদনায়: ড. আবূ বক্কর রফিক	ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ শরীআহর নীতিমালা	জনসংযোগ বিভাগ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১১খ্রিঃ
Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)	Shahriah Standard (আল-মাআয়ীরিশ-শারীআ)	AAOIFI, Bahrain, 2002.A.D.
ড. আলী আহমদ আস-সালুস	মাওসূআতুল ক্বাদায়া আল ফিক্বাহিয়্যাহ আল মুআছারাহ ওয়াল ইক্বতিছাদিল ইসলামী	দারুস সাক্বাফা, কাতার, ১৯৯৬ খ্রি.
ড. ইউসুফ আল কারযাভী	বাইউল মুবারাহা লিল আমিরি বিশ্শিরা কামা তুজরীহিল	দারুল কালাম , কুয়েত,১৯৮৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ড. আব্দুল আজিম আবু যায়দ	বাইউল মুরাবাহাতি ওয়া তাতবিক্বাতুহুল মুআছারাহ ফীল মাছারিফিল ইসলামিয়্যাহ	দারুল ফিক্র, দামেশ্ক, ২০০৪ খ্রি.
OIC, ফিক্হ একাডেমী	আল-ফাতাওয়া আশ-শার'ইয়্যাহ ফিলমাসাইলিল ইক্বতিছাদিয়্যাহ	কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, ১৯৮৫খ্রি.
আস্‌সাইয়িদ সাবিক্ব	ফিকহুস-সুন্নাহ	দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১৯৭১ খ্রি. বৈরুত, লেবানন,
ড. ওয়াহাবাতুয যুহাইলি	আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু	মাকতাবা হাক্কানিয়াহ, পেশওয়ার, পাকিস্তান ২০০২ খ্রি.
Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani	Meezanbanks Guide to Islamic Banking	Darul Isha'at, Karachi, Pakistan, 2006 A.D.
ড. মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী অনূ. এম. এম ছলিমুল ওয়াহেদ	ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা	
ইকবাল কবীর মোহন	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	জেরিন পাবলিশার্স, ২০১০ খ্রি.
শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব	আহসান পাবলিকেশন ২০০৪খ্রি./১৪২৫হি.
আল্‌হাজ্ব কাজী মোহাম্মদ গৌছ মিয়া এডভোকেট	ইসলাম ও উত্তরাধিকার আইন	মিসেস জায়েদা খান ঝিগাতলা, ঢাকা-১২০৯, ১৯৯৫ খ্রি.
Ausaf Ahmed	Income Determination in an Islamic Economy	Jeddah: CRIE. King Abdul Aziz University, 1987 A.D
M. Raihan Sharif	Fuidlines to Islamic Economics: Nature, concepts and prinicples	Dhaka: BIIT, 1996 A.D
Afzalur Kahman	Ecomomic Doctrines of Islam (3 Vols.)	Lahore: Islamic Publication Ltd. 1874 A.D
Syed Nawab Haider Naqbi	Islam, Economics and Society	London: Kegan paul, 1994 A.D.
M. Abdul Mannan	The making of Islamic Economic Society	Cairo: IAIB, 1984
M. Akram Khan	An Introduction of Islamic Economics	Herndon. Va : IIIT, 1994 A.D
Monzer Kahf (ed.)	Lessons in Islamic Economics, Vol.1&2	Jeddah: IRTI/IDB. 1998 A.D
Ziauddin Ahmed	Islam, Poverty and Income Distribution	Leicester: The Islamic Foundation, 1991 A.D
M. Fahim Khan (ed.)	Distribution in Macro Economic framework An Islamic Perspective	Lslamabad: IIIF, IIU, 1989 A.D
M. Abdul Mannan	Islamic Economics: Theory and Practice	Cambridge: The Islamic Academy, 1986 A:D
Mohammad Ariff (ed.)	Monetary and Fiscal Economics of Islam	Jeddah:CRIE King Abdul Aziz University, 1982 A.D.
Masudul Alam Chowdhury	Money in Islam	London: Routiedge 1997 A.D.
Abdul Hamid El-Ghazali	Profit Verses Bank Interest in Econiomic Analysis and Islamic Law	Jeddah: IRTI/IDB, 1994 A.D.
M. Nejatullah Siddiqi	Riba, Bank Interest and the Rationale of its prohibition	Jeddah: IRTI/IDB 2003 A.D.
Anwar Iqbal Qureshi	Islam and The Theory of Interest	Lahore: Sh. Mohammad Ashraf, 1994. A.D
Ausaf Ahmed	Development And Problems	Jeddah: IRTI/IDB 1987 A.D.

Dhaka University Institutional Repository
of Islamic Banks

M. Umer Chapra. And Tariqullah Khan	Regulations and Supervision of Islamic Banks	Jeddah: IRTI/IDB, 2000 A.D
Alan E. Hammad	Islamic Banking: Theory and Practice	Cincinato, Ohio: Zakal and Research fondation, 1989
Ataul Haq (ed.)	Readings in Islamic Banking	Dhaka: IFABA, 1987
M. Nejatullah Siddiqi	Banking Without Interest	Lecester: The Islamic Foundation, 1983 A.D
Manwar Iqbal	Islamic Banking andfinance: Current Development in Theory and Practice	Leicester: The Islamic Foundation, 2001
Manwar Iqbal	Challenges Facing Islamic Banking	Jeddah: IRTI/IDB 1998 A.D
S.Mohisn Khan and Abbas Mirakhor (eds.)	Theortical Studies in Islamic Banking and Finance	Houston, Texsas: Institute for Research and Islamic Studies, 1987 A.D
Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan	Islamic Financial Instruments for public Sector Resource Mobilization	Jeddah: IRTI/IDB 1997 A.D
Ausaf Ahmed	Contemporary Practices of Islamice Financing Technigues.	Jeddah: IRTI/IDB 1993
Mohammad Ariff and M.A. Mannan (eds.)	Develping a system of Financial Instrument	Jeddah: IRTI/IDB, 1990 A.D
Azidi Sattar (ed.)	Resource Mobilisation and Investment in an Islamic Framework	Jeddah: IRTI/IDB 1992 A.D.
Monzer Kahf and Tariqullah Khan	Principles of Islamic Financing	Jeddah: IRTI/IDB 1992 A.D
আল্লামা ইব্ন মানযূর	লিসান আল-আরব	দার আল-হাদীস, আল-কাহেরা, মিশর, ২০০৩ খ্রি./১৪৩২ হি.
Nasiruddin	Banking, Finance and Economics Compendium	Mrs. Shamarukh Nasir 64/B, Green Road, Dhaka, 2000 A.D
Cambridge Dictionary org.	Cambridge Advanced Learner's Dictionary (Third Edition)	Cambridge University Press, Cambriged, 2008 A.D.
A.S. Hornby	Oxford Advanced Learner's Dictionary (New 8th Edition)	Oxford, University Press, Oxford, 2010 A.D
Sri Birendra Mohan Das gupta	Samsad English –Bengali Dictionary	Sahitya, Samsad Calcutta, India, 2006 A.D
জামিল চৌধুরী সংকলন ও সম্পাদনায়	বাংলা বানান-আভিধানপরিমার্জিত ও পরিবর্তিত তৃতীয় সংকরণ উচ্চারণসহ	বাংলা একাডেমী ২০০৯ খ্রি./ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
নরেন বিশ্বাস	বাঙলা উচ্চারণ আভিধান পরিমার্জিত পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্ককরণ	বাংলা একাডেমী ২০০৩ খ্রি. ১৪৯
দিলীপদেবনাথ	এভাবে বাংলা লিখুন	রোদ্দুর, ২০০ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত	বাংলাদেশ অথনৈতিক সমীক্ষা ২০১০, ২০১১ ও ২০১২খ্রি.	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি,ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত, সমীক্ষিত ও সম্পাদিত	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০ খ্রি. ২০১০-২০১১খ্রি. ২০১১-২০১২ খ্রি.	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর,২০১১
সম্পাদক: মুহাম্মদ নূরুল হুদা	অর্থনীতি গবেষণা সংকলন সংখ্যা - ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০০১২ খ্রি.	সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢকা, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১২খ্রি.
সম্পাদক আবদুল, মান্নান তালিব	ইসলামী আইন ও বিচার বর্ষ: ৬,৭,৮,৯ ও ১০, সংখ্যা: ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০	বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা। ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ খ্রি.
Islami Bank Bangladesh Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt. Islamic Bank Bangladesh Limited
Al-Arafah Islami Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt Al-Arafah Islami Bank Ltd.
ICB Islami Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt ICB Islami Bank Ltd.
Social Islami Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt Social Investment Bank Ltd.
First Security Islami Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt. First Security Islami Bank Ltd.
Shahjalal Islami Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt. Shahjalal Islami Bank Ltd.
Exim Bank Ltd.	Annual Report 2009,2010, 2011 and 2012	Public Relation Deptt. Exim Islami Bank Ltd.
জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ খ্রি.	জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যংক বাংলাদেশ লিমিটেড
Islami Bank bangladesh Limited	Islami Bank 18 years of Progress	Public Relations Deptt. Islami Bank Bangladesh Limited, 1999 A.D
সম্পাদক, একে এম নাজিরআহমেদ	মাসিক পৃথিবী, ইসলামী গবেষণা পত্রিকা বর্ষ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ সংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা-২০১০, ২০১১, ২০১২ খ্রি.
সম্পাদক প্রকাশক আবদুল জব্বার মেহমান	পাক্ষিক ব্যাংক বীমা ২০তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা	প্রকাশক,আবদুল জব্বার মেহমান ১০৭, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, জুন ২০১১ খ্রি.
সম্পাদক আমির হোসেন চৌধুরী	পাক্ষিক অর্থজগত বর্ষ-১০ সংখ্যা-১৫	সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ডা. নওয়াব আলী টাওয়ার,ই-৭০১ ২৪/এ পুরানা পল্টন,ঢাকা-১০০০